Published with the Financial Assistance of Sangeet Natak Academy, New Delhi

শারদ সম্ভার-২০১৯

চতুর্দশ বর্ষ

TRIPURA THEATRE

14th Year

ত্রিপুরা থিয়েটার

শারদ সম্ভার- ২০১৯

থিয়েটার বিষয়ক নাট্যগ্রন্থ

নাট্যদল ত্রিপুরা থিয়েটার - কর্তৃক উপস্থাপিত

চতুর্দশ বর্ষ
অক্টোবর- ২০১৯

প্রচ্ছদ- অপরেশ পাল, বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী
আগরতলা, ত্রিপুরা

অক্ষর বিন্যাস
মাইক্রো গ্রাফিক্স

ত্রিপুরা থিয়েটারের পক্ষে সভাপতি,
শুভ্রাংশু চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

TRIPURA THEATRE
A Journal of Theatre, a Presentation of
Tripura Theatre, Agartala (Drama Group)
14th Year
October - 2019

Editor : Bibhu Bhattacharjee
Published by : Subhrangshu Chakraborty.
President, Tripura Theatre.

Address : Hospital Road Extn. Gandhighat, Agartala- 799001
M- 09436126846
E-mail : bibhubhattacharjee@rediffmail.com.

Printed at : MICRO GRAPHICS, Mantribari Road, Agartala.

Rs. 250.00

সম্পাদক
বিভু ভট্টাচার্য

উপদেষ্টামন্ডলী
শ্রী সরোজ চৌধুরী (আগরতলা)
শ্রী শিশির দেব (আগরতলা)

সম্পাদকমন্ডলী
শুভ্রাংশু চক্রবর্তী (০৯৬১২২৩৫৮১১)
কমল মজুমদার (০৯৪৩৬৪৫০১৯৩)
মিহিরকান্তি ভট্টাচার্য (৭০০৫১২২৯২৪)
শেখর সি দত্ত (৯৪৩৬১৩৭৭২৯) ও
বিভু ভট্টাচার্য (০৯৪৩৬১২৬৮৪৬)

সম্পাদকীয় সহায়তা
পার্থ সেনগুপ্ত (৯৪৩৬৯০৩৯১৮)

দপ্তর
হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
পিন- ৭৯৯০০১
ফোন ঃ- (০৩৮১)২৩০৪৭৭৫,০৯৪৩৬১২৬৮৪৬।
E-mail : bibhubhattacharjee@rediffmail.com
kamal.majumder111@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
জ্ঞান বিচিত্রা (বুকওয়ার্ল্ড), পুরাতন আর. এম. এস. চৌমুহণী, আগরতলা।
নবসাহিত্য কেন্দ্র, ওরিয়েন্ট চৌমুহণী, আগরতলা।
পুস্তকালয়, সুভাষপার্ক, খোয়াই ও পাতিরাম,
একাডেমি সংলগ্ন ভাস্করের দোকান- কলকাতা।

আমাদের প্রতিনিধি /প্রতিবেদক

ধর্মনগর	ঃ দীপঙ্কর গুপ্ত	- (০৩৮২২-২৩৮০৯৭)
কৈলাসহর	ঃ অরিন্দম চক্রবর্তী	- (০৩৮২৪-২৩২২২৭)
খোয়াই	ঃ জীবন ঘোষ	- (০৯৪৩৬৫৫০২০৮)
কল্যাণপুর	ঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য	- (০৯৪৩৬৫১৫৭৪৫)
আগরতলা	ঃ মিহির কান্তি ভট্টাচার্য	- (৭০০৫১২২৯২৪)
উদয়পুর	ঃ গৌতম সাহা	- (০৭০০৫১০৪০২৯)
বিলোনীয়া	ঃ পিনাক দত্ত	- (০৯৮৬৩৫৩০৪৪৬)
গন্ডাছড়া	ঃ কার্ত্তিক সাহা	- (০৯৪৩৬৪৬৫০০১৩)
লংতরাইভ্যালি	ঃ সঞ্জয় চক্রবর্তী	- (০৭৩০৮২৪৮৬১৪)
শিলচর	ঃ শেখর দেবরায়	- (০৯৪৩৫৭২৩৪৭০)
গুয়াহাটি	ঃ সীতানাথ লহকর	- (০৯৪৩৫৩০৭৯১১)

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়		৯
স্মরণ		
গিরিশ কারনাডের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য	বিভু ভট্টাচার্য	১১
অজিত রঞ্জন মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	শেখর সি দত্ত	১৪
উৎপল দত্ত'র দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার	পার্থ বন্দোপাধ্যায়	১৭
অভিনয় ও ভাষা	পবিত্র সরকার	২৫
কালচারাল হিপোক্রেসি	রথীন চক্রবর্তী	৩৪
হতাশায় যেন ডুবে না যাই	জামশেদ আনোয়ার তপন (ঢাকা)	৩৭
Theatre Perspective in Tripura	Saroj Chowdhury	42
NSD, Agartala Centre, Activities- 18-19	Correspondant	43
An other in the "Neighborhood": A Clay Cart in New York, 1924	Sudipto Chatterjee	49
সহজিয়া সংস্কৃতি	প্রবীর গুহ	৫৫
এ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি ভাবনা	শ্যামল ভট্টাচার্য্য	৬২
শিলচরের নাট্যচর্চা	শেখর দেবরায়	৬৫
একলা মানুষের কথা	দেবানন্দ দাম	৬৯
মুকুট নাটকের ককবরকে অনুবাদ	প্রশান্ত সেনগুপ্ত	৭২
নাট্যভূমি ও শিল্পতীর্থ-এর রৌপ্যজয়ন্তী	কার্তিক বণিক	৭৪
ত্রিপুরা থিয়েটারের সেমিনার	নারায়ণ দেব	৭৬

সূ চি প ত্র

নাটক

পবিত্র তস্কর	চন্দন সেন	৭৯
খেলা	সৌমিত্র বসু	৯৪
স্বখাত সলিলে	শর্মিলা মৈত্র	১১০
শ্যামবাবুর ডায়েরী	কুন্তল মুখোপাধ্যায়	১৪১
স্বীকারোক্তি	অনুপ রায়	১৫১
হেরো রাজার কলন্দর	শুভঙ্কর	১৬৬
ইঁদুরের গপ্পো	অপূর্ব দে	১৮৯
ফালতু	শিবংকর চক্রবর্তী	২০৩
খোলা জানালা	সমীর বিশ্বাস	২২৭
আচমন	সুভাষ বন্দোপাধ্যায়	২৪৩
ম্যাওসংকেত্তন	মলয় ভৌমিক (বাংলাদেশ)	২৬০
অভিযোজন	দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়	২৯৩
অচেনা নিবেদিতা	সঞ্জয় কর	৩০৫
মৃত্যুঞ্জয়ী পল্টু	সৌম্যেন্দু ঘোষ	৩৩৪
ফিনিক্সের পাখা	রুমা মোদক (বাংলাদেশ)	৩৫৫
স্বয়ংপ্রভা	আদিত্য সেন (দিল্লী)	৩৬৬
শিল্পী	বাদল ধর	৩৮২
ভুল মানুষ	বাবুল দাস	৪০০
২২শে শ্রাবণ	নন্দা চৌধুরী	৪৩৭
বৃষ্টিমুখর এক রাতে	শুভ্রাংশু চক্রবর্তী	৪৪৯
বাপুজী	বিভু ভট্টাচার্য	৪৫৫

ত্রি পু রা থি য়ে টা র

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা-৭৯৯০০১: ত্রিপুরা

ত্রিপুরা থিয়েটারের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বছরে ন্যূনতম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, সঙ্গে পুরনো, দু'বছরে একবার আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব, বছরে একবার মহালয়ায় নাটকের বই (ত্রিপুরা থিয়েটার) প্রকাশ , সঙ্গে সেমিনার, ওয়ার্কশপ; এই নিয়ে ত্রিপুরা থিয়েটারের পথ চলা,

২০০৬ থেকে নিয়মিত।

আমাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রযোজনা

রচনা/নাট্যরূপ ও নির্দেশনা - বিভু ভট্টাচার্য

ধরতী আবা (হিন্দুস্থানী জনজাতি মানুষের জীবন যুদ্ধের কাহিনী), **নয়া আন্দাজ** (নবীন আর প্রবীণ প্রজন্মের মননে সংঘাত), **স্বামী বিবেকানন্দ** (জীবন কথা), **পাণিপথের ৪র্থ যুদ্ধ** (হাসির নাটক), **চক্রব্যূহ** (নর্থইষ্টে উগ্রবাদী সমস্যা), **কাবুলিওয়ালা ও কঙ্কাল** (রবিঠাকুরের গল্প অবলম্বনে), **অলকা** (প্রবীণদের সামাজিক সমস্যা), **মতিজানের মেয়েরা** (উইম্যান এমপাওয়ারমেন্ট সম্পর্কে ঢাকার বিশিষ্ট লেখিকা সেলিনা হোসেনের গল্প অনুসরণে) সহ অন্যান্য।

- চলতি প্রযোজনা -

'বাপুজী' (গান্ধীজির জীবন কথা) ও

'অম্লমধুর' হাসির ছোট নাটক

যো গা যো গ

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন ঃ গান্ধীঘাট ঃ আগরতলা - ৭৯৯০০১ ঃ ত্রিপুরা
ফোন ঃ ০৩৮১২৩০৪৭৭৫/০৯৪৩৬১২৬৮৪৬/০৯৪৩৬৪৫০১৯৩
Email- bibhubhattacharjee@rediffmail.com/
kamal.majumder111@gmail.com

মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট অব হর্টিকালচার (MIDH) ২০১৯-২০২০

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রযুক্তি মিশনে (MIDH) **উদ্যান চর্চায় চাষীভাইদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রকল্প**

প্রকল্পের নাম	সরকারী আর্থিক সহায়তার পরিমাণ
ফল চাষ : (Intensive Crop) আনারস/কলা (ড্রিপ ইরিগেশন ছাড়া)	৩২,৮০০/- প্রতি হেক্টার
উন্নত ঘনত্বের চাষ (HDP) আম/মোসাম্বি/লেবু/কাঁঠাল	৩০,০০০/- প্রতি হেক্টার
সবজি চাষ : (গ্রীষ্মকালীন /শীতকালীন	২৫,০০০/- প্রতি হেক্টার
ফুল চাষ: (খোলা মাঠে) গোলাপ	৫০,০০০/- প্রতি হেক্টার
গ্লেডিওলাস/রজনীগন্ধা	৭৫,০০০/- প্রতি হেক্টার
গাঁদা ফুল	২০,০০০/- প্রতি হেক্টার
মশলা চাষ : আদা/হলুদ	১৫,০০০/- প্রতি হেক্টার
গোল মরিচ	২৫,০০০/- প্রতি হেক্টার
জলাধার নির্মাণ/পুকুর খনন:	৯০,০০০/- প্রতিটি
কৃষি যন্ত্রপাতি : পাওয়ার টিলার (8 BHP or above)	৭৫,০০০/- প্রতিটি
মাশরুম স্পন ইউনিট	৬,০০,০০০/- প্রতিটি
পুরনো বাগান সংস্কার (Rejuvenation)	২০,০০০/- প্রতি হেক্টার

আন্ত: রাজ্য/বহি: রাজ্য/ মহিলা ও পুরুষদের জন্য প্রশিক্ষণের বিশেষ সুযোগও রয়েছে। নিকটবর্তী কৃষি/উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টিকালচার (MIDH) বিভিন্ন অনুদান প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা:
উপ উদ্যান অধিকর্তার কার্যালয়
প্যারাডাইস চৌমুহনী, আগরতলা
দূরভাষ ঃ ২৩২ ২৭৭৩

সৌজন্যে
উপ উদ্যান অধিকর্তা
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা : আগরতলা

সম্পাদকীয়

আত্মসমালোচনা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। আমরাও এর ব্যক্তিক্রম নই। আত্মসমালোচনা ব্যতিরেকে যেটা ঘটে সেটা নিশ্চলতা। আবার এটাও সঠিক যে যদিও আত্মসমালোচনা সর্বদা বাঞ্ছনীয় তবু তা আবার কখনো কিছু মানুষের সমালোচনা করার রসদও জোগায়। গত চৌদ্দ বছরে সবই যে আমরা ভাল করতে পেরেছি তা নয় তবে প্রতি বছরেই যে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে তাও সঠিক। তাই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নিজেকে উন্নীত করার ধারাকেই রক্ষা করতে আমরা সতত ক্রিয়াশীল।

বর্তমানে নানা সমস্যার মধ্যে প্রধান হলো নতুন শিল্পী অন্তর্ভূক্তির সংকট। পাওয়া যেমন দুস্কর তেমনি ধরে রাখাও। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে গত ফেব্রুয়ারীতে আমরা যে সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম তার টার্গেট গ্রুপ ছিল পাঁচটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীগণ। দেশ বিদেশের ফ্যাকাল্টিরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত নাট্যশক্তিকে মূল উদ্দেশ্যে কতটা সংহত করা গেছে তা এখনও প্রমাণিত হয়নি।

বর্তমান সময়ে নাট্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। আগরতলায় প্রতি মাসে পূর্ব নির্ধারিত একটি দিনে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা। অনেক নাট্যকর্মীই এই উদ্যোগের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছেন। আশা করা যায় এই উদ্যোগে সদর্থক ফল লাভ সম্ভব হবে। অন্য দিকে নাট্যকর্মীদের আশাহত হওয়ারও কারণ রয়েছে। সরকারী উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব হয়ে গেল। আশার কথা অনেক নূতন দল উঠে এসেছে। আর হতাশার কথা, দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও রাজ্যের অনেক সক্রিয় নাট্যদলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কারণ ধর্মনগর থেকে বিলোনীয়া, সারা রাজ্যে বহু সচল নাট্যগ্রুপ তাদের নাট্যকৃতি প্রদর্শন করার জন্যে একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তাই সকলেই হতবাক!

যাই হোক নাটক একক শিল্প নয়, সমবেত। সংঘবদ্ধতায় এর শক্তি অসীম। যখনই কোন আবেগে সমাজ আন্দোলিত হয় তখনই নাটক জেগে উঠে- জনপ্রিয় এই বিকল্পহীন ধারা হাজার বছর ধরে মহান নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুণির সময় থেকে এখনো পর্যন্ত অব্যাহত। জয় থিয়েটার।

দেশ বিদেশের সকল লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

বিভু ভট্যাচার্য

With Best Compliments from

A
Well Wisher
of
TRIPURA THEATRE

Joynagar, Dashamighat
Agartala, Tripura

গিরিশ কারনাডের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

(১৯৩৮-২০১৯)

বিভু ভট্টাচার্য

ত্রিপুরা থিয়েটারের পক্ষ থেকে ভারতের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাড এর স্মৃতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় নাট্য বা চলচ্চিত্র জগতে যে কত বড় শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা ক্রমশ আমরা গভীরভাবে অনুভব করব, কারণ তাঁর পান্ডিত্য, সৃজনশীলতা, মেধা, দক্ষতা সব মিলিয়ে গিরিশ যেমন বহুবর্ণী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তেমন ব্যক্তিত্ব আজকের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি জগতে বিশেষ করে নাট্যজগতে সত্যিই বিরল।

তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই টিভিতে। বেশ কয়েকবছর আগে টিভিতে একটি জনপ্রিয় সিরিয়েল চলত মালগুড়ি ডেইজ অথবা ইন্দ্রধনুষ। অথবা টার্নিং পয়েন্ট নামে বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা শো তিনি সঞ্চালনা করতেন। ধীরে ধীরে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। গত কয়েকবছর আগে কলকাতায় দেখেছি তার লেখা নাটক তুঘলক। তার নাটকে পাই লোকজ আঙ্গিকে পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক ঘটনার মেলবন্ধন, সঙ্গে রয়েছে স্রষ্টার নিজস্ব অনুভব। তারও আগে বহুরূপী নাট্য পত্রিকায় আমরা পাই চিররঞ্জন ঘোষ অনূদিত হয়বদন নাটকটির বাংলারূপ। পরে জেনেছি এটাই নাকি গিরিশের নাটকের প্রথম বাংলা নাট্যরূপ। এই নাটকে গান লিখে দিয়েছেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

গিরিশের কাহিনী গতানুগতিক নয়। এই নাটকে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে একটা যোগাযোগের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন। হয়বদন হল মাথা বদলের খেলা। সেখানে কপিল ও দেবদত্ত নামে দুটি চরিত্র রয়েছে। তাদের একজনের শরীর অন্যজনের মাথা মিলিয়ে হয় একটা পূর্ণ মানুষ। এই ভাগ হয়ে যাওযায় নায়িকা পদ্মিনী সংকটে পড়ে। কারণ দেবদত্তের রয়েছে মেধা আর কপিলের শরীর। আর পদ্মিনীর মেধা চাই আবার শরীরও। কিন্তু পায় না, ফলে থেকে যায় অতৃপ্তি। আর এ নিয়েই পুরো নাটকটি। নাটকের ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি দেশীয় বেতাল পঞ্চবিংশতি গল্পের সঙ্গে গিরিশ মিলিয়েছেন ইংরেজী লেখক টমাস মান এর 'দ্য ট্রান্সপোজড হেডস্' এর গল্পটিকে। ভারতীয় লোকগাঁথা আর ইউরোপীয় মানস। মানুষের দ্বৈতসত্ত্বা, সেখানে থেকে তৈরি হওয়া আত্ম আবিষ্কারের কথা, নিজের মধ্যে একাধিক মানুষের উপস্থিতির উপলব্ধি করার সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে অতলান্ত ভাবনা।

বিজয় তেন্ডুলকর, মোহন রাকেশ, বাদল সরকারও আমাদের নতুন ধরনের নাটক উপহার দিয়েছেন। যুক্ত হলেন গিরিশ। ভারতবর্ষে তৈরী হলো চারটি আলাদা নাট্য ধারা। কিন্তু গিরিশ কারনাডের ঘরানাটি যেন এর মধ্যেই স্বতন্ত্র। সবসময়ই নাটকে তার লক্ষ্য- পৌরাণিক জগৎ আর ঐতিহাসিক দর্পণে সমকালকে আবিষ্কার করা। ইব্রাহিম আলকাজি, অ্যালেক পদমসি, বি জয়শ্রী, বা অমল আল্লানার মতো ডাকসাইটে নাট্যনির্শেকরা হিন্দি ও কন্নড় ভাষায় তাঁর নাটক প্রযোজনা করেছেন তাতেই বোঝা যায় নাটককার হিসাবে গিরিশ কতটা উঁচুমানের ছিলেন। বাংলার একটি নাটকই গিরিশ অনুবাদ করেছেন সেটি হলো বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ।' শুধু কাহিনীকার হিসাবেই নয় গিরিশ নাটকে অভিনয় বা পরিচালনাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁর যযাতি, তুঘলক, হয়বদন, তালেদন্ড প্রভৃতি নাটকগুলি ভারত বিখ্যাত, বিদেশেও সমাদৃত।

চলচ্চিত্রেও গিরিশ ছিলেন সমান পারদর্শী। অভিনেতা এবং পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে কাজ করে অন্তত: দশটি জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছেন ।ফিল্মফেয়ার এওয়ার্ড পুরষ্কার পেয়েছেন চারবার। কয়েকটি সিনেমা হলো নিশান্ত, মন্থন, হে রাম, পুকার, ডিভোর্স, সূত্রধর, এক থা টাইগার, টাইগার জিন্দা হ্যায়, গোধূলি, উৎসব প্রভৃতি।

তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালে। কর্নাটকে কলেজস্তরে তার পড়ার বিষয় ছিল অঙ্ক ও স্ট্যাটিস্টিকস্। এরপর পড়াশুনার বিষয়ে গিরিশ নিজেই বলছেন " আমার আগ্রহ ছিল নাটক নিয়ে পড়ার কিন্তু রোডস স্কলারশীপ পেয়ে চলে গেলাম অক্সফোর্ডে।" অক্সফোর্ডে গিরিশ দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। ইচ্ছা ছিল বড় কবি হবেন বা লন্ডনেই অধ্যাপক কিন্তু মাটির টানে ফিরে এলেন ভারতেই।

ষাট বছর বয়সে ১৯৯৮ সালে গিরিশ সাহিত্য সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ লাভ করেন। তারপর ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সামাজিক সম্মান পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ছাড়াও নাটক, টিভি ও সিনেমায় অসংখ্য পুরষ্কারতো রয়েছেই। গিরিশ ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সঙ্গীত নাটক একাদেমীর চেয়ারম্যান ছিলেন। এন এস ডির দায়িত্বও পালন করেছেন। সঙ্গে লন্ডনে কয়েকবছর নেহেরু কেন্দ্রের ডাইরেক্টর,আবার ভারতে কিছুদিন পুণার ফিল্ম ইন্সস্টিটিউটের দায়িত্বে।

এখানে আমাদের ভাল না লাগার মত একটা বিষয় না বললেই নয় যে গিরিশ কারনাড বলেছিলেন " উনিশ শতকের ভারতীয় নাটকে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল গৌণ। উনার নাটক সে সময়ে দেশের মানুষ দেখেইনি, বোঝা দূরে থাক। পেশাদাররা সে সময় তাঁর নাটক ছুঁয়েও দেখতেন না। আসলে বড় কবি মাত্রই যে বড়

নাট্যকার হবেন তেমন কোন মানে নেই। রবীন্দ্রনাথের নাটকের তাঁর নিজের যে অনুবাদগুলো অবাঙালিরা পড়েন তার ভিত্তিতে অন্তত রবীন্দ্রনাথের নাটককে কালিদাসের সঙ্গে আমি একাসনে বসাতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে বাংলাটা শিখে নিতে পারলে ভাল হতো। বাংলা নাটকগুলো ওরিজিন্যাল ভাষায় পড়তে পারতাম।"

যাহোক ভারতের নাটক, চলচ্চিত্র ও মনীষার জগতে গিরিশের শক্তিশালী পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তার যে বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে সেটি হলো অন্যায়ের প্রতিবাদে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। যে কোন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। আজ ভারতে যে উগ্র জাতীয়তাবাদ চতুর্দিকে ফণা বিস্তার করছে যার ছোবলে নানা জায়গায় সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত তার বিরুদ্ধে গিরিশ সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন। গৌরী লঙ্কেশ বা কালবুর্গির হত্যার পরে তিনি এতটাই সোচ্চার হন যে তার নাম পড়ে যায় 'আরবান নকশাল।' এর বিরুদ্ধেও তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও পথে নেমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তার নাম যতই খুনীদের হিট লিষ্টে থাকুক গিরিশ ভয় পাননি। ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টের নাম টিপু সুলতানের নামে রাখার প্রশ্ন তুলেও তিনি আক্রমণের মুখে পড়েন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাকে মুসলিম প্রেমিক হিসাবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু গিরিশ বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে টিপু সুলতান সংগ্রামী চরিত্র। এছাড়া তিনি মহীশূরের মানুষ তাই এ সম্মান তার প্রাপ্য।

আমাদের মনে আছে কিছুদিন আগে দেশের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রতন থিয়াম আগরতলার রবীন্দ্রভবনে এক বক্তৃতায় থিয়েটার অফ রুটস্ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে বলেছিলেন থিয়েটারের সৃষ্টিই হয়েছে প্রধানত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মধ্য দিয়ে। যেখানে সামাজিক অন্যায় সেখানেই থিয়েটারের সম্মিলিত প্রতিবাদ। আমাদের রাজ্যেও থিয়েটার সব সময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে। সেই রবিঠাকুরের 'বিসর্জন' থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যের সফল নাটককার চন্দন সেনগুপ্তের 'সাদা পায়রার জন্য' সহ রাজ্যের অধিকাংশ নাটকের কোনটাই এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ রাজনীতি, সমাজনীতি, থিয়েটার বা সিনেমা এসব মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পর একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক এবং থিয়েটার কর্মী হিসাবে গিরিশ কারনাডের জীবনভর প্রতিবাদী ভূমিকাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অজিত রঞ্জন মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শেখর সি দত্ত

একজন নাট্যব্যক্তিত্বের পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানিয়ে চির প্রস্থান আমাদেরকে ভাবিয়ে দেয় মাওসেতুং-এর কথা 'কোন কোন মৃত্যু পাখির পালকের মতো হাল্কা, আর কোন মৃত্যু পাহাড়ের মতো ভারী'। প্রয়াত সর্বজন শ্রদ্ধেয় নট নাট্যকার অজিত মজুমদারের মৃত্যু ত্রিপুরার নাট্যজগতে পাহাড়ের মতো ভারী। তাই শারদ সংখ্যায় স্মৃতিচারণায় তাঁর কিছু কথা বিবৃত করা। কে তিনি, তাঁর পরিচয়, কেন তিনি ভুলতে না পারার মতো, হারিয়ে না যাওয়া একটি নাম। আমি জানি আমার মতো একজন সাধারণ নাট্যকারের পক্ষে একজন বিরাট নাট্যকর্মির স্মৃতিচারণ কষ্টসাধ্য।

পুরো নাম অজিত রঞ্জন মজুমদার, জন্ম ২০শে নভেম্বর, ১৯৪১ ইং অবিভক্ত ভারত বটগ্রাম, নোয়াখালি জেলা, বর্তমান ঠিকানা মধ্য বনমালী পুর, আগরতলা। পিতা- শ্রী অম্বিকাচরণ মজুমদার (চিকিৎসক), মাতা বীণাপানি মজুমদার (গৃহিনী)। শিক্ষা- বাংলায় অনার্স, এম. এ., বি.এড। পেশা শিক্ষকতা, প্রধান কর্মকান্ড বা নেশা -নাট্যচর্চা। চার ভাইবোনের মধ্যে বড়, তাই দায়িত্বও ছিল বেশি। আগরতলা মধ্য কাশীপুর বাড়ীতে থাকাকালীন কৈশোরেই নাটক অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। পরে তাঁর বাবা মঠ চৌমুহণীতে আর একটি বাড়ী করেন এবং নাটকের জন্য একটি আলাদা ঘর করেন। ১৩ অক্টোবর ১৯৬১ ইং বিয়ে করেন ত্রিপুরার নাট্যমঞ্চের প্রথিতযশা অভিনেত্রী সবিতা সিংহ রায়কে। দুই মেয়ে এবং এক ছেলে হয়েছিল। ১৯৯০ সালে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় আদরের ছেলেটি দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা যায়। উনি ভেঙ্গে পড়েননি। তবে তাঁর কাছের লোকরা তার পাঁজর ভাঙ্গার শব্দ শুনেছে। বেদনা ছাপিয়ে নাট্যচর্চা ও রচনা চলেছে অবিরাম।

স্কুল জীবনে অভিনয় শুরু কলেজে পরিশীলিত। ক্রমে নাট্যরচনা, পরিচালনা, অভিনয়, মঞ্চ পরিকল্পনা মিলে সব্যসাচী হয়ে উঠেন। সব কয়টি ক্ষেত্রেই রাজ্য এবং সর্বভারতীয় মঞ্চে প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন বহুবার। তার অভিনীত প্রায় পঞ্চাশটি নাটকের মধ্যে দক্ষ, বর্ণাঢ্য অভিনেতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যে কয়টি তারমধ্যে অন্যতম - 'আলিবাবা চাল্লিশ চোর' এর কাশেম চরিত্রে অভিনয় যা আজও ভোলা যায় না। তাছাড়া পোষ্ট মাষ্টার, মায়ের ডাক, গ্যাটমেন আরো অনেক। ১৯৬৭ সালে নিখিল ত্রিপুরা নাট্য প্রতিযোগিতায় তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত 'উত্তাল তরঙ্গ' শ্রেষ্ঠ নাটকের

পুরষ্কার লাভ করে। ১৯৬৮ সালে ১৭ মে থেকে ১৯মে উমাকান্ত একাডেমি মঞ্চে তাঁর নির্দেশনায় পর পর তিনটি নাটক ১৯৬৫, বিশ পঞ্চাশ ও ঝড় সফল মঞ্চায়ন যা গুণীজন দ্বারা সমাদৃত হয়। তাঁর নির্দেশিত ও অভিনীত সাড়া জাগানো দুটি বিখ্যাত নাটক 'আমি মন্ত্রী হব' এবং আলি বাবা চাল্লিশ চোর' একই দিনে একই মঞ্চে দুপুরে ও সন্ধ্যায় অভিনীত হয় যা আজও ইতিহাস। তাঁর রচিত ও পরিচালিত 'সভ্যতার সংলাপ' জাতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে। তাঁর রচিত ও নির্দেশিত পুতুল নাটক সবিশেষে উল্লেখের দাবী রাখে। তার মধ্যে 'একটি মোরগের কাহিনী, জন হ্যান্‌রি',। জন হ্যান্‌রি ১৯৮০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পুতুল নাটক উৎসবে সর্বজন কর্তৃক প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছিল।

১৯৫৫ ইং প্রথম নাটক লেখা 'বিয়ে বাড়ী'। এই শুরু চলছিল অবিরত। ১৯৬৬ সালে লেখা 'সৈনিক' মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে মঞ্চস্থ হয় এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়। ছোট বড় মঞ্চ নাটক, পুতুল নাটক, নকসা, বেতার, টি.ভি, শ্রুতি, গীতি নাট্য মিলিয়ে প্রায় ৪৫টি নাটক রচনা করেন। ধারণা করা হয় ১৯৫৯ -৬০ ইং উনার লেখা 'পরিণতি' ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম রচিত ও অভিনীত পান্ডুলিপি। তাঁর রচিত মঞ্চ সফল নাটকগুলির মধ্যে ঝংকার, নকসী কাঁথার মাঠ, সভ্যতার সংলাপ, ভারতনাট্যম, ভাঙ্গা হাট, বৃহন্নলা পালা, ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ, ময়না তদন্ত, পুতুল খেলা, মঙ্গলদীপ, দর্শক ও নাট্যমোদীদের মন্ত্রমুগ্ধের মত মঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। নাটকের বিষয়বস্তু নিয়েও সতর্ক ছিলেন। লিখেছেন সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, পুরোহিততন্ত্রের ভন্ডামি, পণপ্রথা ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, চেতনা, বিশ্বশান্তি, জাতীয় সংহতির পক্ষে। অপেরাধর্মী নাটকের প্রতিফলন যেমন তার নাটকে হয়েছে তেমনি বাস্তবধর্মী বক্তব্যও তিনি তুলে এনেছেন নাটকে। তিনি মনে করতেন 'সময়ের সংকট নাটকে উঠে আসবে'। 'সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে শুধু পাঠ্যগুণ আছে। নাটকে আছে দৃশ্যগুণ। কেবল দৃশ্যগুণের আগলে থাকলে তারও বন্ধ্যা দশা হবে। তাই নাটককে শুধু মঞ্চে আবদ্ধ না রেখে সাহিত্য হিসাবে পাঠকের হাতে তুলে দিতে হবে।' আর তাই তিনি প্রকাশনায়ও হাত দিয়েছিলেন। ১৫টি নাটক প্রকাশিত হয়েছে।

জনশ্রুতি আছে উনি রাগী মানুষ। উনার পরিচালনায় নাটক করতে গিয়ে দেখেছি যে তাঁর রাগ ও একরোখা মনোভাব। অবশ্যই নাটকের স্বার্থে সময়ানুবর্তিতা ও চরিত্রের সঠিক রূপদান বিষয়ে কোন আপস করতেন না। সে যত বড় শিল্পীই হোন না। কিন্তু ওনার মানবিক মুখটা ক'জন জানি। ১৯৭১ ইং বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় একটি মুসলিম পরিবারকে ওনার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ওনার বাড়ীর দুজন

পরিচারিকাকে নিজ খরচায় বিয়ে দিয়েছেন। নেতাজি স্কুলের দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যার্থে নাটক করে অর্থ তুলে দিয়েছিলেন। ওনি ছিলেন সহজ, সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ত্রিপুরার অনেক নাট্যকার, পরিচালক ওনার কাছে পাঠ নিয়েছেন।

এরকম নাটক-অন্তপ্রাণ, মানুষটি ২০১৩ ইং থেকেই দুরারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত। অপারেশান হয়েছিল। কণ্ঠস্বর চলে গেল, নাট্যস্বর থেমে গেল, হিসিং সাউন্ড করে কথা বলতেন। আমি বহুবার হাসপাতালে - বাড়ীতে গেছি। উনিও আমার বাড়ীতে এসেছেন অনেকবার। অসুস্থতার পরেও এসেছিলেন। যন্ত্রণাকাতর মানুষটির অভিব্যক্তি দেখেছি। রোগসজ্জায়, এইড্‌স রোগ নিয়ে অসাধারণ নাটক 'মঙ্গলদীপ' রচনা, তার মঞ্চায়নও হয়েছে। কিন্তু ভগবত গীতার ওপর নাটক 'গীতানাট্যম' মঞ্চায়ন দেখে যেতে পারলেন না। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ ইং সকাল ৬টা ৪৬ মিঃ আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষটি, নাটককে গুছিয়ে রাখার মানুষটি চিরঘুমে ঘুমোলেন। ত্রিপুরার নাট্য জগতে এ এক বিরাট শূন্যতা যা পূরণ হবার নয়।

এই নিবন্ধ লেখকের সঙ্গে ১৯৮০ সালে আন্ত:অফিস নাট্য প্রতিযোগিতায় 'নক্সী কাঁথার মাঠ' নাটকে তাঁর পরিচালনায় অভিনয় করার দিন থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল । আমার দুর্ভাগ্য ওনার প্রয়াণে ফুল দিতে পারি নি রাজ্যের বাইরে ছিলাম বলে। রঞ্জিতা মজুমদার ও তপন গুহর সাথে কথা বলে আর নিজের স্মৃতি উসকে চেষ্টা করলাম এমন একজন বড় মাপের নাট্য স্বজনের স্মৃতিচারণ করার। এই নাট্যপুরুষের মেধা, মনন ও নাট্য প্রতিভার কাছে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়। ত্রিপুরা থিয়েটারের পক্ষে তাঁর প্রতি অভিবাদন জানাচ্ছি।

***

উৎপল দত্ত'র দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন :

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায় (দুজনই প্রয়াত)

(আগরতলার বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী শ্রী ঝলক মুখার্জী ২০১৫ সালের গোড়ায় কথায় কথায় আমাকে একটি "শিল্প সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক" এর কথা বলেন।নাম পর্বান্তর। জানুয়ারী ১৯৯৫-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, হাজরা রোড থেকে প্রকাশিত সাময়িকীটি পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। ১১২ পৃষ্ঠার (এ-ফোর) বই জুড়ে প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকার রয়েছে। ৮৮র সেপ্টেম্বর থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী ৮৯ পর্যন্ত ৩৩০ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি গ্রহন করেছেন শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সুবীর মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘতম এই সাক্ষাৎকারে রয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল দত্তের প্রায় ৪৫ বছরের বিশাল থিয়েটারী কর্মকাণ্ডের বিপুল অভিজ্ঞতা-মথিত উপলব্ধি সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও অকপট কথোপকথন। বর্তমান সময়ে নাট্যকর্মীদের উপকারে আসবে ভেবে, 'পর্বান্তর' সাময়িকীর প্রতি ঋণ স্বীকার ও শ্রী ঝলক মুখার্জীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা ত্রিপুরা থিয়েটারে সাক্ষাৎকারটি পর্যায়ক্রমে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার সপ্তম কিস্তি - সম্পাদক)।

পা.ব. : দর্শককে আপনি বলেছেন কো-অথর। আবার অন্যভাবে বলেছেন যে 'লিঙ্ক বিটুইন লাইফ এ্যান্ড থিয়েটার"— এইটে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে সুবিধে হোত।

উ. দ. : কো-অথর বলেছেন ব্রেখট। নাটক ব্রেখট বদলাতেন, দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখে। সেই অর্থে দর্শকরাও ব্রেখটের সঙ্গে সঙ্গে নাটক লিখতেন। তো সেই জন্য ব্রেখট তাদেরকে এই সম্মানে ভূষিত করেছেন। তবে মার্কসবাদী চিরদিন বিশ্বাস করেন যখন একটা নাটক লেখা হবে এবং একটা দল সেটা তৈরী করেছে, সেটা যখন স্টেজের ওপর অভিনয় হচ্ছে তখন যে দর্শকেরা হাউসে এসে বসেছেন দেখার জন্যে— এই দর্শকরাই হচ্ছে সমাজের প্রতিনিধি। এবং এ দর্শকের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সমাজের প্রতিক্রিয়া। সেই জন্য দর্শকরা যত বড় হবে তত সে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে। দর্শক যত ছোট হবে তত সে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার হারাবে। সেইজন্য এই যে এলিটিস্টি থিয়েটারে— অল্প মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবির সামনে যখন অভিনয় হয়— সেরকম দর্শক কিছুতেই সমাজের প্রতিনিধি নয়। কিন্তু যখন নানা শ্রেণীর মানুষকে থিয়েটারে আমরা নিয়ে আসতে পারি, তখন সেই রকম দর্শককে বলা হয় সমাজের সত্যিকারের প্রতিফলন। সমাজের মতামতের প্রতিফলন।

এই সমাজে বহু শ্রেণী। তাই দর্শককে বলা যেতে পারে নাটক ও সমাজের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। যতক্ষণ রিহার্সল দিচ্ছে ততক্ষণ তা সমাজের মুখোমুখি হচ্ছে না। তাই পরিচালক একরকম ভাবছেন, অভিনেতারা আরেক রকম ভাবছেন, বহু কিছু স্বপ্নের জাল বুনছেন। কিন্তু থিয়েটারে এসে সমস্ত ভেঙে যেতে পারে দর্শকের প্রতিক্রিয়ায়, সমাজের প্রতিক্রিয়ায়। যা আমরা করেছি, যা আমরা ভাবছিলাম, সব ভুল। নাটকে যা আমরা আশা করেছিলাম, এ নাটক থেকে, এটা সেই আশা পূরণ করতে পারছে না। এ নাটকের সব দোষ ত্রুটিগুলো মুহুর্তের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে যাবে। আবার যদি কোন গুণ থাকে সেগুলো প্রকাশিত হয়; সব হচ্ছে এই দর্শকের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ কিনা সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে। তাই দর্শককে বাদ দিয়ে কোন চিন্তা করাই সম্ভব নয় নাটক সম্পর্কে। থিয়েটার সম্পর্কে চিন্তা দর্শককে বাদ দিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু কোন কোন নাট্যবিদ ইওরোপ-টিয়োরোপে জন্মেছেন এবং আমেরিকায়—যারা বলে থাকেন দর্শক-টর্শক গুলি মারো। ওরা কিছু নয়। আমি অভিনয় করি আমার নিজের আনন্দের জন্য। যেমন আমেরিকায় Living Theatre স্পষ্ট বলে থাকেন। তবে স্টেজে না এলেই হয়। রিহার্সলেই থাকলে হয়।

পা.ব. : দর্শকের সমালোচনা র মধ্য দিয়ে, সমাজের সমালোচনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার আবার নাটকটিকে পুনঃলিখিত করতে পারে এবং পরিচালক হিসেবে ব্রেখট যেমন বার বার তার নাটকগুলোকে রি-রাইট করেছেন। সেই অর্থে তারা কো-অথর হচ্ছে।

উ. দ. : এবং নাট্যকারকে বাদ দিয়ে পরিচালক নিজেই চেঞ্জ করে নিতে পারেন, ব্রেখট এটাও বিশ্বাস করতেন। পরিচালক তো নাট্যকারের দাস নয়, সে সমাজের দাস।

পা.ব. : আর তাছাড়া যে নাট্যকারেরা মারা গেছেন তাদের তো নাট্যকার হিসেবে চেঞ্জ করার কোন প্রশ্নই নেই। 'অভিনয় LTG অবশ্যই একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক। বৈজ্ঞানিক মহলার মধ্য দিয়েই সে বিশেষ ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' এখন এই বিশিষ্ট ধারাটি বলতে আপনি কি বোঝেন। কি কি দেখে এটা বুঝব।

উ.দ. : এল.টি.জির অভিনেতার গলা শুনলেই বোঝা যাবে যে সে এল.টি.জি থেকে এসেছে। সে গলার অনুশীলন করেছে। আমি অন্যান্য দলের অভিনয় খুব একটা বেশি দেখেছি, তা নয়। যতটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে— কণ্ঠস্বরের দিকটা ভীষণভাবে অবহেলিত। কণ্ঠস্বরকে যে অনুশীলনের

মধ্য দিয়েই একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে— এ সম্পর্কে অনেকেই অচেতন আছেন। গলা ভাঙা—ভাঙা গলা কেন থাকবে? কি হয়— ওরা রিহার্সাল দিতে থাকে। শো এর আগে প্রচন্ড বেশী রিহার্সাল দিয়ে ফেলে। গলা যায় ভেঙে। দর্শককে এই ভাঙা গলায় অভিনয় দেখানো হয়। রবীন্দ্র সদনে ওদের অভিনয় করতে গেলে মাইকের দরকার হয়।এর চেয়ে লজ্জাকর তো কিছুই ঘটেনি—একটা থিয়েটারের মধ্যে মাইক দরকার হতে পারে অভিনেতার! অনেক দলের দরকার হয়! এর চেয়ে কলঙ্কজনক কিছু ঘটতে পারে না। অভিনেতার কণ্ঠস্বর নেই, ইনডোরে সে মাইক ব্যবহার করছে! এটা লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রয়োজন হতে পারে না এবং বরং মাইক দিলে পর তার অসুবিধে হবে। এত গম গম করবে যে— কিচ্ছু শোনা যাবে না। হাউ হাউ করতে থাকবে। বিশেষতঃ ভার্স বলবার ক্ষমতা— আমরা লক্ষ্য করেছি, কলকাতার কোনো দল রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন অভিনয় করতে গেলেন সেটাকে গদ্যে পুনঃনিখিত করে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন আমরা বলতে পারছি না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় তো কিছু হতে পারে না। অ্যাক্টর ভার্স বলতে পারছেন না। অ্যাক্টররাই তো ভার্স বলবে। না তো কি রাস্তার পথচারীরা বলবেন। অ্যাক্টরদের বলবার জন্যই ভার্স সৃষ্টি হয়েছে। এরা বলতে পারবেন না। কেননা কেউ এদের কোনদিন কিছু শেখায়নি। সামান্য শেখালেই বলতে পারে। যে শেখাবে সেই তো জানে না। যে পরিচালক, তিনিই কোনদিন ভার্স বলেননি। তো এই সব লিটল থিয়েটারের কোন অভিনেতার পক্ষে সম্ভব নয়—অ্যাবসার্ড, যে তিনি ভার্স বলতে পারবেন না। সে মাইকেলের ভার্স বলে, অনুশীলন করে। মাইকেলের ভার্স আবৃত্তি করে সে তৈরী হয়। যেটা in fact লিটল থিয়েটারে ঢুকবার একটা পরীক্ষা ছিল। মাইকেল আবৃত্তি করতে পারে কিনা? এখন, আবার আর একরকম আছে— আমি বহুরূপীর কথা বলছি। —এক রকম Proseকেও ভার্সের মতন আবৃত্তি করা। একটা অত্যন্ত কৃত্রিম ভঙ্গীতে। যেটা অভিনেতার আবৃত্তি নয়। আবৃত্তিকারদের হয়তো মানায়, অভিনেতাকে মানায় না। এত কৃত্রিম সেই ভঙ্গী। এটা হচ্ছে অতিরিক্ত রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করার ফল। ওরা সেই group আবৃত্তি করত, রবীন্দ্রনাথের । যখন আমি ওদের group আবৃত্তি শুনতাম, আমার চেঁচিয়ে বলার ইচ্ছে হতো— আপনারা সম্পূর্ণ ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছেন। এরকম আবৃত্তি যদি প্র্যাক্টিস করেন তাহলে আপনাদের অভিনয় নষ্ট হয়ে যাবে। এই সুর এসে পড়বে আপনাদের প্রোজেও, তাই হয়েছে। সবাই শম্ভুবাবুকে নকল করেন—বুঝতেই

তো পারছেন। বহুরূপীর অভিনেতা আপনি— একবার এক পুলিশ অফিসার আমার সাথে কথা বলছিলেন মুর্শিদাবাদে। সেই পুলিশ অফিসারের একটা সেন্টেন্স শুনেই আমি বলে দিয়েছি — আপনি বহুরূপীতে অভিনয় করতেন? হ্যাঁ, কি করে জানলেন? জাস্ট কথা বলার ভঙ্গী শুনে আমি বলে দিয়েছি উনি বহুরূপীতে অভিনয় করতেন। কেননা নাক দিয়ে কথা বলছেন। সেটা ওরা অনুশীলন করেছিলেন, ভুল অভিনয়। শম্ভুবাবুকে নকল করে। এখন এই রকম ভুলভালে না, নাট্য আন্দোলন ভর্তি। লিটল থিয়েটার গ্রুপের ছেলেমেয়েদের কেউ এভাবে বলতে পারবে না— এ উৎপল দত্তকে নকল করছে। এটা আমাদের প্রাইড। কিন্তু কেউ একথা বলতে পারবে না যে এর গলা শোনা যায় না। কেউ একথা বলতে পারবে না যে এর গলা এক জায়গায় আটকে আছে, অনড়। আর আমাদের অভিনেতাদের দৈহিক তৎপরতা যে কোন দলের কোন অভিনেতার চেয়ে ঢের ঢের বেশী, অন্তত: হান্ড্রেড টাইমস্ বেশী। দৈহিক তৎপরতা—যদি নীচের মহল দেখে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছ সব ক্রাউড সিনগুলো— ম্যাক্সিমাম স্মার্টনেস্ এসব সিনে পাবে। আর পঞ্চান্ন ষাটজন স্টেজের ওপর অভিনয় করছে, একসঙ্গে কারোর গায়ে গা লাগবে না । এসব ব্যাপারে লিটল থিয়েটারে গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অভিনেতাদের মধ্যে পুরষ্কৃত হয়েছে।

পা.ব. : এ বিষয়ে আর একটা কথা আছে— বড় বড় বিশাল বিশাল সেট সেটিং লিটল থিয়েটার ব্যবহার করছে। আপনি বলছেন যে এটা লিটল থিয়েটারের একটা বৈশিষ্ট্য। তার পরেই আছে যে ভারী সাজসজ্জার চাপে লিটল থিয়েটার গৃহবন্দী হয়ে পড়ে, পথ নাটিকা তৈরী করেছেন, গ্রুপকে গতি দিয়েছেন। আমার এখানে একটা প্রশ্ন থাকছে— পথনাটিকা নিশ্চয়ই একটা পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকের মতো নাট্যরস বা নাট্যতৃপ্তি দিতে পারে না। একটা অ্যাজিটেশনাল জায়গায় নিশ্চয়ই পথনাটিকা নিয়ে যায় । কিন্তু পথনাটিকা যেমন সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়—ভারী সাজসজ্জার চাপে সজ্জিত এইসব নাটক কি তেমন সম্ভব?

উ.দ. : না, কিছুতেই না। পথ নাটিকার ক্ষেত্র আলাদা, বড় নাটকের ক্ষেত্র আলাদা। লেনিনের হোয়াট ইজ টু বি ডান-এ পরিস্কার বলা আছে দুটো, একটা প্রপাগান্ডা, অন্যটা ....

পা.ব. : কিন্তু সেক্ষেত্রে এই ধরণের সেট-সেটিং থাকার জন্য এই নাটকটা তো আমরা আপামর দর্শকের কাছে নিয়ে যেতে পারছি না।

উ. দ. : হ্যাঁ, সব সময় পারব। কেন পারব না? সেটাই অনেক সময় ভেতর থেকে

বলা হয়। আই পি টি এ-র নেতৃবৃন্দও এটা মনে করেন। ঐ কালো পর্দাই দিতে হবে সব সময়। কালো পর্দার সামনে অভিনয় না করলে গ্রামে এই নাটক কি করে নিয়ে যাওয়া যাবে। গ্রামে কেন— আমরা এখান থেকে মস্কো নিয়ে গেছি। এখানে থেকে বার্লিন নিয়ে গেছি সব। কিচ্ছু অসুবিধে হয় না। যদি চেষ্টা থাকে, যদি সত্যিকারের ইচ্ছে থাকে তবে সর্বত্র সব কিছু নিয়ে যাওয়া যায়। একটা লরির ব্যবস্থা— দুটো বা চারটে লরি। নিয়ে যেতে চাইলে কে আটকাতে পারে। কেউ আটকাতে পারে না। এবং আমরা অঙ্গার করেছি— বজবজে গিয়ে। ফুল সেট লাগিয়ে—সবটা নিয়ে, কয়লাখনির তলায়, ওপরে, সব কিছু। বিরাট স্টেজ তৈরী করতে হবে। এখন কল্লোল হবে আগামী মাস থেকে। সর্বত্র জাহাজ নিয়েই। করতে কোন অসুবিধে নেই। আধুনিক মঞ্চকলা এতদূর এগিয়ে গেছে যে সব কিছুই মোবাইল করা যেতে পারে।ইউরোপে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা সিজনে তো সমস্ত থিয়েটার ট্যুর করতে বাধ্য— যত পেশাদার নাট্যশালা আছে। বিশাল বিশাল সেট ব্যবহার করে ওরা । সে সব নিয়ে যায় । এ কথা বলে না গ্রামে যাবার সময় সেট-ফেট নেবে না। যেন গ্রামের মানুষের কোন সেট-টেট দেখার অধিকার নেই। ওদের সামনে শুধু একটা কালো পর্দা সঙ্গে করে নিয়ে ঝুলিয়ে দিলেই হবে। আর শহরে যখন আসবে বাবুদের জন্য—তখন সব কিছু থাকবে। এটা তো একটা ক্লাস ডিস্টিংশনের ব্যাপার হয়ে গেল। তাই আমরা উল্টোটা প্রমাণ করে ছেড়েছি তখন। দু'টোই করা যায়। সবই করা যায়— যদি ইচ্ছে থাকে। আর যদি আলস্য চেপে বসে— আবার কে এই মালপত্র টেনে নিয়ে যায়, তখন এই সব চিন্তা মাথায় আসে । যে কোন দিন কোনমতে একটা কালো পর্দা টাঙিয়ে আর দু'টো হাঁক পেড়ে চলে এলেই হয়। আরপথনাটিকা ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এরকম ভাবে তৈরী, যাতে কোন অসুবিধে না হয় এবং ম্যাক্সিমাম মবিলিটি। দিনে ছ'টা সাতটা শো করতে হবে। আর সার্কাস কি করে যায়? সার্কাস! তার চোয়ে বড় সাজ-সরঞ্জাম আর তো কারো নেই। জন্তু জানোয়ার, বাঘ, সিংহ— সব যাচ্ছে।

পা.ব. : পরিচালকের সামনে আর একটা প্রশ্ন আসে— নাটক নির্বাচন। এই নির্বাচনের ব্যাপারে পরিচালকের ভূমিকা কি এবং সমগ্র দলের ভূমিকা কি থাকে?

উ.দ. : আইডিয়ালি এটা হওয়া উচিত-সমাজতান্ত্রিক দেশে যা নিয়ম তা হচ্ছে বেস্ট। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক থিয়েটারে দলের সঙ্গে অ্যাটাচড্ থাকে একজন লোক, যার নাম ড্রামাটুর। সে পরিচালক না। তার কাজ হচ্ছে সারা জীবন শুধু নাটক পড়া। দু'তিনজন থাকে এক একটা দলের। এবং যে নাটকগুলোকে

ওরা মনে করবেন যে অভিনয় করা দরকার, সম্ভব। এবং তারা সেগুলোকে জড়ো করে নিয়ে আসবেন এবং এনে পড়বেন দলে। প্রথমে পরিচালককে পড়তে দেবেন। তারমধ্যে পরিচালকের যেটা পছন্দ হবে সেইটে দলের সামনে পড়া হবে। পরিচালক যখন বলবেন যে, হ্যাঁ এইটে আমি পরিচালনা করতে ইচ্ছুক, সেইটে দলের সামনে পড়া হবে। তারপর দলেরও মতামত নেওয়া হবে, যে এটা হবে কি হবে না। যদি মেজরিটি বলে যে করা হবে তবেই সে নাটক সিলেক্টেড হয়। ড্রামাটুরের পোষ্ট আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশে পরিচালকই সেই কাজটা করে থাকে। তিনি নাটক পড়েন। তিনিই নাটক সিলেক্ট করে এনে দলের সামনে পড়েন এবং দলের সম্মতি পেলে তবেই নাটক শুরু হয়। সব দলেই তাই। এইটে যে একটা স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট, এইটের স্বীকৃতি দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, এই ড্রামাটুরের পদ তৈরী করে। এটা একটা হোল টাইম জব। এটা কোনো পরিচালনা করে তারপরে করা সম্ভব নয়। একজনের কাজ হচ্ছে শুধু নাটক পড়ে যাওয়া। নতুন যে সব প্রকাশিত হচ্ছে, পুরোণো যে সব ক্লাসিকস আছে— সব কিছু পড়তে থাকা অনবরত। আর তার মধ্য থেকে বেছে বেছে জমিয়ে রাখা, এই একেকটা দলের জন্যে।

পা.বা. : নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে পরিচালকের সামনে আর একটা সমস্যা— অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন।

উ.দ. : কাস্টিং। সে তো পরিচালক একচ্ছত্র অধিপতি। ডিরেক্টর। যাকে যা বলবে সে তাই করবে। এবং সে তখন দেখবে প্রথমত: চেহারা। কাকে কোনটা মানায়। তারপর অভিনয়ের ক্ষমতা। কার ক্ষমতার মধ্যে কোনটা আছে। কণ্ঠস্বর, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সব দেখার পর সে কাস্টিং করবে। এক লাইনের পার্টও ভীষণ ইমপর্টান্ট। যার কোন কথা নেই, একবার স্টেজের ওপরে হেঁটে যাবে— সেটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দেয়ার ইজ নো সাচ থিং এ্যাজ এ স্মল পার্ট, দেয়ার ইজ্ ওনলি স্মল অ্যাক্টর— স্তানিস্লাভস্কি বলেছিলেন। ছোট পার্ট বলে কোন কথা নেই। ছোট অভিনেতা আছে। তাদের মন ছোট, সংকীর্ণ।

পা.ব. : কাস্টিং-এর ক্ষেত্রে, ধরুন কাস্টিং করার পরে, মহলা চলতে চলতে মনে হ'তে পারে কাস্টিং বদলানো দরকার। চেঞ্জ করতে হতে পারে?

উ.দ. : হু, হু। অনেক চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। ট্রায়েলে চেঞ্জ করে দেখা হয়— তুমি এটা কর, তুমি ওটা করে দেখোতো। আবার দু'দিন রিহার্সল করে আবার চেঞ্জ হতে পারে।

পা.ব. : এবারই দেখলাম আপনি 'দামামা ঐ বাজে রে'তে শেখর গাঙ্গুলী, প্রথমে অন্য রোল করেছিলেন। পরে দু'টোই শিফ্‌ট করে গেলেন।

উ.দ. : আমার 'দুঃস্বপ্নের নগরী'তেই বিরাট চেঞ্জ হয়েছিল। দশ বারোটা রিহার্সলের পর। সত্য আর সমীর– পার্ট চেঞ্জ হয়েছিল। তাতে নাটকের ভালই হয়েছিল।

পা.ব. : মহলা চলাকালীন নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। এখানে অবশ্য আপনি চিরকালই স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপাল চালিয়েছেন। জানি না কি ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সাধারণত অনেক গ্রুপ থিয়েটারে দেখেছি একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যাগুলো পরিচালক কিভাবে মোকাবিলা করেন।

উ. দ.— আসলে তো দেখেছি—ডিসিপ্লিনের ভিত্তি হচ্ছে সেক্রিফাইস। নিজে ত্যাগ না করলে অন্যকে ডিসিপ্লিনড্ করা যায় না। অভিনেতারা যদি সবাই দেখেন পরিচালকই কিছু কিছু ছাড়ছে—ত্যাগ করছে, তাহলে পরেই তার আদেশ সবাই শোনেন। আর সবাই যদি দেখেন যে পরিচালক নিজের বেলায় খুব রিল্যাক্সড—সে শ্যুটিং করে খুব আর অন্যকে চেপে ধরে। নিজে রিহার্সালে আসে না, শ্যুটিং-এ চলে যান। তাহলে আর তাকে মানে না। কিন্তু যদি ওরা দেখে যে ছবি ছেড়ে দিচ্ছে, রিহার্সাল চললে ।—তখন তার কথার গুরুত্ব ভীষণ বেশী হয়। আমার ধারণা এ ছাড়া পরিচালকের কর্তৃত্ব কায়েম করবার আর কোন উপায় নেই। প্রথমত, প্রত্যেক অভিনেতারই এটা বিশ্বাস থাকা দরকার যে এ লোকটা আমার চেয়ে বেশী জানে থিয়েটারে। এটাই তো হয়— প্রয়োজন। কেউ যদি থিয়েটার সম্পর্কে কিছু বলে তো সেটা মানে। মানা দরকার। এটা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, শৃঙ্খলার ভিত্তি হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগের দু'একটা উদাহরণ সামনে স্থাপন না করলে অন্যদের ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। ডিসিপ্লিন মানেই তো ত্যাগ। কিছু কিছু তো ছাড়তে হবে সব্বাইকে । অফিসে ওভার টাইম করলে পয়সা পাওয়া যাচ্ছে । সুতরাং রিহার্সালে না এসে অফিসে ওভাব টাইম করছে এটাই তো স্বাভাবিক। পেটিবুর্জোয়া জীবনে এটাই স্বাভাবিক। অফিসে ওভারটাইমটা করো না। এই টাকাটা সেক্রিফাইস কর রিহার্সাল দিয়ে। এটা বুঝতে গেলে পরিচালককেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যে আমিও তো ছাড়ছি। আর একটা সমস্যা যেমন আমরা কালকেই আলোচনা করেছিলাম— আমাশা। কলকাতার পেটিবুর্জোয়া নাট্য আন্দোলনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমাশা। পেট খারাপ। কোথায় কি খায় না খায় আমি জানি না। পেট খারাপ সব দলেরই। শুয়ে পড়ে, দু'দিন তিনদিন অ্যাবসেন্ট। আর চেষ্টা থাকে সবারই। থিয়েটার ভালোবাসে বলে এত কষ্ট করে আসে। সন্ধের পর সারাদিন

আপিস করে তারপর বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে, ঠিকতো আসে। আর দেরিতেও আসে না, আগেই এসে পৌঁছোয়। তবে রিহার্সালে যে সব নিয়ম মানা দরকার —সেগুলো অন্যদলে আছে কিনা জানি না—অন্য কোন বই পড়া বারণ, খবরের কাগজ পড়া বারণ, ধূমপান বন্ধ। অখন্ড মনোযোগে রিহার্সাল দেখতে হবে—পার্ট থাকুক বা না থাকুক। এবং দীর্ঘ রিহার্সাল দেওয়া। অনেক দলেই আমি দেখেছি বা শুনেছি— রিহার্সালটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ার ঝোঁক থাকে, বেশ ছড়িয়ে গুছিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রিহার্সাল দেওয়ার ঝোঁকটা নেই । সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধে পর্যন্ত রিহার্সাল— এটা খুব কম দলেরই হয়। সেখানে ছেলেমেয়েদের আগ্রহটা কমে যায়। তেমনভাবে দেখতে গেলে সিরিয়াস নয়। পরিচালক সিরিয়াস না হলে কেউ সিরিয়াস নয়। পার্ট মুখস্ত করা—ডিরেক্টারের সব চেয়ে আগে করতে হবে। যদি তিনি কোন পার্ট করেন। সবচেয়ে আগে তার মুখস্ত হতে হবে ইত্যাদি।

পা.ব. : এই পর্বটা যাবার পরে, স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে। আপনি কি একাধিক স্টেজ রিহার্সাল করেন?

উ.দ. : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আশা করি সবাই করেন। আমাদের ড্রেস রিহার্সাল শুরু হয়ে যায় প্রথম থেকেই। আমাদের প্রথম দুটো-তিনটে এমনি রিহার্সালের পরেই ড্রেস রিহার্সাল। সব রিহার্সালই ড্রেস রিহার্সাল। পুরো পোষাক পরে। কেননা যে পোষাক পরে অভিনেতা অভিনেত্রীরা বাড়ী থেকে আসছে সে পোষাক পরে রিহার্সাল দেওয়া উচিত নয়। যে রকম পোষক পরে অভিনয়টা করবে সে রকমই পোষাক পরে রিহার্সাল দেওয়া উচিত– কনস্ট্যান্ট। ধর হেভি বুট পরে অভিনয় হবে এবং সেই হেভি বুট গোড়া থেকেই পরে নেওয়া উচিত। বা ধর, ইউরোপিয়ান পোষাকে নাটক হবে, সেখানে ধুতি পরে রিহার্সালের তো কোন মানেই হয় না। গোড়া থেকেই ইউরোপিয়ান পোষাক পরে রিহার্সাল করা উচিত। তাই আমরা গোড়ার থেকেই শুরু করে দি ড্রেস রিহার্সাল। অকারণে সেটা শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত ফেলে রাখা ঠিক নয়। তাই আমাদের, বরং যদি শেষ পর্যন্ত তিরিশটা রিহার্সাল হয়— তো তার মধ্যে পঁচিশটাই হয় ড্রেস রিহার্সাল।

পা.ব. : তখন তো আলো বা মিউজিক পাচ্ছে না?

উ.দ. : আলো বা মিউজিক চলে আসে— ধর, প্রথম দশটা রিহার্সালের পরই।

- ক্রমশ:

আবৃত্তি, অভিনয় ঃ ভাষা বিজ্ঞান

পবিত্র সরকার

১ আবৃত্তি ও অভিনয় ভাষার বিশেষ ব্যবহার

ভয় নেই, ভাষা বিজ্ঞানের জটিল কিছুর মধ্যে আপনাদের টেনে আনব না। ভাষাবিজ্ঞান একটা বড়ো বিষয়, এখানে তার একটা অংশ — উচ্চারণের ধ্বনিবিজ্ঞান(articulatory phonetics) নিয়ে কথা বলব, বিশেষভাবে বাংলাভাষার উচ্চারণের ধ্বনিবিজ্ঞান। বাংলা ধ্বনি, শব্দ, বাক্য কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় সে সম্বন্ধে। তাও সব রকমের বাংলা না, বাংলাভাষার একটিমাত্র রূপের। তার নাম চলিত বাংলা বা প্রমিত বাংলা। যে বাংলাটা নানা আচারগত উপলক্ষ্যে সব অঞ্চলের বাঙালি ব্যবহার করে। সংলাপে, যখন নোয়াখালির বাঙালি মেদিনীপুরের বাঙালির সঙ্গে কথা বলবে; শিক্ষাদানে — যখন স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো বা বিদ্যার আলোচনা হবে; রাজনৈতিক বক্তৃতায়, যদি শ্রোতাদের মধে নানা অঞ্চলের লোক থাকে; রেডিয়োতে টেলিভিশনে ভাষণে আর লেখাতে সাহিত্যে। প্রবন্ধে বিশেষ করে গল্পে উপন্যাসে নাটকে লোকের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ আছে, কিন্তু তাতে বর্ণনার অংশ সাধারণভাবে মান্য চলিত বা প্রমিত বাংলায় হবে। তাই এখানে আমাদের আলোচনার মূল ভিত্তি প্রমিত বাংলা।

ভাষা তো সকলের। কোনো একটা ভাষার মধ্যে আমরা জন্মাই, সে ভাষাটি তিন-সাড়ে তিন বছরের মধ্যে গড় গড় করে বলতে শিখে যাই, বছর দশেকের মধ্যে ভাষার সমস্ত ব্যাকরণ মাথার মধ্যে (খুব সম্ভবত মাথার বাঁদিকে মস্তিস্কের দুটো অংশে- ব্রোকা আর ভেরনিক্-এর এলাকায়) পুরোটা বসে যায়। তাই আমরা যারা সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ, তারা অনর্গল কথা বলে যেতে পারি, মুহূর্তের জন্যও আমাদের ভাবতে হয় না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কেউ বেশি কথা বলি, কেউ কম কথা বলি, কেউ নার্ভাস হয়ে কথা হাতড়াই, কিন্তু ভাষা সকলেরই আছে, স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেরই আছে। কেউ নিজের ভাষাটা ছাড়াও আরও এক বা একাধিক ভাষা শিখে নেন, কমবেশি স্বচ্ছন্দভাবে সেগুলিও বলতে শুরু করেন লিখতেও।

কিন্তু আবৃত্তিকার আর অভিনেতাদের ভাষা ব্যবহার ভাষার এক বিশেষ ব্যবহার। সাধারণ লোক ভাষা ব্যবহার করে সে তার নিজের ভাষা, নিজের মাথা থেকে যা বেরোয় তাই বলে, কিন্তু আবৃত্তিতে আবৃত্তিকার আর অভিনেতারা নাটকে যে সংলাপ বলেন ,সে তো তাঁদের নিজেদের ভাষা নয়, অন্যদের তৈরি করে দেওয়া ভাষা। তার জন্য তাঁদের ভাবতে হয় না, শব্দ হাতড়াতে হয় না, কাকে কখন কী বলব, কেন বলব— এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। অনুষ্ঠানের পাটাতনে বা অভিনয়ের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সেই সাজিয়ে

দেওয়া কথাগুলি তাদের বলতে হবে, যেন সেগুলি আবৃত্তিকারের বা অভিনীত চরিত্রের নিজেদেরই কথা, অন্তত শ্রোতা-দর্শকদের সেই রকম বিশ্বাস করাতে হবে। অবশ্যই আবৃত্তিকার আর অভিনেতাদের মধ্যেও নানারকম তফাত আছে। আবৃত্তিকাররা সাধারণত কবিতা বলেন, যে কবিতা দৈনন্দিন মুখের ভাষা থেকে আলাদা, একটু অন্যরকম ভাষায় তৈরি। ফলে আবৃত্তিতে যে আবেগ তৈরি করতে হয় তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের আবেগ থেকে একটু আলাদা, শ্রোতারা তার জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু বেশীরভাগ নাটকে (কাব্যনাট্য, কাব্যধর্মী সংলাপের নাটক ইত্যাদির বাইরে) আমরা আমাদের চেনা সুখ দুঃখগুলিকেই একটু বিশদ আকারে চাই বা পাই। সুতরাং তার আবেদন ভিন্ন।

২ দৈনন্দিন কথা বলার নানা সমস্যা

১ আস্তে কথা বলা, কথা পড়ে যাওয়া

নিজের কথা তো আমরা যেমন-তেমন করে বলি, বলার আগে সেভাবে ভাবি না। কথাটা অন্যে শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না তা নির্ভর করে ওই 'অন্য' কোথায় আছে, সংখ্যায় কতজন, আমি টেলিফোনে বলছি না মাইক্রোফোনের মাউথপিস হাতে নিয়ে বলছি, ঘরে টেলিভিশন চলছে, বাইরে ঝড় বইছে কি না ইত্যাদি নানা উপসর্গের উপর। আগেকার দিনে থিয়েটারের শিক্ষাদানে বলা হত, মনে করো রঙ্গালয়ের একেবারে পিছনের সারিতে বসে আছেন এক বৃদ্ধা, তিনি ভালো কানে শুনতে পান না, চোখেও ভালো দেখতে পান না - তাঁকে তোমার অভিনয় দেখানো আর সংলাপ শোনানো দরকার। কাজেই 'সংলাপ' শোনানোতে যে সতর্কতা দরকার, আমরা বাস্তব পরিবেশে কথা বলার সময় সেই সতর্কতা মেনে চলি না। কখনও আস্তে কথা বলি, যাতে বন্ধুরা বলে 'কী বললি,' আর -একবার বল্, ভালো শুনতে পাইনি। ' ক্লাসে স্যার বলেন 'Speak up!' অবশ্য মঞ্চেও অনেকের গলা ওঠে না, তখন দর্শক চ্যাঁচায় , 'লাউডার', 'একটু জোরে' বা আরও রসালো কিছু কথা। সাধারণ কথা শুনতে না পেলে ইংরেজরা বলে, Pardon! বা Beg your pardon! আমেরিকানরা বলে Come again! আজকাল অবশ্যি প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে, তাই মঞ্চের নানা জায়গায় লুকোনো মাইক্রোফোন রাখা সম্ভব - কিন্তু সাধারণ মঞ্চে ভালো দলের নাটকে এইসব প্রযুক্তি খুব একটা ব্যবহার করা হয়না বলেই জানি। এখনও অভিনয়ে অভিনেতার স্বাভাবিক গলার উপরেই বেশি নির্ভর করি আমরা। কিন্তু সাধারণ কথাবার্তাতেও শ্রোতা শুনতে না পেলে সে কথাভঙ্গি ভুল। আবৃত্তি আর অভিনয়ে তো বটেই। তাই বলে সব সময় হেঁড়ে গলায় গাঁক গাঁক করে কথা বললেও তা শুনতে ভালো লাগে না।

২ তাড়াহুড়ো করে কথা বলা

আস্তে কথা বলার বাইরেও আছে খুব তাড়াহুড়ো করে কথা বলা , যাতে একটা কথা আর-একটা কথার ঘাড়ে এসে পড়ে, সবগুলি স্পষ্ট শোনাই যায় না, অনেক সময় এ

জন্যেও ধমক খেতে হয়। বেশি হড়বড় করে বললে শ্রোতারা কথা বুঝতে পারে না, বলে একটু ধীরে ধীরে বলুন।

'স্বাভাবিক' মানে কী? জীবনের 'স্বাভাবিক' গলা আর মঞ্চের স্বাভাবিক গলা এক নয় তো। মঞ্চে ফিসফিস করে কথা বললেও পুরো হলের লোককে তা শোনাতে হবে, প্রণয়ীযুগলের অতি নরম প্রেমের কথাও একইভাবে শোনাতে হবে সমস্ত দর্শককে। কাজেই ভাষার ক্ষেত্রে মঞ্চের স্বাভাবিকতা আর জীবনের স্বাভাবিকতা এক নয়। আর আবৃত্তিকারই হোন আর অভিনেতাই হোন, ভাষাব্যবহারকারী হিসেবে আপনার একটা সুবিধে হল, আপনি যখন আবৃত্তি বা অভিনয়ে ভাষা ব্যবহার করবেন অন্যে কোনো কথা বলবে না। এটা অভিকরণ-শিল্পের (Performing Arts) -এ শ্রোতা-দর্শক আর অভিকর (Performer)-দের মধ্যে একটা অলিখিত সামাজিক চুক্তি। অভিকরণের ভাষার ব্যবহার ভাষার বিশেষ বিশেষ ব্যবহার। এখানে শুধু বক্তাই (আবৃত্তিকার, অভিনেতা) বলবে, শ্রোতা বা দর্শক ওই অভিকরণের সময়টাতে কিছু বলবে না।

৩. এক সুরে কথা বলা

ভাষার কথার উঁচুনীচু ঢেউ আছে। একটা বাক্যের সব ক'টা কথা একরকম জোরে বা তীব্রতায় উচ্চারিত হয় না। কোনটায় জোর বেশি পড়ে, কোনটায় কম। সে কথা মনে না রেখেই যদি রোবটের মতো একঘেয়ে ভাবে উচ্চারণ করা হয়, রোবট চরিত্রের বাইরে, তা হলে তার আবেদন তত তৈরি হয় না। কথার এই সুরের কথাটাও আমরা বলব। প্রথমে ধ্বনির কথা, তারপরে সুরের কথা।

৩. বাংলা ধ্বনি ও তার উচ্চারণ

সকলকে স্পষ্টভাবে নিজের (বা মুখস্থ করে অন্যের) কথা শোনানোরও একটা প্রযুক্তি আছে। কবিতা বা সংলাপের স্বাভাবিক উচ্চারণের পিছনে যে আয়োজনটুকু দরকার, ভাষাবিজ্ঞান সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে পারে। আমরা সবাই জানি না হয়তো, কিন্তু প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব একটা ধ্বনির সংগ্রহ আছ, কথা বলতে গেলেই সেই ভাষার লোকেরা সেই ধ্বনি সাজিয়ে কথা বলে নিজেদের মনের কথা জানায়। ভাষার প্রতিটি শব্দ ওই ভাষার কিছু ধ্বনি দিয়ে তৈরি। শব্দগুলি আবার নানাভাবে মিলে গিয়ে বাক্য তৈরি করে, আর বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে আমরা কথা বলি।

বাংলায় এইরকম চল্লিশটার মতো ধ্বনি আছে । বাংলায় মানে , আগেই যেমন বলেছি, উচ্চারিত মান্য (Standard) বা প্রমিত বাংলায়। সাতটা স্বরধ্বনি — ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও , উ। আর ব্যঞ্জনধ্বনি ঊনত্রিশটা - প্, ফ্, ব্, ভ্, ত্, থ্, দ্ , ধ্ , ট্ , ঠ্, ড্, ঢ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, ন্, ম্, শ্(স), হ্, র্, ল্, ড়্, ঢ়্। আর চারটে আছে অর্ধস্বর— আমরা লিখি এইভাবে — এ্, ও্, ই্, উ্। এ-কে বানানে সাধারণত 'য়' দিয়ে লেখা হয়, যেমন 'খায়' (= খাএ্) 'নেয়' (= ন্যাএ্) । বাকি অর্ধস্বরগুলি হসন্ত ছাড়াই লেখা হয়- যাও,

নেই, ঢেউ। উপরে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিতে হসন্ত দিয়েছি এই কারণে যা ভাষাবিজ্ঞান ওগুলিকে স্বরের সাহায্য ছাড়া আলাদা ধ্বনি হিসেবে বুঝে নিতে চায়। এর পরে আর হসন্ত ব্যবহার করব না।

আমাদের স্বরধ্বনিগুলির চন্দ্রবিন্দু দিয়ে নাকি স্বরে উচ্চারণও সম্ভব। এগুলির কোথায় কিভাবে উচ্চারণ হয় সে কথা আপনারা স্কুলের ব্যাকরণ বইয়ে পড়ে এসেছেন, তার পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের উদাসীনতা অর্জন করতে চাই না। শুধু কয়েকটা মূল কথা বলি। আশ('আশা') আর আঁশ, কাচা আর কাঁচা, এটা আর এঁটো ছাদ আর ছাঁদ পাশাপাশি উচ্চারণ করে ওই অনুনাসিক উচ্চারণ কব্জা করতে শিখুন।

প্রথমে লক্ষ্য করুন — আপনি যে শব্দই উচ্চারণ করুন না কেন, তাতে উপরের ওই ছত্রিশটা ধ্বনির কয়েকজন লুকিয়ে আছে। 'আপনি' কথাটার মধ্যে আছে আ +প্+ন্+ই। 'রাজশ্রী' কথাটার মধ্যে আছে র্ +আ +জ্ +ও+ স্ +স্+ র্ +ই । আরও লক্ষ্য করবেন যে, আমাদের বানান আমাদের উচ্চারণকে অনেক সময় ঠিক ঠিক প্রকাশ করে না। উচ্চারণকে লেখায় লিখে দেখালে তা অনেক সময় বানান থেকে অনেক দূরে চলে যায়। যেমন 'সহ্য' কথাটার উচ্চারণ হল 'শোজ্‌ঝো'।

আবৃত্তিকার বা অভিনেতা হিসেবে আপনার লক্ষ হবে উচ্চারণ, বানান নয়। কোন্ বাক্যের কী উচ্চারণ জানতে হলে যেমন কোন্ শব্দ বা পদবন্ধের কী উচ্চারণ জানতে হবে, তেমনই কোন্ শব্দের কী উচ্চারণ জানতে হলে যেসব ধ্বনি ওই শব্দটাকে তৈরি করেছে তাদের প্রত্যেকের উচ্চারণ আলাদা করে জানতে হবে।

কাজেই অভিনেতার প্রথম কাজ হল ওই ধ্বনিগুলির যথার্থ , মান্য উচ্চারণ জানা। মান্য উচ্চারণ কী? মান্য বা প্রমিত উচ্চারণ হল মান্য বাংলার শব্দ ও বাক্যের নির্দিষ্ট উচ্চারণ। তার একটা ছাঁচ অনেকদিন তৈরি হয়ে গেছে, ক্লাসে পড়ানোয়, বক্তৃতায়, আলোচনাচক্রে, রেডিয়ো-টেলিভিশনের খবর আর ঘোষণায় মূলত এই বাংলাটাই শোনেন আপনারা। এরই একটা লিখিত রূপ আছে, যা খবরের কাগজে, গল্প , উপন্যাসে- প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়, নাটকেও 'ভদ্র' , 'শিক্ষিত' চরিত্রেরা এই মান্য বাংলায় কথা বলে। মান্য উচ্চারণের অভিধান বেরিয়েছে একাধিক— আমাদেরও একটি ছাপতে গেছে।

তাহলে অ-মান্য (non-standard) ভাষা কী, উচ্চারণ কী? সেগুলি হল গ্রামের, নানা জেলার উচ্চারণ, ধরুন ঢাকা, পুরুলিয়া বা চট্টগ্রামের। সেগুলিকে উপভাষা বলে। আবার সমাজের শিক্ষা, ধনী-গরিব অবস্থা, জীবিকা, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ইত্যাদি অনুযায়ীও ভাষার একটু আধটু ভেদ হয়— যেমন গ্রামের জমিদারের ভাষা আর চাষির ভাষা, কলকাতার 'ভদ্রলোকের' ভাষা আর বস্তিবাসীর ভাষা, পুরুষ ও নারীদের ভাষা, কলকাতার রকের ভাষা ইত্যাদি। নাটকে চরিত্রের মুখে এসব ভাষা থাকলে তার উচ্চারণও শিখতে হবে। কিন্তু সকলের আগে শিখতে হবে মান্য ভাষার উচ্চারণ।

আপনারা অনেকেই হয়তো এই ভাষাটাই বলেন। কেউ জেলা থেকে এলেও জেলার ভাষাটা বাড়িতে ফেলে এসেছেন বা ভুলে গেছেন। এখন মান্য বাংলাটাই আপনার নিজের ভাষা। কিন্তু নাটক করতে গিয়ে নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন যে, এই মান্য বাংলা বলাটাও সহজ কর্ম নয়।

ক. বাংলা স্বরধ্বনিগুলি যেন আপনার মুখে স্পষ্ট শোনায়- ই-টা এ-র মতো, উ-টা ও-র মতো, এ-টা অ্যা-র মতো, ও-টা ও-র মতো, আর আ-টা খাটো হয়ে গিয়ে যেন অ-র মতো না শোনায়। 'এবং' বলতে গিয়ে 'অ্যাবোং' বলবেন না, আবার 'দ্যান' বলতে গিয়ে 'দেন' বলবেন না। কোন্‌টার বেলায় মুখটা কতটা কম বা বেশি হাঁ করতে হবে, ঠোঁট কতটা গোল করতে হবে, জিভকে কীভাবে খেলাতে হবে— তা নিয়ে আমাদের 'বাংলা বলো' (দে'জ) বইটা দেখতে পারেন। স্কুলের ব্যাকরণেও সে পাঠ আপনারা নিয়েছেন, তবু নিজের বইয়ের একটু বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলাম।

খ. বাংলা মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি যেন প্রবল মহাপ্রাণ (জোরে ধাক্কা দেওয়া) উচ্চারণ পায়। ঘ যেন গ-এর মতো না শোনায়, কিংবা ভ ব-এর মতো। এইগুলি বাংলা মহাপ্রাণ ধ্বনি— খ ছ ঠ থ ফ আর ঘ ঝ ঢ ধ ভ ঢ় । প্রথম দলটা অঘোষ (voiceless) আর দ্বিতীয় দলটা সঘোষ (voiced)।

গ. কয়েকটা মহাপ্রাণ ধ্বনি নিয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। ফ—টা যেন ইংরেজী f -এর মতো না হয়ে যায়। বাংলা ফ বলতে হবে ঠোঁট দুটো শক্ত করে বন্ধ করে, তারপর ধাক্কা দিয়ে আওয়াজ ছেড়ে। ইংরেজী f তা নয়, তাতে নীচের ঠোঁট উপরের দাঁতের পাটিকে আলতোভাবে ছুঁয়ে থাকে, আর দুয়ের মাঝখান দিয়ে একটু শিসের মতো আওয়াজ বেরোয়। খ আর মাছের কাঁটা ফুটলে গলা ঝাঁকারি দেওয়ার আওয়াজ যেন এক না হয়।

ঘ. ব্যঞ্জনের মধ্যে যাদের শ-এর দোষ আছে যারা শিগারেট, শাইকেল, শুটকেশ, শিট, শ্যার বলেন — তাঁরা শ বলার জন্যে জিভটা তালুতে ঠেকান, আর তারপর একটু সামনে ঠেলে এনে স বলুন। আর যাদের স-এর দোষ আছে— যাঁরা স্যামবাজারের সসিবাবু বলেন- তাঁরা উল্টোটা করুন, অর্থাৎ স বলার জন্যে জিভটা তালুর সামনে দাঁতের গোড়ায় ঠেঁকিয়ে সেটা একটু পেছনে নিয়ে শ উচ্চারণ করুন। অভ্যেস করুন ক-দিনেই ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে যাবে। জিভ সামনে এনে স, আর পেছনে নিয়ে গিয়ে শ। সামনে মানে উপর পাটি দাঁতের একটু পেছনে, আর পেছনে মানে আরও পিছিয়ে তালুর গভীর অংশের ঠিক আগে।

ঙ. যাঁরা জ আর ইংরেজী Z - এ গুলিয়ে ফেলেন তাঁরা জ বলবার সময় জিভটাকে প্রথমে তালুতে শক্ত করে ঠেকাবেন, তারপর শ বলার মতো ছেড়ে দেবেন— ধ্বনিটা অনেকটা 'dz'-এর মতো । শুধু Z-তে কিন্তু সময় একটু বাতাস বেরোবার রাস্তা খোলা থাকে, বাতাসটা ঘসে বের হয়। জ-এর উচ্চারণে প্রথমে বাতাস আটকে তারপর ছাড়তে হয়। চ আর স (S) - এ একই তফাত।

চ. র আর ড় যাঁরা তফাত করতে পারেন না তাঁরা ন ল বলতে যেখানে জিভের আগা ঠেকান সেখানে ঠেকিয়ে র বলুন। ড় বলতে হলে জিভের আগাটা উল্টে আরও উপরে ঠোকা মারুন। ড় উচ্চারণে জিভটা একটা ঝাপটা মেরে চলে আসবে। অভ্যাস করুন পাশাপাশি বলে- বারি-বাড়ি, কারা-কাড়া, সার-ষাঁড়, পারি-পাড়ি, চরা-চড়া, সারা-সাড়া, মারি-মাড়ি, নারী-নাড়ি, করা - কড়া ইত্যাদি।

৫. অন্যান্য ভাষা ও উপভাষার উচ্চারণ

কিন্তু আবৃত্তিকারদের সম্বন্ধে এ কথাটা পুরোপুরি সত্য না হলেও , যে-কোনো অভিনেতাকে হয়তো একাধিক ভাষার এবং উপভাষার উচ্চারণ একটু রপ্ত করতে হবে। অভিনেতারা সংলাপে কখনও ইংরেজি বা হিন্দি-উর্দু বলবেন— ইংরেজ বা হিন্দি-উর্দুভাষী চরিত্র সাজবেন। তখন তাঁদের ওই ভাষাগুলি ওইসব ভাষার উচ্চারণ দিয়েই যথাসম্ভব বলতে হবে। বাংলার উচ্চারণ দিয়ে চলবে না, যদি না বাঙালির ওইসব ভাষার উচ্চারণ প্যারোডি বা ক্যারিকেচার করে সংলাপ তৈরি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণের ধরন আলাদা হবে।

তেমনই গ্রামের চাষি বা গ্রাম্য মানুষের চরিত্রে গ্রামের ভাষা বা উপভাষা বলার দরকার হতে পারে। ধরা যাক ঢাকাই বা দক্ষিণ ২৪ পরগণা বা বীরভূম বা কোচবিহারের রাজবংশি বয়ান। তখন সেগুলির উচ্চারণ আলাদা করে শিখতে হবে। তার মানে সেগুলিরে স্বর ও ব্যঞ্জনের আলাদা আলাদা উচ্চারণ। অন্য ভাষার বা উপভাষার সব ধ্বনি বাংলার ধ্বনিগুলির মতো নয়, যেমন ইংরেজির p t k f v s z - এমন কি স্বরধ্বনিগুলিরে এক -এক জায়গায় এক এক রকম উচ্চারণ। উর্দুতে ফারশি খে (X) আর গায়েন - এর উচ্চারণ (খুদা, খোয়াব আর গম্ ইত্যাদি শব্দে) একটু অনুশীলন করে শিখতে হয়। এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, আগ্রহীরা আমার 'চম্স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান ' (পুনশ্চ, ২০১৩) বইয়ের দুটি প্রবন্ধ 'ভাষা শিক্ষার নানা দিক' এবং 'হিন্দি -উর্দুর উচ্চারণ' দেখে নিতে পারেন। আর প্রমিত বাংলা উচ্চারণের জন্য 'বাংলা বলো' (দেজ)।

৬. ধ্বনি থেকে বাক্যে

কিন্তু ভাষার ধ্বনির উচ্চারণটা হল ভিত্তি, তা আগে দখল করতে হবে। ধ্বনি জুড়ে তৈরি হয় শব্দ,। শব্দের উচ্চারণ কি ধ্বনির উচ্চারণের যোগফল? এক হিসেবে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু তা সব সময়ে ঠিক নয়। বিশেষত বানান দেখে সেইরকম ভেবে নিলে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে। বাংলা কেন, আরও অনেক ভাষার বানান উচ্চারণের ঠিক নিশানা দেয় না। বাংলা 'আত্মা' কথাটার উচ্চারণ 'আত্মা' নয়, 'আত্তাঁ' — এতে ম-টা উবে গেছে, আবার 'মিত্র' কথাটার উচ্চারণ 'মিত্-ত্রো' — তাতে একট বাড়তি 'ত' এসে ঢুকে পড়েছে, বানান দেখে উচ্চারণ করতে গেলে এইরকম নানা খানাখন্দে পড়তে হয়। শব্দের আলাদা আলাদা উচ্চারণের সুযোগ খুব বেশি থাকে না। যখন থাকে, যেখানে

একটা শব্দই একটা বাক্য হয়ে ওঠে, যেমন, 'তুমি তখন কোথায় চললে'র উত্তরে 'সিনেমায়'— তখন শব্দটার প্রথম দলে (Syllable) একটা ঝোঁক পড়ে, এখানে 'সি-নে-মা-য়্'— এই তিনটে দলের মধ্যে 'সি'-র ওপর বেশি ঝোঁক পড়েছে। এইরকম আরও দৃষ্টান্ত প্রথমত, মহাকাশচারী, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদি। নীচে দাগ দিয়ে আমরা যে দলে জোর বা ঝোঁক পড়ে সেটা দেখালাম।

কিন্তু বাক্যে আবার ধারাবাহিকতার মধ্যে সমস্ত শব্দে এই আলাদা আলাদা শব্দের প্রথম দলে উচ্চারণ থাকেনা। বাক্যের ঝোঁকের দুটি সূত্র আছে। এক বাক্যের খন্ড বা পদবন্ধ (phrase) -গুলির মধ্যে প্রথম শব্দটিতে প্রথম দলে ঝোঁক পড়ে, যেমন—

আমি তো **কা**লই ভেবে রেখেছি যে **তু**মি এলে আমরা **এক** সঙ্গে সিনেমায় যাব।

এই বাক্য সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি-র এর উপর জোর পড়বে, তুমি-র এর ওপর, আর এক-এর ওপর। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্র হল, যদি কোনো কথাকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে হয়, তখন তার প্রথম দলে আলাদা ঝোঁক পড়ে। যদি 'কালই' কথাটায় জোর দিতে চাই তা হলে 'কাল' অংশটায় ঝোঁক পড়বে— আমি তো কাল-ই ভেবে রেখেছিলাম যে ... 'ইত্যাদি । প্রথম সূত্রটাকে সুনীতিবাবু একটা রূপক দিয়ে বুঝিয়েছিলেন— পদবন্ধের প্রথম শব্দটা যেন রেলগাড়ীর ইঞ্জিন, বাকি শব্দগুলোকে তা টেনে নিয়ে যায়। জানি না, এই উপমা হুবহু খাটে কি না, কিন্তু এ থেকে ব্যাপারটার আভাস পাওয়া যেতে পারে।

তাছাড়াও বাক্যের ভঙ্গি অনুযায়ী তার একটা সুর বা তান (Intonation Pitch) আছে। বাক্যেও তো আছে নানা ধরনের, বিবৃতি, প্রশ্ন, আদেশ, বিস্ময়বোধক-মনের কথাটা আমি কিভাবে বলব— সেই বিবক্ষা অনুযায়ী বাক্যের ভঙ্গির তফাত হয়। নীচের বাক্যগুলোর প্রত্যেকটার ভঙ্গি আলাদা, তাই সুরও আলাদা আলাদা হবে .....

আমি আজ দুপুরে ঘুমোইনি। আমি আজ দুপুরে ঘুমোইনি? আমি আজ দুপুরে ঘুমোই নি! (কী আশ্চর্য!)। আমি আজ দুপুরে ঘুমোইনি! আমি দুপুরে ঘুমোব না। লোকে দুপুরে ঘুমোয় কী করে বলো তো! ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭. উচ্চরণের নন্দনতত্ত্ব

উপরে যা বলা হল, তা হল উচ্চারণের ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা। মান্য বাংলা বা প্রমিত বাংলা গ্রহণযোগ্যভাবে বলতে গেলে যে নিয়মগুলি মানতেই হবে। 'গ্রহণযোগ্যভাবে' মানে লোকে আপনার কথা শুনে ভাববে না এ লোকটা স্পষ্টভাবে নিজের কথাটা বলতে পারছে, আমার শুনতে খারাপ লাগছে না। উপরে বলা কথাগুলি এখানে আর -একবার বলি -- 'খারাপ' বা 'অগ্রহণযোগ্য' কথা বলা হল —১. ধ্বনির উচ্চতা-নীচতার মাত্রা — এমন আস্তে বলা যাতে কথা পুরোটা স্পষ্ট শোনা যায় না, বা অবান্তরভাবে এমন জোরে চেঁচিয়ে গাঁক গাঁক করে কথা বলা — যা হয়তো শোনা যায়, কিন্তু যা শুনলে আমরা বিরক্ত হই। ২. উচ্চারণের স্পষ্টতার মাত্রা — খুব হুড়মুড় করে

কথা না বলে একটা সংগত গতিতে কথা বলা, যাতে শ্রোতা কথাটা স্পষ্ট শুনে বুঝতে পারে। এ দুটোই উচ্চারণের শর্ত।

ব্যাকরণের শর্ত হল, কথা বলতে গিয়ে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকবে না, এক ধরনের বাক্যের মধ্যে অন্য ধরনের বাক্যের গোঁজ চলবে না, বিষয় ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার হবে ইত্যাদি।

আর নানারকম সামাজিক শর্ত হল— একজন যখন কথা বলছে তাকে শেষ করতে না দিয়ে মাঝখানে আপনি কথা বলে উঠবেন না, অন্যের কথা শেষ করার সুযোগ দিতে হবে। একে বলে taking turns, কথার মধ্যে গালাগাল দেবেন না, কিংবা মিথ্যে কথা বলবেন না, দরকারের চেয়ে বেশি কিংবা কম কথা বলবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলি নিয়ে পরে আরও বিশদ করে বলা যাবে।

কিন্তু কথা বলার নন্দনতত্ত্ব একটু আলাদা। ভাষা আর সামাজিক ব্যাকরণের শর্ত মেনে তা বলতে হবে, কিন্তু তা এমনভাবে বলতে হবে, যাতে আপনার কথা শুনে লোকে বলে, বাঃ , এর কথা তো শুনতে ইচ্ছে করে। অনেকে বক্তৃতা খুব ভালো দেন, কিন্তু বক্তৃতার কথা বলছি না। সাধারণ কথাবার্তাই এমনভাবে বলবেন যে লোকে ভাববে 'আহা, এর কথা আর-একটু শুনি না!

আবৃত্তি আর নাটকে বিষয়টাই আর একটু বেশি গুরুত্ব পায়, সেখানে আপনার কথা শুনিয়ে লোককে ভালো লাগাতেই হবে। এমন নয় যে, সেখানে গাঁক গাঁক করে বা হড়বড় করে কথা বলতে পারবেন না। নাটকের চরিত্রটি যদি তাই দাবী করে তাহলে সেভাবেই কথা বলতে হবে। কিন্তু সে কথা সকলকেই শোনাতে এবং বোঝাতে হবে, সেই সঙ্গে ভালো লাগতেও হবে। ফিস ফিস করে বলতে পারে নাটকের কোন চরিত্র, কিন্তু তাও একেবারে পিছনের সারির দর্শক শোনাতে হবে।

কথার নন্দনবত্ত্ব প্রবন্ধ বা বই লিখে বোঝানো মুশকিল। শুধু একটা ছোট্ট শব্দ 'না' কতভাবে বলা যায় সে সম্বন্ধে বুঝিয়ে কাউকে বলা শিশিরকুমার ভাদুড়ির একটা গল্প আমরা শুনেছিলাম। এ নিয়ে সম্ভাবনার শেষ নেই। আপনার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে— একটা সময় আপনি বুঝতে পারলেন যে বন্ধুই ঠক, আপনি ভুল। তখন আপনি শান্ত হয়ে বলেতেই পারেন, 'দে , একটা সিগারেট দে।' কিন্তু ঝগড়া করতে করতে ওই একই রকম চেঁচিয়ে যদি কথাটা বলেন, তা হলেও অন্যরকম একটা প্রতিক্রিয়া হবে। পরিচালকেরা সংলাপ এর নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ওইরকম নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, আপনিও তা করতে পারেন।

৮. ভাষার দুটি সহায়ক ব্যবস্থা

শেষে যে দুটি ব্যবস্থার কথা বলব তা আমাদের কথা বলার সঙ্গী, যদিও আমরা সব সময় এদের কথা খেয়াল করি না। একটি হল গলার স্বর, যা আমাদের কথা বলার সঙ্গে ওঠানামা করে। এগুলি বাক্য উচ্চারণের নিয়মের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এগুলিতে আমাদের

নানা রকমের আবেগ ধরা দেয়। ওই যে উপরে 'না' শব্দটির বহুবিধ উচ্চারণের কথা বলেছি, সেগুলি আসলে উচ্চারণ নয়, 'না' কথাটার 'প্রকাশ' (expression) বা অভিব্যক্তি। কথার আবেগের ভিন্নতার ফলে কণ্ঠস্বরের এই ওঠানামা কথাকে নানারকম ব্যঞ্জনা দেয়। এই ব্যাপারটাকে বলে 'প্রায়ভাষা" (paralanguage) । আবৃত্তি ও অভিনয়ে এই প্রায়ভাষাকে যেমন খেলাতে শিখতে হয়, তেমনই নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হয়। প্রায় ভাষার তফাত হলেই কথার অর্থ বা ব্যঞ্জনারও তফাত হয়। ফ্ল্যাট করে রোবোটের মতো 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলা, আবেগ দিয়ে চেঁচিয়ে কথাটা বলা, আরও বিষন্ন হতাশায় প্রায় নিরুচ্চারভাবে বলা— প্রতিটির ব্যঞ্জনা ভিন্ন, আবেদন ভিন্ন হয়ে যায়।

এই রকম আর একটা সহায়ক ব্যবস্থা হল অঙ্গভাষা (gestures)। এটাও অসচেতনভাবে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে— আমাদের চোখ ছোটো বড়ো হয়, হাত বা হাতের আঙুল নানাভাবে নড়াচড়া করে, কথা বলতে বলতে হাততালি দিয়ে উঠি, আমাদের মাথা দোলে, মুখটা সামনে এগিয়ে আনি বা পিছনে পিছিয়ে নিই— এগুলি যে করছি তা আমরা সব সময় খেয়াল করি না। এগুলি খানিকটা ইংরেজিতে যাকে বলে reflex action, তাই। কিন্তু অনেক সময় এই অঙ্গভাষাগুলি বুঝে নিয়ে আমাদের কথাকে আরও তীব্র করার জন্য আমরা অঙ্গভাষাগুলিকে ব্যবহার করতে পারি। সাধারণ কথায় আঙুলটা শ্রোতার দিকে যতটা উঁচিয়ে ধরি, তারচেয়ে হয়তো একটু বেশী করে আঙুলটা তার বুকের কাছে নিয়ে যাই। নাটকে অঙ্গভাষার এই অতিরঞ্জনের কিছুটা জায়গা আছে।

মনে রাখবেন, অঙ্গভাষা মূলত অসচেতন, আমাদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি এসে যায়। সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেও কথা বলা য়ায, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো, তাতে আবার অন্যরকম একটা মজা তৈরি হয়। কিন্তু ভাষার সহায়ক আর - একটি ব্যবস্থা অছে, যেগুলি সংস্কৃতির সৃষ্টি, সেগুলি আমরা অনেকটা সচেতনভাবে নির্বাচন বা ব্যবহার করি। যেমন ধরুন কাউকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'তুমি আমার এইটা করবে ' অর্থাৎ 'কাঁচকলা' করবে বলা। এটা আর আমার ব্যক্তিগত অঙ্গভাষা রইল না, এটা হয়ে গেল আমাদের গোষ্ঠীগত দেহভঙ্গির একটা সাংস্কৃতিক প্রতীক। এগুলি হল 'ভঙ্গি' বা sign, যা সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে কমবেশি ভিন্ন হওয়ারই কথা। আমরা যে ভাবে মাথা উপরে-নীচে করে 'হ্যাঁ' বলি, দক্ষিণ ভারতীয়েরা সেভাবে বলেন না, তাঁদের ওই অর্থ প্রকাশের ভঙ্গি আলাদা। পৃথিবীর নানাদেশে এইরকম সাংস্কৃতিক sign system গড়ে উঠেছে, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা সেসব নিয়ে গবেষণা করেছেন। বানানো চিহ্ন-প্রণালীও তৈরি হয়, যেমন বয় স্কাউটদের ইশারা-প্রণালী, অন্ধ ও বধিরদের ইশারা প্রণালী— সেগুলি সাধারণ ভাষা ব্যবহারের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়। সেগুলির সঙ্গে আবৃত্তি বা অভিনয়ের সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্ক নেই। প্রায়ভাষা আর অঙ্গভাষা সম্বন্ধেই আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়।

কালচারাল হিপোক্রেসি!

রথীন চক্রবর্তী

কলকাতা শহরতলীর একটি ছোট নাট্যদল 'রম্বস'। গত শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে এর পত্তন। অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রম্বসের নাট্যপরিক্রমা। এই সময়কালে অনেক নাটক এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন, প্রযোজনার দিক থেকে কিছু নাটক ভালো, দর্শকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম। কিছু নাটক, যেমন হয়, তেমন গভীর কোনও ছাপ সেভাবে রাখতে পারেনি বলেই আমার ধারণা। এঁদের খুব সামান্য কিছু প্রযোজনাই অবশ্য আমি দেখেছি। সম্প্রতি একটি নাটক দেখলাম, বার বার দেখার জন্য অনুরোধ করেছিল তারা। নাটকের নাম 'অভিনয়'। নাটকের প্রেক্ষাপট সত্তরের দশক। কিন্তু আজও বিষয়ের দিক থেকে তা সমান প্রাসঙ্গিক। ছোট নাটক যাকে বলা যেতে পারে 'শর্ট প্লে'। নাটক সম্পাদনা ও নির্দেশনায় অঞ্জন বিশ্বাস। এক পলাতক বিপ্লবী এই নাটকের মূলকেন্দ্রে, যাকে ধরার জন্য দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পালানোর সময়, যে দিনের কাহিনী নাটকে বিধৃত, তাকে গুলি করে মারা হয়। কার্টেন কলের সময় নির্দেশক জানান, ওদিন ছিল নাটকটির ১৮২তম মঞ্চায়ন।

দর্শক সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। সেই সামান্য সংখ্যক মানুষ এই ঘোষণায় কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েন, করতালি দিয়ে নাট্যদলকে অভিনন্দন জানান। শহরতলীর একটি ছোট নাট্যদল একটি ছোট প্রযোজনা নিয়ে ১৮২টি রজনী অতিক্রম করে, এটা কোনও ছোট ঘটনা নয়। কিন্তু ঘটনাটি প্রশ্ন রাখে, সত্তরের দশকের কাহিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আজও কোনও কোনও নাট্যে এত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কেন, প্রশ্ন রাখে, যে দায়বদ্ধতা নিয়ে এমন প্রযোজনায় ব্রতী হয় এই নাট্যদল, সেই দায়বদ্ধতার প্রশ্নে অন্যান্যরা এত নিশ্চুপ থাকে কেন? শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ আজ জ্বলছে। একদিকে নয়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ, অন্যদিকে শোষণ আর বঞ্চনাজাত বৈষম্যের ব্যাপক বিস্তার প্রতিটি রাজ্যকে খুন, হত্যা, লুঠ, সংঘাত ও সংঘর্ষ সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত দাঙ্গার দিকে নিয়ে গেছে। গত এক দশকে ক্যালেণ্ডারের পাতায় এমন একটি দিনও উল্লেখ করা যায় না যার গায়ে রক্তের দাগ নেই। এমন একটি ঘটনাকে উল্লেখ করা যায় না, যাকে সামনে রেখে বলা যায়, দেশের মানুষ ভালো আছে। মানুষের জীবনযাপনের প্রতিটি সিঁড়িতে আজ নিরাপত্তাহীনতার সঞ্চার । এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলার কালে আতঙ্কগ্রস্ত ও শোষণ কবলিত মানুষ বুঝতে পারছে, বা পারছে না, তারা কতটা দিশাহীন। বুঝতে পারছে, বা পারছে না, কেন কোনও রাজনৈতিক ভাবনা

ও সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শ তাদের কাছে নিশ্চিত অবলম্বন হয়ে উঠছে না। এই যে সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা, এই যে অসংবদ্ধতা, এই যে রাজনৈতিক শূন্যতা, এই শূন্যতাই সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করছে। থিয়েটারেও তার ছাপ পড়ছে। বাংলা থিয়েটার, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বকে ফেলে, কখনও কখনও আশ্রয় নিচ্ছে ষাট-সত্তরের দশকে, নিজের পরিচিতিকে বজায় রাখার জন্য— কখনও কখনও বিদেশি ছায়ার কাছে আশ্রয় চাইছে, অস্তিত্বের প্রমাণ রক্ষার তাগিদে। কিন্তু সমকালীনতাকে সে ছুঁতে পারছে না। বা সেই চেষ্টাও করছে না। অথচ এই সমকালীনতাই ছিল বাংলা থিয়েটারের অন্যতম প্রধান সম্পদ।

কিছুদিন আগে এক আলোচনাসভায় অনেকটা এমন কথাই যেন ফুটে উঠল কারোর কারোর কণ্ঠে। গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে বাংলা থিয়েটার কিছু কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য বিভিন্ন ঘটনার ঢেউ এসে এই ঘটনাকে কিছুটা বিস্মৃতির আড়ালে নিয়ে যায়। এই প্রয়াসকে সফল করে পুলিসের তদন্ত রিপোর্ট এবং বিশেষ আদালতের রায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গুজরাট দাঙ্গা পরবর্তীতে বহু 'ছোট দাঙ্গার' জন্ম দেয়, এবং সারা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ ও পরিস্থিতিকেই বিপন্ন করে তোলে। বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশ করে তথাকথিত ধর্ম-ভাবনার এক জিগির। তার অপঘাতী কাজকর্ম সংখ্যলঘু ও নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। বেছে বেছে কয়েকজন বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করা, দলিত ছাত্র ও অন্যান্যদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অত্যাচার চালানো, সরকারের কাজ নিয়ে কোনও সমালোচনা করলেই তাকে 'দেশদ্রোহিতা' বলে চিহ্নিত করে জেলখানায় ঠেলে দেওয়া, আদিবাসীদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ, বনাঞ্চল নির্মূল করা এবং সেই জমি সরকার ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া, ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গেরুয়া রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়া, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে নতুন নতুন দমনমূলক আইন তৈরী করা ও সেই আইনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা ইত্যাকার নানা ঘটনায় গোটা দেশের মানুষ আজ সন্ত্রস্ত। তার পাশে কালো টাকার দুর্নীতি, নোটবন্দির ঘোষণা, ভুল শিল্পনীতি ইত্যাদি কারণে অর্থনীতিগতভাবে দেশ আজ প্রচণ্ড সংকটে। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় নেমেছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তাদের সঙ্গে অনেক জায়গাতেই সামিল হয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ৪০ হাজার কৃষক দিল্লীর বুকে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে, হাজার হাজার কৃষকের আত্মঘাতের প্রতিবাদে। কোটি কোটি কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর আজ অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। সারা দেশের মানুষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার ও সরকারে অধিষ্ঠিত শাসক দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি বাংলা থিয়েটার। এটা কি সামগ্রিকভাবে আমাদের সকলের পক্ষেই কুৎসিত ও নির্মম গ্লানি নয়?

কিছুদিন আগে কলকাতায় এক আলোচনাসভায় ঠিক এরকম কিছু অভিযোগের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, এই জাতীয় আলোচনায় খুব একটা রাজি নন আমাদের থিয়েটারওয়ালারা। কারণ, দিল্লি তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারে। ত্রিপুরা বা আসাম, যেখানে বাংলা থিয়েটারের কিছু চর্চা হয়, সেখানকার কথা বলতে পারব না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখি, বাজার প্লাবিত হয়ে গেছে সরকারি অনুদানে। একদিকে রাজ্যের ২৮ হাজার ক্লাবকে তৃণমূল সরকারের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়ে নিয়মিত পোষা, যারা নির্বাচন ও অন্যান্য কর্মসূচিতে লাঠি হাতে অংশগ্রহণ করে, অন্যদিকে কেন্দ্রিয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের অন্তত চল্লিশ শতাংশ নাট্যদলকে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান—এই দুই হাত ঘিরে ফেলেছে থিয়েটার কর্মীদের কণ্ঠস্বর। গত শতকের ষাট বা সত্তর-আশির দশককে যাঁরা বললেন বাংলার সংস্কৃতি মঞ্চের এক উজ্জ্বল যুগ, যে অর্থে বা যে কারণে তাঁরা একথা গর্বভরে বলেন, সেই কারণ আজ অনেকটাই অপসৃত। বাংলা থিয়েটার একান্তভাবেই মধ্যবিত্তের থিয়েটার। সেই মধ্যবিত্তদের একাংশ আজ তাঁদের স্বচ্ছলতার পরিধিকে অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছেন, ২৫ হাজার টাকার মাসিক বেতনও তাদের মুখের অন্ধকার কাটে না। অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের আর এক অংশ, এক বিরাট অংশ, কাজ হারিয়েছেন ছাঁটাইয়ের দৌলতে বা রয়েছেন কর্মসংস্থানহীনতায়। কেন্দ্রিয় সরকারের বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার ঘোষণায় বিভ্রান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তের অন্নহারা ঘরছাড়া এই অংশের কাছে থিয়েটার তথা সংস্কৃতি এক বিলাস, যে থিয়েটারে একটি আসনের ন্যূনতম মূল্য ৬০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত। থিয়েটারের দর্শক তাই হয়ে পড়েছে সীমিত। থিয়েটার-করিয়েদের কাছে প্রযোজনা ব্যয়ের সংস্থান এক দুঃস্বপ্ন। এই অবস্থায় রাজ্যের কাছে অনুদান এবং কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া পথ নেই। কে বলে, সমকালীনতাকে আশ্রয় করা দায়বদ্ধতা? কে বলে, থিয়েটার হল সমাজ বদলের প্রক্রিয়ার অন্যতম হাতিয়ার?

এই পরিস্থিতিতে রম্বস এবং রম্বসের মতো কিছু ছোট দল যখন সমকালীনতাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং ভাঙা হাটের প্রযোজনাকে ১৮২ রজনীতে নিয়ে যায় তখন মনে হয় বাংলা থিয়েটারের নাট্যদলগুলির বড় অংশ এক সুবিধাবাদী রাজনীতির পথে পা বাড়িয়েছে। তাদের তথাকথিত রাজনীতি-বিবর্জিত অবস্থানের জন্ম দিয়েছে এক অন্যতর রাজনীতির। যাকে বলা যায় কালচারাল হিপোক্রেসি।

❄ ❄

হতাশায় যেন ডুবে না যাই

জামসেদ আনোয়ার তপন (ঢাকা)

রাস্তার ধারে মস্ত একটু হাতি বেঁধে রাখার কাহিনীটি পড়েছিলাম বেশ আগে। কাহিনীটি এমন... এক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশেই একটা হাতি দড়ি দিয়ে বাঁধা। হাতিটাকে এই অবস্থায় দেখে লোকটা খুব অবাক হলো। কোন শিকল নেই, কোন খাঁচাও নেই। হাতিটার এক পা শুধু একটা পাতলা দড়ি দিয়ে বাঁধা। চাইলেই হাতিটা যে কোন মুহূর্তে দড়ি ছিঁড়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু হাতিটা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। দড়ি ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে না বা ছেঁড়ার কোন চেষ্টাই করছে না। অনেকক্ষণ আনমনে ভাবলো লোকটা। ঘোর কাটছে না কিছুতেই। সুযোগ থাকার পরও হাতিটা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে না কেন? কি এমন কারণ থাকতে পারে এর পেছনে? ঘটনাটা বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে লোকটাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন ট্রেইনারের সাথে দেখা হলো তার। "সুযোগ থাকার পরও হাতিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে কেন?কেন সে দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে না? অনেক আগ্রহ নিয়ে ট্রেইনারকে জিজ্ঞাসা করলো লোকটা। লোকটার প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলো ট্রেইনার। বললো " হাতিটা যখন অনেক ছোট ছিল, তখন এরকমই একটা পাতলা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো তাকে। তখন বাচ্চা হাতিটাকে বেঁধে রাখার জন্য এই ছোট দড়িটাই যথেষ্ট ছিল। তাই চেষ্টা করার পরও দড়ি ছিঁড়ে সে মুক্ত হতে পারেনি। এরপর সে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তার সেই দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হওয়া সম্ভব না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে হাতিটা অনেক পরিণত হয়েছে, কিন্তু তার সেই বিশ্বাস এখনো আছে। সে এখনও ভাবে তার পক্ষে এই দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হওয়া সম্ভব না। তাই সে দড়ি ছিঁড়ে মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি আর।" লোকটা অভিভূত হয়ে গেল! নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ থাকার পরও হাতিটা যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে আছে কারণ সে ভাবে তার পক্ষে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়! এমন কি সে আর চেষ্টা করে দেখেনি!

গল্পের লেখক শেষে তাঁকে নিজের কিছু মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন এভাবে" ভেবে দেখুনঃ কোন কাজে দু-একবার ব্যর্থ হয়েছি বলে আমাদের কতজন এই হাতিটার মতো "পারব না" ভেবে জীবনকে এই জায়গাতেই ঝুলিয়ে রেখেছি? কতজন ভাবছি আমরা অক্ষম, আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব না? ব্যর্থতা শিক্ষার একটা অংশ, ব্যর্থ হয়েছি বলে কখনই চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া উচিত না।"

'মোরাল অব দ্য স্টোরি' একেকজনের কাছে একেকভাবে ধরা দেয়। আমার মনে গল্পটি এক অন্যরকম অর্থ নিয়ে হাজির হয়েছে। গল্পটির সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ইতালিয়ান দার্শনিক গ্রামশি'র চিন্তাধারার মিল খুঁজে পাই আমি। গ্রামশি'র ভাবনার জগতে একটু উঁকি দিয়ে আসা যাক।

তিনি বলেছেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কেবল তার দমনমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন পুলিশ, বিভিন্ন ধরনের বাহিনী, আইন-আদালত, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করে না, একটি বাইরের আস্তরণও তৈরি করে যা জনগণের এক বিরাট অংশকে বুর্জোয়া স্বার্থের সহমতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দমন ও সহমত এই দুই হাতিয়ারকে ব্যবহার করে বুর্জোয়ারা তাদের শাসন-শোষণ ও ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে। এই সহমত সৃষ্টির ব্যাপারটি সাংস্কৃতিক। তিনি বাইরের আবরণটিকে সিভিল সোসাইটি বলে বর্ণনা করেছেন। এরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে কাজ করে। বুদ্ধিজীবীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্রামশি মনে করেন সমাজে প্রত্যেক শ্রেণিরই নিজস্ব বুদ্ধিজীবী অছে এবং তারা এই সিভিল সোসাইটিকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে। তাই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে সিভিল সোসাইটিকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার কথা বলেন।

হাতি যেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে তার সমস্ত জীবনকে একটি চিকন দড়ির হাতে সমর্পণ করেছে ঠিক তেমনি ভাবে জনগণের একটি বিশাল অংশ প্রচলিত আইনকানুন, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির কাছে নিজেদের সমর্পণ করে বসে থাকে। মানুষভাবে এটাই তো স্বাভাবিক, এইতো নিয়তি। ফলে সে তার উপর চাপিয়ে রাখা শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে না। মেনে নেয়। এই মেনে নেয়া বা মেনে না নেয়ার ব্যাপারটি সাংস্কৃতিক ব্যাপার। এর সূত্র ধরেই উদীচী সংগঠনের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও ইতিহাসের আঙিনায় আমরা প্রবেশ করতে পারবো।

সত্যেন সেন ছিলেন একজন কৃষকনেতা। কৃষকদের সংগঠিত করে একটি সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়েই কমিউনিস্টরা শক্তিশালী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে সত্যেন সেন সহ অন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, কৃষকদের সংগঠিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে উদীচী গড়ার ভাবনা এলো কোথা থেকে? গ্রামশি'র এই বিশ্লেষণ কি সত্যেন সেনকে প্রভাবিত করেছিল? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরতে হবে। আরো কয়েক দশক আগে ইতিহাসের পথ পাড়ি দিতে হবে। পিছু হাটতে হাটতে পৌঁছে যেতে হবে চল্লিশের দশকে ভারত জুড়ে গড়ে ওঠা বৃটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (আই পি টি এ) আঙিনায়। সেই উত্তরাধিকারকে বাদ দিলে উদীচীর ইতিহাস অপূর্ণই থেকে যাবে।

দুই

আই পি টি এ (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ) হল বামপন্থীদলগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত থিয়েটার-শিল্পীদের সংগঠন। এর লক্ষ্য ছিল বামপন্থী মতাদর্শ প্রচার ও জনগণের সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটানো। ত্রিশের দশকে গড়ে ওঠা 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং

সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় গণনাট্য সংঘ। সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা এবং সেই শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেতনা সঞ্চার করার নামই ছিল গণনাট্য। গণনাট্যের দর্শক ছিল সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, যারা দিন আনে দিন খায়। জীবনের বাস্তব সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা থেকে মুক্তির উপায় বলে দেয় গান আর নাটকের মাধ্যমে। এর ব্যবস্থাপনা ছিল বেশ সাধারণ কিন্তু বার্তা ছিল বেশ স্পষ্ট। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের আগ পর্যন্ত গণনাট্য তার আদর্শকে সামনে রেখে রুচিশীল চেতনাসম্পন্ন সচেতন সমাজমানস গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

দেশভাগ আর কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি তৎকালীন ভারত সরকারের দমনমূলক আচরণের প্রেক্ষিতে গণনাট্য আন্দোলন পরবর্তী সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এই বাংলায় জারি হয় পাকিস্তানী চরম সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল ত্রাসের রাজত্ব।

তিন

একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে ৫০ বছর ধারাবাহিক সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং স্বমহিমায় টিকে থাকা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এক অনন্য ঘটনা। আদর্শিক ভাবে অটুট থেকে ৫০ বছর বিভাজন ছাড়া টিকে আছে এমন সংগঠন বাংলাদেশে এক উদীচী ছাড়া আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যেন সেনের হাতে গড়া সংগঠনটি আজ এক মহীরূহে পরিণত হয়ে গোটা দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দেশে বিদেশে উদীচীর ৩৭৫টি শাখা সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর উদীচীর প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী ৫০ বছর নিছক কিছু ঘটনাবলীর সমাহার নয়। বরং এই সংগঠনের ঐতিহাসিক অবদান গোটা দেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে জাতীয়ভাবে সংঘটিত প্রথম আন্দোলনটিই ছিল সাংস্কৃতিক। বাহান্নের ভাষা আন্দোলন যে পরিমাণ সাংস্কৃতিক আবহ নিয়ে জাতির সামনে হাজির হয়েছিল তা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল নজির স্থাপন করে। যার অভিঘাতে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চিত্রকলাসহ সংস্কৃতির নানা বিভাগে এক নতুন উন্মাদনা তৈরি হয়। এই সাংস্কৃতিক নবযাত্রার সহযাত্রী হয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যুথবদ্ধ আন্দোলনের নব পর্যায়ে সৃষ্টি হয় অনেক নতুন সংগঠনের। যারা বিভিন্ন সময়ে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেমন ছায়ানট, ক্রান্তি, সৃজনী ইত্যাদি। কিন্তু আদর্শিক অথবা সাংগঠনিক দূর্বলতায় ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যায় এই পরিসর। সত্যেন সেন কৃষকদের মাঝে গিয়ে তাদের জীবনের দুঃখ কষ্টগুলো শুনতেন এবং দুঃখ কষ্টের উৎসমূলে গিয়ে তা থেকে মুক্তির দিশা দেখাতেন। একদল শিল্পকর্মী নিয়ে গ্রামে গ্রামে কবিগানের আসর বসাতেন। যেখানে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির ভেতর দিয়ে সমাজে শোষণ,

বৈষম্য ও বঞ্চনার কথা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হত। এবং এর থেকে মুক্তির জন্য সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম করতে হবে তাও বুঝিয়ে দেয়া হত। কৃষক শ্রমিক সমাবেশে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন শিল্পীরা। সাংগঠনিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন সত্যেন সেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে সহমত পোষণ না করে একে ভাঙবার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়েই গঠন করলেন নতুন দিনের নতুন শিল্পী সংগঠন। নাম তার উদীচী।

চার

উদীচী সৃষ্টি হয়েছিল মেহনতি নিপীড়িত মানুষের গান গাইবার অঙ্গীকার নিয়ে। ধীরে ধীরে উদীচী তার কার্যক্রমের মধ্যে নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি, চারুকলা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি শিল্পমাধ্যমকেও যুক্ত করে নিয়েছে। নিপীড়িতের পক্ষে গান, কবিতা, নাটক করতে গেলে পীড়নকারীর বিরুদ্ধেই গান, কবিতা, নাটক করতে হবে। কারণ পীড়িত আর পীড়নকারী দুজন একে অপরের শত্রু। একই সঙ্গে দু'জনের পক্ষে অবস্থান নেয়া যায় না। সুতরাং যারা গণমানুষের গান তথা গণসঙ্গীত গাইবেন বা থিয়েটার করবেন তাদের পক্ষে শ্রেণি-নিরপেক্ষ থাকার কোন সুযোগ নাই। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যারা ধনীদের স্বার্থ দেখে তারা সমগ্র জনগণের স্বার্থ দেখবে না এটাই স্বাভাবিক।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শাসন শোষণ করছে অল্প কিছু মানুষ। জনগণকে মতাদর্শিকভাবে অনুগত বানিয়ে রাখা হচ্ছে। বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষে সামাজিক সহমত তৈরী করার জন্য একধরনের সাংস্কৃতিক আবহ তৈরী করে রাখা হয়েছে। এবং এর পক্ষে নতুন নতুন আইন বানানো হচ্ছে। সুতরাং এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সাংস্কৃতিকভাবে শক্ত প্রতিরোধ রচনা করতে হবে। পরিবর্তনের পক্ষের ধারাকে শক্তিশালী করতে হবে। পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করার এবং আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পকলার ভূমিকা ব্যাপক প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। আমরা জানি অন্য যে কোন জাগরণের চেয়ে সাংস্কৃতিক জাগরণ অনেক গভীর ও স্থায়ী হয়।

উদীচীর যাত্রা হয়েছিল পরাধীন দেশে। আজ স্বাধীন দেশের মানুষও একরকম পরাধীন জীবনযাপন করছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে। পাকিস্তান ছিল বৈশিষ্ট্যগতভাবে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। ধর্মের দোহাই দিয়ে সে তার জনগণের উপর বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছিল। সে বৈষম্য ধনী-গরীবরে, নারী-পুরুষের, হিন্দু-মুসলমানের, পাহাড়-সমতলের। স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা কী এই বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি? বৈষম্য কী আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি? এমন মুক্তি কী আমরা চেয়েছিলাম?

বর্তমান যখন নিরাশ করে, নিদারুণ বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেয়, আমরা তখন

অতীতের আশ্রয় নিই। ইতিহাস হয়ে ওঠে আমাদের নিরাপদ দুর্গ। বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করি, আমাদের লড়াইয়ের ইতিহাস কত দীর্ঘকালের! এই বঙ্গভূমি জন্ম দিয়েছে কত না বীরের! ইতিহাসের টেরাকোটায় উঁকিঝুঁকি দেয় কত বীরের মুখ! সেসব মুখ দেখে দূরন্ত সাহসে ফুলে ওঠে বুক। ভেসে অসে দূরাগত জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরঃ ' না , জাতি হিসেবে তুমি উন্মূল নও। তোমার ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত, তুমি এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার নিয়ে তুমি এগিয়ে যাবে। বর্তমানে এই হতাশায় তুমি ডুবে থাকবে না। বর্তমানের এই অবস্থায় তুমি সন্তুষ্ট থাকবে না। তাই এই ব্যবস্থাকে ভাঙতে হবে।

বস্তুত কোন প্রকৃত শিল্পী বা লেখক তার সময়কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এই অতৃপ্তি বা অসন্তুষ্টিই শিল্পীর সৃজনশীলতাকে উস্কে দেয়। জন্ম হয় নতুন নতুন গান কবিতা নাটক গল্প সিনেমা ইত্যাদি। বিশ্বের যেখানেই যারাই নিপীড়িত মানুষের পক্ষে শিল্পকলাকে হাতিয়ার করে লড়াই করেছে তারাই উদীচীর সহযোদ্ধা; উদীচীর বন্ধু। উদীচীর বন্ধুরা এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে নতুন শিল্পভাবনা ও পরিবেশনা নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হবে। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও সংগ্রামকে উস্কে দেবে।

(জামসেদ আনোয়ার তপন)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী
কেন্দ্রীয় সংসদ

A Few Words Expanding Theatre Perspective in Tripura

Prof. Saroj Choudhury

With the new concepts in content and in presentation, we become aware of the possibility of an expanding perspective of theatre. Yet much of our theatre does not explore the new perspectives. Only in a few creations we find glimpses of the possibility. In the rest, somehow, we ramain bound up in conventions. To make full utilisation of the possibility we need to come out of the barriers of conventions, which render the theatre into mechanical and repetitive enterprise.

Few sporadic efforts to the new approach is not enough to usher in the new era. It needs a collective and cumulative acceptance, As preparation to that we must know where we stand and how the novel aspect can be accommodated in the present. Once we are in possession of novelty, it should be codified and subjected to repeated practise.

Therein comes the question of theoretical preparation of a theatre worker. Consensus of both exponents and experts can indetify the areas, extent and methods of theoretical training, Classes workshops and discussion should supplement the practical. An 'Educated Artist' is no less useful for the art as a genious.

NATIONAL SCHOOL OF DRAMA

T.I.E WING : TRIPURA

ACTIVITIES DURING THE YEAR - 2018-19

CLASSES HELD FROM APRIL TO JULY 2018 :-

Classes of **Light Design** by Mr. Lointangbam Paringanba, **Puppetry** by Mr. Prabhitangshu Das, **TIE** by Mr. Vijai Kumar Singh, **Magic** by Mr. Bijoy Acharjee, **Object Theatre** by Ms. Choiti Ghosh, **Learning to conduct workshop with children** by Mr. Manish Saini & Mr. Dipendra Rawat, **Preparation of practice teaching** by Mr. Dipendra Rawat, **Yoga & Acting** by Mr. Vikram Singh Rathore, **Practice Teaching** by Mr. Vijai Kumar Singh, **Preparation of seminars on Pedagogy of Theatre & Applied Theatre** by Mr. Vijai Kumar Singh, **Grips Theatre & Play Writing** by Mr. Shrirang Godbole & Ms. Vibhawari Despande, **Modern Indian Drama** by Ms. Kirti Jain were conducted from April to July, 2018.

DEMONSTARATIONS :-

Demo on Stage Light was conducted by students on 14/04/2018.

Demo on Puppet was conducted by students on 20/04/2018.

Demo on Magic was conducted by students on 28/04/2018.

STREET PLAY :-

NSD, Tripura Centre conducted Street Play namely "Aurat" & "Samachar" on 12/04/2018 at Paradise Chowmuhani, Agartala on the birth anniversary of famous playwright, actor, director, lyricist and theorist Lt. Safdar Hashmi. The plays were performed TIE Alumnus.

SUMMER THEATRE WORKSHOP, 2018 :-

National School of Drama (TIE Wing), Tripura conducted One Month Summer Theatre Workshop with children at Agartala w.e.f. 15th May to 22nd June, 2018 where 200 childrens were participated. The workshop was conducted by TIE Students under the supervision of Mentors namely Mr. Manish Saini, Mr. Dipendra Rawat & Mr. Manoj Bhatia. The

culmination of Summer Theatre Workshop, 2018 was conducted at Agartala Town Hall w.e.f. 14th to 16th June , 2018 & Sukanta Academy Hall on 22nd June, 2018, where children performed different plays namely Nanha Parinda, Yehi Hai Dosti, Pariksha,, Selfie, Dreamland, The King of Adhbhudpur, Bagher Upor Taak, Rio during the occasion.

Tripura Centre also conducted Summer Theatre Workshop at Manipur w.e.f. 2 to 30 June, 2018 , at Amarpur, Gomati Tripura from 26th April to 16th May 2018 at Belonia, South Tripura from 29th April to 27th May , 2018 at Dimapur, Nagaland w.e.f. 16th to 05th August, 2018 and at Barpeta, Assam w.e.f. 1 to 31 July, 2018.

CELEBRATION OF 4TH INTERNATIONAL DAY OF YOGA ON 21ST JUNE, 2018:-

NSD, Tripura Centre organized 4th International Yoga Day on 21st June, 2018 at NSD, Tripura Centre. The Yoga session was conducted from 07.00 AM to 09.30 Am by Mr. Vikram Singh Rathore (Yoga Instructor) . A Free Yoga Camp on therapy for holistic health was also organised by Mr. Vikram for the students, staff & local peoples from 10.00 Am to 07.00 PM inside the campus.

PARTICIPATORY PLAY PERFORMANCE :-

TIE students performed a participatory Play "Fair or Foul" directed by Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director) for the childrens at NSD Campus on 01st & 03rd May, 2018 , Amarpur New Town Hall 04th May, 2018 , Muktadhara Auditorium, Agartala on 05th May & 05th July, 2018 (Total 5 shows performed). The Performance was conducted successfully and the childrens present with their parents appreciated the performance whole heartily.

FINAL VIVA 2017-18 :-

Final Viva of Students of the session 2017-18 conducted by Ms. Kirti Jain, Saroj Choudhuri (Ex-Professor), Mr. Narendra Debbarma (Theatre Personality), Mr. Prabhitangshu Das (Puppetteer) on 08th July, 2018.

SELECTION OF NEW CANDIDATES FOR ADMISSION IN TIE COURSE 2018-19:-

NSD, Tripura Centre received 60 application for admission in one year TIE Course for the academic session 2018-19, where 54 candidates

were shortlisted for final workshop/interview. The workshops/interview were conducted by the Selection Committee on 08th July 2018 at NSD, Tripura Centre & 14th July, 2018 at NEZCC , Shilpgram, Guwahati, Assam. Total 20 students (13male & 07 female) selected for the TIE Course at Tripura Centre as on 31/07/2018 for this academic session 2018-19.

CLASSES HELD FROM AUGUST 2018-MARCH 2019 :-

Classes on Physical Movement by Mr. Gourav Hazarika, **Session Planning for class & workshop** by Mr. Dipendra Rawat, **Script Reading** by Ms. Babita Pandey, **DIE & TIE** by Mr. Vijai Kumar Singh, **Craft Making & Handling** by Mr. N. Jadumani Singh, **Painting** by Mr. Biswajit Deb & Mr. Amit Modak, **Theatre Games** by Mr. Jayanta Dey & Manojit Deb Roy, **Indian & World Drama** by Mr. Devendra Raj Ankur , **Indian Art & Culture** by Prof. Vijay Kumar L. Dharurkar, **Yoga** by Mr. Vikram Singh Rathore, **Child Development** by Ms. Dimple Rangila, **Acting/Body Movement** by Mr. H. Tomba Singh, **Child Development (Adolescence)** by Ms. Nikita Agarwal, **Music Composition & Sound recording** by Mr. Huidrom Anil Kumar, **Dance Drama** by Mr. Kishore Sharma, **Costume Designing** by Ms. Babita Pandey, **Theatre with Children** by Mr. Walter peter, **Acting for Children** by Mr. Mandar Kulkarni, **Grips Play Writing** by Mr. Shrirang Godbole & Ms. Vibhawari Deshpande, **Grips Theatre** by Mr. Mandar Kulkarni, **Contemporary India & Childhood- Gender Discrimination (Seminar-08)** by Ms. Sharmila Chhotaray, Indian History & Art by Mr. Konstantin Senzlaff, **Indian History of Craft** by Mr. Ravindra Singh & Mr. Hiroshi Miyauchi, **Devising Performance** by Mr. Rajneesh Bisht, **Puppetry** by Mr. Suresh Datta, **Natya Shastra** by Dr. Vijaikumar L. Dharurkar, **Voice & Speech** by Mr. Vivek Mishra, **Curriculum Drama** by Mr. Dipendra Rawat & Ms. Jyotsana, **Acrobatics** by Mr. Aloy Debbarma, **Contemporary India & Childhood (Seminar 6,7)** by Ms. Nidhi Gulati, **Contemporary India & Childhood** (**Seminar 1-5**) by Ms. Asha Singh & Ms. Priyanka Rao, Lebon Movement by Ms. Faezeh Jalali & Mr. Gaurabh Hazarika, **Applied Theatre** by Mr. Kaustubh Bankapure, **Movement** by Mr. Tatsumi Fujieda, **Story Telling** by Mr. Subhash Rawat, **Theatre on Oppressed** by Mr. Sanjoy Ganguly & Ms. Sima Ganguly, **Mass & Physical Acting** by Ms. Shelley Wyant, **Theatre**

Music by Ms. Jilmil Hajarika, **Puppetry** by Mr. Prabhitangshu Das, Magic by Mr. Bijoy Krishna Acharjee, **Light Design** by Mr. Himangshu B. Joshi, **Sound Design & Recording** by Mr. Huidrom Anil Kumar were conducted from August , 2018 to March 2019.

DEMONSTRATIONS :-

Demo on Child Development performed by TIE Students (2018-19) on 03rd Oct, 2018.

Demo on Acting for Children performed by TIE Students (2018-19) on 14th Nov, 2018.

Demo on Magic conducted on 11th March, 2019 by Mr. Bijoy Krishna Acharjee,

Solo performance on speech preparation at classroom performed by Mr. Vivek Mishra on 18/01/2019.

15 DAYS RESIDENTIAL DRAMA & THEATRE -IN-EDUCATION ORIENTATION COURSE :-

Tripura Centre conducted 15 days Residential Drama & Theatre -In-Education Orientation Course at NSD Campus from 20th July to 05th August, 2018, where a total candidates from all over India & 01 observer from Maharashtra participated the course successfully. The aim of the course is to use theatre education in different context. The Culmination of 15 days orientation course was conducted on 04th August, 2018 at NSD Campus. Dr. Vijai Kumar Laxmikanta Rao Dharurkar, Vice Chancellor Tripura University attended the programme as a Chief Guest and delivered a valuable speech.

DIKSHARAMBHA ANUSHTHAN :-

NSD, Tripura Centre organized " Diksharambha Anushthan" for the session 2018-19 at Tripura University Auditorium namely "Maharaja Bir Bikram Manikya Auditorium" on 09th August, 2018. On this occasion Dr. Vijay Laxmikantarao Dharurkar, Vice Chancellor, Tripura University attended the programme as a Chief Guest and delivered a valuable speech on the role of theatre in modern education system. A folk performance "Jatra" was also organized under the direction of Ms. Bijali Chakraborty (Expert of Jatra) at the end of the programme, where participants performed "Mirar Badhua".

REHEARSAL/PERFORMANCE OF CHILDREN'S PLAY :-

TIE Students performed a children's play "Ekta" directed by Mr. N, Jadumani Singh at Ananda Auditorium, Nazrul Kalakshetra on 8/9/2018.

HALF YEARLY VIVA (2018-19) :-

Tripura Centre conducted Half Yearly Viva of TIE Students on 23rd Dec, 2018 (Sunday). In this occasion Mr. Abdul Latif Khatana (Associate Professor, NSD, New Delhi), Mr Rajneesh Bisht (Guest Faculty from New Delhi), Dr. Tripti Watwe (Asst. Professor, S.D. Memorial Govt. Music College, Agartala) & Mr. Narendra Debbarma (Theatre Personality of Tripura) were present as experts.

SUNDAY CLUB ACTIVITIES :-

Tripura Centre conducted Sunday Drama Club Activities at NSD Campus & Amarpur, Gomati, Tripura during the year 2018-19. In this connection, a "Children Threatre Festival" was held at Ananda Auditorium, Nazrul Kalakshetra, Agartala from 03rd to 05th January, 2019 & at Anandadhara Hall, Amarpur, Gomati, Tripura on 06th & 07th January, 2019. where children performed the plays namely Ek Soch, Jungle Ka Dangle, The Tormented Soul & Courtroom.

PERFORMANCE OF PLAY "ANHAD" :-

NSD, New Delhi showcase the play "ANHAD" directed by Associate Prof. Abdul Latif Khatana (Chief of TIE Company, NSD, New Delhi) at Ananda Auditorium Nazrul Kalakshetra on 04th Oct., 2018 at 03.30 PM & 06.30 PM (02 shows), where the play was appreciated by the audience wholeheartedly.

NEW GRIPS PLAY :-

Students of this centre prepared a New Grips Play "Bye Bye Gussa" under the Direction of Mr. Pramod Kale and the performance was conducted at Ananda Auditorium-02 shows, Amarpur Town Hall-01 show, Army Public School-01 show, Kendriya Vidyalaya, Salbagan-01 show (Total 05 shows performed)

PRACTICE TEACHING BY THE STUDENTS 2017-18 SESSION :-

The passouts (2017-18) conducted Practice Teaching in schools located at their home towns after completing One Year TIE Course. The passouts namely Mr. Rakesh Borah, Mr. G. Imotomba Sharma, Ms. Haobam Hemlata Devi, Mr. Uttam Chakraborty, Mr. Ankit Lohar, Mr. Th. Roshini Devi, Mr. Pabitra Mashahary, Mr. Raju Debnath, Mr. Rupashree

Debnath, Mr. Samiran Brahma, Ms. Ila Das, Mr. Bansing Basumatary, Mr. Didwm Basumatary, Ms. Dipika Dutta Mukherjee, Mr. Sonit Jyoti Saikia, Mr. Birendra Ganju conducted the Practice Teaching & submitted their reports to this centre.

TWO DAYS WORKSHOP ON TEACHING KOKBOROK LANGUAGE THROUGH DRAMA :-

National School of Drama, Tripura Centre & Tripuri Cultural Organization jointly organized o2 Days Workshop on "Teaching Kokborok Language Through Drama "for Kokborok Teachers at Nazrul Kalakshetra, Agartala, w.e.f. 28th to 29th January, 2019. The above said Workshop is an introductory & practical in nature which helps the teachers to create interest in Kokborok Language in schools for children through TIE Methodology. Total 21 Kokborok Teachers from different schools of Tripura attended the workshop.

SIX (6) DAYS WORKSHOP ON FORUM THEATRE AT KOLKATA (EDUCATIONAL TOUR) :-

20 TIE Students & Staff of Tripura Centre, visited Jana Sanskriti Centre for Theatre of the Oppressed, Kolkata on 03/03/2019 for attending " Workshop on Forum Theatre" Organized by Mr. Sanjoy Ganguly (Experts) & Ms. Sima Ganguly(Experts) w.e.f. 04th to 09th March 2019. The Workshop was completed successfully and will help the students in their one year TIE Course.

PRACTICE TEACHING UNDER "CREATIVE PARTNERSHIP PROGRAMME" :-

The TIE Passouts namely Mr. G. Imotomba Sharma, Mr. Raju Debnath, Ms. Haobam Hemlata Devi, Mr. Thokchom Roshini Devi, Mr. Didwm Basumatary, Ms. Ila Das, Mr. Pabitra Mashahary, Mr. Samiran Brahma, Mr. Bansing Basumatary, Mr. Birendra Ganju, Ms. Sharmistha Chakraborty conducted practice teaching at different schools under creative partnership programme during January to March, 2019.

03 DAYS TIE WORKSHOP "ACTING FOR CREATIVITY" :-

Tripura Centre conducted about 129 nos. of Three Days TIE Workshop on "Acting of Creativity" successfully in Northeast States namely Assam, Tripura & Arunachal Pradesh during the year 2018-19. About 3,500 (approx) graduate participants attended the workshop.

(সুদীপ্ত চ্যাটার্জী কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব। নিয়মিত নাটক রচনা, অভিনয় ছাড়াও নাটক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। সর্বোপরি তিনি একজন বিশিষ্ট নাট্য শিক্ষক। নিউইয়র্কে প্রায় দশ বছর নাটক নিয়ে পড়াশুনা, গবেষণা এবং অধ্যাপনা করে দেশে ফিরে বর্তমানে একজন পারফর্মার এবং নাট্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়মিত কাজ করছেন। আমাদের আমন্ত্রণে ২০১৮ সালে ত্রিপুরা থিয়েটার আয়োজিত বামাপদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি নাট্যোৎসবে যোগ দিতে তিনি তাঁর নাট্যদল স্পেক্ট্যাক্টর্স নিয়ে আগরতলায় এসেছিলেন। সেই পরিচয়ের সূত্রে ত্রিপুরা থিয়েটার প্রকাশনা গ্রন্থে ২০১৯ সালের পূজা সংখ্যায় প্রকাশের জন্য নাটক সম্পর্কিত একটি লেখা দেবার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করি। বিষয় 'বিশ্বনাট্যে ভারতীয় নাটক'। যথাসময়ে আমরা তাঁর লেখা পেয়েছি এবং ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যগ্রন্থে পর্য্যায়ক্রমে কয়েকটি কিস্তিতে ছাপাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা প্রথম কিস্তি — সম্পাদক ।

AN OTHER IN THE 'NEIGHBORHOOD'
A Clay Cart in New York, 1924
Sudipto Chatterjee

[*The Little Clay Cart*] cannot in equity be tried by laws with which the Author and his audience were unacquainted. If, therefore, it exceeds the limits of a play according to our approved models, we are not to consider it of disproportionate length; if it occasionally arranges the business of the stage after what we conceive an awkward fashion, we are not to pronounce it devoid altogether of theatrical ingenuity; and if it delineates manners repugnant to our social institutions, we are not to condemn them as unnatural or immoral.We must judge the composition after the rules laid down by Schlegel[1], and identify ourselves, as much as possible, with the people and the time to which it belongs.
(Wilson[2]: 181]

1

Arthur William Ryder[3] came to teach at the University of California, Berkeley in January 1906 from Harvard University. Though Sanskrit had been offered at Berkeley since 1897, with Ryder's arrival the courses were expanded into a full programme for Sanskrit language and literature. Ryder was a pioneering and dynamic promoter of Sanskrit studies not only in Berkeley but in the US as well. Ryder translated many Sanskrit works which included not only the masterpieces of Kalidasa[4]-- *Sakuntala*,and the *Cloud Messenger* —

but also King Shudraka's5 *The Little Clay Cart*. As a scholar par excellence of Sanskrit literature, Ryder held the play in high esteem.

> Nowhere else in the hundreds of Sanskrit dramas do we find such variety, and such drawing of character, as in *The Little Clay Cart*; and nowhere else, in the drama at least, is there such humor. (Ryder: xvii)

And Ryder's version, published in 1905 as part of the celebrated Harvard Oriental Series, remains one of the best and liveliest translations of the Sanskrit classic. Within a year of the publication of the play, Ryder moved to Berkeley in 1906; and, within a year of the coastal move, he initiated a production of the play in 1907. On 17 February, the San Francisco Call announced the college production:

> Keen Interest among the student body at the university has been provoked by the promise of dramatic novelties which are to be associated with the production by the English Club […] of a drama from the Sanskrit called "The Little Clay Cart," and requests for places in the cast are so numerous that Coach Garnet Holme[6], the English actor, is troubled by an embarrassment of riches In the way of acting material.
>
> One important actor has been chosen already. This is Princess, a baby elephant at the Chutes in San Francisco, who is to tread the stage while "The Little Clay Cart" is on and help to convey the

1 August Wilhelm von Schlegel (1767–1845), brother of the renowned German philosopher, Friedrich von Schlegel, was one of the first critics to see the importance of social evolution in the history of art. He was also the first professor of Sanskrit in Continental Europe to translate the *Bhagavad Gita* into Latin in 1823. August Schlegel, more than any other scholar of his time, established a model for the academic study of literature with an international, indeed almost global scope.

2 Horace Hayman Wilson (1786 – 1860) was an English orientalist. He went to India in 1808. In 1827, Wilson published *Select Specimens of the Theatre of the Hindus*, which contained the first full survey of the Indian drama and performance theory in any language.

3 Arthur William Ryder (1877 – 1938) was a professor of Sanskrit at the University of California, Berkeley. Regarded as one of the finest translators of Sanskrit, he is best known for translating a number of masterpieces of the Sanskrit literature into English.

> Impression that a real scene from India is being enacted before the university audience which wilt witness the Hindu play.

One might wonder — what sort of a stage could accommodate and carry the weight of an elephant…? It had to be an amphitheatre. It was. The Hearst Greek Theater. It was built in 1903 on the site of a rough outdoor bowl already in use as an amphitheatre since 1894.

A spectacular site well-suited to a spectacle. Gurden Edwards, writing for a local newspaper, felt that

> …the production of "The Little Clay Cart," with its peculiar stage necessities, it again proved [the Hearst Greek Theater's] usefulness, for effects were obtained that could not be produced on an ordinary stage. (Edwards: 485)

Edwards goes on to add,

> Another distinction attaches to this production of "The Little Clay Cart," as it is the first time that a Hindu play… has ever been given before a Western audience, not only in America, but in Europe as well. Former productions of the piece, in Paris and Berlin, were so thoroughly "adapted" as to lose most of their original charm and atmosphere…. (Edwards: 485)

The Berkeley production of the play went for spectacular entertainment (at an admission charge of 75 cents per ticket) in an amphitheatre that could accommodate more than 7000 people.

> The great scene of the piece was the great final… act, which represents a street festival in the crowded streets of Avanti. A

[4] Kalidasa (flourished 5th century CE, India) was a Classical Sanskrit writer, widely regarded as the greatest poet and dramatist in the Sanskrit language of India. His plays and poetry are primarily based on the *Veda*s, the *Ramayana*, the *Mahabharata* and the *Purana*s. Much about his life is unknown, except what can be inferred from his poetry and plays.

[5] Shudraka (or Œudraka) was an Indian king and playwright. Three Sanskrit plays are ascribed to him - *Mrichchhakatika* (*The Little Clay Cart*), Vinavasavadatta, and a *bhana* (short one-act monologue), *Padmaprabhritaka*. It is difficult to provide confirmed dates for Shudraka. It seems likely that he was writing at the beginnings of a golden age of Sanskrit drama under the Gupta kings of Kanauj, who ruled over the greater part of India during the fourth and fifth centuries.

> throng of people enter with a troop of Oriental musicians playing the weird music of the East. The procession was headed by an elephant… and two zebras. (Edwards: 490)

Are zebras native to India? Regardless of the zoologist's answer, this production was hailed as a first time West-meets-East theatrical venture.[7] But despite it being the 'first ever' Western production of *The Little Clay Cart*, it remained an amateur production, a single-trick flash in the pan. The first professional production of the play would have to wait another seventeen years.

2

When, in 1922-23, Irene Lewisohn (1886-1944) and her sister Alice (1883–1972), daughters of Rosalie Jacobs and industrialist Leonard Lewisohn, decided to visit the 'East' — the Middle East, India, and Burma — the "little" theatre company they had established in New York had already completed almost 10 continuous seasons. In 1915, the Lewisohn sisters had founded the Neighborhood Playhouse at 466 Grand Street in the lower East Side of Manhattan, New York. With help from many directors, actors, designers, and social workers, they had turned the Playhouse into a haven for both community theatre and experimental work, working against the tide of the highly commercial Broadway and, as Christopher Gray wrote in the New York Times in 2010, "seeking to bring high culture to the immigrants crammed into the tenements of the Lower East Side" (Gray: RE7). Alongside children's theatre, Neighborhood Playhouse also put up popular plays ranging from John Galsworthy to George Bernard Shaw and Harley Granville-Barker. They also performed pageants of various sorts from myths and folk tales from various lands to ritual plays and balletic pieces. Several of their productions went to Broadway, but invariably failed. Alice Lewisohn offered justification for that in her memoirs: "The theatres of Broadway… were merely houses or caravansaries for selling their wares,

[6] Garnet William Holme (1873-1929) was a British theatre teacher and director who settled in Berkeley, California and taught at the University of California there. He specialised in pageantry and was director of pageants for United States National Parks. Holme wrote and directed *The Ramona Pageant* is the longest running outdoor play in the United States.

while the audience, to a large extent transient comers, had no relationship to distinctive values." (Lewisohn Crowley: 113) It was this search for "values", their incessant questions about the ultimate meaning of theatre that made the Lewisohns look for "sources," one of them being the East. Of course, the term 'East' is a deeply problematic and reductive term. Like the term 'Orient' — as exposed by the expansive interrogation and critical consideration of the politics of Orientalism made available to us through the developments in postcolonial studies — it is fraught with hidden, often contradictory and layered implications and meanings: mysterious, spiritual, alluring, romantic, degenerate, decrepit, uncivilised, et cetera. The list of antinomies could go on. In this regard, it would perhaps be more pertinent to just go by the travel itinerary of the Lewisohn sisters.

By the time the sisters began traveling, they had already presented performances that incorporated elements from cultures that are usually clubbed under the termb 'Eastern'. They were perhaps the first American theatre company to attempt a production of a Japanese Noh play, *Tamura*, by Zeami [8]. It is important to note here that, during the first decades of the twentieth century, Noh Drama was already known to European audiences (and its American counterpart, by extension) through the translations of Paul Claudel and the directorial work of Jacques Copeau in French, and Ezra Pound and WB Yeats' engagement with the form in the Anglophone world. Alice Lewisohn Crowley, in her *Neighborhood Playhouse: Leaves from a Theatre Scrapbook*, had this to say about the undertaking:

> This experiment in the Noh drama was to attempt a translation into Western theatre idiom of an exotic, mystical experience. I do not think it would have occurred to us to consider the strain we might inflict upon the imagination of the audience had we not been wholly beguiled by this fugitive, ancestral soul of Japan. (Lewisohn Crowley: 75)

[7] After *The Little Clay Cart*, Ryder's equally celebrated translation of Kalidasa's *Shakuntala* was performed in 1914 at the Hearst Greek Theatre in Berkeley, California.

After describing in detail how this production was designed and staged with every effort to remain faithful to its original "fugitive, ancestral" cultural setting of Japan, in discussing the effect the staging had on the audience, Lewisohn Crowley, perhaps more forgivingly than a critic, wrote:

> The scheduled ten performances received sympathetic response, indicating an interplay between the intensified experience of actor and the mood absorbed by the audience who together released the magic of theatre. (Lewisohn Crowley: 91) Beyond some visual descriptions, role assignations and a few elements that marked deviations from the Noh tradition, it is impossible to ascertain from Lewisohn Crowley's description what the exact mode of staging may have been, or even how close or distant it was from the Japanese traditional Noh.

[8] Zeami Motokiyo (c. 1363 – c. 1443), was a Japanese aesthetician, actor, and playwright. His father, Kan'ami, introduced him to Noh theatre performance at a young age, and found that he was a skilled actor. Kan'ami was also skilled in acting and formed a family theatre ensemble. In 1374, Zeami made acting his career. After the death of his father in 1385, he led the family troupe, a role in which he found greater success.

সহজিয়া সংস্কৃতি

প্রবীর গুহ

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের শুরু আদিমকাল থেকেই। মানব জীবনের কল্যাণের জন্যে তৎকালে মুনি-ঋষিরা নানা কথা বলে থাকতেন। লোকমুখে শুনে অন্যেরা তা শিখে নিতেন। এইভাবে পরের প্রজন্ম অবধি বহমান ছিল সে সব নীতিমালা ও দর্শন। এই জন্যে এর নাম ছিল 'শ্রুতি'। অক্ষর আবিষ্কার হবার পর তা লিখিত হল। তখন তার নাম হল 'বেদ'। এই বেদের শেষ অংশ হল উপনিষদ। বেদের অন্ত তাই বেদান্তও বলা হত। তারপরে ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও বেদান্ত ব্যাখায় নিয়োজিত হয়। বেদান্ত দর্শনে ধ্যান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। সে ছিল এক ধরণের সংস্কৃতি। বেদান্ত ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য আর অদ্বৈত ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য দুই বিখ্যাত নাম, অদ্বৈতবাদ নিয়ে আরও অনেক পণ্ডিতজন কাজ করলেও শঙ্করাচার্য্যই সুসংহত একটা রূপদান করেন।

মাধবাচার্য্যর দ্বৈত মতবাদ অনুযায়ী পরমাত্মা আর জীবাত্মা দুটি ভিন্ন জিনিষ। জীবাত্মা ঈশ্বরসৃষ্ট নয় কিন্তু তার ওপরেই আজীবন নির্ভরশীল। ঈশ্বর, জীবাত্মা, পদার্থ সব দ্বৈত, ভিন্ন ভিন্ন। এক কথায় জীব ও ভগবান আলাদা। কিন্তু, শঙ্করাচার্য্য বলে গেছেন, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য আর পরম সত্যই ব্রহ্ম। তাই সেও শুদ্ধ চৈতন্য।

উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র-এর ব্যাখ্যা অদ্বৈত মতেই দেওয়া হয়। আত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যার সাহায্যে মোক্ষলাভ সম্ভব তবে প্রয়োজন প্রকৃত গুরুর অধীনে, কঠিন প্রশিক্ষন। এই মতে সব কিছুই পরস্পরের সাথে যুক্ত। কিছুই আলাদা নয়। কিন্তু একই সময়ে প্রতিটি বস্তু তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছে। গোবিন্দ ভাগবতপাদ আর তার গুরু শঙ্করাচার্য্যের গুরু, গৌড়পাদ বৌদ্ধদের দুটি মতবাদ গ্রহণ করলেন। যোগাচার মত আর বিশ্বের প্রকৃতি চারমুখী মিথ্যা। স্বপ্নে দেখা বস্তু আর বাস্তব জগতের বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছে, তবে শেষ পর্যন্ত দুটোই মিথ্যা। Neither 'is', nor 'is not'.

প্রায় পাঁচশ বছর পরে চৈতন্যদেব অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের কথা বললেন। অচিন্ত্য, চিন্তার সীমানা ছাড়ায়ে। যে জ্ঞান যুক্তি তর্কের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, আবার প্রত্যক্ষ সত্য বলে অস্বীকারও করা যায়না— সেটাই অচিন্ত্য জ্ঞান। আমার মধ্যেই দুটো সত্তা। ভেতরেও আছি, বাইরেও আছি। ভূমি যেমন চাষযোগ্য, মনও তেমন। 'মন রে কৃষি কাজ জান না ..... এমন মানব জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা ....'। ভূমি কর্ষনে ফসললাভ আর মনকর্ষনে কৃষ্টিলাভ। সংস্কৃতির দোসর

কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবার। সকল মানুষের। নগর, গ্রাম—অধুনা, পুরাণো- সংস্কৃতি সবার ছিল, আছে। শিক্ষিতের সংস্কৃতি একটু আলাদা। কারণ, শিক্ষা সংস্কৃতির মান উন্নত করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ হয় না। দীর্ঘদিনের চর্চা সংস্কৃতিকে একটা রূপদান করে। ঐতিহ্য দিয়েই সংস্কৃতি বিকশিত হয় বটে কিন্তু ঐতিহ্যের গুণগুলো চিরকাল একরকম থাকে না। নতুনের সাথে পুরাতনের সংঘর্ষে যে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরী হয়, তার থেকেই পরিবর্তিত হতে থাকে চলমান সংস্কৃতি। পরিবর্তন না হলে তার অপমৃত্যু ঘটে। অচল ও অন্ধ অতীত বিশ্বাস মানব জীবনকে এগোতে বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজেও ক্ষয়ীভূত হতে থাকে।

সভ্যতার সাথে কিন্তু সংস্কৃতির একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে। দুটো আলাদা শব্দ, আলাদা মানে ও আলাদা কাজ। প্রথমটা জীবনের সংগঠিত রূপ, পরেরটা জীবনের অভিব্যক্তি। জীবনের উপযোগীতার কারণেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়।

কোনও একটা স্থানে একটা জাতি থাকার ফলে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক গুণাগুণ নিয়ে তৈরী হয় এক সভ্যতা। সেই সভ্যতার পরিচয়টাই সংস্কৃতি। এ এক সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখা। সংস্কৃতি কিন্তু তথাকথিত শিক্ষার ধার ধারে না। শিক্ষিত ইউরোপীয়দের যেমন সংস্কৃতি আছে, তেমনি পৃথিবীর আদিম জনগোষ্ঠীরও আলাদা সংস্কৃতি আছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের বাইরের জীবন আর ভেতরের জীবনকে প্রভাবিত করে। সে অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি,খাদ্যাভ্যাস মানুষের দেহ ও মনের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। রুক্ষ কিংবা নমনীয়, কোমল কিংবা কঠিন, সরল কিংবা জটিল হিসেবে গড়ে তুলেছে। কেউ সমতলে থাকে, কেউ পাহাড়ে, কেউ জঙ্গলে, কেউ শহরে, কেউ নদী বা সাগরের ধারে, কেউ মরুভূমিতে, আবার কেউ অ্যান্টার্কটিকায়। প্রত্যেকের জীবনচর্চা, খাদ্যাভ্যাস, ভাবনা চিন্তা, বিশ্বাস— সব বিভিন্ন। কারও সাথে কারও মেলে না। কোথাও সুরেলা মমতার সুর ত কোথাও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সুর। কোথাও সুর দীর্ঘায়িত আবার কোথাও হ্রস্ব। যারা পাহাড়ের মানুষ তাদের উপরে উঠা আবার নামার সুরে পার্থক্য আছে। জল যাদের জীবন, তাদেরও জোয়ারে এক সুর আবার ভাটায় দীর্ঘায়িত সুর। ভাষা আর সংগীত তৈরী হয়েছে ঐ সুরের ভিত্তিতে। ধর্ম ও মানবজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গেছে। বিধান আর শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নিজস্ব আচার আচরণ গঠিত হয়েছে। প্রায় সমস্ত আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতির সাথে ধর্ম জড়িয়ে গেছে। আবার ধর্মের কারণেই একই জায়গার বসবাসকারী হয়েও জীবন চর্যায় তাদের নানান পার্থক্য। খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, আচার আচরণ প্রায় দ্বিমুখী। কেউ কাঁকড়া, কচ্ছপ, শুয়োর খায় ত অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে তা অচ্ছূৎ। আবার কোনও সম্প্রদায় গরু খায় যা অন্যদের কাছে গ্রহণীয় নয়। পোষাক আশাকেও তার ভয়ানক প্রভাব। স্থাপত্যেও

ভয়ানক বৈপরীত্য। মন্দির আর মস্‌জিদ্‌ গড়তে আলাদা স্থাপত্য জ্ঞান লাগে। তার অলংকরণও হয় একেবারে অন্য ধরণে, মোটিফে, আকৃতিতে। এই আকৃতিও বিশেষ কোনও ধর্মে আবার এক রকম নয়। হিন্দু মন্দিরে নানা প্রদেশে নানা রকম স্থাপত্য। পোষাকেও নানান বৈচিত্র্য। সব প্রদেশেই একই দেব-দেবীরা গুরুত্ব পায় না হিন্দু মন্দিরে। কোথাও রাম, কোথাও কৃষ্ণ। এই ভাবেই দুর্গা, কালী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, শিব, বিশ্বকর্মা, হনুমান যে যার মত জায়গা করে নিয়েছে। নিম্নবর্গরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধীতা করতে গিয়ে নানা জায়গায় পুরুষ লোকদেবতার জন্ম দিয়েছে। বাবসায়ী আর রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে-ফেঁপে তাদেরও একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এক এক সম্প্রদায়ের এক এক লোক-দেবতা, তাদের জন্মতিথি, তিরোধান দিবস পালণের নানা সংস্কৃতি। এই সব লোক-দেবতারা রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্যদের দ্বারা তেমন সমাদৃত ছিলেন না। আজকাল তাঁদের মধ্য থেকে এম.এল.এ, এম.পি বা স্থানীয় প্রশাসনেও প্রতিদ্বন্দিতা করছেন, জিতছেন, মন্ত্রী হচ্ছেন এবং সেখানকার সংস্কৃতিতেও বদল আনছেন। আদিম সংস্কৃতি, উপজাতি সংস্কৃতি, নগর সংস্কৃতি, ও লোকসংস্কৃতি- এই চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে সংস্কৃতিতে।

আধুনিক সমাজ সংস্কৃতি আদিম সংস্কৃতিকে খুবই সামান্য প্রভাবিত করেছে বা একেবারেই করেনি। সেন্টিনেল দ্বীপের বাসিন্দারা, জারোয়া বা ওড়িষ্যার কিছু অঞ্চলের সংস্কৃতি প্রায় অবিকৃত রয়ে গেছে। আবার বেশ কিছু রাজ্যে অল্প বিস্তর পরিবর্তন এসেছে। নাগা, মেইতেই, অসমীয়া, অরুণাচলী, হিমাচলী ইত্যাদি দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিকতার ছাপ সর্বত্র নেই। তাই শহর ছাড়া তাদের সংস্কৃতিও খুব বেশি আধুনিকতা দ্বারা প্রভাবিত নয়। কিন্তু, যে অঞ্চলই হোক না কেন, সেখানকার নগরের সংস্কৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং সব নগর বা সংস্কৃতিও নানা জাতির মানুষের সমাগমে, মিলনে, বন্ধুত্বে এক ধরণের সাধারণ গ্রাহ্য মানের সংস্কৃতি তৈরী করেছে। এ সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে অত্যাধুনিকতার সাহচর্য্যে, ইন্টারনেট আর বাজার সংস্কৃতির প্রভাবে। এখানে আঞ্চলিক পোষাক, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, লেখাপড়া, মূল্যবোধ সবটাই - বাজার নিয়ন্ত্রিত, এবং আধুনিক মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত। একই জাতির লোকেরা একে অপরের সাথে কথা বলে ইংরেজীতে। যারা ইংরেজী জানে না তারা হিন্দিতে কথা বলে অন্য একটা গর্ববোধ করেন। এই সংস্কৃতিতে বড় হওযা মানুষেরা এক অভ্যাস নিয়ে বেশিদিন চলতে পারে না। সব সময় নিজ সংস্কৃতিকে ছোট করে দেখেন। '...নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ও পাড়েতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস...' যিনি ঈষৎ কালো, তিনি ফর্সা হবার চেষ্টায় থাকেন আর সাদারা কিভাবে কালো হবেন সেই রাস্তায় হেঁটে প্রচুর পয়সা খরচা করেন। পাশ্চাত্যের মানুষেরা রোদে গা পুড়িয়ে রং কালো করেন। আর কালো বা বাদামী মানুষেরা রঙ ফর্সা করার জন্যে গাদা গাদা ক্রীম ব্যবহার করেন।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষেরা একটু পয়সা জমিয়ে ভালো পোষাক পরার চেষ্টা করেন, তেমনি ধনীরাও দরিদ্রদের ছেঁড়া পোষাকের আদলে ছেঁড়া, ফাটা, নোংরা, রংচটা পোষাক কেনেন মোটা দামে। নগর সংস্কৃতি মূলত বাজার নিয়ন্ত্রিত। সবসময় কোনও 'সুখ'কে অ্যাবসলুট বলে না দেখানো, অতৃপ্তির একটা বেদনা বহমান রাখার নামই হল 'বাজার'। নগর সংস্কৃতিতে এর প্রভাব মারাত্মক। কোন পোষাক, কি খাব, কি দেখব, পড়ব, শুনব, ভাবব—সবটাতেই এদের অদৃশ্য খবরদারী। সাধারণ মানুষও পরিচালিত হয় ঐ বাজারী, শেখানো সংস্কৃতি দ্বারা। চশমা, জামা-কাপড়, মোবাইল ফোন, টিভি, এসি, ফ্রিজ ইত্যাদি কিনলেই হবেনা, কোন ব্রান্ডের জিনিষ সেটাও বিচার্য্য। তবেই পে-ডিগ্রি তৈরী হবে। নগর সংস্কৃতি এখন একটা পচা গলা আবর্জনার ভ্যাট। আর যেটুকু প্রতিবাদ, তাও খুব একই অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি মাত্র। মানব-বন্ধন, মোমবাতি মিছিল, মুখে কাপড় বেঁধে প্রতিবাদের মিছিল ... ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু লোক সংস্কৃতি একদম ভিন্ন চরিত্রের।

লোকসংস্কৃতি সহজিয়া মতে চলে। যা কিছু সরল, সোজা, প্রচন্ড নিয়মাবদ্ধ নয় ব্রাহ্মণদের মত— তাই 'সহজিয়া'। সহজ কথা, সহজ ভাবনা, সহজ কর্ম। সহজ— যা মানুষের স্বভাবের অনুকূল। 'সহজিয়া' মতে, সাধারণ লক্ষ্য যিনি, তিনি জ্ঞান স্বরূপ আর বাস করেন দেহমধ্যে। আসলে দেহই ত ব্রহ্মান্ড।... যা নেই ভান্ডে তা নেই ব্রহ্মান্ডে। তাই দেহ নিয়েই সাধন। এই সাধনের নামই 'সহজিয়া'। এর আবার দুই ভাগ। 'বৌদ্ধ' আর 'বৈষ্ণব'।

বৌদ্ধ মতবাদে 'সহজযান' অবলম্বনে মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-অর্চনা, শাস্ত্র ইত্যাদি মেনে চলতে হবে পুরাণো নিয়ম মতে। কিন্তু পরবর্তীতে এ সব নিয়মের যাঁতাকলে হাঁসফাঁস করতে করতে নিষ্পেষিতেরা অন্য রাস্তার সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। এঁরা বললেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বুদ্ধ আছেন। আর বুদ্ধ মানেই ত মহাজ্ঞান। তাই এখানে শাস্ত্রপাঠ অনাবশ্যক। মহাজ্ঞানীকে ত আর শেখাবার প্রয়োজন নেই। পাল রাজাদের সময় এই সহজিয়া বৌদ্ধরা বিস্তার লাভ করলেন। চর্য্যাপদের পদকর্তারাও এই মতেরই অনুসারী ছিলেন। পরে এঁরা চিত্তশুদ্ধির কথা বললেন। কিন্তু সেটা করতে হলে ত গৃহত্যাগী হতে হয়। বিষয়াসক্তিহীন হতে হয়। তাই প্রকাশ্যে এই মতের স্বপক্ষে দাঁড়ালেও ব্যক্তিজীবনে গৃহীরূপেই প্রবেশ করলেন।

অন্যেরা একটু অন্যপথ নিলেন। শৈব, নাথ আর মহাযান ধর্মমত এক করে বৌদ্ধ সহজিয়া পথ তৈরী হল। নিজেদের কূল, জাতি, পদ গোপন করে নতুন নাম গ্রহণ করলেন। সান্ধ্য ভাষায় হেঁয়ালীর মাধ্যমে নানা উপমায় এরা কথা বলতে শুরু করলেন। নির্বাণ লাভ করাই এঁদের একমাত্র মোক্ষ। পুরাণো সংস্কৃতি পাল্টে নতুন

সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে। সতের শতকে বৈষ্ণব সমাজে এই সহজিয়া মতকে আপন করে নেয়। আঠার শতকে 'বাউলে'র সাথে পরিচয় হয় সমাজের। মধ্য এশিয়ার ভ্রাম্যমান এক যাযাবর গোষ্ঠী গান-বাজনা করেই জীবন চালাতেন। তাদের বলা হত 'আ-ওল'। তারাই যখন চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন,তখন তাঁরাই বাউল হলেন। অবশ্য এ নিয়ে প্রচুর মতামত আছে। 'বায়ু' থেকে 'বাউল' বা 'বাতুল' থেকে 'বাউল'। এরকম নানা মতবাদ আছে। তবে সতেরশ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর সম সময়ে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে ইসলামের প্রবেশের আগেই বাংলায় বাউল শব্দের প্রচলন ছিল। তবে গানে ছিল কীর্তনেরই প্রাধান্য। কীর্তনকে সহজ করে 'ঢপ কীর্তন'-এর প্রচলন হল। বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতেন এই কীর্তন গেয়ে।

এগার শতকের মধ্যভাগ থেকে আঠার শতক পর্যন্ত ইসলামের সাথে সুফিবাদও প্রবেশ করল বাংলায়। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, পারস্য দেশ থেকে সুফী সাধকরা আসতে থাকেন। বার শতকের শুরুতেই বখতিয়ার খিলজী বাংলা বিজয় করার পর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা সাধকরা আসেন। সেই সাথে সুফীরাও আসেন, চিস্তিয়া, মাদারী, নক্সবন্দী, কলন্দর, কাদেরিয়া ইত্যাদি ঐতিহ্যেরা আসতে থাকল এবং সে সময়কার নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরী করল। প্রেমের মাধ্যমে উপাস্যকে শ্রদ্ধা নিবেদন— সুফীবাদের এই আদর্শের সাথে বৈষ্ণব ধর্ম, লৌকিক মরমীবাদ, বাউল ও অন্যান্য ভক্তিমত কমবেশী প্রভাবিত হতে থাকল।

বৈষম্যমূলক ব্রাহ্মণ্যবাদের বংশগত জাতিভেদের বদলে গুণ ও কর্মের আধার মানুষদের শ্রদ্ধা জানানোর এক নতুন ব্যবস্থা চালু করাই ছিল আউলচাঁদ ঠাকুরের 'কর্ত্তাভজা' সম্প্রদায়। এছাড়াও ছিল আরও নানা সম্প্রদায়। আউল, বাউল, দরবেশ, বনচারী, মাঝবাড়ি, কন্ঠধারী, অটলবিহারী, কালাচাঁদী প্রভৃতি বৈষ্ণবী উপ-সম্প্রদায়ের নানা মত, বিচার, পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, মূর্ত্তিপূজা —অজস্র বৈচিত্র । 'বৈষ্ণব সহজিয়া' আমাদের সমাজে চতুর্দশ শতকে বড়ু চন্ডীদাসের হাত ধরে অবতীর্ণ হল। কথিত আছে, রামী নামের এক রজকিনীর সাহায্যে তিনি এই তত্ত্ব দর্শনে সিদ্ধিলাভ করেন। পরে আঠার দশকে সমাজে এই মত প্রচলিত হয়। তিনিই বললেন, প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ। তার জন্য মানব দেহই অবলম্বন। রূপ— প্রেম—আনন্দ, এটাই আদর্শ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পরকীয়া প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে নয়। আবার সহজিয়া সাধকরা বাস্তব জীবনকেই পরকীয়া বিশ্বাস করেন। পরকীয়াতেই সিদ্ধিলাভ— এটাই বিশ্বাস তাদের। তাই রাধা কৃষ্ণের মানবরূপ দরকার হয়ে পড়ে এবং তাদের মিলনই সাধন পথের দরজা। এদের সৃজিত 'পদাবলী'

আর 'নিবন্ধ' সাহিত্যের মধ্যে পদাবলীই অতি জনপ্রিয়। রচয়িতাদের অন্যতম বিদ্যাপতি, রূপ গোস্বামী, বড়ু চন্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি।

সুফী ফকির ও বাউল সম্প্রদায় অনেক জায়গায় মিলে মিশে একাকার। কৃষ্ণ আর আল্লা এদের কাছে সমার্থক। অনেকেই মূর্ত্তি পুজো করে না, জাত-ধর্ম মানে না। যেকোন সম্প্রদায় ও জাতি এঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন আবার গুরুও হতে পারেন। শুধুমাত্র সাধন সঙ্গী নয়—নারীরা গুরুমাতাও হতে পারেন। এই বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার সংস্কৃতিও এই সহজিয়া মত থেকে আসল। এরা নিজেদের পাগল, ক্ষ্যাপা, দিওয়ানা ইত্যাদি নামে পরিচিত করান। পরমারাধ্যকেই 'মনের মানুষ' বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তার ঠাঁই মানবদেহেই। বাউল গানে কীর্ত্তনের প্রভাব তাই তার সাজসজ্জা, রীতি-নীতি, আঙ্গিক মূলত হিন্দু সংস্কৃতির। আবার ফকিররা যেহেতু গজল প্রভাবিত গান চর্চা করেন, তাই তাদের সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে ইসলাম সংস্কৃতি অনুসারে।

তবে এসব পদ্ধতি তাদের জীবন যাপনের আদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর নির্মিত হয়েছে। এই সম্প্রদায়কে সমাজ বা রাজনীতি অ-সচেতন বলা যাবে না। তা যদি হত সিরাজদৌল্লার পতনের পর-পরই এতবড় ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করত না। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর ব্যাপী এই বিদ্রোহের অগ্নি বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে এরা লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আর এসব থেকেই তাঁদের মধ্যেকার যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হয়ে আরেক সহজিয়া পথে উত্তরণ ঘটায়। হিন্দু লোক-দেবদেবী বা ইসলামীয় পীর, পয়গম্বর উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। এবং সামাজিক কল্যাণে আচরিত তাদের কৃত্যতেও ধর্মের বেড়া ভেঙে সাধারণের মধ্যে মিশে গেছে।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির এই বিকাশের সময় প্রাচীনকাল থেকেই। অনেক যুগ ধরে গ্রহণ-বর্জন, শোষণ-প্রতিবাদ-এর পথ বেয়ে পুষ্টি ও সমৃদ্ধিলাভ করেছে যে সংস্কৃতি, সেটাই আমাদের প্রবহমান সংস্কৃতি। আজকের এই বাজার ভাবনার সংস্কৃতির সাথে লড়াই করতে হলে নতুন এক 'সহজিয়া' পথেই আমাদের হাঁটতে হবে। নিজের সংস্কৃতির জমিতে লালিত পালিত এক প্রতিজ্ঞা।

স্বল্প সাধনে আপোষহীন গূঢ় সত্যের শিল্পীত প্রকাশের নামই 'সহজিয়া থিয়েটার'। এটা কোনও নতুন থিয়েটার তত্ত্ব নয়। এ পর্যন্ত আমরা দুটো 'থার্ড থিয়েটার' তত্ত্ব পেয়েছি। ইউজেনিও বারবা বাহাত্তর সালে তাঁর Third Theatre এর কথা বলেন, যেখানে ডিরেক্টর'স থিয়েটার ও করপোরেট থিয়েটারকে বাতিল করে সবাই মিলে সৃষ্টি করার নাম দিলেন থার্ড থিয়েটার আর বাদল সরকার সাতাত্তর সালে এই একই

নাম বললেন যে প্রথমটি আমাদের পুরণো দেশীয় থিয়েটার আর দ্বিতীয়টি ইউরোপীয় থিয়েটার। এই দুই থিয়েটারের সংমিশ্রণে আরেক নতুন থিয়েটারের নাম— থার্ড থিয়েটার। এই থিয়েটার হবে যথাসাধ্য কম খরচের,সঙ্গে বহনযোগ্য ও মানুষের সাথে মানুষের একটা কথা বলার মাধ্যম হবে।

আমাদের দেশে সেভাবে ডিরেক্টর'স থিয়েটার কিংবা করপোরেট থিয়েটারের প্রভাব বিস্তৃত নয়। আবার দেশীয় লোকনাট্য আর ইউরোপের থিয়েটারের মিলনক্ষেত্রও হয়ে ওঠেনি। তাই এক এ কটি ভাবনা থেকে সরে এসে বারবা'র সবাই মিলে থিয়েটার আর বাদল সরকারের কম খরচের সহজ বহনযোগ্য থিয়েটারের কথা ভাবি, তবে সে থিয়েটার চৈতন্য যুগ থেকেই শুরু হয়ে গেছে, সে সময় তিনি নিজেই অভিনয় করতেন। তাঁর সময়ে লোকগান, লোকনৃত্য, লোক কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী মিলেমিশে জন্ম হয়েছে 'যাত্রা' নামে এক নবতম লোকশিল্পের। যাত্রা অর্থে Journey এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে অভিনয় করা হত। সে সময় 'ব্রজলীলা' ও

'রুক্মিনী হরণ' নামে যাত্রায় চৈতন্যদেব নিজে অভিনয় করে মানুষকে ভাবরসে মাতিয়ে দিতেন। তাঁর প্রভাবে তখন অনেক যাত্রা লেখা শুরু হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' সযত্নরক্ষিত অবস্থায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন জয়ন্ত রঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ। ১৯১৬ সালে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। আগে এর নাম ছিল মনে করা হয় 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'। তুলট কাগজে হাতে লেখা ৪৫২ পৃষ্ঠার এ পুঁথি আনুমানিক তেরশ খ্রীষ্টাব্দে বড়ু চন্ডীদাস দ্বারা রচিত। তারও কয়েক দশক আগের থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর রচনা করেছেন জয়দেব, বিদ্যাপতিরা।

অতএব এই 'সহজিয়া কাব্য' প্রায় হাজার বছরের পুরাণো (লিখিত হিসাবে পরে আসলেও) । তারপরে এসব নাটক অভিনীত হতে আরম্ভ করেছে। চৈতন্যদেব এই থিয়েটারকে এক আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, কোনও ঈশ্বর নেই, উচ্চ-নীচ নেই এবং অত্যাচার যেখানে যত বাড়বে, নাম-গানও পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে শুধু কণ্ঠস্বর, শ্রীখোল আর অভিনয় নিয়ে। এ থিয়েটার আমাদের রক্তে বহমান। এটাই 'সহজিয়া' থিয়েটার।

এ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি ভাবনায় অপ্রতিরোধ্যতার ভূমিকা

শ্যামল ভট্টাচার্য

ট্রাজেডি মূলতঃ নিয়তিবাদের নাট্যগত প্রকাশ। এ্যারিস্টটল কিভাবে এই সন্দর্ভ প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে আলোচনার অবতারণ করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার তার ট্রাজেডির উৎস হিসাবে তিনি চরিত্রের মধ্যেই অন্বেষণ করেছেন সেই মহাপাপ যার প্রতিফলনের হৃদয়বিদারক গাঁথাই হল ট্রাজেডি। চরিত্রগত এই পাপের শক্তি অপ্রতিরোধ্য।

নাটক শুরু হল। ট্রাজিক চরিত্রটি মঞ্চে এলেন। ঘটনাপ্রবাহ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে ট্রাজিক নায়কের সঙ্গে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর এক আবেগঘন সহমর্মিতার পরিমণ্ডল তৈরী হয়ে গেল।

নাটকে মূল ঘটনার সূত্রপাত। এবার সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে নায়ক তার প্রতিক্রিয়ায় একটি চরম ভুল করে বসলো। এই চরম ভুল (Hamartia) তাকে তাৎক্ষণিক ভাবে অপার সুখানুভূতি এনে দিল। ফলতঃ ভুলটা সে বুঝলোই না। তার প্রতি দর্শকমণ্ডলীর যে সহমর্মিতা বোধ জন্মেছে সেই অনুভূতি থেকে তারাও নায়কের সুখে সুখী হয়, উজ্জীবিত হয়, তার ভ্রান্ত কর্মের সমর্থক হয়ে পড়ে।

অকস্মাৎ এমন কিছু ঘটে যা সব কেমন ওলোটপালোট করে দেয়। (উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজা ওয়দিপাউস যে খুনীকে খুঁজে চলেছেন তিনি নিজেই যে সেই খুনী এমন ভয়ঙ্কর তথ্যটি তিনি হঠাৎই তাইরেসিয়াসের মারফৎ জানতে পারেন)। ট্রাজেডির নায়ক যিনি তার অজ্ঞাত পাপের কারণে সুখ ঐশ্বর্যের শীর্ষে উঠে বিরাজ করছিলেন এবার তার সেই সুখের মিনার থেকে পতন শুরু হল। এই মর্মান্তিক পতনের যন্ত্রণা নায়ক কল্পনাও করতে পারেন না। তার দুঃস্বপ্নের দিন শুরু হয়। যে দর্শকদের মধ্যে নায়কের সুখানুভূতি সঞ্চারিত হয়েছিল, তারা এবার ভয় পেতে শুরু করে। নায়কের আতঙ্ক-শঙ্কা-অসহায়তা তাদেরকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করে। এই যে নায়কের চরিত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেল আচম্বিতে, তার 'পোয়েট্রিক্স' গ্রন্থে এ্যারিস্টটল এই চরিত্রটির অপ্রতিরোধ্য নিয়তির দিকে যাত্রাকে Peripeteia বলে বর্ণনা করেছেন। চরিত্রের দুর্ভাগ্যযাত্রা শুরু হচ্ছে। উদাহরণ— রাজা ক্রেয়ন খবর পেলেন তার স্ত্রী এবং পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। আবার হিপোলাইটাস তার বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে সক্ষম হলো না যে সে নিষ্পাপ— তার বাবা তাকে অনিচ্ছা সত্বেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলেন। এ পরিণতি অনিবার্য।

এই Peripeteia পর্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ট্রাজেডিতে। প্রবল সুখ বৈভব থেকে

রিক্ত-ধ্বস্ত-অস্তিত্বের বিপন্নতার দিকে যাত্রা। এ এক দুঃসহ অভিগমন। (স্মরণীয় কিং লিয়ার)। এই পর্যায়ের একেবারে শেষ পর্যন্ত দর্শকচিত্ত নায়কের সাথে উদ্বেল থাকে গভীরতর সমবেদনায়। কিন্তু তারপর দর্শকচিত্তের এই উদ্বেল সমবেদনার তীব্রতা কমতে থাকে। বিপর্যয়ের অশনিসংকেত দর্শককে নায়কের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। কারণ সংঘাতজনিত দ্বন্দ্ব দর্শককে দোদুল্যমান অনুভবের কঠিন স্তরে পৌঁছে দেয় যেখানে সে উত্তরণের কোনো পথ খুঁজে পায় না। অপ্রতিরোধ্য এই বিনাশক্রিয়া তারা অসহায় ভাবে দেখতে থাকে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে এ্যারিস্টটল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি এবার উত্থাপন করেন। নায়কের এই নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতাকে নতুন এক পর্যায়ে তিনি নিয়ে যান। কী সেই পর্যায়? এ্যারিস্টটল এই পর্যায়টির নাম দিয়েছেন Anagnorisis - অর্থাৎ আত্মসমীক্ষার পর্যায়। এই পর্যায়ে নায়ক তার নিজের পাপের স্বরূপটা চিনতে পারে এবং সেই পাপকর্মের বিশ্লেষণ করতে থাকে নানা যুক্তি সাজিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে। এই প্রক্রিয়া তাকে আত্মনিপীড়ণ থেকে অনেকখানি মুক্তি দেয়। এবং তার মনের মধ্যে একটা প্রত্যাশার জন্ম হয় যে দর্শক নিশ্চয়ই তার এই আত্মবিশ্লেষণকে গ্রহণ করবে, তার পাপের দায় থেকে তাকে মুক্তি দেবে। কিন্তু দর্শকের সুযোগ আছে এই পাপবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিতে ঘটনার বিশ্লেষণ করার। তাই সে অনিবার্যভাবে স্খলনমুখী নায়কের ওপর থেকে নৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করতে থাকে। নায়ক আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। চেতন অবচেতনের দ্বন্দ্বে দর্শক অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়ের বৃত্ত থেকে নিজেকে দূরে নিয়ে যায়। অপেক্ষা করে নায়কের আসন্ন ভয়ংকর পরিণতির জন্য। প্রকৃতির পরিশোধ তিলে তিলে চরম শিক্ষা দিয়ে যায়।

এ্যারিস্টটল ট্রাজেডির এই মর্মন্তুদ পরিসমাপ্তিকে বলেছেন Catastrophe যা কিনা ট্রাজেডির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে ইতিবাচক বা সুখসমাপ্তির কোনো উপাদান থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে নায়কের করুণ মৃত্যু ঘটবেই। কখনও কখনও নায়কের মৃত্যু হতে পারে, অথবা সে তার সবথেকে প্রিয়তম মানুষটির মৃত্যুদৃশ্য দেখার অসীম যন্ত্রণা সহ্য করে। পরিসমাপ্তি যেভাবেই ঘটুক Catastrophe তে নায়কের মৃত্যু না হওয়া মৃত্যুর অধিক মর্মান্তিক।

এই যে তিনটি স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা করা হল, এদের এক ও অভিন্ন লক্ষ্য হল দর্শকচিত্তে আত্মশুদ্ধির প্রগাঢ় বোধ গড়ে তোলা, একেবারে নায়কের চিত্তে যেভাবে এই বোধ তিলে তিলে জন্ম নেয় ঠিক সেভাবে। অর্থাৎ 'চরম পাপ' বা 'অপ্রতিরোধ্য অপরাধ' থেকে শুদ্ধি হওয়ার বা পরিত্রাণ লাভের যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়া। এ যাত্রা চলতে থাকে সুস্পষ্ট তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।

তিনটি পর্যায় হল অজানা পাপ বা অপরাধ থেকে প্রাপ্ত তীব্রতম সুখানুভূতির পথে চরিত্রটি যাত্রা শুরু করে এবং সেই যাত্রা পথে সে দর্শকদের সম্পূর্ণ সাহচর্য পায়।

এরপর আসে বৈপরীত্যের পালা। চরিত্রটি অতঃপর দর্শকচিত্তসহ যাত্রা শুরু করে সুখ ঐশ্বর্য থেকে চরম বিপর্যয়ের দিকে। দর্শক দেখতে থাকে নায়কের পতন।

দ্বিতীয় পর্বটি হল নায়ক এবার নিজের পাপের ভয়ঙ্কর চেহারাটা চিনতে পারে। তার নিজস্ব অপরাধের বয়ান স্পষ্ট হতে থাকে তার আত্মগ্লানিতে। এই গ্লানি থেকে কিছুতেই সে মুক্তি পায় না। (anagnorisis)। নায়কের প্রতি সমবেদনার আবেগ থেকে দর্শকও বুঝতে পারে তার নিজের মর্মান্তিক ভুল তার সুখ বৈভবের তাসের ঘর, তার রীতিনীতি বিরুদ্ধ মহাপাপ সেও উপলব্ধি করতে শুরু করে।

এবার আসে শেষ তথা তৃতীয় পর্বটি। এই পর্বে দেখা যায় ট্রাজেডির নায়ক তার পাপের মারাত্মক ফল সে পেতে শুরু করে ভয়ঙ্করভাবে, কখনও নিজের অথবা তার প্রিয়তম মানুষটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আবার উল্টোদিকে দর্শকচিত্ত নায়কের এই মর্মন্তুদ পরিণতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে এবং নিজের পাপলব্ধ সুখ ঐশ্বর্য সম্পর্কে সতর্ক হয়ে আত্মশুদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করে।

এ্যারিস্টটল সম্পর্কে একটা কথা খুবই প্রয়োগ করা হতো, সেটা হল "Amicus Plato, sed majis amicus veritas" (I am Plato's friend but I am more of a friend of truth). অর্থাৎ, আমি প্লেটোর বন্ধু কিন্তু আমি তার থেকেও বেশি বন্ধু সত্যের— এই হল এ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি। আর আমরা তার সাথে সহমত হয়েই বলি যে আমরাও এ্যারিস্টটলের বন্ধু তবে তার থেকেও বেশি বন্ধু সত্যের। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন যে কাব্য, ট্রাজেডি, থিয়েটার ইত্যাদি কলার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের অন্য কথা বলে। এমনকি তার রচিত Poetics বইতেও আমরা ভিন্ন ভাষ্য পাই। আমাদের অবশ্যই আরও বড় বন্ধু হবে সমাজ বাস্তবতা। সামাজিক স্তরে সকলের কাজ, সকল ধারার শিল্পচর্চা, বিশেষত থিয়েটার— এই সবই রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে হতে পারে না। থিয়েটারই হল সবথেকে প্রভাবশালী নিখুঁত শিল্পচর্চার কেন্দ্র যা রাজনীতিকেও পরিশুদ্ধ করে। এ্যারিস্টটলের এই নিয়তিচক্রের সুন্দর একটি রেখাচিত্র উপস্থাপন করেছেন Augusto Boal তার Theatre of the Oppressed গ্রন্থে। সেই রেখাচিত্রটি এখানে রাখা হল।

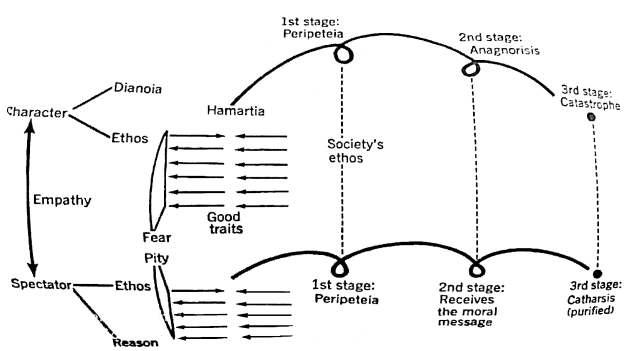

শিলচরের নাট্যচর্চা ঃ আমাদের অবস্থান

শেখর দেবরায়

বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর শহরে নাট্যচর্চার অতীত ইতিহাস সুদীর্ঘ শতবর্ষ অতিক্রান্ত। শিলচরের নাট্যচর্চা শতবর্ষের ঐতিহ্য বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন '১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বরাক উপত্যকা বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮৩৩ সালে শিলচর শহরের গোড়া পত্তনের মাধ্যমে সূচিত হয় নগরায়ন প্রক্রিয়া। গড়ে উঠতে থাকে অফিস কাছারী। সময়ের দাবী মেনে ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮২ সালে স্থাপিত হয় ষ্টেশন কমিটি। ১৮৮৬ সালে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৮৯ সালে বিধুভূষণ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রথম সংবাদপত্র 'পাক্ষিক শিলচর'। ১৮৯৯ সালে শিলচর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় রেল যোগাযোগ।

এ হেন এক জনপদে প্রথম আধুনিকতার নান্দীপাঠ করেছিলেন কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার ।(১৮৩১ - ১৯০৪)। কিন্তু সন্ধিক্ষণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে তিনিও মুক্ত ছিলেন না। তাই একদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের উত্তর 'বীরাঙ্গনা পত্রত্তোর' (১৮৭২) রচনা করলেও অন্যদিকে তিনি নিমগ্ন ছিলেন যাত্রাপালা, পাঁচালী ইত্যাদি রচনায়। এক্ষেত্রে পরিবেশের দাবীও ছিল প্রবল। বিনোদন মাধ্যম হিসেবে শিলচরে তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল কবিগান পাঁচালী ও যাত্রাগান। এই পরিস্থিতিতে সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শিলচরে এলেন নীলদর্পণ খ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রত্যন্ত ভূমিতে এসে তিনি শুধু কাজের পরিমন্ডলেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। স্থানীর ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হলেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে লিখলেন 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) নাটক, ঊনিশ শতকে বাংলা নাটকে জায়গা করে নিল বরাক উপত্যকা র ইতিহাস।

অতএব অনুমান করতে বাধা নেই, শিলচরে এসে দীনবন্ধু মিত্র পরিচিত হয়েছিলেন রামকুমার নন্দী মজুমদারের সঙ্গে। আলাপচারিতার সূত্র তিনি বপন করে গিয়েছিলেন আধুনিক নাট্যচিন্তার বীজ। কিন্তু প্রান্তীয় এই জনপদের মানসিকতা তখনও আধুনিক নাট্যরীতি গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। দর্শকদের মধ্যেও কোন চাহিদা তৈরি হয়নি। তাই আধুনিক নাটকের জন্য অপেক্ষা করতে হলো আরো তিনটি দশক।

আধুনিক শিক্ষা প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত মূল্যবোধ পাল্টাতে শুরু করল। রুচিবোধও পরিবর্তিত হল। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যারা সিলেট, কলকাতা

যাওয়া আসা শুরু করেছিলেন এবং কর্মসূত্রে যারা বাইরে থেকে শিলচরে এসেছিলেন তারাই নিয়ে এলেন নাগরিক সংস্কৃতির হাওয়া। লৌকিক বিনোদন মাধ্যম পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হয়ে পিছু হঠতে শুরু করলে এই নব্য নাগরিকরাই নাটক অভিনয়ে উদ্যোগী হলেন। শিলচরের নাট্যচর্চার সূচনাপর্ব ১৯০৪-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ । নূতন আঙ্গিকে পরিবেশিত এই নাটক দর্শকদের মধ্যেও ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলল। বাড়তে লাগল নাটক দেখার আকাঙ্খা। সদ্য জাগ্রত এই চাহিদার যোগান দিতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শিলচরে এল কলকাতার একটি ভ্রাম্যমান থিয়েটার দল 'গোল্ডেন জুবিলি থিয়েটার'।

(১৯১১- ১৯৪৭) শিলচরে প্রথম স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ আর ডি আই হল (রিডিং এন্ড ড্রামাটিক ইনষ্টিটিউশন হল) স্থাপন করা হয়। এর পর থেকেই নাট্যকর্মীরা নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় অভিনবত্ব সন্ধানে উদ্‌যোগী হলেন। তবে আর ডি আই হলের নাট্যচর্চা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত না থাকায় শিলচরের নাট্যচর্চার একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল।

পরবর্তীতে এই মঞ্চের সুবাদেই শহর শিলচরে নাট্যচর্চার গোড়াপত্তন শুরু হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা (১৯৪২) ধ্বনি এই প্রান্তিক শহরের সাংস্কৃতিক জীবনেও পড়ে। ফলস্বরূপ গোটা শহরের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো সেনা ছাউনিতে পরিণত হয়। স্বভাবত নাগরিক জীবন জীবিকার ছন্দপতন ঘটে। যার ফলে নাট্যচর্চায় ভাটার টান পড়ে।

তবে তখন লক্ষ্য করার বিষয় হলো স্বাধীনোত্তর কাল থেকে শহর শিলচরে বিশেষত সার্বজনীন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে নাট্যচর্চা পুনরায় শুরু হয়। যেমন আর্যপট্টি দুর্গাবাড়ী, অম্বিকাপুর (চৌরংগী) রামকৃষ্ণ মিশন রোড, দক্ষিণ বিলপাড়, ইটখোলা, মধ্য-শহর ইত্যাদি স্থানে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই নাটক মঞ্চায়নে পুনরায় নাট্যচর্চার চাহিদা যেন নবজন্ম লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হল কেদার-রায়, শাজাহান, বংগে-বর্গী, চক্রধারী, সুবর্ণলংকা, উত্তরা, বিসর্জন, উল্কা, রক্তকরবী, গয়াতীর্থ ইত্যাদি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিলচরে অনুষ্ঠিত হয় গণনাট্য সংঘের প্রাদেশিক সম্মেলন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে বামপন্থী ভাবধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। নবনাট্য আন্দোলনের মূলেও আছে এই চেতনা। শিলচরের নাট্য চর্চায়ও বামপন্থী চিন্তাধারার সুফল দেখা গেল। তাই সম্মেলনে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য রচিত 'আদাব' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। সম্ভবত তখন থেকেই বামপন্থী প্রগতিশীল ধারায় শিলচরে সূচনা হলো নতুন আঙ্গিকে নাট্যাভিনয়।

গণনাট্য সংঘ ছাড়া ষাটের দশকের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মত শিলচরেও গ্রুপ থিয়েটারের আদলে বেশ কয়েকটি নাট্যদল সৃষ্টি হয় যাদের হাত ধরেই শিলচরে

আসে নাট্যচর্চার জোয়ার। রূপম (১৯৬১), নাটুকেরা (১৯৭০), পূবালি (১৯৭২), গণসুর (১৯৭২), শিলচর কালচারাল ইউনিট, দশরূপক (১৯৭৯), দিশারি (১৯৮০), ভাবীকাল (১৯৮৪), কোরাস (১৯৮৭), নাট্যাঙ্গন, অগ্রণী, নবারুণ, প্রয়াস, সারস্বত ইত্যাদি। এই পর্বে মুসলমান সমাজও নাট্যাভিনয়ে এগিয়ে আসেন। ১৯৬৬-১৯৬৯ সনে মধুরবন্দের প্রগতি সংঘ 'টিপু সুলতান', 'সিরাজদ্দৌল্লা' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। এর মধ্যে ১৯৬৮ সালে জনাব কুতুব আহমেদ মজুমদার রচিত অন্তরাল নাটক উক্ত এলাকায় অভিনীত হয়। গ্রুপ থিয়েটার চর্চার প্রারম্ভে বেশিরভাগ সময়ে বহির্বরাকের ছাপানো নাটক প্রযোজনা করা হতো। এর কারণ হয়তো স্থানীয় নাট্যকারের অভাব। যাইহোক এই অভাব বোধ থেকে ধীরে ধীরে আশির দশকের মাঝামাঝি উক্ত নাট্য সংস্থাগুলিতে তাদের নিজস্ব নাটক করার (আঞ্চলিক ও শুদ্ধ ভাষার) আন্তরিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে দেখা যায় দশরূপক, কালচারাল ইউনিট, দিশারী, অগ্রণী, নাট্যাঙ্গন, কোরাস, নবারুণ, প্রয়াস প্রভৃতি নাট্যসংস্থার নিজস্ব নাট্যকারদের নাটকগুলো নানান প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও একের পর এক মঞ্চস্থ করেছে।

নাট্যকারদের মধ্যে যীশু চন্দ (প্রয়াত), সুজয় ভট্টাচার্য্য, চিত্রভানু ভৌমিক, শেখর দেবরায়, বিশ্বজিৎ দাস, ইন্দ্রনীল দে, দেবব্রত (চঞ্চু) চৌধুরী, দীপেন্দু দাস, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, শেখর দাস এবং কল্যাণী চৌধুরী, চম্পা ভট্টাচার্য, মৌটুসী বিশ্বাস পুরকায়স্থ উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতা ও উৎসবে বহির্বরাকের নাট্যদলগুলোর সাথে আমাদের এই শিলচরের বেশ কয়েকজন নাট্যকার তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বিশেষত বর্তমান বাংলা নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত নতুন নতুন নাটক প্রযোজনাগুলোর সাথে আমাদের নাটকের প্রযোজনাগত গুণমান আরও উৎকৃষ্ট করা খুবই প্রয়োজন। সেজন্য এই উপত্যকার নাট্যকারদের সাথে আরও বেশি উদ্‌ভাবনী শক্তি নিয়ে মৌলিক নাট্য রচনায় প্রচেষ্টা নিতেই হবে। এই উপত্যকার নানা বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক জীবন ধারার সাথে সম্যক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নাট্যরসদ সংগ্রহ করে নাটক রচনায় এগিয়ে যেতে হবে। শুধু শহর কেন্দ্রিক নাট্যরচনায় প্রকৃত অর্থে একমাত্রিক প্রকাশ ভঙ্গি যথেষ্ট নয়। বরাক উপত্যকার আলো হাওয়া রৌদ্রের মাঝেই খুঁজতে হবে আমাদের নাট্যভাষার স্বার্থে নতুন আঙ্গিক। নাট্যরচনার স্বার্থে বরাক উপত্যকায় ছোট গল্প থেকে নাট্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে।

সেই সাথে নাট্য বিষয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে আমাদের নাট্য রচনায় ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরা উচিত। মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে

আমাদের নাটক রচনায় দিশা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। বাংলা নাটকের গতি প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে বর্তমানে নাট্যকারদের আরও সমৃদ্ধ হতে হবে। নাট্য সংস্থাগুলোর আর্থিক অসচ্ছলতা তদুপরি আধুনিক নাট্যমঞ্চের অভাব অভিযোগ নিয়ে একেবারে খাঁটি অপেশাদারি অবস্থান থেকে নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। তবু আমরা নাটক করি, কারণ নাটক ছাড়া আমরা বাঁচব না। বরাকের বাইরে থেকে কোন বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব পেশাদারী মানসিকতা ছেড়ে আমাদের এ অঞ্চলের নাট্যচর্চার অহল্যা উদ্ধার করবেন এই আশা করা মনে হয় ঠিক হবে না। অতএব নিজেরাই নিজেদের পথ চলার রাস্তা তৈরী করতে হবে। চাই শুধু প্রত্যয়ী মনোভাব।

শহীদের রক্তস্নাত পথ চলার এই বরাক উপত্যকায় যেখানে মাতৃভাষা শিখতে হয় রক্তের অক্ষরে তবু এত কৃচ্ছসাধনের মধ্যেও বুকভরা আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে আমরা শিলচর তথা উপত্যকার নাট্যচর্চাকে আরও আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। অবিরত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই শিল্পীদের মনে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধ হোক এই প্রত্যয়।

কৃতজ্ঞতা: শিলচরের নাট্যচর্চা ঃ শতবর্ষের ঐতিহ্য

ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য

একলা মানুষের কথা

দেবানন্দ দাম

আজকাল সংবাদপত্র বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে হামেশাই সন্তানের হাতে বৃদ্ধ বাবা মায়ের লাঞ্ছনার ঘটনার কথা জানা যাচ্ছে। মা-বাবার উপর অত্যাচার, ঘর থেকে বার করে দেওয়া, এমনকি সম্পত্তি বা অন্য কোনো কারণে সন্তানের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনাও বিচিত্র নয়। এইসব ঘটনায় অনেকেই বিচলিত হচ্ছেন, অনেকে সমাজের অধোগতির কথা ভেবে উঁচুস্বরে 'গেল গেল' রব তুলছেন। অথচ সামান্য একটু তলিয়ে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখলে, অনেকের মতে অবাক হবার বিষয় নয়। আজকের দিনে ষাট-সত্তর-আশি বছর বয়সের সিনিয়র সিটিজেন অনেকেই আছেন যারা বার্ধক্যের একাকীত্বে ভুগছেন, তারা এ ব্যাপারে অনেকাংশে দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। সেই সঙ্গে রয়েছে সভ্যতার অগ্রগতি।

অতীতের দিকে তাকালে — সেকালে মানুষ যূথবদ্ধ থাকত। বাঁচার প্রয়োজনেই মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে হত। ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতি, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি মানুষকে আত্মনির্ভর হতে শেখাল। এবং গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকবার দিন ক্রমশ শেষ হল। এই সভ্যতার অগ্রগতির একটি শর্ত। এদিকে উন্নত সমাজে অর্থের বিনিময়ে অনেক কিছু সহজলভ্য হতে থাকল। আজকের ষাট-সত্তর বা আশি বছর বয়সের উর্ধ্বের অনেকে বাবা-মায়ের একাধিক সন্তানের একজন ছিলেন। সেকালের অনেকেরই ভাই -বোন মিলে সাত-আট জন ছিলেন। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন তার পিতা-মাতার পনেরোতম সন্তান। এ কালের মা-বাবারা হয়তো এতে আঁতকে উঠবেন। তখনকার একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের সন্তান-সন্ততি অনেকেই শিশুকালে বৃদ্ধ দাদু-দিদিমার কোলে বসেই নানা বিষয়ের প্রাথমিক পাঠ শিখে নিতেন, যেমন — চাঁদ, সপ্তর্ষিমন্ডল থেকে কাক, বক, গাছপালা, নদী-সমুদ্র ইত্যাদি । সে যুগ এখন ইতিহাস।

সরকারী বিজ্ঞাপন, 'ছোটো পরিবার', 'সুখী পরিবার'— এ সবের ডাকে সাড়া দিয়ে একটি বা দুটি সন্তানের বাবা-মা হয়ে আরামপ্রদ সংসার চালানোর জন্য 'ফ্ল্যাট কালচার' শুরু হল মধ্যবিত্ত সমাজে। সন্তানকে 'মানুষ' করার জন্য ছাড়তে হল অনেক কিছু। এমন কি নিজেদের বাবা-মাকেও। সন্তানকে 'বড়ো' করতে হবে- এই

উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রিয়জনদের ত্যাগ করতে হল— বাবা-মা দৃঢ়তা দেখালেন তাদের নিজেদের জীবনেও।

পারিবারিক, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সৌজন্যে এসে গেল কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ-এইসব। দেশকে উন্নত করতে এ সবের প্রয়োগ গতি পেল অফিস ইত্যাদিতে। কম্পিউটারের কারণে কর্মীর সংখ্যা কমল। অন্যদিকে মানুষের যোগযোগ ক্রমশ কমে যেতে থাকল— ডিজিটাল যুগে সব যোগযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে, যার জন্য চিঠিপত্র লেখালিখি প্রায় ইতিহাস। রোমান হরফে কিম্বুৎকিমাকার ভাষায় 'এস এম এস' -ই এখন যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। এসব পরিবর্তনকে বিজ্ঞানের উন্নতি, সেই সঙ্গে সমাজের সভ্যতার অগ্রগতি হিসবে গণ্য করা হল, এবং গর্বের বিষয় বলে সমাজে এইসব আধিপত্য বিস্তার করল। যেভাবে আজ থেকে শতবর্ষ অতীতে গরুর গাড়ি থেকে রেল বা মোটর গাড়ি প্রথম চালু হয়েছিল—তখনও সভ্যতার অগ্রগতি হিসাবে এই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নতি একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সভ্যতার অগ্রগতিকে সূচিত করে। আধুনিক সভ্যতার এই অগ্রগতিকে ঠেকানো যাবে না, হয়তো উচিত নয়। এই কারণেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভূতপূর্ব, চমকপ্রদ উন্নতির সোপানে দাঁড়িয়ে 'গেল গেল' রব তুলে কোনো সুরাহা হবে না। হাতে মোবাইল, কানে যন্ত্র আজকের বিশ্বব্যাপী 'নেট' - এর যুগে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই একা। একা-ই সবাই। হাতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ছোট্টো একটি যন্ত্র, যন্ত্রেই পড়াশুনো, খেলাধূলো, বিনোদন ইত্যাদি। এমনকি, এক সন্তান হলে, যন্ত্রেই ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব। কাজেই একা-র যুগে মা-বাবা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ব্রাত্য হবেন — এটা নতুন কিছু নয়।

তবে অনেকের মতে, এ অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না। বয়স্কদের ভুলে, অতীতকে মান্যতা না দিয়ে কোনো জাতির প্রকৃত উন্নতি ঘটে না। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেমন বিজ্ঞানী ও কুশীলবদের মৌলিক ভাবনায় ক্রমে উন্নততর হবে, কিন্তু তার ব্যবহার তো করবে মানুষ। মানুষের শুভবুদ্ধিতেই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটে।

অন্যদিকে একাকীত্ব কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। অল্পবয়সীদের মধ্যেও একাকীত্ব ক্রমশ বাড়ছে। মাল্টিপ্লেক্স বা অপেক্ষাকৃত খালি প্রেক্ষাগৃহে বেশ কয়েকটি আসনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে একাকী মানুষ দেখতে পাবেন। কোথাও বড়ো পপকর্নের পাত্র নিয়ে একা একা বসে থাকা তরুণী, কোথাও বা স্মার্ট ফোনে ব্যস্ত থাকা একা তরুণ। আবার একটু দূরে হয়তো মাঝবয়সী এক

ভদ্রলোক তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সিনেমার পর্দার দিকে তাকিয়ে। তিনিও একাই এসেছেন। কোনো কফি শপে দু-জনের টেবিলে একজন মানুষ বিষন্ন চিত্তে কফির দিকে তাকিয়ে বা কোনো তরুণী, সেলফি, ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে মগ্ন, কিন্তু তিনি এসেছেন একাই। কোনো নদীর ঘাট, নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকা অসংখ্য মানুষ, যাঁদের পাশের আসনে কেউ নেই। শহরের কোনো বিখ্যাত রেস্তোরাঁ, তরল পানীয়ের গ্লাস হাতে কোনো তরুণ আপন মনে সময় কাটাচ্ছে মোবাইল, অথবা রেস্তোরাঁয় চলতে থাকা গানের মধ্যে। এয়ারপোর্ট বা রেলওয়ের লাউঞ্জে উদাসীনভাবে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে থাকা অসংখ্য মানুষ আপনার নজরে পড়বেই। বিনোদন পার্কে সঙ্গীহীন একা মানুষের দেখতে পাওয়া তো আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতা।

এই দৃশ্যগুলো কিন্তু নিছকই উদাহরণ নয়। এই দৃশ্য বার বার ফিরে দেখা যায় শহরের বিভিন্ন অংশে। মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা সত্যি কি একা হয়ে যাচ্ছি? এরকম একলা মানুষ যে আগে একদমই দেখা যেত না, সেই দাবি নিশ্চয়ই করছি না। কিন্তু এটা কি সত্যি নয় যে, ইদানীং প্রবণতাটা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তো বটেই, এমনকি অল্পবয়সীদের মধ্যেও বেড়ে চলেছে? বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে তো কিছুটা যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে? একটু খেয়াল রাখলে দেখতে পাবেন, আপনি যেখানেই যান না কেন, এই দৃশ্যগুলো আপনার চোখে পড়বেই। মনোবিদ্‌দের কাছে প্রশ্ন করা যেতেই পারে, অল্পবয়সী মানুষদের মধ্যে একাকীত্ব কেন বাড়ছে? নিছকই কি তাঁরা ব্যতিক্রম? নাকি অসহনশীলতা? নাকি ডিজিটাল জীবনের ভয়ানক পরিণতি? সমাজ কোন্ গভীর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এখনই, সময় থাকতে থাকতে, তার অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি।

বিশ্বকবির মুকুট নাটকের
ককবরকে অনুবাদ ও মঞ্চায়ন

প্রশান্ত সেনগুপ্ত

আজ থেকে সে প্রায় ৮০ বছর আগের কথা হবে। ত্রিপুরায় শেষ রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্ব। ১৯৪০ এর দশকে রাজ অন্দরে সাংস্কৃতিক চর্চার জোয়ার। মূলত বাংলাভাষায় কাব্য, সাহিত্য চর্চা করতেন রাজা ও রাজ পরিবারের সংস্কৃতিপ্রিয় সদস্য সদস্যারা। হোলি উৎসব হতো জাঁকজমকভাবে।

ঠিক সেই সময় আগরতলা থেকে প্রায় চল্লিশ কিঃমিঃ দক্ষিণে বিশ্রামগঞ্জে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে। তখনকার সময়ে ওই এলাকাটা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। উপজাতি মানুষ বসবাস করতেন। সবাই প্রধানত: কৃষিজীবী, শ্রমজীবী। কিন্তু চল্লিশের দশকে জনশিক্ষা আন্দোলন চলছিল পূর্ন মাত্রায়। উপজাতি অংশের মানুষের মনে প্রথাগত শিক্ষার প্রতি বাঁধ ভাঙ্গা আগ্রহ তৈরি করেছিল জনশিক্ষা আন্দোলন। তারই ফলশ্রুতিতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের কাছেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হতে প্রগতিশীল অংশের অভিভাবকরা ছেলেদের ওই বিদ্যালয়ে পাঠান। সে সময় যাদব ভৌমিক নামে এক গুণী সংস্কৃতি মনস্ক শিক্ষক ওই বিদ্যালয়ে আসেন। তিনি ককবরক ভাষা খুব ভালোই জানতেন। দেখা গেল যাদব ভৌমিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' নাটকটি ককবরকে অনুবাদ করেন। তিনি শুধু ভাষান্তরই করেননি। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটা গ্রুপ তৈরি করেন।

ওই গ্রুপের ছেলেদের দিয়ে দিনের পর দিন রিহার্সাল দিয়ে মুকুট নাটক প্রকাশ্যে মঞ্চস্থ করেন। তবে সেটা হয়তো সার্বিক ভাবে নাটক হয়নি। কারণ সেই সময় মঞ্চ তৈরি করা বা প্রযোজনা করার কাজটা খুবই দুরূহ ছিল বিশ্রামগঞ্জের মতো জায়গায়। তবুও শিক্ষক যাদব ভৌমিকের এই অনুবাদ উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বাংলা নাটকের ককবরকে ভাষান্তর এবং সদ্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়।

বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার নন্দকুমার দেববর্মা এক সাক্ষাতকারে এই অজানা তথ্যটি প্রতিবেদককে জানান । তিনিও বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা

করেছেন। পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তিনি মুকুট নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু শিক্ষক যাদব সম্পর্কে এ কৃতিত্ব ছাড়া আর কিছু জানা যায়নি। বিস্মৃতিতে তিনি হারিয়ে গেছেন।

এখানে যে কথাটা বলা দরকার মনে করি সেটা হচ্ছে, এমন একটা সময় যখন রাজবাড়ীর প্রত্যক্ষ আগ্রহ , উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চা ও বাংলা সাহিত্য চর্চা হচ্ছিল তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষক সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে উপজাতিদের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চার পরিমন্ডল গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এটা কম কথা নয়। ককবরক ভাষা শিখে সেই ভাষায় বিশ্বকবির বাংলা নাটক ককবরকে অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

যদিও তৎকালীন সময়ের দাবী অনুযায়ী 'এগিয়ে চলো' নাটক রচনা করে তৎকালীন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুদন্ব দেববর্মা সারা রাজ্যে উপজাতি মহল্লায় মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন। এই নাটকে বাংলা ককবরক ও হিন্দী ভাষায় সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সারা রাজ্যেই নাটকটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল।

আগরতলায় বাংলা নাটকে উপজাতি অংশের বেশ কয়েকজন নাট্যপ্রেমী অভিনয়শিল্পে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম করবী দেববর্মা, নন্দকুমার দেববর্মা, মধু দেববর্মা, রূহি দেববর্মা অন্যতম। রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি চর্চায় এসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় পঁচিশ বছর পূর্তি নাট্যভূমি ও শিল্পতীর্থ

কার্তিক বণিক

চারদিকেই যখন ভোগবাদ আর মূল্যবোধের অবক্ষয়, কর্মহীনতার ফলে যুবমন যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখন একদল যুবক যুবতী নিয়ে ধারাবাহিকভাবে নাট্যচর্চায় পঁচিশ বছরে পদার্পণ করে নাট্যভূমি ও শিল্পতীর্থ। তাদের এই নাট্যচর্চা একদিকে ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনকে যেমন এগিয়ে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে অসংখ্য নাট্যকর্মী তৈরী করতে সাহায্য করেছে। ফলে নাট্যক্ষেত্রে ত্রিপুরা আজ পরিচিত রাজ্য, রাজ্যের বাইরে, দেশে, বিদেশে।

নাট্যভূমি চন্দন সেনগুপ্তের 'আরোহণ', 'সোনার হরিণ', কমল রায়চৌধুরীর 'ধর্মগোলা', সঞ্জয় করের 'প্রেতচ্ছায়া', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি মঞ্চসফল নাটকের ধারাবাহিক প্রযোজনা নাট্যভূমিকে দেশ ও দেশের বাইরে প্রভূত প্রশংসা এনে দিয়েছে। তাদের ধারাবাহিক 'চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি নাট্যোৎসব' দেশ ও দেশের বাইরে ত্রিপুরার নাট্যচর্চাকে মহীয়ান করেছে। এভাবেই নাট্যভূমি পা দিয়েছে পঁচিশে।

একই সাথে একঝাঁক তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে পঁচিশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নাট্য চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে শিল্পতীর্থ। বুদ্ধদেব বসুর 'পুনর্মিলন' দিয়ে যাত্রা শুরু করে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে শক্তি হালদারের 'দিবা কথমা', 'কান্না', চির রঞ্জন দাসের 'ঝড়ের পাখি', নরেন পাটগিরির 'দিবাকরের আত্মকথা', সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর 'দেবতার বলি', কার্তিক বণিকের 'পুষ্পহার' ইত্যাদি নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে পঁচিশ বছর ধরে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছে।

এই দুটি নাট্যদল বর্তমানে এক কঠিন সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল দীর্ঘ পঁচিশ বছর চলার পথ খুব মসৃণ ছিল না। তবু থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা মেনে নিয়ে এই দুই নাট্যদল তাদের প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে চলেছে। যে কোন নাট্যদলের পক্ষেই পঁচিশ বছর ধারাবাহিক নাট্যচর্চা করে যাওয়া যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। তাই নাট্যভূমি ও শিল্পতীর্থ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী নাট্যদলের শিরোপা অনায়াসেই প্রাপ্য। এই দুই নাট্যদলের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসা একটি সফল মাইলস্টোন ২০১৮ সাল। এই বছর তারা পালন করে রৌপ্যজয়ন্তী বর্ষ। এই উল্লেখযোগ্য বর্ষটিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্ব স্ব নাট্যদল বিভিন্ন নাট্য কর্মসূচি গ্রহণ করে।

ত্রিপুরার অন্যতম নাট্যসংস্থা নাট্যভূমি তাদের ২৫ বর্ষপূর্তিতে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'নাটক লেখা প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করে। এছাড়া নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের নাটকের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করতে মোট ২২জন শিল্পীকে নিয়ে একমাস ব্যাপী নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার খ্যাতনামা নাট্যকার কমল রায়চৌধুরী। নাট্য কর্মশালা পরিচালনা করেন নাট্যভূমির প্রাণপুরুষ সঞ্জয় কর। সবশেষে পালিত হয় ২৫-২৬ আগষ্ট ২০১৮, দুই দিন ব্যাপী নাট্যভূমির রজত জয়ন্তীবর্ষ নাট্য উৎসব। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। প্রথম দিন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রবীণ নাট্যশিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সাথে নাট্যভূমি তাদের পঁচিশ বছরে মোট মঞ্চস্থ হওয়া ২১টি নাটকই ধারাবাহিকভাবে দেখে এসেছেন এমন দুইজন নাট্যদর্শককে দলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দিয়ে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ঐদিন দলের একমাস ব্যাপী নাট্য কর্মশালার নির্মাণ 'সুখু দুখু' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। রচনা ও নির্দেশনা সঞ্জয় কর। দ্বিতীয় দিন ২৬ আগষ্ট ২০১৮, ২৫ বছরে নাট্যভূমির নিরলস কাজের ইতিহাস নিয়ে তৈরী তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরে 'নাটক লেখা প্রতিযোগিতা'য় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সবশেষে সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ করে তাদের সফল প্রযোজনা 'রাইমা সাইমা'। নাটক ও নির্দেশনা সঞ্জয় কর।

শিল্পতীর্থের ২৫ বছর পূর্তিতে 'শক্তি হালদার স্মৃতি নাট্যোৎসব- সৃজনে মননে' ২৮ থেকে ৩০ আগষ্ট ২০১৮। তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আলোচনা, সম্মাননা, স্মরণিকা প্রকাশ এবং নাটকের আয়োজন করা হয়। তিন দিন পর পর নাটক 'কীপ সাইলেন্স', 'দেবতার বলি' এবং 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রবীণ নাট্যশিল্পী নমিতা হালদার। উদ্বোধনের পর শিল্পতীর্থের ২৫ বছর আগে মঞ্চস্থ হওয়া প্রথম নাটক বুদ্ধদেব বসুর 'পুনর্মিলন' নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরে নাটক 'কীপ সাইলেন্স' মঞ্চস্থ করে শিল্পতীর্থের কিশোর বিভাগের শিল্পীরা। রচনা- সুশান্ত দে। নির্দেশনা- ইন্দিরা সরকার। ঐদিন দ্বিতীয় পর্বে ছিল নাট্য বিষয়ে আলোচনা। বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালকদের মধ্যে বিভু ভট্টাচার্য, সঞ্জয় কর, কুমার শংকর পাল এবং আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে কার্তিক বণিক মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রুতি নাটক। উপস্থাপনা- পূর্বিতা হালদার। এরপর মঞ্চস্থ হয় নাটক 'দেবতার বলি'। রচনা- সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। নির্দেশনা - ইন্দিরা সরকার। উৎসবের শেষদিন মঞ্চস্থ হয় নাটক 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। রচনা ও নির্দেশনা - কার্তিক বণিক।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিহাসে যে স্বাক্ষর রেখেছে এই দলদুটো, তাদের অগ্রগতির পথে সব বাধা পেরিয়ে আরও এগিয়ে যাবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

ত্রিপুরা থিয়েটারের সেমিনার
Expanding Theatre Perspective in Tripura
এক অনন্য অনুভূতি

নারায়ণ দেব

"বর্তমান নিষ্ঠুর সময়ে অনুভব করার ক্ষমতা জরুরী। শিল্প অনুভব করতে শেখায়, আর এটা থিয়েটারেই সম্ভব। সকলের জন্য কাজ করতে হলে থিয়েটার করা একান্ত আবশ্যক।" কথাগুলি বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সৌমিত্র বসু গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ 'Expanding Theatre Perspective in Tripura' শীর্ষক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত নাট্যবিষয়ক এই আলোচনাচক্র সম্ভবতঃ রাজ্যে প্রথম। এর আগে নাটক সম্পর্কিত এধরনের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই। রাজ্য, বহিঃরাজ্য, আমেরিকা এবং জাপানের দুইজন নাট্য পরিচালক ও গবেষকের উপস্থিতি ও আলোচনায় সেমিনারটি আন্তর্জাতিকরূপ লাভ করে।

সঙ্গীত নাটক একাডেমির সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনারকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছিল। সেমিনারের প্রারম্ভেই ত্রিপুরা থিয়েটারের শিল্পীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই পর্বে স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা থিয়েটারের সম্পাদক বিভু ভট্টাচার্য্য । তিনি বলেন রাজ্যের ১৫০ বছরের নাটকের ইতিহাস। প্রচুর নাটক অভিনীত হয়, কিন্তু তবুও রাজ্যের নাটক জাতীয়স্তরে তেমনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। কেন? কোথায় ত্রুটি? ছোটরা স্কুল স্তরে নাটকে অংশগ্রহণ করে কিন্তু নবম /দশম শ্রেণীতে উঠার পরই নাটক ছেড়ে দেয়। ত্রিপুরাতে শেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথের নাটকের চর্চা তেমনভাবে হয় না। নাটক করার পাশাপাশি নাটক নিয়ে পড়াশুনা করার উপরেও গুরুত্বারোপ করেন। সেমিনারে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নাট্যাভিনয়ে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি এবং এ ব্যাপারে ত্রিপুরা থিয়েটার প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন।

উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সৌমিত্র বসু, রঙ্গন চক্রবর্তী পরিচালিত বিখ্যাত বাংলা ছায়াছবি 'বাড়ী তার বাঙলা'র গল্প উল্লেখ করে বলেন চারপাশের ঘটনাবলী নিয়ে লিখতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী থেকে নাটকের উপাদান খুঁজে নাটক তৈরী করে তা মঞ্চায়ন করতে হবে। উদ্বোধনী পর্বের সভাপতি শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর বক্তব্যের মাধ্যমে এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়, ত্রিপুরা শাখার ডিরেক্টর বিজয় সিংয়ের সভাপতিত্বে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা। আলোচনার সূত্রপাত করে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক

সরোজ চৌধুরী বলেন বর্তমানে দর্শক ও থিয়েটার কর্মীদের মধ্যে gap তৈরী হচ্ছে। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকাতে এটা হচ্ছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে থিয়েটার কর্মীদের আরও যত্নবান হতে হবে। ভালো নাটক করতে গেলে নাটকের উপর পড়াশোনা করতে হবে। শিক্ষা ছাড়া নাটক সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত নাটক সম্পর্কে ধ্যানধারণা ও যোগাযোগ রাখা নাট্যকর্মীদের একান্ত আবশ্যক বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন অধ্যাপক চৌধুরী। নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নবীন প্রজন্মের নিকট আহ্বান রাখেন।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সৌমিত্র বসু মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার বিভিন্ন ঘটনাবলীর পাশাপাশি ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর নাটক মঞ্চস্থ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে থিয়েটারের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। থিয়েটার পড়াশোনারও সহায়ক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রত্যেক মানুষ মস্তিস্কের সাহায্যে নতুন নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। শিল্পের ক্ষেত্রে এটা খুব কাজে লাগে— বিশেষ করে নাটকে। নাটকহচ্ছে সম্মিলিত কলার আধার। অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, আলোক শিল্পী, রূপসজ্জাকার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতনির্দেশক প্রত্যেকের সম্মিলিত অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরি হয় মঞ্চসফল নাটক, বলেন সেমিনারের অন্যতম বক্তা জাপানের নাট্য বিশেষজ্ঞ মিঃ মুসি মারো ফুজিয়েদা (Mr. Mushi Maru Fujieda) । যোগা এবং নৃত্য নাটকের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে তাঁর নাট্যবিষয়ক আলোচনা সেমিনারে এক অন্যমাত্রা যোগ করে।

সেমিনারের অপর বক্তা আমেরিকার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও বিশিষ্ট নাট্য গবেষক শ্রীমতি শেলী ওয়ান্ট (Ms. Shelly Want) বলেন- নাটক অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরী করে। তিনি বলেন নাটকের ভাষা আন্তর্জাতিক। ভারতের দুটি মহাকাব্য 'রামায়ণ ও মহাভারতে' রয়েছে নাটকের ভরপুর উপাদান। অধ্যয়নের মাধ্যমে তা অনুশীলন করে মঞ্চে তুলে আনার জন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি সেক্সপীয়ার এর নাটক অধ্যয়ন ও মঞ্চস্থ করার কথা বলেন। School Level Studentদের জীবনের মানে ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করতে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার কথাও বলেন শ্রীমতি ওয়ান্ট।

দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ভাষণ দিতে গিয়ে এই পর্বের সভাপতি তথা NSD Tripura Wing এর Director বিজয় কুমার সিং Theatre in Education এর উপর গুরুত্বারোপ করেন। ত্রিপুরায় উপজাতি ভাষায় নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন ত্রিপুরার লোক কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি নাট্য সংস্থা নাটক তৈরী করে মঞ্চস্থ করেছে এবং তা বহিঃরাজ্যে প্রশংসিত হয়েছে, লোক-কাহিনী নিয়ে নাটক এবং যাত্রার প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে, এটাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথাও তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন নাটক যাত্রাসহ সমস্ত আর্ট ফর্ম বাইরে থেকে দেখলে

চলবে না তার ভেতরে ঢুকতে হবে, নাটকের নতুন নতুন research সম্পর্কে জানতে হবে। Perform করে Performer এর মনে যেমন অনুভূতি হয় তেমনি Viewers এর মনেও অনুভূতি হয় এটা পরীক্ষিত সত্য।

সেমিনারের ৩য় তথা শেষ পর্বের প্রারম্ভে লালনের গান পরিবেশন করেন ত্রিপুরা থিয়েটারের সদস্য বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য্য। অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠে গান পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বলেন কলেজ স্তরের নাট্যচর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের grass -root level থেকে ছোট ছোট নাটকের গ্রুপ করে নাট্যচর্চা করলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাটক সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী হবে এবং নাট্যজগৎ সমৃদ্ধ হবে। বিপ্রজিতের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি সেমিনারে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে। ত্রিপুরা থিয়েটারের বিশিষ্ট শিল্পী-শিল্পী ভট্টাচার্য্য পর পর দুটি লোকগীতি পরিবেশন করেন। এই পর্বে আলোচনা করতে গিয়ে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি নন্দিতা চক্রবর্তী ভারতবর্ষের নাটকের ইতিহাস নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান নমস্ক নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারের অপর আলোচক মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুরজিৎ সেন আধুনিক ইংরেজী থিয়েটার নিয়ে একটি সমৃদ্ধ আলোচনা উপহার দেন। আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশেষ গুপ্ত বলেন থিয়েটার যদি মানুষের চাহিদা না মেটায় তাহলে দর্শক আসবে না। এদিকে থিয়েটার কর্মীদের সচেতন হতে হবে। থিয়েটারকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করলে পরে থিয়েটার এগোবে না। চারপাশের ঘটনাবলীকে থিয়েটারের মাধ্যমে প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়ে এবং আগামীদিনে থিয়েটার সম্পর্কিত সেমিনারের পাশাপাশি থিয়েটারের ওয়ার্কশপ করার জন্য ত্রিপুরা থিয়েটারের প্রতি আহ্বান রেখে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সমাপ্তি পর্বের সভাপতি অধ্যাপক সৌমিত্র বসু।

আলোচনাচক্রে মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয়, বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয় ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী এবং এন.এস.ডি ত্রিপুরা উইং-য়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা বক্তাদের সঙ্গে নাট্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

নাটক করার পাশাপাশি নাটকের বই প্রকাশের সঙ্গে নাট্য সম্পর্কিত এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত করায় ত্রিপুরা থিয়েটারকে জানাই কুর্নিশ। একথা অনস্বীকার্য যে এই ধরনের সেমিনার রাজ্যের নাটকের গতিকে আরও বেগবান করবে। এককথায় সমগ্র আলোচনাচক্রটি উপস্থিত নাট্যপ্রেমী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক অনন্য অনুভূতি জাগায়। আলোচনা চক্রটির সঞ্চালক ছিলেন ত্রিপুরা থিয়েটারের সদস্য শেখর সি. দত্ত।

পবিত্র তস্কর

চন্দন সেন

চরিত্র চোর, পারুল, সাবিত্রী, তারক, পুলিশ অফিসার, কনস্টেবল

(কলকাতার উপকণ্ঠে একটি প্রাচীন বাড়ি। বাড়ির মধ্যেকার একটি পেল্লাই সাইজের বসার ঘরে এখন দু-তিনটে পুরণো আমলের চেয়ার, পুরণো বই ভর্তি কাঠের আলমারি, একটি টেবিল এবং একটি বিশাল লম্বা ঘড়ির বিশাল পেণ্ডুলামটি শুধু দৃশ্যমান। ঘড়িটিতে কাঠের বহিরাবরণ। পেণ্ডুলামের সামনের ছোট দরজাটি ভেঙে গেছে। অচল ঘড়ির পেণ্ডুলামটি কিন্তু প্রবল হাওয়ায় দোল খেয়ে কিংবা কারুর হাতের ঘায়ে জোরে বেজে উঠতে পারে। ঘরে কিছু ব্যবহার অযোগ্য অ্যান্টিক জিনিস। আবছা অন্ধকারে একটি কালো গেঞ্জি, কালো হাফপ্যান্ট পরা চোর পিঠে বস্তা নিয়ে ভিতরের ঘর থেকে এসে দাঁড়ায়। টেবিলের উপর রাখা পুরাণো রূপোর মোম বাতিদানটাকে তার পিঠে রাখা বস্তা নামিয়ে ভরার প্রবল চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় গভীর রাতে (আনুমানিক একটা-দেড়টা) ঘরের টেলিফোন বেজে ওঠে। চোর ভয় পেয়ে পালাতে চায়, কিন্তু পালাবার মুখে থমকে যায়।)

প্রথম প্রেক্ষাপট

সূত্রধর ১ - ৬

১+ ২ : এখন তো এখানে —
৩ + ৪ : এখানে এখন তো —
৫ + ৬ : মরারাও জ্যান্ত —
১+ ২ : এবং জ্যান্তরা মরা —
৩+ ৪ : স্টপ স্টপ স্টপ এই ছড়া—
৫ + ৬ : যত্তসব উজবুক ছোড়া—
১+ ২ : বরং গান ধরে টান দেবে যেখানে—
৩ + ৪ : সেখানে এখন তো
সেখানে এখন তো মরারাও জ্যান্ত
আর চোর বেশে পাকা সাধু
৫ + ৬ : বুঝে নাও দিদা দাদু / এখানে এখন তো—
১ + ২ : তবুও তো বেঁচে থাকা—
৩ + ৪ : জীবনে জীবন রাখা—

৫ + ৬ : তাই টক ঝাল মিষ্টির কান্নায় —
১ + ২ : সাধু নয় চোর শুধু / চোর চোর চোর বলে চিল্লায়।
৩ + ৪ : আজ চোরেদেরও বড়ো চোর সাধুরা
(এবার) বুঝে নিন দাদা দিদা দাদুরা —
৩ + ৪ + ৫ + ৬ : এ নাট্য সাধুদেরই আখ্যান।
যেথা চোরকেই মনে হয় চরিত্রবান।

(চলে যায়)

চোর : কে? এইসময় টেলিফোন বাজে কেন? তবে কি, উঃ.... না, পালাবো কেন, বাড়িতে তো দেখেই এলাম কেউ নেই। পালাবো কেন? *(ফোনটা তোলে। সঙ্গে সঙ্গে ফোনের মধ্য থেকে আওয়াজ দর্শকের শ্রুতিগ্রাহ্য হয়। চোর নার্ভাস হয়ে ফোনটা বুকে চেপে ধরে)*

নারীকণ্ঠ: *(শ—S-এর উচ্চারণে)* আরে কে বলছেন? কে? কথা বলছেন না কেন? শুনুন, শুনুন—

চোর : (রিসিভার তুলে) ও .... তুমি? ... পারুল, বলো সোনা। হ্যাঁগো, পারুল বলছ তো? *(মঞ্চের এক কোনে পারুল)*

পারুল: হ্যাঁ—এতক্ষণ জবাব দিচ্ছিলে না কেন? কত সোহাগ করে বেরুবার আগে তুমিই ফোন নাম্বারটা দিলে, যে টাইমে ফোন করতে হবে তাও বলে গেলে— এখন ন্যাকামি হচ্ছে?

চোর : আরে পারুল পুরো বোমকে গেছি! একটু বোঝো, যখন বলেছিলাম তখন বুঝিনি, এই ফাঁকা বাড়িতে এতগুলো ঘর! এটা এখন বিজনেস টাইম। একটা স্বর্ণখনি! এতক্ষণ দুঘরের দামি দামি কিছু বস্তায় ঢুকিয়ে বসার ঘরে কি কি জিনিস বস্তায় ঢোকানো যায় তা তাড়াতাড়ি ঠিক করছি ... যে কোন সময় বাড়ির কর্তা বা গিন্নি কোনও জরুরি কাজে বাড়িতে ব্যাক করতে পারে। এই জরুরি কাজের সময়ে বিরক্ত কোরো না সোনা। নিজেরই স্বার্থে আমায় সৎভাবে নিশ্চিন্ত মনে চুরি করতে দাও পারুল।

পারুল : আচ্ছা ঠিক আছে। সরি। সরি। তা আমার স্বার্থে বললে না — মানেটা কি?

চোর : ওদের বেডরুমের আলমারিতে এক জোড়া পুরোণো আমলের কানপাশা পেয়েছি— আড়াই আড়াই পাঁচ ভরি গোল্ড হবে বোধহয়। ওটা তোমার, নো বিক্রি অফ কানপাশা। — পারুল সোনা।

পারুল : ও মা, ও মা, একি শোনালে গো। — আজ আমাদের নবম বিবাহ বার্ষিকী।

হ্যাঁগো মনে আছে? নবোম তো—তুমিই ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলে রাত্তিরে একটা নাগাদ এই নম্বরে সুনসান বাড়িতে থাকবে। রাত্তিরে ফোন করে গান শোনাতে। নবোম বিয়ের তারিখ তো। একটু শোনাই। নবোম।

(গান) তুমি নবো নবো রূপে এসো প্রাণে ....'

চোর : *(গান থামিয়ে দিয়ে)* না নবোম নয়, বোম বোম তারক বোম! বোম বোম তারক বোম'...

পারুল : কি হলো ?

চোর : এ বাড়ির কর্তার নাম তারক, তারক সিংহ, গিন্নির নাম নেমপ্লেটে লেখা নেই, নিশ্চয়ই তারকা রাক্ষসী টাক্ষসী হবে।— নবোম, আমার কাছে বোম বোম তারক বোম! তারক ফিরে আসতে পারে। কাজ করতে দাও সোনা, পরে কথা বলব।

পারুল : আমার সঙ্গে কথা বলতেই তোমার এখন হাজার ব্যাগড়া। তাও এমন সুন্দর রাতে। কোথায় তোমার কথা মনে করে আমার মনটা ছটফট করছে আর তুমি বার বার ঠাণ্ডা করে দিচ্ছ।

চোর : পারু—পারু—পারু। উম্‌ম। ঠিক আছে ভোর হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরব।

পারুল : হুঁ।... শুধু দুটো কানপাশা নিয়ে? ওই সাইডে ফাঁকা বাড়ি, এই সাইডে সুনসান বিছানা।

চোর : (বিরক্ত) দেখো মেজাজ চিত্তির কোরোনা। একটা চালু পুরাণো বড় ফ্রিজ আছে, লাগবে? একটা মেহগিনি কাঠের পুরাণো খাট আছে। নেব? চোরের ধর্মপত্নী হয়ে চোরকে ধম্মছুট হতে বলছ। আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে বলা হতো চুরির জিনিস, মানে কাজের জিনিস নট ফর সেল্ফ, বাট ফর সেল.. তবুও নবম বিয়ের তারিখ বলে একজোড়া কানপাশা। তাতেও ঠাণ্ডা হচ্ছে না? হোয়াট ইজ দিস পারুল? *(চেঁচায়)*

পারুল : আঃ চেঁচাচ্ছ কেন? নিজের বাড়ি পেয়েছো ? ঠিক আছে ঠিক আছে কাজ করো। আর ফোন করবো না, যাও।

চোর : পারুল সোনা এমন করে না। বুঝছ না কাজ করতে গিয়ে লেট করলে ধরা পড়ে যাব যে। পারুল সোনা তোমার বাপের বাড়িতে তোমার প্রেস্টিজ থাকবে?

পারুল: প্রায় দশ বছর আগে সিঁদেল চোরকে বিয়ে করে পারুল সোনার প্রেস্টিজ যে পাংচার হয়ে গেছে খোকাবাবু।

চোর : আহা! ভুলে গেলে? তোমার বাপ ছিল মালখোর-মাল্লুখোর একটা কাপালিক। মা-মরা মেয়েকে বলি দিতে যাচ্ছিল ষাট বছরের এক সুদখোর লম্পটের সঙ্গে। আমি তোমায় সিঁদকেটে চুরি করলাম বলে নারীর মান সেদিন রক্ষা পেয়েছিল মেরিজান!

পারুল : মোটেই সিঁদকেটে নিয়ে আসনি। রীতিমতো শ্যামনগরের কালীমন্দিরে পুরুত আমাদের বে দিয়েছিল। সাক্ষী ছিল সুরধনি গঙ্গা! ছুপা রুস্তমের মতো রেজিস্টারি নয়, শ্যামা মা সাক্ষী! কি?— স্বীকার করছ তো?

চোর : ঠিকই তো। এই তো একমত হলাম। এখন রাখি?... পারু ...পারু গো ... রাখি?

পারুল : হুঁ-উঁ । তুমি আমায় ভালবাস?

চোর : ভালো না বাসলে যে বাড়িতে রাতে চুরি করতে ঢুকবো তার ফোন নম্বর নিয়ে আসি?— ভালবাসি

পারুল : খু—ব?

চোর : খুব!—সোনা রাখি?

পারুল : রাখো। ভোর রাতে এলে খু—ব আদর করবো!—দেখো না গো,... ছোট কিছু পেজেন্টেশন পাও কিনা। দু-একটা ছোট আংটি! বাচ্চার হলেও হবে, খুব শিগ্গিরই তো লাগবে গো। ফোনে একটু আদর পাঠাই। *(হাসি)*

চোর : উ-হুঁ! অমন করে না!— কাজে হাত লাগাতে যাচ্ছি— তোমার জন্য গা শিরশির করছে সোনা—

পারুল : ও মা! ও মা! ও মা! *(গান ধরে)* 'সেদিন দুজনে, দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাধা ঝুল না সেই স্মৃতিটুকু...' *(অন্ধকার)*

দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট :

১+ ২ : চোরেদের গল্পে পরিবেশ নোংরা —

৩+ ৪ : মধুবনে খোঁজে যায় মিঠা মিঠা ভোমরা—

৫+ ৬ : এবার ভদ্দর লোকের কথা বলো —

১+ ২ : চোরেরা নোংরা তাই / ভদ্র জীবন চাই—

সকলে : চলো ভদ্রজীবন দেখি চলো—
ভদ্দরলোকেদের কথা বলো।

(একই রাত একই ঘর। চোর সবকিছু গুছিয়ে বস্তাটা টানতে টানতে দরজার কাছে টেনে নিচ্ছে। দরজার ওপার থেকে তারকের গলা— 'এসো এসো , কোনও ভয় নেই, এসো'। চোর ভয় পেয়ে বস্তাটা টানতে টানতে ঘড়ির পেছনে রাখে, নিজে ঘড়ির পেন্ডুলামের বাঁদিকে গিয়ে বসে পড়ে। তালা খোলার শব্দ। একটি মধ্যবয়সী মেয়েকে নিয়ে মধ্যবয়সী তারক ঢোকে ভিতরে)

মহিলা : একি! বাড়ির অবস্থা এমন কেন? এত আগোছালো।— এটা তোমার বাড়ি তো?

তারক : হ্যাঁ সাবু.. *(হাসি)* এটা এই শহরের ভাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিজের পৈত্রিক বাড়ি। আসলে বউ তো তার বাপের বাড়ি গড়িয়ায় দু'দিনের জন্য গড়াতে গেছেন। এখানে খুব পরিশ্রম, বাপের বাড়ি মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য যান, একটু গড়িয়ে নেন। সেই শান্তির দিনগুলোতে কাজের লোক দিয়েই সব দেখাশোনা চলে, তাই এই দশা।

মহিলা : ও, *(হেসে)* তুমি এখন ভাইস?

তারক : ইয়েস। এবং তুমি সাবিত্রী দত্ত ইজ দি ওনলি গার্লফ্রেন্ড কাম উপপত্নী অফ দিস পাওয়ারফুল ভাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। যার হাতে চার চারটে দপ্তর — শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও শ্মশান। — চলো ভিতরে চলো সাবিত্রী।

সাবত্রী : বউ ফিরবে কবে?

তারক : আজ রাতে নয়। কাল বিকেলে।

সাবত্রী : আমার খু—ব নার্ভাস লাগছে জানো।

তারক : কেন, তোমার হাজব্যান্ড তো রাঁচি থেকে পরশুর আগে পিরছে না।

সাবিত্রী: না, আমার মনে হচ্ছে — এখানে কোথাও ...

তারক : *(চারিদিকে দেখে)* হুঁ, পুরাণো বাড়ি তো... ইঁদুর-টিদুর— দু-চার পিস ধাড়ি ছুঁচোও রাতে ঘোরাফেরা করে ... তা বাদ দিয়ে —

সাবিত্রী : *(লম্বা অস্পষ্ট ঘড়িটা দেখায়)* ওটা কি?

তারক : জমিদার দর্পনারায়ণ সিংহের আমলের ইটালিয়ান বড় ঘড়ি ... মোর দ্যান এইট ফুট... পেণ্ডুলামই চার ফুট ... এখন অচল, কিন্তু অ্যান্টিক ভ্যালু কয়েক কোটি।

সাবিত্রী : অচল তো রেখেছ কেন?

তারক : যে ঢুকবে সে বুঝবে কার বাড়িতে ঢুকেছে, বুঝবে— হু এম আই। বিড়ির

কারখানা মালিকানা আর চাকর-বাকরের মতো পা ধরা আনুগত্য দেখিয়ে ভাইস হইনি।— সাবু, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শালা আর আমি এক নই। শালা আগে বিড়ি বাঁধতো। শালা চুকুলবাজ, তেলবাজ, ডিস-অনেস্ট। তোমার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে একটা ব্যাপারে মিল আছে,— সুযোগ পেলেই সব ফেলে মাল্লুর ধান্দা।—ঘরে তোমার মতো সুন্দরী মাল ফেলে একটু সুযোগ পেয়েই মাল্লুর ধান্দায় রাঁচি। ফুঃ। অসৎ, অসৎ।গত বছর আমাদের যাত্রা উৎসবে একটা পালা এসেছিল, মনে আছে?— 'অসৎ স্বামীর সতী বৌ' সেম কেস।

সাবিত্রী : *(কাঁদো কাঁদো)* তুমি সব সময় আমাকে মনে করিয়ে দাও! সব সময় ...

তারক : কী?

সাবিত্রী : *(কেঁদে ফেলে)* যে আমার একটি রোজগেরে পাগল স্বামী আছে। পাজি, পাষণ্ড! একটু অন্য মুডে ছিলাম এখন পাপবোধ, ভয়, নৈতিকতা — সব ফিরে আসছে। তুমিই ফিরিয়ে আনলে। সাবু আবার সাবিত্রী হচ্ছে।

তারক : সরি, সরি, আচ্ছা আমরা আগে একটু অন্যরকম গল্পটল্প করি। কেমন?

সাবিত্রী : সাধারণ মজার গল্পটল্প কোরো না, তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ধান্দাবাজির কিংবা তোমার সততার গল্প — না হয় বানিয়েই বলো।

তারক : মানে। আমি যে সৎ সেটা বানানো কথা? নো, নো, সাবু, বানিয়ে কিছু বলি না। সব অভিজ্ঞতা থেকে বলি, যাতে তুমি বুঝতে পারো যে তুমি অবশেষে একজন সৎ লোকের নিরাপদ প্রেমে পড়েছ। ভাবলেই তোমার মনটা একটু শান্তি পাবে।—

সাবিত্রী : সেটাই ভালো।

তারক : সেটাই ভালো?— তাহলে মন শান্ত করে ভিতরে চলো।

সাবিত্রী : না, বলছি, অন্যরকম গল্প বল্লে না— সেটাই ভালো। বরং ছোটবেলার গল্প বলো .... বাচ্চাদের আর বাচ্চা বয়সের গল্পগুলো আমার খুব ভালো লাগে। বাচ্চা বয়সের কত মজার মজার গল্প ....

তারক : আছে। বলছি। শোন, হোয়েন আই ওয়াজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড —

সাবিত্রী : আরে ধ্যুৎ, সাত বছরে তো শিশু ধেড়ে হয়ে যায় । তার আগের গল্প কিছু

তারক : না, আসলে বিছানা—

সাবত্রী : আবার এক কথা। বিছানার স্কিম ...

তারক : না, আমি তো ছোটবেলায় ছ'বছর পর্যন্ত নন-স্টপ বিছানা ভেজাতাম—। তাই তারপরের গল্প—

সাবিত্রী : ও, যখন এটা বন্ধ হলো তারপর থেকে বলো।

তারক : এই, তুমি আমায় বুদ্ধু পেয়েছ?— ভুলিয়ে-ভালিয়ে টাইম কিলিং? একবার বাচ্চাবেলার গল্পের অজুহাত, আরেকবার নিজের বরের প্রসঙ্গ তোলার অজুহাত— শুধু টাইম কিলিং ....

সাবিত্রী : এই, আমার বরের কথা তুলবে না বলে দিলাম —

তারক : কেন?

সাবিত্রী : তুমি জানো না— মানুষটা আমার খুব ন্যাওটা। কোনদিন অবাধ্য হয় না। তোমার বউয়ের মতো নয়। আমায় আরও খুশি রাখতে টাকার ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়। কি বলব, সেই কবে একবার মাত্র দুর্বল মুহূর্তে আবেগের চাপে ফিক করে একটু অন্যরকম হাসতেই বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠল মানুষটা .... *(হেসে)* টেনে নিয়ে গেল ছাদনাতলায় ....

তারক : অ! এতই যদি ন্যাওটা —

সাবিত্রী : দাঁড়াও। শেষ করতে দাও, বিয়ের পর বুঝলাম, লোকটা বড্ড বৌ পাগল ন্যাওটা ... যে ক'টা দিন বাড়ি থাকে বউয়ের আঁচলের তলায় থাকতে ভালবাসে — পার্সোনালিটি কম, রাগ কম, পৌরুষ কম .... সেইদিক থেকে তুমি হচ্ছ আইডিয়াল পুরুষ। যা চাও, যেভাবেই হোক তা বাগিয়ে ছাড়বে। এই যেমন আমি, শেষ পর্যন্ত এই ফাঁকা বাড়িতে টেনে আনতে পারলে তো।— এই জবরদস্ত পৌরুষের জন্যই এতবড় নামী দামী ভাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ভালবাসায়, কোনও ভাইস আছে বলে আমি মনে করিনা।

তারক : তাহলে চলো আর বিলম্ব নয়। *(সাবিত্রীকে ধরে)* চলো বেডরুমে, চলো বলছি। *(জোর করতেই টেলিফোন বেজে ওঠে, ওরা ছিটকে যায়)* এই কে হতে পারে ... এত রাতে ... কে ..

সাবিত্রী : *(ঘাবড়ে গিয়ে)* কে আবার, তোমার বউ ..

তারক : অসম্ভব। সে জানে আমি দিল্লিতে দলের মিটিং-এ এসেছি। তাছাড়া, ফোন করলে আমার মোবাইলে করবে। — তুমি ধরো না, নিশ্চিন্তে ধরো।

সাবিত্রী : *(অস্বস্তি নিয়ে)* না। এখানে অস্বস্তি লাগছে। চলো ওঘরে চলো —

(ফোন থেমে যায়)

তারক : ও ! ফ্যানটাস্টিক । —চলো *(আবার ফোন বাজে)*

সাবিত্রী : আঃ ! অসহ্য। আগে ফোনটার ব্যবস্থা করো। *(তারক ফোনের কাছে নির্দ্বিধায় যায় প্রবল দ্বিধায় যেন ধরতে গিয়ে ধরে না। এক সময় রিং বেজে যাওয়া রিসিভারটা টেবিলের দেরাজে ঢুকিয়ে দেরাজ বন্ধ করে।)* এটা কি করলে ? — ইস্ সর্বনাশ হয়ে গেল।

তারক : কেন। আর আওয়াজ হবে না, দেরাজে রিসিভারটা ঢুকিয়ে দিলাম। বন্ধ দেরাজে রিং হলেও শোনা যাবে না।

সাবিত্রী : ওদিকে যে ফোন করছে সে বুঝে গেল, এখানে লোক আছে, নইলে রিসিভার ওঠালো কে ?

তারক : তাই তো যে করেছে সে ভাবছে আমি ডেফিনিটলি কিছু লুকোতে চাইছি। কোন গোপন পাপ করছি। ছি—ছি—ছি। এবার হয়তো ধরা পড়ে যাবো। ব্যস্ সব চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ ...

সাবিত্রী : *(কেঁদে ফেলে)* এখন কি হবে ? আমায় ফাঁসিয়ে দিলে তো ? প্রথম থেকেই খালি এক কথা, ভিতরে চলো, ভিতরে চলো। — নাও, দুজনে এবার শ্মশানে গিয়ে শুই।

তারক : এই সাবু। মাথা ঠাণ্ডা করো। কুল, কুল। — আচ্ছা ভেবে দেখো, এমনও তো কেউ হতে পারে যে জাস্ট মজা করছে। মজা। অথবা ধরো যে, বিনিদ্র ক্রেজি লোকটা ফোন করছে সে জানবে কি করে এখানে কে আছে।

সাবিত্রী : এমনও তো হতে পারে, বাড়ি ফাঁকা আছে জেনে তোমার বউ ফোন করছে ফাঁকা বাড়িতে চোর ঢুকেছে কিনা তা ভেরিফাই করতে। —তোমার বউ বুঝল, চোর ঢুকেছে এবং ফোনটা চোর নার্ভাস হয়ে তুলে আবার নামিয়ে রেখেছে।

তারক : আমার বউ-এর মোটা শরীর। ঘুম সহজে ভাঙেনা। কিন্তু একটা কথা ঠিক, সে খুব খুঁত খুঁতে এবং নাছোড়বান্দা। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে এতক্ষণে সে পুলিশে খবর দিয়েছে এবং আমার মতো ভাইসের বাড়িতে চোর ঢুকেছে এই খবর পেয়ে পুলিশ চলে এলো বলে। দাঁড়াও আগে ফোনটা

(ফোনটার রিসিভার ফেলে রাখে)

সাবিত্রী : তার মানে তোমার সঙ্গে আমি হাতে নাতে ধরা পড়ে যাচ্ছি। না, আমি এক্ষুনি চলে যাব... আমার স্বামী একবার জানতে পারলে সুইসাইড করবে

... কেলেংকারি ফাঁস হওয়ার আগে হয় আমায় সুইসাইড করতে হবে, নইলে পালাতে হবে। যাই ...

(চলে যেতে যায় বাইরে ছুটে গিয়ে পিছনে পিছনে তাকে থামাতে যায় তারক। সামনে র জোনে দুজনে উত্তেজিতভাবে কথা আদান প্রদান করছে— সেই নীরব দৃশ্য দেখা যায়। ঘরের ঘড়ির পেণ্ডুলামের আড়াল থেকে চোর বার হয়ে আসে)

তারক : ওরে বাপরে! কি ভয়ংকর ব্যাপার! পারুল দু-দুবার ফোন করেছে আবার হয়তো করবে। উঃ কী হবে ....

(সাবিত্রীকে হাত ধরে টেনে তারক দরজার দিকে এগোয়)

সাবিত্রী : এ সময় বাইরে গেলে আরও ধরা পড়ার চান্স ... আরও কেলো হবে। ঘরে চলো .. চলো ...

চোর : এইরে, আবার ফিরে আসছে। ওরে বাবা, না এখানেই যাই, বাবারে—

(পেণ্ডুলামের পিছনে যেতে গিয়ে পেণ্ডুলামে ধাক্কা খায়। পেণ্ডুলামটা দুলে ওঠে, ঢং করে একটা ঘন্টা বাজে ঘড়ির ভিতর থেকে)

সাবিত্রী : *(ভয় পেয়ে)* এই, তুমি বল্লে ঘড়ি অচল, ঘড়ির তো ঘন্টা বাজল। একটার ঘন্টা।

তারক : বিদেশী তো, বারোটার পর মাঝে মাঝে আপন মনে চালু হয়। আপন মনে বন্ধ হয়। চলো। চলো। যা হবার ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে ... *(ফোন বাজে। তারক আচমকা রিসিভারটা তোলে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে)* হ্যালো ...

(ও প্রান্তে পারুলকে দেখা যায়। সে ভীষণ বিরক্ত)

পারুল : ন্যাকামি হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে ফোন করে যাচ্ছি। ফোন ধরে আবার কেটে দিলে কেন? শয়তান। উল্লুক। ভাল্লুক। ..

তারক : *(ফোনটা এক হাতে চেপে)* এ আমার বৌ নয় ... এই ল্যাংগুয়েজ আমার বউ-এর হতেই পারে না। ধরো প্লিজ।

সাবিত্রী : *(অস্বস্তি কাটিয়ে)* আপনি কে কথা বলছেন ভাই?

পারুল : ভাই! ভাই নারে তোর যম! আমার স্বামীর সঙ্গে তুই কেরে রাক্ষসী! তাই তো বলি ঢ্যামনা কিসের টানে আজকের রাতেও বাইরে পড়ে থাকে। কানপাশা? এবার থাবড়ে তোর কানঠাসা করে দেব, একবার আয়।

সাবিত্রী : *(প্রায় কান্না)* দেখুন এভাবে গাল দেবেন না। বোধহয় রং নাম্বার হয়েছে।

পারুল : এই বাজারী মেয়ে বড় গলা আমায় শোনাবি না। রং নাম্বার। এটা প্রেমকুঞ্জ প্যালেস তো?

সাবিত্রী : হ্যাঁ —

পারুল : বাড়ির নম্বর - ১১।

সাবিত্রী : *(ভেঙে পড়ে)* হ্যাঁ।

পারুল : তাহলে রং নাম্বার বল্লি কেন হারামজাদী। দে, ফোনটা আমার স্বামীর হাতে দে। দে বলছি।

সাবিত্রী : *(প্রায় অজ্ঞান)* ধরো। তোমারই বউ!

তারক : *(ফোনটা ধরে, ক্ষীণস্বরে)* হ্যালো কে বলছেন?

পারুল : তোর বাবা বলছিরে শয়তান। আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসিটি .. আর তুই অন্য মেয়েছেলে নিয়ে এখন প্রেমকুঞ্জে ফূর্তি করছিস? চিটিংবাজ। মিথ্যেবাদী। শালা চোর কখনও সত্যিবাদী হয়?

তারক : দেখুন ম্যাডাম। অনেক আজেবাজে বলেছেন। আপনি জানেন, আপনি কার সাথে কথা বলছেন? আমি এখানকার ভাইস...। না আপনি কি ভাবছেন আগে বলুন তো, আপনি কি অবহিত আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন? কোথা থেকে বলছেন? এমন গাল দেবার সম্পর্ক কার সঙ্গে?

পারুল : কেন আমার বরের সঙ্গে ... মাত্র একটু আগে তো অনেক কথা হলো ... আপনি যদি আমার বর সত্যি না হন, তবে ভালো করে শুনুন, আমার ঘরের পাশেই শীলতলা বস্তি উন্নয়ন সমিতির অফিস... মাঝে দরমার বেড়া ... সেই বেড়া খুলে তো সমিতির ফোনে বরের সঙ্গে রাতে কথা হল।

তারক : তাহলে আপনার বর একজন চোর এবং ঠগ। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আপনি আমার স্ত্রী নন, কিছুতেই নন এবং আমি আমার স্ত্রীর স্বামী। সে এখানে নেই, সে বাপের বাড়ি গেছে। তার বাপের বাড়ি শীলতলা বস্তিতে নয়, গড়িয়ায়। সেখানকার ফোন নং আপনাদের সমিতির ফোন নং নয়, ২৪৯২২০০০৫ ... কি আপনার সঙ্গে মিলল?

পারুল : না। তাহলে আমার স্বামী কোথায়? একটু আগে এই নাম্বার থেকে কথা বলেছে।

তারক : এখানে তো কেই নেই .... নিশ্চয়ই তিনি ভূত হয়ে এখন অন্য কোন ভাগাড়ে আছেন।

পারুল : এই মুখ সামলে। আমার স্বামী একজন অভিজ্ঞ মানুষ। শুধু আপনাদের ওখানকার নয়, আশেপাশে চার চারটে থানাতে রেগুলার হিস্যা দেয় জানেন? এখানকার থানার সেজবাবুর বাচ্চার জন্মদিনে আমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন ছিল জানেন? ফোরেন ভিডিও মেশিন পেজেন্ট করেছি। হুঁ—

তারক : সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন! বুঝবেন যখন কাল আপনারা দুজনেই অ্যারেস্ট হবেন। এতদিন শুনেছি চোরের মা-র বড় গলা। এখন দেখছি, চোরের বউ-এর আরও বড় গলা। গলা এবার বন্ধ। কারণ যখন দুর্নীতির খোঁজ পেয়েছি তখন আমি আপস করব না। নো, নেভার। আমায় কেউ কোনদিন নীতিভ্রষ্ট করেনি।

পারুল : আরে আমার নীতিবাগীশ গুরুঠাকুররে। বউ বাপের বাড়ি, রাতে অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি মারছ, ... বলছে নীতিবাগীশ ... খুব বড় নীতিবাগীশ! দেখাচ্ছি, তোমার বউ-এর নম্বরমতো পেয়েছি। এখুনি ফোন করছি গড়িয়ায়। অ্যাঁ চোরের বউ-এর বড় গলা। আগে নামী গলার বড় নলীটা মাটিতে নামাই। *(ফোন রাখে)*

তারক : ধ্যুস। আবার মিসটেক।

সাবিত্রী : (উৎকণ্ঠিত) আবার কি হলো?

তারক : আমি আবার দেখছি একা ঘরে মেয়েছেলে সামনে থাকলেই আমি কেমন ক্যাবলা হয়ে যাই... চোরের বউটাকে নিজের বউ-এর নাম্বার দিয়ে দিলাম এবং গবেটের মতো রোয়াব দেখাতে চাইলাম। হারামজাদী ক্ষেপে গিয়ে নমিতাকে এক্ষুনি ফোন করছে বলে ফোন রেখে দিল ... বোঝ নার্ভাস হয়ে কতবড় বোকামি করলাম।

সাবিত্রী : এবার কি হবে? আমার সর্বনাশের সার্কেলটা চূড়ান্ত হলো তো? বাঁচার আর কোন উপায় নেই... বাঁচার আর দরকারও নেই... এরকম পলিটিক্যাল পাঁঠার সঙ্গে প্রেম। চলোতো একসঙ্গে সুইসাইড করি।

তারক : একসঙ্গে? একেই বলে মেয়েছেলের বুদ্ধি। সুইসাইড করলে , ভেবে দেখেছ মিডিয়া কিম্বা পাবলিক কি স্ক্যান্ডাল শুরু করবে। আমার প্রেস্টিজ... কোথায় যাবে আমার নাম যশ ইমেজ।

সাবিত্রী : মরা মানুষের প্রেস্টিজ থাকে না। *(মাথায় হাত বোলায়)* তাছাড়া নমিতার ঘুম তো নাও ভাঙতে পারে... এত ভেঙে পড়ছ কেন।

তারক : ভাঙবে। ওর ঘুম কন্ট্রোলের রিমোটটা ওর পছন্দ-অপছন্দের হাতে থাকে। উঃ আমি দেখছি এসব ক্ষেত্রে নমিতার রাগ কিম্বা গলা কোনটাই নামে না সাবু। টপে থাকে।

সাবিত্রী : তাই তো বলছি... মরণের পর কে কি বলল তার হিসাব নিতে যাবে কে? চলো একসঙ্গে ঝুলে পড়ি। এভাবেই এখন বাঁচতে পারি।

তারক : না পরি না। তুমি জান না, কনট্রাকটারদের আগে থেকেই বলা আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ভাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হঠাৎ দেহ রাখলে কোথায় ওদের স্ট্যাচু বসবে। এভাবে মরলে তো আমার স্ট্যাচু বসবে না অথচ ওই চোর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্ট্যাচু তো বসবেই ... ও ঘুষখোর কিন্তু ওর ছেলেমেয়েরা ওকে সবসময় এমন কড়া পাহারায় রাখে যে আমার মতো ওর ছেলেমেয়েরা ...। *(হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে)* না, এভাবে তারক সিংহ লম্পট ইঁদুরের মতো মরতে পারে না। আমি একটা বাঁচার ক্লু পেয়ে গেছি। আমি এক্ষুনি থানায় ফোন করব ... বলব একজন নোটোরিয়াস ক্রিমিনালের বউ ফোন করে জানিয়েছে যে ক্রিমিনালটা একজন অসহায় মহিলাকে ভয় দেখিয়ে এ বাড়িতে ঢুকিয়েছে। মহিলাটি আমার এলাকার সাবিত্রী দত্ত। শয়তানটা জানত সাবিত্রী বাড়িতে একা আছে। অসৎ উদ্দেশ্যে সে আর তার লোকজন, অল মিসক্রিয়ান্টস্ সাবিত্রীকে হাত পা বেঁধে আমার নির্জন বাড়িতে ঢোকে ... ওই লম্পট চোরের না ডাকাতের সতী সাবিত্রী স্ত্রী গোপনে আমাকে সমস্ত প্ল্যানটা জানায় .. বস্তিবাসিনী ওই দুঃখী মহিলা জানতো ভাইস গরীবের বন্ধু... অসতের যম, ব্যস্ ... আমি বদমাইশটাকে হাতেনাতে ধরব বলে দিল্লি না গিয়ে আড়ালে অপেক্ষা করি। ... নাউ দ্যাট লোনলি টরচারড লেডি সাবিত্রী ইজ হোয়ার উইপিং লাইক বেহুলা অর সীতা ... এবং বদমাইশটাও নিশ্চয় আমার আঁচ পেয়ে এই বিশাল বাড়ির কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে ... পুলিশ, ওহে পুলিশ, তুমি খুঁজে বের করো আসামী। এদের জন্যই আইন-শৃঙ্খলা, নারীর ইজ্জত আজ মাটিতে লুটোচ্ছে। আমার ফোনে সি এল আই ফিট করা ... শয়তানটার বউ-এর নাম্বার ও ঠিকানা পেয়ে যাবে ... *(হাসি)* ওঃ আমার বুদ্ধি আর ব্রেনের অ্যানটেনাটা এবার একটু বুঝলে তো সাবু ...

সাবিত্রী : কিন্তু এই গল্পের গরুটা যদি ঠিকঠাক গাছে না ওঠে —

(গড়ির পেণ্ডুলাম থেকে বার হয়ে চোর এগিয়ে আসে)

চোর : উঠবে না। আমি আছি, জাগ্রত বিবেকের মতো, জ্যান্ত ভগবানের মতো

সব দেখছি, শুনে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি এবং ছবি তুলে ফেলেছি। আমি এখন ফেলুদা।

সাবিত্রী : *(ভয় পেয়ে তারককে জড়িয়ে)* ওমা — চোর, চোর।

চোর : *(মোবাইলে ছবি তোলে)* এবং আবার একটা ছবি উঠল। একেবারে সুচিত্রা উত্তম, করিনা-সইফ *(হাসি)* স্যার, এতক্ষণ আপনি আমাকেই ফাঁসাবার কথা বলেছিলেন, মানে আপনাদের বাঁচার জন্য আমাকেই শহীদ বানাবার শেয়ালগিরি করছিলেন স্যার। হ্যাঁ, আমি চোর।

তারক : হাতে ওটা কী? কার মোবাইল?

চোর : আপনার টেবিলের উপর ছিল। এখন তো আপনার তুরীয় অবস্থা। আনমাইন্ডফুলি টেবিলের উপর ফেলে রেখেছেন। ইংরেজি শুনে বুঝছেন তো ইংরেজি একটু জানি, সরস্বতীর রাজহাঁসের স্টুল আমার মাথায় একটু আছে। সময়ে একটা পাশ দিয়ে সেকেন্ড পাশ দিতে গিয়ে ... ধপাস। ঠাণ্ডা। তারপর এইকুল সেইকুল আকুল ব্যাকুল হয়ে কঠিন অ্যাপ্রেনটিস পিরিয়ড। (হাসি) অফিসে বিদ্যা হোল না। শিখলাম হ্যাপিসের বিদ্যা ... আমি স্যার সচ্চরিত্র চোর ... ইংরেজিতে R.B মানে Religious Burglor. আমার বাড়ি স্যার আপনার এ পাড়াতেই—

তারক : জানি, শীলতলা বস্তি—

চোর : কে বলেছে?

তারক : তোমার বউ।

চোর : টিকই বলেছে। সে আপনার মতো বুদ্ধু না যে বিপদে পড়লেই নার্ভাস হয়ে সত্যি কথা বলবে। আমার বাড়ি এখান থেকে হেঁটে গেলে ৩ মিনিট, দৌড়ে গেলে ১০ মিনিট।

সাবিত্রী : সেয়ানা পাগল। ওকে বের করে দাও। হেঁটে গেলে ৩ মিনিট আর দৌড়ে গেলে ১০ মিনিট।

চোর : আপনার এই ধেঁড়ে বয়ফ্রেন্ড ভাইস আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট অসমান করে এমন খোড়াখুড়ি করে রেখেছেন যে দৌড়াতে গেলেই ধপাস। পরে উঠতে গেলেও হাত-পা টনটন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্তত ১০ মিনিট ... তবে দেখেশুনে হেঁটে গেলে মিনিট তিনেক। আমরা যে কাজ করি তাতে তো দেখেশুনেই চলতে হয় স্যার। *(ফোন বাজে)*

(তিনজনের কে ফোন ধরবে তাই নিয়েই দ্বিধাগ্রস্ত। শেষে একলাফে

টেবিলের উপর উঠে বসে চোর ফোনটা ধরে)

সাবিত্রী : *(চেঁচিয়ে ওঠে)* স্কাউন্ড্রেল । তুমি ধরলে না কেন?

চোর : হ্যালো মা, ও না আমি এলাকার বিশিষ্ট মানুষ.. এ নামী স্কাউন্ড্রেল অফ দি এলাকা ... আপনার স্বামীকে এখন দেওয়া যাবে না ... তিনি এখন একজন মেয়েছেলের সঙ্গে *(দুজনের করুণ অবস্থা)* না, না, মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েছেলেটি বিপন্ন তার স্বামী কাজের জন্য বাইরে ... একদল দুষ্কৃতি তার বাড়িতে গভীর রাতে ঢুকে তাকে অজ্ঞান করে এই ভাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ফাঁকা বাড়িতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না আপনার স্বামীকে আমিই এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে ডেকে আনি ... হ্যাঁ ঠিক বলেছেন ম্যাডাম, পাইলটদের মিটিং চলছে তো... আমি... না না,আর আমার বৌ-এর পেটে পেইন হয়... অত রাত্রে এই রাস্তার পাশ দিয়ে .. ধ্যুৎ শালা আর বানাতে পারছি না... বাকিটা আপনি বানান, তারকবাবু স্যার, গড়িয়া থেকে তামান্না আপনার বৌ ... *(তারক মাথা নাড়ে)*... না উনি অচেতন পরস্ত্রীর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন.. না, না, আমি তো নিজেই উপস্থিত আছি ... নানা আসতে হবে না, ... ও আসছেন । বেশ তো .. না, না ধন্যবাদের কি আছে? আমার নাম? ধুস্

তারক : তাই, তোমায় সত্যিই ধন্যবাদ। Thank you, তুমিও thank you বল।

সাবিত্রী : (গম্ভীর) thank you পুলিশ আসছে। *(কলিং বেল বাজে)*

চোর : দরজা খুলুন। আমি চুরির পোটলার মধ্যে আপনার স্যুটটা আছে, পরে আসছি। এই চেহারায় বিশ্বাসযোগ্য হবে না । আপনি সীতা-বেহুলা দেশের বউ ... পুলিশের সামনে একটু লম্বা ঘোমটা টেনে বসুন এখন। পরে খ্যামটা নাচবেন। ম্যায় হুঁ না।

(চলে যায় ভিতরে)

(তারক দরজা খুলে দেয়। পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ও কনেস্টবল ঢোকে সাবিত্রী ঘোমটা দিয়ে বসে পড়ে)

পুলিশ : স্যার, ম্যাডামের ফোন পেয়ে আসছি। কী হয়েছে ? উনি ....

(সাবিত্রী হঠাৎ কেঁদে ওঠে)

তারক : ইনি মিত্র পাড়ার এক নির্যাতিতা গৃহবধূ ... মানে প্রায় নির্যাতিতা ... দুষ্কৃতিরা আমার এই বাড়িটা ফাঁকা পেয়ে ওকে এখানে অসৎ উদ্দেশ্যে *(সাবিত্রী জোরে কেঁদে ওঠে)* না, সেই বীভৎস দৃশ্য ওকে আর মনে করাব না।

ইন্সপেক্টর : বাঁকা সিং ।

কনস্টেবল : হুজৌর ।

ইন্সপেক্টর : হাই তুলছ কেন। অ্যাটেনশন। নাইট ডিউটি দিতে গেলে ডি.আই.পি. কেসে আসতেই হয়। এই বাড়িটা বিশাল। প্রতিটি ঘর, বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজো। একটা দুষ্কৃতিকেও যদি দেখতে পাও চুল পাকড়কে লে আনা, যাও।

তারক : দাঁড়ান । আগে সবটা শুনুন।

ইন্সপে : সব শুনব স্যার। আগে ক্রিমিন্যালকে ধরি? হুঁ দেখছেন না, কাগজগুলোতে কন্টিনিউয়াস অপপ্রচার- "অপরাধ বাড়ছে, পুলিশ ঘুমাচ্ছে।" পুলিশ ঘুমোয়? না। পুলিশ রাত তিনটার সময় ক্রিমিন্যাল ধরে। কথা বলতে থাকুন, আমার বউ, আপনার বউ, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে অনেকের বউ অনেক মানুষের কুম্ভমেলা বসে যাবে। বলুন, আমি কিভাবে সমাজবিরোধীদের হাত থেকে এই মহিলাটিকে উদ্ধার করলাম বলুন। আমি ততক্ষণ একটু ধূমপান করি।

(ওরা কথা বলতে থাকে। বাঁকা সিং চোরের পুঁটলি নিয়ে ঢোকে, চোরের মোবাইল বাজে পেণ্ডুলামের পাশ থেকে)

তৃতীয় ও শেষ প্রেক্ষাপট :

১+ ২ : এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত চোরেদের আখ্যান

৩+ ৪ : এবার ভদ্রনাট্যে ভদ্র শিল্পে/দেখবে গঙ্গাজলে চান/দেখুন কতো পুণ্যবান

৫+ ৬ : পারুলবালা চোরের আখ্যান শুনলেন তো কুছ্ কুছ্

১+ ২ : ভদ্দরলোকের হাজার ফুটো / চোরেদের তো সূচ।

সকলে : ভদ্দরলোকের হাজার ফুটো / চোরেদের তো সূচ।

অনুপ্রেরণা : দারিও ফো *(কৃতজ্ঞতা : কিশোর সেনগুপ্ত)*

নোবেলজয়ী ইতালীয়ান নাট্যকার দারিও ফো বেঁচে থাকলে বয়স হোত ৯৩। আমরা, দুনিয়ার সব নাট্যকর্মীরা হয়তো আরো কয়েকটি কাল-কাঁপানো মজার সিরিয়াস নাটক পেতাম, যা এই নোংরা সময়ে জরুরী দৃশ্যপট হয়ে উঠতে পারত।

*
**

খেলা

সৌমিত্র বসু

(জঙ্গল। নিশুত রাত। একজন মানুষ চুপ করে বসে আছে। উঠে আসে সামনে, দর্শকদের দিকে। সূত্রধার)

সুত্রধার : আমি এই নাটকের কোন চরিত্র নই। এই নাটকে যা কিছু ঘটবে, তার কোন কিছুর নিয়ন্তাও আমি নই। মানে এই নাটকের কোন ব্যাপারেই কোন দায়িত্ব নেই আমার। আমি শুধু বিবরণকারী। নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত। নিরাসক্ত? তা কি সম্ভব কখনো? জানি না। যাক, নাটকের কথায় আসি। ঘটনা ঘটে, তারপর সে ঘটনা বীজ হয়, ছড়িয়ে যায় অরণ্যের ভূমিতে ভূমিতে। মাটির তলা থেকে যেন উঠে আসে উদ্ভিদ, ছেয়ে ফেলে লোকালয়। আকাশে ধোঁয়া হয়ে উঠতে থাকে, জলের ওপর ভাসতে থাকে ছায়ার মতন। কবিতার মত লাগছে, না? কখনো কখনো এমন সময় আসে, যখন সোজা কথায় কিছু বোঝানো যায় না, তখন ভাষা বেঁকে যেতে থাকে, উপমার আশ্রয় নেয়। কখনো কখনো। যেমন এখন, এই সময়ে। *(দূরে দেখে)* ওই ওরা আসছে। যুযুধান দুই পক্ষের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া একজন। তার পেছনে তাড়া করে আসছে তিনজন। এই অরণ্যের মধ্যে এখনই একটি হত্যাকাণ্ড ঘটবে। আমি নিয়ন্তা নই, সে হত্যা আমি আটকতে পারি না। আমি জানিও না তার কারণ। যারা ঘটাবে তারাও কি নিয়ন্তা, তারাও কি জানে ?

(মঞ্চের একপাশে বসে। দূর থেকে আর্ত চিৎকার শোনা যায়। একটি ছেলেকে তাড়া করে আসে তিনজন। ঘিরে ধরে তাকে। ছেলেটি হাত জোড় করছে। একজন গুলি করে, ছেলেটি পড়ে যায়। অন্ধকার হয়ে যায় জায়গাটা। সূত্রধার এগিয়ে আসে আলোকবৃত্তে)

সূত্রধার : রক্তে ভিজে গেল অরণ্যের মাটি। লাল, গাঢ় লাল রক্ত, লাল গাঢ় লাল কাদা, যে নিহত হল, সে যদি হত্যাকারী হত, আর ওই হত্যাকারীদের কাউকে যদি গুলি করত, তাহলে ঠিক এমনিভাবে তার শরীর থেকেও বেরিয়ে আসত রক্ত, লাল গাঢ় লাল রক্ত। আবার পদশব্দ। অরণ্যের মধ্যে দিয়ে, সূর্যালোক স্পর্শ না করা ভিজে মাটির ওপর দিয়ে শ্বাপদের মত ছুটে আসছে —
(একই দৃশ্য। তিনজন ঘিরে ধরে একজনকে। হত্যাকারীদের কেউ বন্দুক তোলে, ২য় জন বাধা দেয়)

২য় : না, ফায়ার করিস না।

১ম : মানে?

২য় : আরে গুলি করে তো কতগুলো মারলাম। এবারে —

৩য় : এবারে ?

২য় : অন্যরকম কিছু হোক। নতুন রকম।

১ম : সেটা কী?

(দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে এগিয়ে যায়। পকেট থেকে ছুরি বার করে দুটো চোখ উপড়ে নেয়)

২য় : যা পালা এবার।

(ছেলেটা পালাতে যায়। তাকে ঘিরে আছে বাকিরা। যেদিকেই যাচ্ছে হাতের চপার দিয়ে মারছে। অন্ধ ছেলেটা বুঝতেও পারছে না কোথায় আছে হত্যাকারীরা। প্রায় নাচের মত গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে ছেলেটিকে। জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যায়। সূত্রধার বেরিয়ে আসে)

সূত্রধার : গুলি করে মারা একঘেয়ে হয়ে গেছে। তাই নতুন খেলা। নতুন নতুন খেলায় ভিজে যাচ্ছে অরণ্যের মাটি। আরো একজন বাকি আছে। তার পেছনেও আসছে তিনজন হত্যাকারী। নিশ্চিত, অমোঘ।

(চলে যায়। বিমান পা টিপে টিপে ঢোকে। সতর্কভাবে চারদিকে তাকায়। হঠাৎ আবছা আলো মঞ্চে। টর্চের আলো। বিমান সতর্ক হয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে কোন গাছের পেছনে। তিনজন লোক ঢোকে। টর্চ ফেলে এদিক ওদিক দেখে। দেখতে পায় না।)

১ম : কুত্তার বাচ্চাটা কোথায় গেল বল তো?

২য় : পায়ের শব্দটা তো এদিকেই এলো মনে হল

১ম : মনে হল ? মানে? শালা তুই শিওর নোস?

২য় : আরে শিওর কী করে হবো, এই অন্ধকারে? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোনদিকে গেছে-- মনে হল পায়ের শব্দটা যেন —

১ম : শালা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

৩য় : মানে?

১ম : জঙ্গলের এত ভেতরে ঢুকে খোঁজার কোন মানে হয় না।

৩য় : তাহলে?

২য় : চল, ফিরে যাই।

১ম কী বলছিস কি? ফিরে চলে যাব?

২য় : কী আর করা যাবে? খুঁজে না পেলে?

১ম : কী রে, তুই কিছু বল। কী করব?

৩য় : চল তাহলে, ফিরেই যাই। কতক্ষণ এই অন্ধকারে গাছপালা ঠেঙিয়ে মরবি?

১ম : বাড়ি ফিরে যাব? কেমন করে জবাই করব মনে মনে ঠিক করে রেখেছি—

৩য় : আরে একে দিয়েই কি অপারেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি? যা ভেবেছিস পরের

লটে করবি। সারা রাত এখানে ঘুরে বেড়াবি নাকি?

২য় : তা বটে। গাঁয়ে ফিরতে এখন কতটা হাঁটতে হবে বল তো? শালা এই রাত্তিরে।

১ম : বহুৎ আফশোষ কি বাৎ। দুটোকে নিকেশ করলাম, আর এই শালাটাই-

৩য় : ও ভেবে আর কি করবি, খেলায় জিৎ হার আছেই।

২য় : খেলা?

৩য় : খেলাই তো! একটু বেশি টেনশনের খেলা। যাকে বলে মরণ বাঁচনের খেলা।

১ম : শালা বলে ভাল। মরণ বাঁচনের খেলা। আর আমরা হচ্ছি বাঁচনের দলে।

৩য় : সে তো আজকের জন্যে। ওদের পাড়ায় ঢুকে পড়লে মরণ বাঁচনের পার্টিরা পাল্টে যাবে না? যাক গে, একটু জিরিয়ে নিবি নাকি? নইলে এতটা রাস্তা ফিরতে হবে।

২য় : জিরিয়ে নেব? এখানে? এই জঙ্গলের মধ্যে? মাথা খারাপ?

১ম : *(ঘড়ি দেখে)* আড়াইটে বাজে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সোয়া তিনটে তো বটেই। চল রওনা দিই।

৩য় : হ্যাঁ । তোরা দুজনে তো এক পাড়ায় যাবি। আমার তো একা একা কতটা যেতে হবে ভাব তো? বেরিয়ে পড়ি।

১ম : দূর, আমার মনটা খুঁত খুঁত করছে মাইরি। মালটাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারলাম না।

২য় : সে আর কী হবে? সব কিছু কি ঠিক ঠিক হয়?

১ম : তা বটে (৩য়কে) কী রে কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোর?

৩য় : আমার ? কী হবে ?

২য় : হ্যাঁ, তখন থেকে দেখছি চুপচাপ। কী যেন ভাবছিস।

৩য় : না, না, সে সব কিছু না। আসলে দম চলে গেছে আর কি। এতটা রাস্তা দৌড়ে দৌড়ে — আর যা অন্ধকার, যেন গিলে খেতে আসছে।

১ম : হ্যাঁ, অভ্যেস নেই তো।

৩য় : চল।

২য় : কী হল? আবার কী দেখছিস?

১ম : মালটা হাত ফসকে বেরিয়ে গেল।

২য় : গেল। এ শালার মুখে আর কোন কথা নেই মাইরি।

১ম : ধরতে পারলে —

৩য় : ও সব নিয়ে যেতে যেতে ভাবিস। এখন চল।

(তিনজনে রওনা হয়। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিমান। পারছে না আর, টলছে। এক জায়গায় বসে পড়ে। কী ভেবে পকেট থেকে বিভলবারটা বার করে রাখে। গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে চোখ বোজে। গাছতলায় খুব মশা। চাপড়ে দুটো একটা মশা

মারে। তৃতীয় ঢোকে। এখন থেকে তাকে আমরা চন্দন বলব। চন্দন এসে বিমানের সামনে বসে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে সশব্দে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরায়। বিমান চমকে লাফিয়ে ওঠে, রিভলবারটা মাটি থেকে তুলতে গিয়ে নিজেই আচমকা পড়ে যায় মাটিতে। রিভলবার তাক করে)

বিমান : এই একদম চালিয়ে দেব কিন্তু, দানা ভরে দেব শালা। কী হল তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছ?

চন্দন : তারপর?

বিমান : কী তারপর?

চন্দন : এই রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্যে গুলির শব্দ। তক্ষুনি ওরা ফিরে আসবে না? কোথায় পালাবে তখন? এই জঙ্গল তুমি চেনো?

বিমান : না,তবে—

চন্দন : তবে টবে কিছু নেই। এই জঙ্গল তুমি চেন? চেন না তো? এই অন্ধকার রাত্তিরে সারা রাত ধরে ঘুরে বেড়াবে। বুনো জন্তু আছে, সাপ আছে। কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বে। আর সকাল হয়ে গেলে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে তোমাকে।

বিমান : বেশ । তাহলে আগে তোকে নিকেশ করি, তারপর নিজেকে মারব।

চন্দন : সেই তো মরতে হবে। তাতে লাভ?
(বিমান বন্দী পশুর মত চারদিকে তাকায়, ততক্ষনে চন্দন পকেট থেকে সিগারেট বার করছে)

চন্দন : সিগারেট খাবে?

বিমান : কী?

চন্দন : সিগারেট। খাও তো। নাও। আরে নাও নাও। আগে নামাও ওটা।
(বিমান ইতস্তত করে রিভলবার নামায়, হাত বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু খায় না)

চন্দন : খাও। আমি তো টান দিয়েছি। তুমিও দাও। তোমার বেশি দরকার।

বিমান : তুমি ... আবার ...

চন্দন : তোমাকে একটা কথা শিখিয়ে দিই। যখন লুকিয়ে থাকবে না, গায়ে আলো পড়লেও নড়াচড়া করতে নেই। তাহলে লোকে ভাববে এমনি, গাছেরই কোন একটা কিছু। নড়লেই সন্দেহ হয়। এই গুড়িটার গায়ে যখন আলো পড়ল, সরে যেতে গেলে কেন?

বিমান : তুমি তখনই আমাকে দেখেছিলে?

চন্দন : দেখেছিলাম। গুঁড়ির ওপাশে কি যেন একটা সরে গেল।

বিমান : ওদের বলে দাওনি কেন? আমাকে ধরলে না কেন? *(চন্দন হাসিমুখে তাকিয়ে আছে)* কী হল? জবাব দাও।

চন্দন : কী জবাব দেব তাই ভাবছি।

বিমান : হেঁয়ালী করছ কেন?

চন্দন : হেঁয়ালী নয়, সত্যি। যদি বলি, তোমাকে দেখে মায়া হল, বিশ্বাস করবে?

বিমান : না।

চন্দন : কেন? বলো কেন?

বিমান : কেন তুমি জান না?

চন্দন : ধরো জানি না। বলো।

বিমান : মায় দয়া বিশ্বাস এসব — এসব আমাদের নেই। থাকে না।

চন্দন : ঠিক। মায়া দয়া নয়, আসলে— কদিন ধরেই আমার কী রকম একটা লাগছে। এই যে আমরা তোমাদের পেলেই মারছি, তোমরা আমাদের পেলেই মারছ। নিজেদের মধ্যে এই একই জিনিস। এরঘেয়ে লাগছে, একঘেয়ে। তোমার লাগে না?

বিমান : একঘেয়ে?

চন্দন : একঘেয়ে একঘেয়ে— বোরিং। খেলাটা খুবই এক্সাইটিং, কিন্তু যত যাই হোক, বার বার খেলতে খেলতে মজাটা তো হারিয়ে যায়। কী, কিছু বলো?

বিমান : আমি ও সব বুঝি না।

চন্দন : একঘেয়ে লাগে কিনা টের পাও না?

বিমান : বললাম তো আমি অত বুঝি না।

চন্দন : বুকে হাত দিয়ে বলছ? বোঝ না? কখনো মনে হয়না, কীসের জন্যে এই রকম ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি? এই রকম করেই একদিন মরে যাব। মানে কী এসবের? এর চেয়ে এমনি লোকজন যেমন করে বেঁচে থাকে— বিয়ে ফিয়ে করল, বাচ্চা কাচ্চা হল —

বিমান : এ সব ফালতু কথা তুমি আমাকে কেন বলছ বলো তো? কেন বলছ?

চন্দন : একটা অন্য রকম কিছু করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একা ঠিক, কী বলব, ভরসা পাচ্ছি না। যদি তুমিও আমার সঙ্গে থাকো তাহলে একবার দেখি।

বিমান : কী ইচ্ছে?

(চন্দন বিমানের হাত চেপে ধরে)

চন্দন : চলো পালাই।

বিমান : কী ?

চন্দন : পালাই, এই সব কিছুর থেকে। শালা এই রকম করে বেঁচে থাকার থেকে । *(বিমান ম্লান হেসে আলতো করে হাত ছাড়িয়ে নেয়।)* কী হল?

বিমান : আরে ফায়ারটা করে দাও না ভাই, সব চুকে যাক।

চন্দন : আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

বিমান : না ।

চন্দন : কেন, অবিশ্বাসের কী দেখছ আমার মধ্যে? আমার চোখে, আমার কথা বলায়—

বিমান : কিচ্ছু না। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না। করতে পারছি না।

চন্দন : কেন?

বিমান : এই জমানাটা বিশ্বাস করার জমানা নয় বলে।

চন্দন : বেশ। তাহলে বলো কোনটা ভালো? বিশ্বাস না করে মরা, না কি বিশ্বাস করে একটা চান্স নেওয়া। কোনটা বলো।

বিমান : আরে হাতে রক্ত লেগে গেছে তো।

চন্দন : মুছে ফেলব।

বিমান : ইছে করলেই মোছা যায় নাকি? যেখানেই যাব ঠিক টের পেয়ে যাবে।

চন্দন : পাবে না। অন্য নাম নেব। সব কিছু অন্য অন্য। চেহারা পাল্টে ফেলব। লোকে এ রকম রে হাপিস হয়ে যায় না?

বিমান : তা অবশ্য ....

চন্দন : তুমি আর আমি ।

বিমান : তুমি আর আমি?

চন্দন : দুই বন্ধু। না, ভাই। দুই ভাই। যা হোক কিছু জমিয়েছি, কটা দিন ঠিক চলে যাবে। তার মধ্যে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হবে, ব্যস।

বিমান : কোথায় যাব? কে আমাদের কাজ দেবে?

চন্দন : আছে আছে । সে রকম জায়গা আছে। যেখানে লাল নেই, সবুজ নেই, গেরুয়া নেই, কিচ্ছু নেই। খেটে খেতে হবে, কিন্তু খাটলে খাওয়া জুটে যাবে। আর একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখি না, না হলে তো না হল।

বিমান : না হলে তো না হল মানে? আর তো আগের জায়গায় ফিরতে পারব না।

চন্দন : তখন মরব। দুজনেই। সেটা তো নতুন কিছু নয়। শোনো, অত ভাবলে শেকল কাটা যাবে না। যা ঠিক করবার চোখ বুজে ঠিক করে ফেল। পুরোপুরি বিশ্বাস করে। বল, কী হল, রাজি?

বিমান : রাজি ।

চন্দন : আমাকে দাদা বলে ডাকতে বাধবে না?

বিমান : (এক মুহূর্ত তাকিয়ে খানিকটা যেন জোর করেই) না।

চন্দন : বাধবে। বাধছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমারও বাধছে। কাটাতে হবে। চলো। না, চল। দাদা তো। (বিমানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ে। অন্ধকার।)

২

(আলো জ্বললে দেখা যায় সূত্রধার দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে মঞ্চ সাজানোর কাজ চলছে।)

সূত্রধার : পৃথিবীতে মাটির ওপরটা খুব শান্ত, ঠান্ডা। সেখানে গাছপালা, সেখানে সবুজ। কিন্তু একটু গভীরে নামলেই আগুন বয়ে যাচ্ছে, লাল জিভ বার করে চেটে নিচ্ছে সব কিছু। সে কি সব সময় মাটির গভীরেই লুকিয়ে থাকে? আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে লাভা হয়ে বেরিয়ে আসে না? সে কি মাটি ফুঁড়ে ঘাসের মতন, বালির মতন, পাথরের মতন উঠে আসে না মানুষের শরীরের মধ্যে ? তার ভেতরে বইয়ে দেয় না গুমরে ওঠা লাভার স্রোত? চন্দন আর বিমান। দাদা আর ভাই। তারা পালাচ্ছে এই স্রোত থেকে দূরে। জঙ্গল পেরিয়ে হাইওয়ে, সেখানে একটা বাস ধরে রেল স্টেশন। চায়ের দোকানে তেরপলের তলায় দাঁড়িয়ে চা আর আলুর চপ খেল দুজনে। ট্রেন। সারা রাত এই ট্রেনে। দূর, দূর, অনেক দূর। ভোরবেলা ঝেঁপে বৃষ্টি এল। আর তারপরেই একটা অচেনা স্টেশন। মেঘ কেটে আলো বেরিয়ে আসছে আকাশ থেকে। এই সারাটা রাস্তা বিমান বার বার ঘুরে ঘুরে দেখেছে চন্দনের দিকে। অচেনা একটা শব্দ, বিশ্বাস। অচেনা একটা অনুভূতি, নির্ভরতা। আলো ছড়াচ্ছে আকাশে। স্টেশনে নেমে সাইকেল রিক্সা। দুজনে পাশাপাশি। গায়ে গায়ে লাগছে। একে অন্যের ঘামের গন্ধ পাচ্ছে। তারপর— বিশ্বাস নির্ভরতা, বিশ্বাস নির্ভরতা, বিশ্বাস—

(দরজার কড়া নড়ে ওঠার শব্দে অন্ধকার হয়ে যায়। আলো জ্বলে। একটা ঘর। বিশাখা সেখানে এটা ওটা আসবাবপত্র সাজাচ্ছে। বিছানায় চাদর পাতল। গুঁজে দিল চারপাশে। ঘরটা ভাল করে দেখে নিয়ে)

বিশাখা : রেডি। চলো এসো।
(মঞ্চে ঢুকল চন্দন আর বিমান। পোষাক বদলে নিয়েছে)

চন্দন : করেছ কি বস, ভোল পাল্টে দিয়েছ এ ঘরের।

বিশাখা : কী করে বুঝলে ভোল পাল্টে দিয়েছি। আগের ভোলটা তো আর দেখ নি।

চন্দন : ও দেখিনি বুঝি? (বিমানকে) কী রে, দেখি নি?

বিশাখা : মানে? লুকিয়ে লুকিয়ে—

চন্দন : ঘর ঠিক করার সময় দরজা বন্ধ রাখলে কী হবে, ওদিকের জানালাটা খোলা ছিল, খেয়াল করিসনি তো।

বিশাখা : এ বাবা।

চন্দন : তাছাড়া নতুন চাদর, নতুন বালিশের ওয়াড়, নতুন পর্দা এ তো দেখলেই বোঝা যায়। কেমন নতুন নতুন গন্ধ ছাড়ছে।

বিশাখা : ঘরটা তো পড়েই থাকে। এতদিন একা একা ছিল, এখন তোমরা এলে, কটা দিন একটু মানুষ নড়াচড়া করবে। মানুষ বাস করলে ঘর খুশি হয়, জান তো!

চন্দন : তা জানি না, কিন্তু সব নতুন জিনিস কিনে রেখে দিয়েছিস কেন সেটা বুঝতে

পারলাম না। কেউ আসার কথা ছিল নাকি? সে রকম কেউ?

বিশাখা : ছিলই তো, তোমাদেরই আসার কথা ছিল। যাক গো পছন্দ হয়েছে?

চন্দন : আমাদের মুখে প্রশংসা শুনতে মন ছটফট করছে, না?

বিশাখা : এই, যত বাজে কথা। কিন্তু নতুন মানুষটি তো কিচ্ছু বলছে না?

চন্দন : কী রে, কিছু বল।

বিমান : কী বলব !

চন্দন : কী বলব মানে? কিছুই বলবার নেই? ঘর পছন্দ হয়েছে?

বিমান : হ্যাঁ।

চন্দন : শুধু হ্যাঁ? ঘরে ঢুকে বেশ নিশ্চিন্ত লাগছে না? *(বিমান ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে)* আরে সেটা মুখ ফুটে বল ভাল করে।

বিমান : না মানে, আমি ওরকম বলতে পারি না।

বিশাখা : এই চন্দনদা, ছাড় না ওকে। বেচারি।

চন্দন : বিশাখা, বিমান কিছু বলতে পারে না, ওর চোখ মুখের ভাব দেখে পড়ে নিতে হয়।

বিশাখা : ওরে বাবা, সে সব কি আর আমি পড়তে পারব? যা মুখচোরা, ভাল করে তো আলাপই হল না এখনো। আচ্ছা বেশ, একটু জিরিয়ে টিরিয়ে নাও। আজকের চানটা কলঘরে করে নিও। নতুন বর্ষা, পুকুরে নামলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। দুজনের ভাত চাপা রইল, গরম করে খেয়ে নিও, কেমন? আর না, অবার আমাকে বেরুতেই হবে।

চন্দন : এটা কিন্তু অন্যায়। স্কুল একটা দিন ছুটি নেওয়া যেত না?

বিশাখা : না গো। আজকে সব গার্জেনরা আসবে, মিটিং হবে। আমাকে যেতেই হবে। এর মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। আর একটা কথা।

চন্দন : কী?

বিশাখা : ঘরেই থেকো, বাইরে বেরিও না। মানে আশেপাশের লোকজন তো কিছু জানে না। কী সব জিজ্ঞেস করবে। ফিরে আসি, তারপর যা ভাল ঠিক করে নেব, কেমন? চলি। *(বিশাখা চলে যায়)*

চন্দন : কেমন লাগছে?

বিমান : ভাল।

চন্দান : শুধু ভাল?

বিমান : সত্যি কথা বলব? আমার না পুরো ব্যাপারটা কী রকম অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

চন্দন : তাই, না? কালকে রাত্তিরে ছিলি জঙ্গলের মধ্যে, পেছনে আমরা তাড়া করে

আসছি, ধরতে পারলেই খাল্লাস। আর একটা দিন বাসে ট্রেনে কাটাবার পর—

বিমান : আচ্ছা, ইনি কোন খবর পাবেন না? তোমার খবর, আমার খবর।

চন্দন : কী করে পাবে?

বিমান : আমরা যে পালিয়ে এসেছি, ওরা তল্লাস করছে না?

চন্দন : করুক না। সে তল্লাস বিশাখা অবধি পৌঁছোবে নাকি?

বিমান : পৌঁছোবে না?

চন্দন : কী করে পৌঁছোবে? ওর সঙ্গে আমি ছাড়া আর কারুর যোগাযোগই নেই। আর কে ভাববে, তুই আমি একসঙ্গে এইখানে পালিয়ে এসেছি?

বিমান : উনি জিজ্ঞেস করেননি, আমরা হঠাৎ কেন এসেছি, কতদিন থাকব।

চন্দন : জিজ্ঞেস করেছিল, সে তো করবেই। তবে সেটা ওই এমনি জানতে চাওয়া, জেরা নয়। আমরা যে এসেছি এতেই খুশি।

বিমান : ম্যাডাম কি এখানে একাই থাকেন?

চন্দন : একাই তো চাকরি নিয়ে চলে এসেছিল।

বিমান : বিয়ে হয়নি?

চন্দন : হয়েছিল, বনে নি।

বিমান : কেন?

চন্দন : আরে বিয়ে করলেই বনে যাবে তার কোন মানে আছে? ছাড় না ওসব কথা। মোদ্দা কথা শ্বশুর কথা বাড়ি থেকে চলে এসেছিল। তবে এর মধ্যে অন্য কারুর সঙ্গে কোন ব্যাপার ট্যাপার হয়েছে কিনা কী করে জানব বল। হয়ে থাকলেও বিয়ে যে করেনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আস্তে আস্তে জানা যাবে।

বিমান : এক হিসাবে ভালোই হয়েছে, বলো।

চন্দন : ভাল তো হয়েইছে। তবে তুই কোন্ মানেতে ভালটা বলছিস সেটা আগে বল।

বিমান : আমরা দুজন পালিয়ে এসেছি, ওই খুন খারাপি আর ভাল লাগছে না বলে। আর ম্যাডামও পালিয়ে এসেছে ফালতু লোকের সঙ্গে ঘর করবে না বলে।

চন্দন : আরে বাবা, ভালো বলেছিস তো এটা।

বিমান : কিন্তু দাদা, এই রকম করে আর কতদিন চলবে? যা হোক একটা কাজ টাজ জোগাড় করতে হবে তো।

চন্দন : সে তো হবে। দেখি, তোর ম্যাডামকে বলে দেখি।

বিমান : সন্দেহ করবে না তো? হঠাৎ একটা উটকো লোককে নিয়ে তুমি এখানে চলে এলে। সে আবার থাকতে লাগল। চাকরি খুঁজছে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন .... যদি ওখানে খবর দিয়ে দেয়?

চন্দন : এত ভয় পাচ্ছিস কেন?

বিমান : যখন ওই সব কাজের মধ্যে ছিলাম তখন ভয় করত না। তখন তো জানতাম যে কোন সময়ে মরে যেতে পারি। কিন্তু এখন ....

চন্দন : এখন?

বিমান : জানি না। এখন যতবার মরার কথা মনে আসছে ততবার মনে হচ্ছে মরবনা, মরবই যদি তাহলে এমন করে বেঁচে গেলাম কেন?

চন্দন : পাগলা। কিচ্ছু হবে না। যা চানটা করে আয়। আজ দুপুরে একটা ভাল করে ঘুম দিতে হবে।

বিমান : যাই।

(বেরিয়ে যায়। চন্দন একটু অপেক্ষা করে, তারপর পকেট থেকে মোবাইল বার করে, বোতাম টেপে।)

চন্দন : আমি চন্দন। বিশাখার বাড়ি। স্কুলে গেছে। সব ঠিকঠাক। হ্যাঁ হ্যাঁ।

(মোবাইল নামিয়ে রেখে মুখ তুলে দেখে বিমান দরজায় দাঁড়িয়ে। মুখ কাগজের মত সাদা। হঠাৎ আর্তনাদ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়)

চন্দন : বিমান, বিমান। কী বল, বিমান?

(বিমানের আর্তনাদ শোন যাচ্ছে, বোঝা যায়, মঞ্চের আড়ালে চন্দন বিমানকে ধরতে চাইছে। একটু পরে তাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে চন্দন)

চন্দন : কী হয়েছে তোর? পাগলামি করছিস কেন?

বিমান : তুমি কাকে ফোন করছিলে?

চন্দন : বাড়িতে।

বিমান : বাড়িতে ফোন করে কী বলেছিলে? বলো, কী বলেছিলে?

চন্দন : কী আবার বলব? আমি যে বিশাখাদের বাড়িতে আছি সে কথা জানিয়ে দিলাম। নইলে ভাববে না?

বিমান : তুমি তো সব বলে দিয়েছ ! আমরা কোথায় আছি, বিশাখা ম্যাডামের নামটা পর্যন্ত।

চন্দন : হ্যাঁ, তাতে কী বল? তুই যে আমার সঙ্গে আছিস সে কথা তো বলিনি রে বাবা।

বিমান : তা বলো নি, তবু ওরা তো জেনে গেল তুমি কোথায় আছ! তোমার খোঁজ পেয়েছে যখন আমার খোঁজও পেয়ে যাবে।

চন্দন : আরে কেউ আমার খোঁজ করবে না। বউ ছাড়া আর কেউ জানে না বিশাখার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা তোকে নিয়ে যে আমি পালিয়ে এসেছি সে কথা জানবে কী করে? আরে জানা তো দূরের কথা, তোকে বিশাখার বাড়িতে নিয়ে এসেছি, পাগল ছাড়া কেউ ভাববে?

বিমান : যদি তোমার খোঁজে কেউ আসে? এসে আমাকে দেখে?

চন্দন : কেউ আসবে না। খবরটা পেয়ে গেল নিশ্চিন্ত। খামাখো আসতে যাবে কেন?

বিমান : যদি যদি যদি ..

চন্দন : যদি আসেও, তাতে কী? তোকে চেনে কে? আমার পার্টির কেউ তো চেনে না। আমরা তাড়া করেছিলাম অন্ধকারে গোটা কয়েক ছায়ার মত মানুষকে। খতম হয়ে যাবার পর তবে লাস গুলোর মুখ ভাল করে দেখেছি। তুই তো লাশ হয়ে যাসনি, তোকে ওরা চিনবে কেমন করে? বুঝতে পেরেছিস? মাথায় ঢুকেছে? টেনশনে পাগল হয়ে গেল ব্যাটা। যা, চান করে আয়। তারপর আমি যাব। খিদে পেয়েছে তো। *(বিমান যেতে গিয়ে ফিরে আসে, হঠাৎ জড়িয়ে ধরে চন্দনকে)* কী হল?

বিমান : ভয়টা কিছুতে সরাতে পারছি না গো।

চন্দন : বিশ্বাস কর বিমান, বিশ্বাস । নির্ভর কর আমার ওপর। নইলে বাঁচবি কী করে? *(বিমান আঁকড়ে ধরে চন্দনকে)* পাগলা।

(স্মিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে চন্দন। চন্দন বোকার মত হাসে। অন্ধকার)

৩

(ছাদ। চাঁদের আলো। বিশাখা একা গান গাইছে)

বিশাখা : তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে / সুপ্তরাতে। আমার ভাঙল যে ঘুম অন্ধকারে/ চরণপাতে। *(পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিমান। হঠাৎ বিশাখার চোখ পড়ে যায়। গান বন্ধ করে)।*

বিশাখা : কে? কে?

বিমান : আমি।

বিশাখা : ওঃ ! তুমি— ছাদে এই সময়—

বিমান : ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

বিশাখা : ভয়? না, ভয় কেন পাব?

বিমান : আপনার খুব সাহস, না?

বিশাখা : সাহসের কথা উঠছে কোত্থেকে? কী বল, সাহসের কথা এল কোথা থেকে?

বিমান : না এমনি। হঠাৎ করে অন্ধকারে আমায় দেখেও ভয় পেলেন না?

বিশাখা : কেন? তোমরা দুজন বাড়ির মধ্যে আছ, যে কেউ তো ছাদে উঠে আসতে পারে। ভয় পাব কেন?

বিমান : দুজন না, আমি একা। চন্দনদা তো বাড়িতে নেই, সকালবেলা বেরলো।

বিশাখা : বেরিয়েছে? কোথায় গেছে?

বিমান : জানি না। বলল আমার চাকরির ব্যাপারে কাকে যেন বলতে যাচ্ছে। ফিরতে রাত হবে। তুই কোথাও যাস না কিন্তু, বাড়িতেই থাকিস।

বিশাখা : সে আবার বলে যাবার কী আছে? তুমি তো কখনোই বাড়ি থেকে বেরোও না। কেন বল তো, বেরোও না কেন? *(বিমান একটু মাথা নিচু করে থাকে,*

তারপর অন্যদিকে চলে যায়) সব সময় এত ভয় পেলে চলে?

বিমান : ভয় মানে?

বিশাখা : ভয় মানে ভয়।

বিমান : আমি ভয় পেতে যাব কেন?

বিশাখা : কেন সে তুই নিজেই জানিস। *(তুই শুনে বিমান মুখ তুলে তাকায়)*

বিমান : কী, কী জানব আমি? *(বিশাখা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিমানের দিকে। বিমান স্পষ্টত অস্বস্তিতে পড়ে)* আসলে ঘুম আসছে না। মনে হল—

বিশাখা : কেন, ঘুম আসছে না কেন? দুপুরে খুব ঘুমিয়েছিস?

বিমান : না ঠিক তা নয়।

বিশাখা : তবে বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

বিমান : না, ও সব কিছু না। বিশাখাদি, যা হোক একটা চাকরি আমায় পেতেই হবে। তুমিও একটু দেখ না।

বিশাখা : মানে? তুই সিরিয়াস?

বিমান : নিশ্চয়। কাল তো বললাম তোমাকে। চন্দনদাও বলল। বিশ্বাস হল না তোমার? যা হোক একটা কাজ। করে দেবে?

বিশাখা : বিশ্বাস? বিশ্বাস করার কি কথা?

বিমান : মানে?

বিশাখা : সব কথার মানে হয় না। সত্যি সত্যি এত দূরে এসে এখানে থাকবি?

বিমান : হ্যাঁ, সত্যি।

বিশাখা : বাড়িঘর নেই তোর।

বিমান : না।

বিশাখা : তার মানে পালাতে চাইছিস।

বিমান : পালানো মানে?

বিশাখা : পালানো নয়? নিজের দেশ ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এতদূরে চাকরি নিয়ে চলে আসতে চাইছিস, একেই তো পালানো বলে।

বিমান : আমার ভাল লাগছে না।

বিশাখা : কী ভাল লাগছে না?

বিমান : এত জেরা করছ কেন বলো তো?

বিশাখা : বাঃ, এই বাজারে চাকরির ব্যবস্থা করে দেব, কার জন্যে এত করছি সেটা জেনে নেব না? চন্দনদাদের দলে ছিলে?

বিমান : চন্দনদার দল?

বিশাখা : কখনো নিজের হাতে খুন করেছিস?

বিমান : খুন?

বিশাখা : ন্যাকামি করিস না। খুন করিসনি কখনো?

বিমান : না, আমি— ও সব কিছু না।

বিশাখা : কিছুই না যদি ব্যাগে রিভলবার থাকে কেন?

বিমান : (যেন বজ্রপাত হল। বিমান ভয়ে কুঁকড়ে যোয়) তুমি দেখেছ?

বিশাখা : দেখেছি।

বিমান : তুমি আমাকে সন্দেহ করো, না?

বিশাখা : করব না? জানা নেই, শোনা নেই, চন্দনদার কী রকম একটা পাতানো ভাই, মনে কোন সন্দেহ না এলে তো মনে করতে হয় আমি একটা— কী হল, কোথায় যাচ্ছিস?

বিমান : আজকের রাত্তিরটা থাকি, কাল সকাল হলেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

বিশাখা : কোথায় যাবি?

বিমান : সে খোঁজে তোমার দরকার কী?

বিশাখা : চলে যাবি কেন?

বিমান : ন্যাকামি করছ নাকি? আমি খুনী এটা জেনেও তুমি আমাকে নিজের বাড়িতে থাকতে দেবে? দু বেলা খেতে দেবে? আমার জন্যে চাকরি খুঁজে দেবে? আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?

বিশাখা : দেব না কেন? কে খুনী নয় বল তো বিমান? তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানে সবাই, সবাই খুনী। সবাই সমান, সবাই এক রকম করে ভাবে, এক রকম করে বাঁচে, তবু কেউ তাদের মুখস্ত করিয়েছে তুমি লাল, তুমি নীল, তুমি সবুজ, তুমি হলুদ। আর সেটাকে বিশ্বাস করে সবাই সবাইকে খুন করে যাচ্ছে। খুন খুন খুন। আমি একদিন সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম, আর আজ তোকে আমি তাড়িয়ে দেব?

বিমান : তুমিও পালিয়ে এসেছিলে?

বিশাখা : ঠিক পালিয়ে নয়? আসলে আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে আমি শুধু ছড়ানো ছিটনো রক্ত দেখতে পেতাম। ডাক্তার বলল, কিছুদিনের জন্যে দূরে কোথাও চলে যেতে। আমি চলে এলাম। কিছুদিনের জন্যেই এসেছিলাম, কিন্তু এখন ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

বিমান : কিন্তু চন্দনদা যে বলল— মানে তোমার বরকে ছেড়ে চলে এসেছিলে?

বিশাখা : সেই তো ছিল খুনীদের পাণ্ডা। কতদিন রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরেছে, জামায় মাখামাখি হয়ে আছে রক্ত। রাত্তিরবেলা সেই রক্তমাখা জামাকাপড় কাচতে হত আমাকে। সে বলত, এত তাড়ার কি, কাল কেচো, আজ শুয়ে পড়ো। কিন্তু কী করব? বাথরুমে ওই জামাকাপড় রেখে দিয়ে বরের সঙ্গে শোয়া যায়? শুয়ে চোখ বুজলেই ওই রক্ত। জামা কাপড় থেকে আমার সারা গায়ে ছড়িয়ে

পড়ছে। আমার মুখে, হাতে, আমার নাকে টাটকা রক্তের গন্ধ! তারপর এমন হল, দিনের বেলাও হঠাৎ ওই রকম রক্ত দেখতে লাগলাম। হঠাৎ হঠাৎ। যাক গে। সে সব চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি।

বিমান : তোমার বর তোমার খোঁজ করেনি?

বিশাখা : করেছিল। এখানে অব্দি এসেছিল আমাকে নাড়াতে পারেনি। ওখানে আমি আর ফিরে যাব না।

বিমান : যদি এত ঘেন্না তোমার, তাহলে আমাকে আর চন্দনদাকে থাকতে দিলে কেন? আমরা তো খুনী। তোমার বরের মতই। কী হল, চুপ করে গেলে কেন, বলো!

বিশাখা : তোরা তো পালিয়ে এসেছিস, পালাতে চেয়েছিস। আমার মতই। তাই।

বিমান : কিন্তু—

বিশাখা : কিন্তু কী?

বিমান : তোমার সঙ্গে আমার ব্যাপারটা কি এক?

বিশাখা : কেন, এক নয় কেন?

বিমান : আমি হেরে গিয়ে বাঁচবার জন্যে পালিয়ে এসেছিলাম। তুমি তো তা নও। তোমার পেছনে তো মরবার ভয় ছিল না।

বিশাখা : ছিল না কে বলল তোকে?

বিমান : মানে?

বিশাখা : মরা কি আর এক রকমের হয় রে পাগলা? এই যে রোজ রোজ রক্ত কাচা, এও তো এক রকমের মরা? যদি বলি এই মরার থেকে পালাতে চেয়েছিলাম?

বিমান : তোমাকে একটা কথা বলব?

বিশাখা : বল ।

বিমান : আমি যদি এখন থেকে তোমার বাড়িতে থাকি? তোমার কাছে?

বিশাখা : হঠাৎ?

বিমান : বলতে ইচ্ছে হল। খুব বোকা বোকা কথা এইসব, না? তুমি একটা মেয়ে একা থাকো, দুম করে একটা ছেলে—

বিশাখা : সবই তো বুঝছিস, তবে এমন কথা বললি কেন?

বিমান : মনে হল। তোমার কাছে কাছে থাকতে খুব ইচ্ছে করছে। আমি বাজার করে আনব, সকাল বেলা তুমি ভাত রেঁধে দেবে, দুজনে মিলে এক সঙ্গে বসে খাব। তারপর ঘরে তালা দিয়ে দুজনে একসঙ্গে চাকরি করতে বেরবো। সারাদিন পরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে চা আর মুড়ি চানাচুর খেতে খেতে এই ছাদে বসে গল্প করব দুজনে।

বিশাখা : *(বিশাখা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে)* পাগলা। তুই থাকিস।

বিমান : জামাটা খুলে ফেলব দিদি?

বিশাখা : ওমা, কেন?

বিমান : ফ্ল্যাগ করে ওড়াব।

বিশাখা : লর্ডসে জিতে সৌরভ যেমন করে উড়িয়েছিল?

বিমান : একদম।

(একটা শিসের শব্দ সোনা যায়। মঞ্চে ঢোকে চন্দন আর দ্বিতীয়। পলকের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে)

বিশাখা : কে?

চন্দন : আমি।

১ম : আমরা।

বিশাখা : তুমি কি ব্যাপার?

(প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয়ের হাতে উঠে আসে উদ্যত রিভলবার। চন্দনের হাতেও রিভলবার উঠে এসেছে)

বিমান : মানে?

১ম : *(রিভলবার তাক করে)* মানে এইটা। কুত্তার বাচ্ছা, পালাবি ভেবেছিলি?

বিশাখা : (চন্দনকে) তাহলে তুমিই ওদের ছেলেটাকে মারবার জন্যে নিয়ে এসেছ?

চন্দন : যা ব্বাবা, তুমিই তো আমাকে বললে ভাই, বললে না?

বিমান : কী বলেছিল, দিদি?

চন্দন : দিদি? তোর দিদি কী বলেছিল শুনবি? ছেলেটাকে আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখছি, দিদি ভাই পাতাচ্ছি, এইবার তুমি ওদের নিয়ে এসে কাজটা শেষ করো।

বিমান : তুমি?

বিশাখা : না বিমান, বিশ্বাস কর, আমি—

বিমান : আমি কিছু বুঝতে পারছি না, এ সবের মানে কী?

চন্দন : আমি বললাম আমিও থাকব না বিশাখা, তুই এ বাড়িতে একা, যদি ছেলেটা তোকে কিছু করে পালায়? তুই বললি —

বিশাখা : এ সব কোন কথা হয়নি বিমান, কোন কথা হয়নি। ওরা মিথ্যা বলছে। আমি— আমি তোমাকে— *(বিমান একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিশাখার দিকে)* তুমি শোন, আমাকে বিশ্বাস করো, এ সব মিথ্যে—

বিমান : কেন বলবে মিথ্যে কথা? কেন বলবে? একটা কারণ দেখা কুত্তি!

বিশাখা : বিমান, আমি, আমি তোমাকে—

চন্দন : তুমি বিশ্বাস করেছিলে। দেখেছ তো, এই জমানায় বিশ্বাস করার ফল কী! ইস্। *(বিমান হঠাৎ লাফিয়ে গিয়ে বিশাখার গলা টিপে ধরে)*

বিমান : আমাকে আর একটু সময় দাও। আগে এটাকে মারি, তারপর তোমরা আমাকে মেরো।

চন্দন : হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। খুনটা আগে করে নাও। আমরা ওয়েট করছি। *(পকেট থেকে*

সিগারেট বার করে। ধরায়, বিমানের মুখে গুঁজে দেয় সেই জলন্ত সিগারেট)
নাও। মুখে রাখো। গলাটা টিপে ধরে থাকো, আর মুখের সিগারেটটা দিয়ে ওর মুখে একটু আলপনা এঁকে দাও। নাও।

বিশাখা : *(শেষ আর্তনাদের মত করে)* বিমান, আমি যদি ওদের দলের লোকই হব, তাহলে ওরা এইভাবে তোমার হাতে আমায় মরতে দেবে কেন?
(বিমান গলা থেকে হাত ছেড়ে দেয়)

বিমান : এ কথার কী জবাব দেবেন আপনি?

চন্দন : দ্যাটস টু। পুরোটা আমার প্ল্যান।

বিমান : কী প্ল্যান?

চন্দন : এই যে —
(এর পরের সংলাপ তিন হত্যাকারী একসঙ্গে বলতে থাকে)

তিনজন: গুলি করে খুন করা — পুরণো হয়ে গেছে, মজা নেই। কুপিয়ে জবাই করা— পুরণো হয়ে গেছে, মজা নেই।

চন্দন : নতুন নতুন খুনের উপায়। আমার মাথায় এইটা এসেছিল। শরীরটাকে খতম করার আগে যদি বিশ্বাস, যেটা আস্তে আস্তে মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, তাকে যদি খুন করে দেওয়া যায়। নির্ভরতা, যেটা মনের মধ্যে আস্তে আস্তে জন্ম নিয়েছিল, তাকে যদি খুন করে দেওয়া যায়। সেটা বেশ নতুন রকমের খেলা হয় না? খেলাটা অনেক দূর অবধি ঠিক ঠাক চলছিল, শেষটায় ঘেঁটে গেল। যাক গে, এর অন্য কোন কেসে ঠিক করে নেওয়া যাবে।
(ইশারা করে, বাকিরা রিভলবার তোলে)

বিমান : *(বিশাখাকে আড়াল করে দাঁড়ায়)* আমাকে মারো, কিন্তু দিদিকে মারছ কেন? দিদি কী করেছে?

চন্দন : শত্রুর রক্তমাখা জামাকাপড় কাচতে না চেয়ে যেদিন পালিয়ে এসেছিল, সেই দিনই ওর ডেথ সেনটেন্স হয়ে গিয়েছে। চল, আর বাড়িয়ে লাভ নেই, খেলাটা শেষ কর। *(তিনজনে যন্ত্রের মত একসঙ্গে রিভলবার তোলে)* ওয়ান–টু- থ্রি—
(সূত্রধার এগিয়ে এলে এরা নিশ্চল হয়ে যায়)

সূত্রধার: আমি সূত্রধার, বিবরণকারী। মহাভারতের সঞ্জয়ের মত। আমি শুধু এইটুকু চাইতে পারি, মঞ্চের সব আলো নির্বাপিত হয়ে যাক, সমাগত দর্শকরা সকলে বধির হয়ে যান, যাতে বিশ্বাস হননের এই মুহূর্ত আপনাদের স্পর্শ করতে না পারে।

(তিনজন রিভলবার তোলে। চন্দন বলে— ফায়ার। আলো নিভে যায়। নিস্তব্ধতার মধ্যে পর্দা নামে)

স্বখাত সলিলে

শর্মিলা মৈত্র

প্রথম দৃশ্য

মঞ্চের একেবারে পিছন দিয়ে আড়াআড়ি একটা লম্বা প্ল্যাটফর্ম চলে গেছে, যেন হাইওয়ের ধার। মাঝে মাঝে মাইলস্টোন পোঁতা। ঐরকম একটি পাথরে বসে মাছধরা জাল বুনছে একজন প্রৌঢ়, পরনে লুঙি, খালি গা, মাথায় একটা গামছা পাট করে রাখা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা । অন্য একটি পাথরে বসে এক যুবক, মুখে বিরক্তি, মাথার টুপি খুলে মাঝে মাঝে হাওয়া খাচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে বার বার। স্বাস্থ্যবান চেহারা কিন্তু মুখে নির্বুদ্ধিতার ছাপ প্রকট। প্ল্যাটফর্মের ওদিক থেকে, যেন নীচের নাবাল জমি থেকে এক প্রৌঢ় উঠে আসেন, বগলে ফোলিও ব্যাগ, ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, হাতে কিছু কাগজপত্র। তিনি অপেক্ষমান যুবকের বাবা।

বাবা : নাঃ, ওটাই, যদিও নম্বরগুলো একটাও মিলছে না- আমার মনে হচ্ছে চাঁদু, কেউ পাথরগুলো পালটে দিয়েছে।

চাঁদু : গত তিনদিন ধরে তুমি একই কথা বলে চলেছ বাবা। এখানে চক্কর মেরে কি লাভ? তারচেয়ে ঐ দালাল বেটাকে ধরি চল। কানের গোড়ায় সাটিয়ে একটা ঝাড়লে না বাপের বিয়ের ডিটেলস সুদ্ধু বলবে।

বাবা : মাথামোটার মত কেবল মারব ধরব করিস নি তো। আগে আমায় কনফার্ম হতে দে ওটাই আমার জমি কিনা-

চাঁদু : লেঃ লুল্লু। এখনও কনফার্ম হও নি? তিন দিন ধরে রোদে ঘুরে ঘুরে-

বাবা : কনফার্ম। কনফার্মই তো। বার বার তিনবার মিলিয়ে দেখেছি, শুধু নম্বরগুলো মিলছে না আর মাইনাস লাউমাচা সবটাই তো আমার।

চাঁদু : লাউফাউ তো এখানে চাদ্দিকেই চাষ হচ্ছে দেখছি। তোমারও যেমন- সস্তা করবে বলে সেই ইয়ের আমল থেকে কিনে ফেলে রেখে দিয়েছ- গ্যাপে কেউ লাগিয়ে দিয়েছে, সিম্পল।

বাবা : কিন্তু নম্বর লেখা পাথরগুলো ? ওগুলো কে পাল্টালো?

চাঁদু : আমাকে জিজ্ঞেস করে পাল্টালে বলতে পারতুম। বাবা এবারে কিন্তু মটকার মধ্যে ঘিলু ফিলু সব ফুটছে - বাড়ী চল।

বাবা : তোদের এত ধৈর্য্য কম না! এই তো এলুম- দাঁড়া না- আচ্ছা, ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করি- দাদা, এই যে- শুনছেন-

লোকটি : আমারে বলচেন?

বাবা : আশপাশে আর কাউকে তো দেখছি না, তাই আপনাকেই একটু বিরক্ত করছি। বলছিলাম ঐ যে জমিটা - লাউমাচা সমেত-

লোকটি : বাটুদার জমি, আমার লাউ।

বাবা : বাটুদা, সে আবার কে? দেখুন, ঐ জমিটা আমি কিনেছি- মানে কিনেছিলুম। এই কাগজপত্তর-

লোকটি : আমি পড়তি জানি তাই? ঐ পাতরের নম্বর নিকে নে যান আর আপিসে গে মিলিয়ে নেন, না মিললি সে ত্যাখন-

বাবা : না মিললে মানে? পাথর পাল্টেছে- আপনি বলছেন অফিসে রেকর্ডও পাল্টাতে পারে? সর্বনাশা।

লোকটি : পরিবর্ত্তনের যুগি কি পালটাবে আর কি থাকবে কে বলতি পারে? আজ এই আছে তো কাল সেই হয়ে যাচ্ছে- আমনি নালিশ ঠুকুন না গে-

বাবা : আরে, আমার জমিটা কেনা পড়ে ছিল বহুদিন, আপনি চাষ করেছেন, এতে নালিশের কি আছে? আইনতঃ ওটা আমার কেনা জমি তো তাই বলছিলুম।

লোকটি : আমারে আইন দেখাবেন না বাবু। যে আপিস থে কিনেছেন সেথা যান গে। রেজেস্ট্রারী আপিস, সরকারী দপ্তর, থানা, পুলুশ যেখেনে খুশী যান, যা খুশী করেন, আসল কতা হল নম্বর। সেটা মিললি তবে তো।

বাবা : বলছেন জমিতে পোঁতা পাথরের মত রেকর্ডেও নম্বর পালটে গেছে?

লোকটি : গরিবীর মুকি বড়নোকি কতা মানায় না। বাবু, আমাদের ঘরে বসে ইস্তিরি আর জমি কোনটাই আবাদা ফেলি রাখতি নি, চাষ করে থুইতি হয়। ঘরে ছেলেপেলে আর ক্ষেতি নাউ কুমড়ো না থাকলি পুরুষমানষের সোমসার মনে হয়? আপনার এই এট্টি না আরও -

চাঁদু : অ্যাই মশাই। তখন থেকে দেখছি প্রচুর বাতেলা দিচ্ছেন। এটা আমার বাবার কেনা জমি। মাস্তানি করে লাউ ফলিয়ে নম্বর পালটে ফেলুন আর যাই-ই করুন, এই যাচ্ছি থানায়, আমাদের জমি আমরা ঠিক বের করে নোব। চল বাবা-

লোকটি : আমিও তো তাই বলতিচি। আমনার বাপের সম্পত্তি আম্নিই তো বুঝে নেবেন। আমারে গরম দেখায়ে সময় নষ্ট না করি- আমি হলুম বাটুদার বসানো নোক। তেনার পারমিশান নেওয়া আছে আমার। চাইলে তার কাচেও যেতি পারেন। গুড়ির মাচির মতন কানের গোড়ায় ভ্যান ভেনিয়ে নাভ হবে নে খোকন-

চাঁদু : শালা! তোমার লাউফাউ উপড়ে ফেলে । **(লোকটিকে মারতে উদ্যত হয়। লোকটিও রণমূর্তি ধরে)**

লোকটি : লাশ ফেলি দুব। খবদ্দার বলতিচি- হাতকাটা হাবুর নাউ-এ একটুকু নিশ্বেস অব্দি যদি নেগেছে- জন্মশোধের জমি কেনা ঘুচোয়ে দোব এক্কেরে।

বাবা : আহা আহা আহা- হাবুবাবু- চাঁদু- কি হচ্ছে কি? (**হাতকাটা হাবুকে বসায়**) বেশ নাম তো আপনার- হাতকাটা হাবু! কিন্তু দুটো হাতই তো-

লোকটি : আমার হাত কাটবে তেমন বাপের বেটা আচে এদিগরে? আমার সংগে গোঁপ খেজুরি করলি তার হাত আমি কেটে নিই - তাই ঐ নাম। আমারে চেন খোকন? থাক, হাতকাটা হাবুর নাম শুনলি আবার লোকজনের কাপড়ে চোপড়ে হইয়ে যায়।

বাবা : চাঁদু- চাঁদু- কি হচ্ছে কি?

চাঁদু : সেই থেকে আলবাল বকে যাচ্ছে। আমার ওর হ্যাজানো শুনতে হবে নাকি চুপচাপ? এই জমিটা ওর বাবার নাকি?

লোকটি : এই জমি বত্তমানে যার, তিনি আমাদের সক্কলার বাপ। তোমার বাপেরো বাপ।

বাবা : দেখুন হাবু বাবু, ছেলে মানুষ, একটুতেই মাথা গরম করে ফেলে। আমি আপনি তো তা নই। আমরাও যদি ওর সংগে সঙ্গে -

লোকটি : ঢিলটি মারলি পাটকেল্টি খেতি হয় বাবু। সেই এস্তক আম্নাদিগকে বলছি এখেনে ডাঁড়িয়ে না থেকে যেখেনে গেলি কাজ হবে সেখেনে যান। কোন দালালে জমি বেচেছে আপনারে- রাজু না মোহন?

বাবা : (কাগজ দেখে) রাজীব- রাজীবলোচন নস্কর।

লোকটি : ঐ তো - রাজু। বাটুদারই লোক। ওকে গে ধরুন। আমনাদিগে বাটুদার কাচে নে যাবে, সেখেনে গে তেনার হাতে পায়ে ধরলি-

চাঁদু : মাজাকি নিজের গ্যাঁটের কড়ি দিয়ে কেনা জমি তোমার ঐ রাস্কেল বাটু না ফাটু তার পা ধরে ফেরত নিতে হবে? জোচ্চোর-ফ্রড- শালাকে জেলের লাপ্সি না খাইয়েছি তো আমার নাম -

লোকটি : হরি হে দীনবন্ধু - কিরিপাসিন্দু- এ ছোঁড়াটার ঘনায়ে এয়েচে গো- সুবুদ্ধি যখন মগজে সেঁধোয় না তখন বুঝতি হবে কেস গুরুচরণ।

বাবা : এ্যাই চাঁদু- চল-চল তো- তোকে এখানে আনাটাই উচিত হয়নি আমার।

লোকটি : বাড়ি নে যান। ওদে মাতা তেতে গেছে- সকাল বিকেল মেতি মৌরী ভেজানো জল খাওয়াবেন এট্টু এট্টু - উদ্ধুক হয়ে গেছে মনে হচ্চে - আপাতক মাতায় দু মগ জল ঢেলে দুগাল ভাত পেটে দ্যান গে। যে পূজোর যে মন্তর দাদা। পাঙ্গা দেকিয়ে বেহাত জমি ফেরত পেতি গেলি হাতকাটা হাবুর সংগে ময়দানে নাবতি হবে। ভদ্দরলোক আমনারা। অতখানি পাঁকে নামতি পারবেন? তার চে যা বললুম করেন। রাজুর ধরে বাটু পাইকের বাড়ি যান, ওখেনেই দফারফা করে আসুন গে। পরিবর্তনের যুগ দাদা, ঘরে ঘরে কেলাব, সরকার অব্দি চাঁদা বরাদ্দ করে রেখেছে। আমি আপনি তো নস্যি।

চাঁদু : বাঞ্চোত পলিটিক্সের গুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে গন্ধ ছড়াচ্চে চাদ্দিকে। তোর বস কে বলে দিস জমি আমি উদ্ধার করবই। দেশে ল এ্যান্ড অর্ডার নেই নাকি? যাব তোর ঐ বাটু না লাটুর কাছে। কিন্তু উইথ পুলিশ। হাতে গয়না পরালে শালা বুঝবে কার সংগে পাঙ্গা নিয়েছে।

লোকটি : বাবু, এত টোকা ছাওয়াল হাই পেশার আচে না কি?

বাবা : চাঁদু ! আমার আর ভাল লাগছে না-

লোকটি: বাড়ি নে যান- বাবু, চাষের নাউ এট্টা কেটে দিই ? নে যাবেন? আমার বাবা নিত্যি টিবি তেনে বলচে নাউ কা জুস খেলি সব্ব ব্যাধি ইয়ে হয় -

চাঁদু : **(রাগে উন্মাদ হয়ে যায়)** তোর নাউ এর ক্ষেতে ইয়ে করি- ডাক তোর বাটুবাবাকে! ডাক! হয়ে যাক! এমনি এমনি জিম করে গুলি ফোলাই নি রে- একখানা ঝাড়লে উড়ে গিয়ে পড়বি তোর ঐ লাউক্ষেতে। শালা মুন্ডু ছিঁড়ে খড় ভরে ঐ লাউক্ষেতে কাকতাড়ুয়া করে রেখে দোব!

বাবা চাঁদুকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকটি আবার নিরীহভাবে মাথায় গামছা দিয়ে পাথরের ওপর জাল বুনতে বসে।

লোকটি : সব পরিবত্তন কল্লি মা- মানষের স্বভাব পরিবত্তন কল্লি নি। গ্যাঁট্টাগোট্টায়তে মারবে, লিকপিকেতে মেশিন দেখিয়ে চমকাবে, ক্ষ্যামতা দুব্বলের কান ধরি ওটবোস করাবে- হাতকাটা হাবুর কপাল নেকন পালটাবে নে-সকলি তোমারি ইচ্ছে ইচ্ছেমই তারা তুমি/তোমার কম্ম তুমি কর মা/লোকে বলে করতিচি আমি-

অন্ধকার

দ্বিতীয় দৃশ্য

মধ্যবিত্ত পরিবারের বসার ঘর। চাঁদুর দাদা রঘু বসে ল্যাপটপে কাজ করছে। মা আসেন।

মা : ও রঘু, চা খাবি বাবা? নাকি তোর বাবা আর চাঁদু এলে একেবারে জল বসাব?

রঘু : ও মা, এখানে একটু বোস- বোস না-

মা : এখন বসব কি রে? রান্নাঘরে-

রঘু : পরে হবেখন। আগে বোসো । একটা দারুণ খবর আছে।

মা : মাইনে বেড়েছে তো? জানতুম। দাঁড়া, বড় ঠাকুরের মানতের টাকাটা তুলে রেখে আসি-

রঘু : উফ্, মা। গাঁইয়াপনা কোর না তো। ওসব বাতিক আবার কবে থেকে হল তোমার? মাইনে শুধু বাড়ে নি, প্রমোশন- একেবারে ডবল প্রমোশান হয়েছে। বিদেশে কতগুলো অ্যাপ্লিকেশান পাঠিয়েছিলাম- এই তার উত্তর এসেছে।

মা : বিদেশে? তুই-তুই এখান থেকে চলে যাবি রঘু?

রঘু : ও মা, মুখটা অমন কোর না মা। সেই কবে থেকে চেষ্টা করছি বল তো! দেখ না, কেমন কলেজের ছবিগুলো- কি দারুণ ক্যাম্পাস- এখানে পড়াব আর সংগে সংগে আমার নিজের রিসার্চের কাজটাও-

মা : এখানে মাইনেকড়ি তো ভালই পাচ্ছিলি। বাড়ী ছেড়ে অদ্দূরে একা একা-

রঘু : ও, তার মানে তুমিও খুশী নও। আচ্ছা মা, আমি কি এখনও ছোট আছি? আর আমেরিকা কি বিশ্বের বাইরে নাকি? যাব, কোর্স শেষ করে চাকরি করব, টাকাপয়সা কমিয়ে- (ওদের কথার মধ্যেই চাঁদু আর ওদের বাবা আসে।)

চাঁদু : কোথায় যাবি রে দাদা?

রঘু : আমেরিকা।

চাঁদু : আ-মে-রি-কা- মানে স্টেটস মানে - উলালালালালা- হেব্বি ব্যাপার! বরাবরের মত ? মানে অলবিদা ইন্ডিয়া?

রঘু : দূর পাগলা! তোরা আছিস না? ওখানে ভালভাবে সেটল করে তোদেরও-

চাঁদু : নিয়ে যাবি? সত্যি? তাহলে আমি ওখানে কিন্তু একটা জিম খুলব দাদা, বুঝলি। যোগাফোগার হেভি ডিমান্ড এখন ওখানে -

মা : **(বাবাকে)** তুমি কিছু বলবে না?

বাবা : আমি আবার এর মধ্যে কেন? দুই ভাইয়ে তো ঠিক করেই ফেলেছে সব। তোমার আহ্লাদের পেহ্লাদ ছেলে- তুমিই বল-

মা : ছেলে আমার একার হয়ে গেল এখন? সব ব্যাপারে মুখটা এমন করে রাখ না-

বাবা : রাখি। কারণ আমার মুখটাই অমন। কি করব? ছেলে বিদেশ যাচ্ছে- হ্যান্ডবিল ছেপে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিলোব?

মা : তোমাদের কড়া যেন তেতেই আছে সদা সব্বদা। একফোঁটা জল পড়ল কি অমনই ছ্যাঁক করে উঠবে-

বাবা : চা-ফা দেবে তো দাও নইলে আমি ঘরে যাই- (**উঠে দাঁড়ায়**)

চাঁদু : ও বাবা, বাবা , বোসো না। আমি চা করছি। মা, তুমিও বোসো।

মা : থাক। আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। আমি করছি- (**ভেতরে চলে যায়। বাবা খবরের কাগজ খুলে বসে**)

রঘু : কি কেস রে চাঁদু? মেজাজ খাট্টা মনে হচ্ছে বাবার?

চাঁদু : আরে, সেই যে রে, কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে জমিটা কিনেছিল না বাবা, সেই যে রে-

রঘু : জানি, জানি। কি হয়েছে বলবি তো?

চাঁদু : বেওয়ারিশ করে ফেলে রেখেছিল, মালটা জবরদখল হয়ে গেছে।

রঘু : কতবার বলেছি বাবা বাউন্ডারীটা দিয়ে নাও-

বাবা : জমি কিনতেই বলে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেছি- আবার বাউন্ডারী!

বসে জ্ঞান ঝেড়ে দেওয়া খুব সহজ বাবা, তোমায় আর এক্সপার্ট কমেন্ট করতে হবে না, তুমি তোমার আমেরিকায় মন দাও।

চাঁদু : বাবা, ও বাবা, চায়ের গন্ধ পাচ্ছ? চা আসছে। ততক্ষণ কাগজ পড়ো না। দাদা, ছিল রে, চারকোণে চারটে নম্বর লেখা পাথর ছিল, বেমালুম পালটে অন্য নম্বর লেখা পাথর লাগিয়ে রেখেছে। আর জমি জুড়ে শুধু লাউ আর লাউ-

রঘু : লাউ তো ভাল রে। ভাগ্যে ক্লাবঘর বানিয়ে চাট্টি ছোঁড়া বসিয়ে রেখে দেয় নি। আজকাল আবার ক্লাবের মাস মাইনে হয়েছে। ওঠাতে জীবন বেরিয়ে যাবে। আগেই বলেছিলাম ওসব বাড়িফাড়ির ঝামেলায় না যেতে। আমি তো চলেই যাচ্ছি, তোকেও ওখানে বন্দোবস্ত করে দোব- আর মা বাবা-

বাবা : সারাজীবন ভাড়াবাড়িতে পচে শেষ বয়েসে সরকারী হাসপাতালের বারান্দায় চোখ ওল্টাবে , তাই তো?

রঘু : আমি তাই বললাম? পুরোটা বলতেও তো দিলে না।

বাবা : নিজে গাছে উঠছ, তাই ওঠো। পরে এক কাঁদির কথা ভেবো। আমাদের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

রঘু : ছেলেমেয়ের উন্নতিতে বাবা মা খুশী হয় জানতাম। তোমাদের সবই উল্টো। জমি তো তুমি তোমার ইচ্ছেমতই কিনেছ। সামলাতে পারছ না তার ঝালটা আমার ওপর ঝাড়ছ কেন? (**মা চা নিয়ে আসে**)

মা : ও কি রঘু! বাবার সংগে ওরকম করে কথা বলে কেউ? একটা নিজের বাড়ির স্বপন তোর বাবার কতদিন থেকে! কত কষ্ট করে টাকাপয়সা জমিয়ে ঐ জমিটুকু কিনেছিল রিটায়ারমেন্টের টাকায় আস্তে অস্তে ছোট্ট একটা বাড়ি করবে বলে।

রঘু : আস্তে আস্তে ? এত স্লো মোশানে স্বপ্ন দেখলে সে কি আর ধরা যায়!

বাবা : তুমি তোমার স্বপ্ন নিয়ে জেট প্লেনের মত উড়ে যাও না বাবা। আমার স্বপ্ন নিয়ে তোমাদের কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

মা : রঘু, বাবার এই বিপদের সময় ছেলেরা পাশে না থাকলে-

রঘু : বিপদটা কে ডেকে এনেছে? আমি? দেখ মা, ওসব সেন্টুফেন্টু দিয়ে লাভ নেই, এই মুহুর্তে আমার কাছে কেরিয়ারের থেকে ইম্পর্টান্ট কিছুই না। এখন ঐসব জমিফমির ব্যাপারে ইনভলভড হলে থানা পুলিশ কোর্ট কাছারী- সব প্ল্যান প্রোগ্রামের বারোটা বেজে যাবে মা! ভিসাফিসা আটকে ফাটকে-প্লিজ মা, তোমরা যা ভাল বোঝ কর, আমায় এর মধ্যে টেনো না।

বাবা : ওয়ান্ডারফুল এই না হলে প্রথম সন্তান! ইস্কুলের বাইরে ঠা ঠা রোদে বোতলে মুসম্বির রস ভরে দাঁড়িয়ে থাকতে না? মোজা থেকে জাঙিয়া অবধি মুখের কাছে ধরে দিতে না? বগলে টালা থেকে টালিগঞ্জ টিউশন পড়াতে নিয়ে

ছুটতে না?

রঘু : ওগুলো করত বলেই তো বিদেশের স্বপ্নটা দেখতে পারছি বাবা। তুমি আমার ইস্কুলের মাইনে দিতে কি আমায় দারোয়ান বা সিকিউরিটি গার্ড বানাবার জন্যে?

বাবা : রঘু!!

চাঁদু : বাবা, ও বাবা, চুপ করো না , দাদাকে ওরকম করে বলছ কেন? কোথায় কোথায় যেতে হবে তুমি আমায় বল না , আমি যাব তোমার সঙ্গে। দাদা এসব পারে না, জানোই তো।

বাবা : তুমি তো আবার মাথার চেয়ে শরীরের ব্যায়াম বেশী কর। তোমায় ল্যাজে বেঁধে নিয়ে গিয়ে মরি আর কি।

মা : তোমরা সবাই এবারে থামো। রঘু, চা খেয়ে জামা কাপড় ছাড় গে। একটু পরে খেতে দিচ্ছি। তোমাকেও বলি, দয়া করে আর অশান্তি বাড়িও না। যেখানে যাবে চাঁদুকেই নিয়ে যাও। ও চুপ চাপ থাকবেখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে।

চাঁদু : সিকিউরিটি গার্ডের মত, কেমন বাবা?

বাবা : **(হেসে খেলে)** বেশ তুইই যাস। কিন্তু একদম মাথা গরম নয়, কাকুতিমিনতি করে কাজ হাসিল করতে হবে। আমরা মিডল ক্লাস মানুষ, ওসব কাপ্তেনি বদমাইশি আমাদের কম্ম নয়।

চাঁদু : তাহলে পয়লা কোথায় যাবে বল? পুলিশে?

বাবা : নাঃ। আগে যাব জমি দখল করে যে বসে আছে তার কাছে- বাটু পাইক।

চাঁদু : আই ব্বাস! হারামজাদা বাটু পাইক! জমি যদি না ফেরত দিস তো বাড়ির সামনে ধর্ণামঞ্চ করব- আমরণ হাঙ্গার স্ট্রাইক।

অন্ধকার

তৃতীয় দৃশ্য

বাটু পাইকের বাড়ি। চাঁদুর বাবা দুপাশে রাজু দালাল আর চাঁদুকে নিয়ে বসে আছেন। দুজনেই অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা ঘাড়ের কাছে বসা একটা মশা চাপড় মেরে মারতে ওরা ধড়ফড় করে জেগে ওঠে।

চাঁদু : এসছে? কই?

বাবা : না রে বাবা, আসেনি। কিন্তু ভদ্দরলোকের বাড়ী এসে কেউ এভাবে ঘুমোয়? হুট করে কেউ এসে পড়লে কি ভাববে? (**নেপথ্যে পূজার ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়**)

রাজু : (হাই তোলে) ক'ঘন্টা হোল কাকা?

বাবা : তুমি খামোখা সাত তাড়াতাড়ি নিয়ে এলে। পাক্কা সওয়া দু ঘন্টা হতে যায়।

রাজু : তাও বলব অ্যাডভান্টেজে আছেন। আগে এলেন বলেই তো এক নম্বরে নাম।

বাবা : এটা কি দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার নাকি? আর কিসের এক নম্বর হে রাজু? দু নম্বর তো কাউকে দেখছি না।

চাঁদু : যান না রাজু দা, ভেতরে গিয়ে স্পীড মারুন না একটু।

রাজু : পাকড়াশীবাবুর মত করবেন না দাদা। (**পাকড়াশীকে ভেঙায়**) একটু ফাস্ট। রাজু একটু ফার্স্ট। আমার আরও তিনটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে- আরে মড়া, অ্যাক্সিলেটার কি আমার হাতে নাকি? তাপ্পর সেদিন আবার ছিল শনিবার। ওদিন বাটুদার একঘন্টা বেশী লাগে পূজো কত্তে। আর শুনুন, পাকড়াশীর মত ভড়কে থাকবেন না, রিল্যাক্স- রিল্যাক্স করে একদম। বাটুদা এন্ট্রি নিলেই পাঙ্গা নিতে যাবেন না- তাহলে কিন্তু কেস শুধু জন্ডিস না একেবারে এনকেফেলাইটিস।

চাঁদু : মানে?

রাজু : বুল্লেন না? সিম্পিল। জন্ডিসে তবু বাঁচার চান্স থাকে, এনকেফেলাইটিসে একেবারে সোজা ওপরে।

বাবা : আমরা শিক্ষিত মিডল ক্লাস মানুষ রাজুভাই, ওসব আমরা পারি না। যুক্তি, বুদ্ধি, সততা এসব নিয়েই লড়তে হয় আমাদের।

রাজু : দিল রে- দুদে ছিড়িক করে চোনা মেরে দিল রে! সিক্ষা মারাতে যাবেন না খবদ্দার। আর লড়ালড়ির কতা মুখে আনবেন না। ওর নাম বাটু পাইক, ওর বাপের ক'টা ভেড়ি ছিল এ সাইডে জানেন?

চাঁদু : সেগুলো বুজিয়ে জমি বানিয়ে আমাদের মত মাথামোটাদের বেচছে আর সেই জলের দরে বেচা জমি জবরদখল করে আবার আমাদের ফাঁদে ফেলে এক্সট্রা কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। ইচ্ছেমত পাথর পাল্টাচ্ছে, রেকর্ড পাল্টাচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন সব কিনে রেখেছে। মগের মুল্লুক বানিয়ে রেখেছে দেশটাকে। লাউ ফলাচ্ছে- শালা ঐ লাউ-এর চারা একদিন ওর পেছনে গজাবে এই বলে দিলুম! জোচ্চোর! খচ্চর! চোর!!!

রাজ : ওরে বাবা- ওরে বাবা- নাইন্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন এফ এম রেডিও- আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি- টিং টং- ইস্টপ!! কি কচ্চ ছোট ভাই- বাটুদার কানে গেলে- শালা রেডিওর মত আলবাল ছেপে যাচ্ছ সেই থেকে - নীচু গলায় বলছি- পুকুর না বুজোলে জমি আসবে কোত্থেকে শুনি? জমি কেটে পুকুর খুঁড়লে কেউ কিচ্ছুটি বলে না উল্টোটায় যত আপত্য?

চাঁদু : নেহাত বাবাকে প্রমিস করে বেরিয়েছি তাই-নইলে-

রাজু : (ভয়ে ভয়ে) নইলে?

চাঁদু : তোমার ঐ থোবড়খানা এক ঘুষিতে বার্স্ট করে তোমার হাতে গুনে গুনে বত্তিরিশখানা দাঁত ধরিয়ে দিতুম।

রাজু : পারতে না ছোটভাই। মানে, আটাশখানা পেতে। দুখানা আক্কেল আর দুখানা গুটকা খেয়ে ওপড়াতে হয়েছে। কাকা, ও কাকা, তোমার নসীবে বহোত দুঃখ আছে। এই ভাইটি, চল না, বাইরে থেকে খেয়ে আসি- আরে , ধোঁয়া-ধোঁয়া- এখানটা কাকা একাই ম্যানেজ করে নেবে।

চাঁদু : আমি স্মোক করি না। আজকের ঝামেলাটা মিটুক, তারপরে তোমায় আমি দেখছি। জমির দালালী? অ্যাঁ? আমার বাবাকেই পেয়েছিলে মুরগী করার জন্য?

রাজু : মোক করো না সে ঠিকাছে। আমিও কি চেন মোকার নাকি? সব জায়গায় লেখা থাকে দেখেছি মোকিং ইজ ইঞ্জিনিয়ার টু হেলপ। কাকা, এটা কিন্তু বহুত খারাপ হল। আমি বলে কত ফিটিং ফাটাং করে বাটুদার কাচে তোমায় আনলুম সেটেলমেন্টের জন্যে আর তুমি এই ডাব্লু ডাব্লু এফটাকে আমার পেচুনে লেলিয়ে দিলে? জমি কি আমি তোমায় বাড়ি বয়ে বেচতে গেসলুম নাকি? আমি রাজীবকুমার নস্কর বোকার- লোকাল টেনের হকার না।

চাঁদু : শালা ঘাপলার জমি বেচে আবার সেটেলমেন্ট! নেহাত বাবাকে প্রমিস করেছি তাই- নইলে-

রাজু : (ভয়ে ভয়ে) নইলে?

চাঁদ : কানের গোড়ায় একখানা ঝাড়তাম এমন- সাতদিন কানে হিমেশ রেশমিয়া বাজত- একবার আজা আজা আজা-

বাবা : চাঁদু! একদম মুখ বন্ধ। এইজন্য তোকে আনতে চাইনি। তোর মা এমন কতগুলো ঝামেলা পাকায় না!

চাঁদু : ঠিক আছে, ঠিক আছে। মুখে বলেছি তো শুধু। কিছু করেছি নাকি?

বাবা : তোমাকে আমার কোন বিশ্বাস নেই। করতে কতক্ষণ?

রাজু : ছেড়ে দিন কাকা। বাচ্চা মানুষ, চেহারাটা একটু হাফ পাউন্ড হলে কি হবে, বয়েসে- আরে এ বয়সে একটু আধটু জোশ ফোশ-

(নেপথ্যে গান শোনা যায়- দোষ কারো নয় গো মা/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা/হাতে হুইস্কির গ্লাস, লালচেলির জোড় পরা বাটু আসে।)

বাটু : জয়ত্তারা ! জয় মা বগলা!! সকাল সকাল কি ব্যাপার রাজীব- এরা কারা? কি চাই?

রাজু : ঐ যে গো বাটুদা, বাঘের ভেড়ির এগারোশো পঞ্চান্ন নম্বর পলট-লাউমাচা-হাতকাটা হাবু-

বাটু : আ-চ্ছা- বুঝেছি, মানে মনে পড়েছে। বেশ, বেশ বসুন। হাঁ করুন- **(রাজু আগেভাগে হাঁ করে, বাটু ওকে উপেক্ষা করে বাবার কাছে যায়)**

বাটু : হাঁ করব? মানে?

বাটু : বগলা মা'র চন্নামেত্তর। হাঁ করুন-ঢেলে ঢেলে দিই-

বাবা : **(ঝাঁজে কাশতে থাকে)** এটা কি রে বাবা? গলা মলা জ্বলে গেল যে-

বাটু : কারণ-কারণ-বেটির আমার মুখে আর কিছু রোচে না যে। দেখি খোকা- হাঁ- **(চাঁদু মুখ টিপে নেতিবাচক মাথা নাড়ে)** না কি রে? মায়ের পেসাদী কারণ। দিশী

কিন্তু ভালো হুইস্কি । মা'কে যাতা জিনিস দেওয়া যায়, বলুন? দেখি- হাঁ - **(চাঁদুর অনিচ্ছুক হাঁ - এ ঢেলে দেয়, সে মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গেলে না)**

বাবা : বাটুবাবু বলছিলুম ঐ জমিটা - ওটা আমি কিনেছিলুম। এই - এই রাজুই বেচেছিল আমায়। বল না রাজু- তুমি তো সবটা জানো।

রাজু : **(হুইস্কি না পাওয়ার বিরক্ত)** তাড়াহুড়ো কত্তে মানা করেছিলুম কিন্তু। দাদাকে বসতে দিন আগে। বাটুদা, কিচ্ছু না, ছোট্ট একটু ডিস্পিউট। ঐ জমিটায় আপনার শিলমোহর পড়ে গেছে কিনা- তা কি ডিসপ্যুট সেটেলমেন্ট চার্জ লাগবে সেটা ঠিক করে ওটা ছেড়ে দিতে হবে। মানে দিতেই হবে দাদা, আমি বড় মুখ করে কাকাকে নিয়ে এসেছি।

(চাঁদু তীরবেগে মুখের মদ ফেলে আসে)

চাঁদু : বজ্জাত! ডিসপ্যুট ক্রিয়েট করে তার আবার চার্জ? মগের মুল্লুক পেয়েছিস নাকি?

বাটু : বরফ!

রাজু : বরপ?

বাটু : তলানিটা গলায় ঢেলে নতুন করে বরফ দিয়ে আন। পেসাদী বোতল থেকে আনবি । **(রাজু মহানন্দে তাই করে)** এটি কে? পুত্র?

বাবা : আজ্ঞে। ছোট ছেলে। ছেলেমানুষ, ওর কথা ধরবেন না। শুনুন বাটুবাবু, আমি ছাপোষা গেরস্ত মানুষ অনেক কষ্ট করে ঐ জমিটুকু কিনেছিলুম। আপনার তো জমির শেষ নেই, দয়া করে ওটুকু যদি ছেড়ে দেন-

বাটু : কি করা হয় খোকন? ব্যাপক বাইসেপ দেখছি-

বাবা : ও একটা জিমে ব্যায়াম শেখায়। যাক গে, যা বলছিলাম, জমিটা- অনেক কষ্ট করে কেনা তো, এইসবে ভাবছিলুম রিটায়ারমেন্টের পর একটা ছোট বাড়িটাড়ি-

বাটু : **(চাঁদুর গা টিপে টিপে দেখতে থাকে)** হেব্বি! তবে কি জান খোকন, এখন এসব দিয়ে কিছু হয় না। এখন হচ্ছে মেসিনের জমানা, শালা কাউয়ার মত স্বাস্থ্য নিয়েও চমকে দেবে তোমাকে! কি দাদা, ঠিক কিনা?

বাবা : অ্যাঁ? হ্যাঁ- ঠিকই তো। আমার জমিটা কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন কাঠা। ওটুকু ছাড়লে আপনার - মানে সাগরে এক ঘটি জল কম বেশী আর কি।

বাটু : আমারও খুব নেশা ছিল কম বয়সে বুল্লেন- বডি বানানোর । হল না। মাল ফাল ধরে নিলুন। এখন অবিশ্যি ছেড়ে দিইছি। বৌ ঘাড়ে ধরে মায়ের পায়ে ফেলে কসম খাইয়ে নিয়েছে। (**রাজু গেলস ভরে নিয়ে আসে**) আজকাল সক্কাল সক্কাল একটা বোতল পেসাদী করে নিই, সারাদিন ঐ চলে।

রাজ : সেটেল হল বাটুদা?

বাটু : দেখেছ, ভুলেই গিছি। আসলে এই খোকনের বডিখানা দেখে না- মুঝে বচপন ইয়াদ আ গয়া। রাজু মনে আছে তোর, আমার সেই বডি খানা?

রাজু : বডি? মনে আছে মানে-

বাটু : সত্যি, আমিও যেমন। তুই কোথায় তখন! মায়ের গভভো থেকে বেরিয়েছিলি? না বোধহয়। তোর বাপকাকা জানবে। কত খেটেছিলুম রে সেই বডিকে পিছে! আঃ!

রাজু : তাপ্পর? বডি ছেড়ে দিলে?

বাটু : হ্যাঁঃ.... ভীমকে দেখে। আমার পাটনার ভীমকে দেখেছিলিস না? কি বডি! ছোট্ট এইটুকুন ছোলাভাজার সাইজের দানা ভরে ভেড়ির জলেতে ফেলে গেসল। তিনদিন পর এই এমনি উল্টোবাগে ভেসে উঠল। জিন্দিগিটা বহত উদাস হয়ে গেল রে রাজু। বডি ফডি সব বেকারকা চীজ- **(ঝট করে পিস্তল বের করে চাঁদুর মাথায় ঠেকায়)**

বাবা : এই-এই-কি করছেন-

বাটু : দেখলি তো? ওঃ , কি জিনিস মাইরি! শুদু দেখেই কাপড়ে হয়ে গেল?

রাজু : তুমি মাইরি হেভি ইয়ে আছ বাটুদা। কখন যে কি কর!

বাটু : (**গর্বের হাসি হেসে**) টপে থাকতে হলে সাস্পেন্স দিতে হবে তোকে বাবা। এক সীন দেখতে দেখতে পাবলিক যাতে হারগিজ বুঝতে না পারে পরের সীনে কি হবে। মানে, পাবলিককে হর ওয়াক্ত ঝটকায় রাখতে হবে।

বাবা : এই রাজু, একটু বল না ওঁকে-

বাটু : **(নিজের কথায় মগ্ন)** আর তোকে একদম ছুপা রুস্তম হয়ে থাকতে হবে, শালা বাঁ হাত পাছা চুল্কোলে ডান হাত যেন জানতে না পারে । কিন্তু আবার পাবলিক ঢেকুর তুললে তোকে বুঝে নিতে হবে দুকুরে মালটা কি দিয়ে ভাত খেইছিল।

বাবা : বাটুবাবু, আমরা কাজের কথাগুলো সেরে বরং-

বাটু : সেই তখন থেকে কাজের কথা কাজের কথা করে আপনি মদনামি করে যাচ্ছেন আর আমি ঝেলছি। কি কাজ? কাজের কি কথা? যা জমির দাম তার ফিফটি পার্সেন্ট রাজুর হাতে জমা দিবেন ব্যস। নেড়িকুত্তাগুনোও আপনার জমি আর মুততে যাবে না, হল?

বাবা : ফিফটি পার্সেন্ট?

বাটু : হ্যাঁ, কারেন্ট রেটের ফিফটি পার্সেন্ট।

বাবা : কারে .... মানে আমার জমি আবার আমাকেই কিনতে হবে? এ কোন যুগে বাস করছি আমরা?

রাজু : কাকা, ও কাকা .... এট্টু সাইড কেটে আসুন— **(একপাশে টেনে আনে)** এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে আনলুম, কেঁচিয়ে দেবেন না মাইরি। কপাল ভাল যে ফিফটি পার্সেন্ট বলেছে।

বাবা : আমি পুলিশে যাব— কোর্টে যাব। মগের মুল্লুক নাকি! দরকার পড়লে মিনিস্ট্রি অবধি— একটা অশিক্ষিত গুন্ডা! শুধু ইয়ের জোরে-

রাজু : আরে কাকা পুলিশের বড়কত্তা যেদিন বগলা মা'কে পেন্নাম ঠুকতে আসে সেদিন পেসাদে ডবল বোতল চড়ে। কোতায় যাবেন?

বাবা : **(অন্ধ রাগে)** তোমরা নিজেদের কি ভাব কি? যা ইচ্ছে তাই করবে? দুটো কাঁচা পয়সা হাতে আছে আর ক্ষমতার পদলেহন করে মানুষকে মানুষ বলে ভাব! কেন? লেখাপড়া করে কি মহাপাপ করেছি নাকি?

রাজু : আম্নারা মানে এই চাকুরে কেলাস না কতায় কতায় না বড্ড সিক্ষা মারান। কি সব পহলে ডন ফন বলছেন- ঠিক আচে, আর একবার আমি কতা বলে দেখছি। আমনারা আসুন গিয়ে এখন। নয়তো -

চাঁদু : নয়তো? নয়তো কি?

বাটু : এই তো! পাখী হরেকেষ্ট বলেছে! বোবা নয় তাহলে। শোনও হে চাঁদু, আমার নাম বাটু পাইক।

বাপের দাঁড়ে বসে কপচাচ্ছো, ঠিকাছে আমার খাঁচায় ঢুকে বেশী কপচালে না - **(বন্দুক দেখায়)** মটকায় ছ' ছ'টা ছোলাভাজা ভরে দোব। **(চটি ফটফটিয়ে চলে যায়)**

রাজু : আম্নাদের মতন এই মিডিল কেলাসগুলো না লাফড়া ছাড়া থাকতে পারে না। দিলেন তো ফালতু পাঙ্গা নিয়ে বাটুদার মটকা গরম করে? এই মালটার জন্যে! **(চাঁদুকে দেখায়)** কোঁতা একখানা বডি নিয়ে- আচ্ছা কাকা, আমনাকে পই পই করে বলে দিলুম বেস কাঁদো কাঁদো মুখে একা আসবেন। সেই একখানা হাফ পাউন্ড ছেলে ন্যাজে বেঁধে এলেন। তখনই জানি বাটুদার মটকায় আগ

লেগে যাবে-

চাঁদু : **(রাজুর কলার ধরে)** তখন থেকে আমার বাবাকে ফালতু অপমান করে যাচ্ছিস। নেহাত মা'র কাছে প্রমিস করে এসছি তাই। নইলে-

রাজু : **(ভয় পায়)** নইলে?

চাঁদু : পাতলা করে তোর পাছার নুন ছাল চেঁছে টাটার আয়োডাইজড সল্ট মাখিয়ে রোদে উপুড় করে শুইয়ে রাখতুম। **(অন্ধকার)**

চতুর্থ দৃশ্য

বড়দার চায়ের দোকান। সামনে লেখা আছে 'এখানে লেবু চা ও দুধ চা পাওয়া যায়।' রঘু আর তার বান্ধবী নীনা বসে আছে। রঘুর অফিসের পোষাক সামান্য বিদ্ধস্ত, মুখ গম্ভীর। নীনা আধুনিকা তরুণী। বড়দা আধ ময়লা পোষাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গলায় কণ্ঠী নিয়ে মন দিয়ে চা করছে। বড়দা লোকটি আমাদের চোখের সামনে তার মেলে ধরা চেহারার থেকে অনেক বেশী সুপুরুষ।

নীনা : কিছু বলবে তো , না কি? তখন থেকে মুখ গোঁজ করে বসে আছ। বিদেশ যাচ্ছ, কোথায় পার্টি ফার্টি দেবে, তা না - যেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে যাচ্ছ। এত মন খারাপ হলে যেও না।

রঘু : আমি বলেছি আমার মন খারাপ লাগছে?

নীনা : কিছুই তো বলছ না। এত উৎসাহ করে সব ব্যবস্থা করলে আর সবকিছু ফাইনাল হতেই রামগরুড়ের ছানার মত মুখ করে বসে আছ। আশ্চর্য!!

রঘু : আচ্ছা, নীনা, আমি কি আমার একার জন্যে যাচ্ছি বলে তোমার মনে হচ্ছে?

নীনা : মানে?

রঘু : মানে বলছি যে যদি একটা দুর্দান্ত কেরিয়ারই না হয় তাহলে এত কষ্ট করে লেখাপড়া করে কি লাভ বল? ভাল রোজগার, ভাল লাইফস্টাইল এগুলোর জন্যই তো-

নীনা : লেখাপড়া আর রোজগার - এ দুটোর সম্পর্ক আমার কাছে অনেকটা ম্যাট্রিমোনিয়াল দেখে বিয়ে দেবার মত। মূলমন্ত্র হল - শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

রঘু : আমার বাবার মত তোমারো কথার জিলিপি ভাজার অভ্যেস আছে দেখছি। আমি ভাই অত ঘোরপ্যাঁচ বুঝি না। আমি ঐ সব বাড়ির উদ্ভট খেয়ালে হাওয়া দিয়ে আমার কেরিয়ারের বারোটা বাজাতে রাজী নই।

নীনা : বাড়ি জমি? ও , মেসোমশাইয়ের সেই সাড়ে তিন কাঠা? সেটা নিয়ে লেগেছে বুঝি? তা করুন না উনি বাড়ি। তোমারি বা তাতে এত আপত্তি কিসের?

রঘু : আপত্তি কেন হবে? আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না, ব্যাস। আমি চলে গেলে তিনটি তো প্রাণী পড়ে থাকবে। ক'টা বছর একটু কষ্ট করে কাটিয়ে

দিলেই তো-

নীনা : তুমি আটঘোড়ার রথে সবাইকে তুলে নিয়ে সাত মহলা প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুলবে, তাই তো? পুরো হাততালিটা । একাই নিতে চাও। কিন্তু বন্ধু, কাকু যে তোমার আগে স্টেজে নেমেছে, বেস্ট অ্যাক্টরের সোনার মেডেলটা সেই বা ছাড়বে কেন?

রঘু : আমার কারো সঙ্গে কোন কম্পিটিশান নেই। ঝুটঝামেলা আমার ভালো লাগে না তাই-

নীনা : তোমার কাছে যেটা ঝামেলা কাকুর কাছে সেই স্বপ্ন রঘু। সবার নিজস্ব স্বপ্ন আছে- তোমার স্বপ্ন সার্থক করতে গিয়ে অন্যেরটা তুচ্ছ করে দেখা কি ঠিক?

রঘু : জিলিপি ভেজো না- সোজাসাপ্টা বল না, তুমি বলতে চাইছ আমি স্বার্থপর। বাবা তাঁর সারাজীবনের ঘাম রক্ত ঝড়ানো পয়সাগুলো আমার, চাঁদুর আর ঐ জমিটার পেছনে ঢেলেছে। আমি তো তারই কিছুটা শোধ করতে চাইছি নীনা।

নীনা : তাহলে ডিসপিউট কিসের? তুমি কেরিয়ার তৈরী করো আর কাকু তাঁর স্বপ্নের বাড়ী।

রঘু : এ্যাই- এ্যাই এইখানে ফুলস্টপ ! ডিসপিউট! আসল কথাটা বলে ফেলেছ এবার। বাড়ী তো দূর ঐ জমিতে একটি আধলাও আমরা গাঁথতে পারব না ম্যাডাম।

নীনা : কেন? পেপার্সে গন্ডগোল আছে নাকি? কাকু কেনবার সময় দেখে নেয় নি?

রঘু : এখন বাহুবলের জমানা— ওসব পেপারফেপার যতই থাক, একবার ঝান্ডা গেড়ে দিলে ওটাতে তোমার ইয়ে ফেটে দরোজা হয়ে যাবে।

নীনা : ঝান্ডা ? পলিটিক্যালি ক্যাপচারট হয়েছে? কোন পার্টি?

রঘু : লাউপার্টি। নম্বর লেখা পাথর ফাথর সব পালটে দিয়ে নিজেদের পাথর গেঁড়ে দিয়েছে আর জমি জুড়ে ইয়া কেঁদো কেঁদো লাউ ফলিয়ে রেখেছে।

নীনা : ও গড! লাউ হোক কিন্তু আসলে কালারটা কি ধরতে পারলে?

রঘু : রামধনুর সাতরঙ! যখন যেটা লাগবে মেখে নেবে। আজকাল আবার পাকা রঙ থাকে না কি কারো?

নীনা : লীগ্যালি যেতে হবে তাহলে-

রঘু : যাও। কেস করো গিয়ে। তুমি হলে গিয়ে রুচি সম্পন্ন, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালী- লড়ো গিয়ে গুন্ডাদের সঙ্গে কোর্টে যাও, মামলা করো- যা খুশী কর। মামলার বাইরে তোমার ওপর যে যে চাপ আসবে, সেগুলো নিতে পারবে তো? আর মামলা ফুরোতে ফুরোতে তুমি তো ফুরোবেই, মানে ধনে মানে সব দিক দিয়েই, তোমার অধস্তন সাত পুরুষও ঐ মামলার কুম্ভীপাকে ঘুরতে থাকবে।

নীনা : কিন্তু রঘু, এতো দিনে দুপুরে-

রঘু : ডাকাতি। ইয়েস। ওরা তোমায় বলে কয়ে চ্যালেঞ্জ করে দিয়ে ডাকাতি করেছে। যাও দম থাকে তো লড়ে যাও। মিডিয়া, পুলিশ, মন্ত্রী, সান্ত্রী, আন্দোলন- এই ক্যাঁচকলাটি হবে। কালচারের ভালচারেরা ক্ষীরটি খেয়ে উড়ে যাবে আর তুমি শ্মশানে মিডিয়া , পুলিশ, দাঁড়িয়ে মরার হাড় গুণবে। বড়নৌকোর ন্যাজে নোঙর বাঁধতে পারলে তার টানে বৈতরণী পেরোলেও পেরোতে পার, কিন্তু তার আগে যে আছাড়ি পিছাড়ি খেতে হবে তার ধাক্কা সইবে তো? আর না না হলে ঐ চোরগুলোর লেভেলে নেমে এস, ঢিলের পালটা পাটকেল রেডি রাখ, খিস্তি দিতে পারবে তো? চোখা চোখা? মা বাবা চৌদ্দগুষ্টি তুলে? মার খেতে পারবে পিঠের চামড়ায় কড়া পড়িয়ে ?

নীনা : ইজি-ইজি-ইজি - খুব রেগে গেছ দেখছি। একবার পুলিশে যেতেই হবে কাকুকে, আমিও না হয় যাব সঙ্গে আর চাঁদু তো আছেই।

রঘু : খবরদার! আমার সামনে ঐ বাঁদরাটার নাম করবে না বলে দিলাম। বাবা বদমাশগুলোর সঙ্গে কথা বলার সময় ওকেই তো নিয়ে গিয়েছিল। মা পই পই করে বলে দিয়েছিল মুখ বন্ধ রাখতে। ওখানে বাবাকে বোধহয় উল্টোপাল্টা কিছু বলেছে। গাধাটার যত কসরত তো শরীর নিয়ে, মাথার ব্যায়াম তো জিরো। ওখানে চুপচাপই ছিল, কিন্তু পরে কি করেছে জানো?

নীনা : মারপিট? ভালোই তো?

রঘু : ওদের জিম থেকে গোটাদশেক ছেলে নিয়ে গিয়ে জমির চারকোণে বসানো পাথরগুলো উপড়ে ফেলে আমাদের নম্বরগুলো ফের লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। লাউ ফাউ সব উপড়ে পাশের জমিতে ফেলে দিয়েছে আর পাহাড়াদারটাকে — কি যেন হাতকাটা হাবু না কি - তাকে তারই পরণের লুঙি দিয়ে নিমগাছে বেঁধে রেখে এসেছে।

(উদ্ভ্রান্তের মত চাঁদু আসে)

চাঁদু : এ্যাই যে- দাদা। জানতুম তোকে এখেনেই পাব। শিগগির চল- **(রঘুর হাত ধরে টানতে থাকে)**

রঘু : আরে— আরে কি হয়েছে বলবি তো-

চাঁদু : বাবা- বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে-

রঘু : **(গলাটা টিপে দিই তোর)** চার টুকরো করে চারকোণে পুঁতে নম্বর লাগিয়ে দিই?

নীনা : আঃ! রঘু! কি হচ্ছে কি- ওর কি দোষ?

রঘু : নাঃ ! উনি তো আবার সার্কে কাচা তুলসীপাতা! বডি ফুলিয়ে মস্তান হয়েছে- চুটকি বাজিয়ে জমি উদ্ধার করে দেবে- না না, যা , এখন আমায় কেন? তোর

দলবল নিয়ে থানায় যা।

নীনা : এখন ঝগড়াঝাটির সময় নয়। চাঁদু, শর্টে শুনি কি হয়েছে-

চাঁদু : ঐ হারামজাদা বাটু পাইক সব জায়গায়- জে এল আর ও আপিসের রেকর্ডেও নম্বর পালটে রেখেছে। আমাদের রেকর্ড ফেকর্ড সব হাপিস! টাকা না দিলে জমি দেবে না। তাই আমি-

রঘু : তুমি একেবারে পিতৃভক্ত শ্রবণ কুমার! গাধা কোথাকার!

নীনা : ও তো তবু একটা ঢিল ছুঁড়েছে। কাদায় পড়লে কাদা ছাড়া আর কি ছিটকাবে।

রঘু : তাই নাকি? তা যাও, এবারে জীবন ভর সেই কাদা তোলো গে। আমি এর মধ্যে নেই। পুলিশের ঝামেলায় গেলে আমার ভিসাফিসা সব আটকে যাবে। এসব করে কোন লাভ আছে?

নীনা : সবকিছু লাভক্ষতি মেপে চালানো যায় না রঘু। কিছু সিদ্ধান্ত পরিস্থিতি বুঝেই নিতে হয়। তুমি তো মাথার ব্যায়াম কর তাহলে বুঝে দেখ তো, ওরা চাঁদুর বদলে কাকুকে অ্যারেষ্ট করল কেন? স্রেফ কাকুর মনে একটা ট্রমা তৈরী করার জন্য। উনি সহজে ওটা নিতে পারবেন না, আর আরও নড়বড়ে হয়ে যাবেন শুধু সেই জন্যে।

রঘু : কি বলল তোকে থানায়?

চাঁদ : আজ রাত্তিরে ছাড়বে না। কাল গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হবে।

নীনা : দেখলে? কি বলেছিলাম? সব ছক করে করা। কাল ছেড়ে তো দেবেই নইলে কেস দিতে হবে। ওরা কেস টেসের মধ্যে যাবেই না। স্রেফ ভয় দেখাচ্ছে। চল, তোমাদের বাড়ি যাই। কাকিমা নিশ্চয়ই খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন।

চাঁদু : খুব কাঁদছে। তাই তো দাদাকে ডাকতে এলুম। **(ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে)** স্যরি নীনাদি, আমি ভাবি নি যে এতটা - এই বাটু লোকটা হেব্বি শয়তান। বাবাকে বিনা কারণে এত অপমান করছিল, দাদা তো দেখেনি তাই আামার ওপর রাগ করছে। তুমি থাকলে-

নীনা : আমি থাকলে?

চাঁদু : হারামীটার সব হুইস্কিই নাকি পেসাদী। তুমি থাকলে নিঘঘাত ওতে ঘোড়ার জোলাপ গুলে দিতে- গামছার জল শুকুতে পেত না বেটার-

রঘু : মারব টেনে এক কানের গোড়ায়-

নীনা : আহ হা-

অন্ধকার

পঞ্চম দৃশ্য

রঘু চাঁদুদের বাড়ি। ওদের বাবা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন। পাশে ওদের মা। রঘু, চাঁদু আর নীনাও রয়েছে।

মা : আর কতক্ষণ ওভাবে বসে থাকবে? যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

বাবা : **(রাত জাগা বিধ্বস্ত মুখ তোলে)** আমি- আমি কি চোর? আমায় ওইভাবে কেন-

মা : এবারে কিন্তু তুমি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছ। হ্যাঁ, মানছি ওইভাবে গামছা পরা অবস্থায় নিয়ে যাওয়াটা -

বাবা : আশপাশের বাড়ীর সবাই দেখল- মান সম্মান কিছুই রইল না। মধ্যবিত্তের ঐ একটাই আব্রু থাকে তো - সেটাও ওরা একটানে-

চাঁদু : গামছাটাও খুলে নিয়েছিল? বাবা? দেখাচ্ছি শালাদের-

নীনা : আঃ! চাঁদু। কাকু, বুঝতেই তো পারছেন- এসবই প্ল্যান করে আপনাকে কাবু করে ফেলার জন্যেই করা? লজ্জা, ঘেন্না, ভয় এই তিনটে নিয়ে আপনি কেন কেউই ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না।

বাবা : তুমি তো সব দেখলে, শুনলে, আচ্ছা, আমার এই বাড়ি করতে যাওয়া, জমি কেনা, এগুলো কি অপরাধের মধ্যে পড়ে? জেলে তো অপরাধীদের রাখে তাই না?

নীনা : ওরা একটা নাটক করেছে কাকু। খুব সাক্সেসফুলি আপনাদের ভয় দেখাতে পেরেছে। ফার্স্ট রাউন্ড ওরা জিতেছে। কিন্তু নাটক এখনও শেষ হয়নি যে। জমি ফেরত নিতে গেলে হয় ওদের কথা মেনে নিতে হবে আর নয়তো-

মা : নয়তো?

নীনা : নাটকের বাকী সিনগুলো আমাদের লিখতে হবে- সাকসেসফুলি।

বাবা : আমার চাই না জমি ফেরত। যে ক'দিন বাঁচব শান্তিতে বাঁচতে চাই। রঘু তো বাইরে চলেই যাচ্ছে। চাঁদুটার হিল্লেও ঐ করে দেবে বলেছে। আমাদের এই ভাড়া বাড়ীতেই কেটে যাবে ক'টা দিন। সবাইকে এত গোলমালে ফেলার জন্যে তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি-

মা : কি একলষেঁড়ে মানুষ রে বাবা! এক কথাই আউড়ে যাচ্ছে। নীনা কি বলতে চাইছে একবার শোনোই না।

বাবা : ঘরের জানালা বন্ধ করে ঢিল আটকানো যায়, কিন্তু মাঠে নেমে যে খেলে তার গায়ে ঢিল এসে লাগবেই- আমি যা নষ্ট করেছি তা আমার নিজের রোজগার করা টাকা। আর কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমিও ভুলে যাবার চেষ্টা করব। ও জমি আমার চাই না।

রঘু : কিন্তু আমার যে চাই! **(সবাই এতক্ষণ নীরব থাকা রঘুর কথায় চমকে ওর দিকে তাকায়)** চমকাবার কিছু নেই। আমার ফিউচার প্ল্যান পাল্টাচ্ছে না, কোন বদলা টদলার গপ্পোও নেই হিন্দি সিনেমার মত। কিন্তু, নীনার কথাটা আমায় ভাবাচ্ছে - সত্যিই তো একটা নাটক হচ্ছে- নীনা, বল কি বলবে-

মা : কিন্তু তোর কেরিয়ার ? এসব ব্যাপারে জড়ালে-

রঘু : ক্ষতি হবে? হয়ত তাই। কিন্তু সাকসেস্‌ফুল হলে খেলাটা ঘুরেও যেতে পারে। কি? তাই তো নীনা? আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন আড়াল থেকে শুধু তোমায় নয়, আমাদের পুরো জেনারেশানটাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাদের সাহস মাপছে। আমার যেতে এখনও কয়েক

মাস দেরী আছে মা। এ গেমটা খেলে তবে যাব!

বাবা : একজন হাজতবাস করিয়েছে, তুমি আবার ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে না তো?

রঘু : আমি নয়, প্ল্যান তো নীনার।

নীনা : একটা বস্তাপচা চেনা ছকে নাটকের বাকী সিনগুলো লিখতে হবে। আমার দলের ছেলেরা আর তুমি - কিছু খরচাও আছে, পরে সব সুদে - আসলে ফেরত।

রঘু : বিদেশ যাবার ফান্ড থেকে আপাতত ইনভেষ্ট করছি।

নীনা : কাকু, কাকিমা, চাঁদু এদের কোনও রোল নেই। এরা আন্ডার কভার থাকবে- জাস্ট লাইক মেঘনাদ।

চাঁদু : আমি খেলব না নীনাদি? ঐ বাটুটার মুন্ডু নিয়ে গেন্ডুয়া খেলা হবে তো?

নীনা : চাঁদু, নো উত্তেজনা। মুখ একদম সেলাই। তোমার কাজ শুধু একটা ঝিন চ্যাক গাড়ী যোগাড় করা আর বিদেশের নম্বরওয়ালা একটা সিমকার্ড যোগাড় করা, পারবে?

চাঁদু : বাঁয়ে হাত কা খেল। এখনি যাব?

নীনা : না, আমি বললে তারপর।

বাবা : কি করতে যাচ্ছ আমার মাথায় তো কিচ্ছু ঢুকছে না! দোহাই মা, আর বিপদে ফেলো না।

নীনা : নো ফিয়ার কাকু ডিয়ার। আপনি বরং কয়েকদিন আপিস ছুটি নিয়ে নিন। বলুন, জমি নিয়ে খুব মনঃ কষ্টে আছেন- মানে আপনার অরিজিনাল স্টেটে থাকুন। রাজু দালালকে জানিয়ে রাখুন টাকাটা ধারটার করে যোগাড় করছেন। হাফ হাতে এসে গেছে, বাকীটা এলেই দিয়ে দেবেন। ব্যাস, আপাতত আপনার রোল এইটুকু। পারবেন?

বাবা : তা পারব। কিন্তু-

মা : আবার কিসের কিন্তু? তোমার জমি ফেরত পেলেই তো হল? ওরা যা করছে করুক না।

নীনা : ফেরতের গ্যারান্টি দিতে পারছি না, তবে ওরা যে নাটকটা শুরু করেছে আমি সেটা শেষ করবার চেষ্টা করব।

রঘু : আমরাই শেষকালে জিতব। নীনার বিজ্ঞাপন নাটক সবের স্ক্রিপ্ট যা ধড়াদ্ধড় বিক্রি হয়ে যায়- এটাও সুপার হিট হবে দেখে নিও তোমরা।

নীনা : ওদের চালেই ওদের মাত করতে হবে রঘু। ওরা আমাদের লজ্জা দিতে চেয়েছিল সেটা আমাদের যেটা নেই সেটা আমরা যোগ করব ওদের স্ক্রিপ্টে- ওদের লোভ। এই দুটো হাতিয়ার সম্বল আমাদের।

চাঁদু : লোভী তো ওরা বটেই, কিন্তু লজ্জা? বাটু পাইকের পাজামা খুলে নেবে? জমে যাবে-

নীনা : ওদের কাটা খালে যদি ওদেরই ডুবিয়ে দিতে পারি- সেই গানটা আছে না

'দোষ কারো নয় গো মা/ আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' - স্বখাত সলিলে ডোবা মানুষ চট করে মাথা তুলতে পারে না চাঁদু।

চাঁদু : কিচ্ছু বুঝলুম না! জাস্ট চাঁদি টাচ করে বেরিয়ে গেল- ঘিলুতে হিট করল না।

নীনা : বুঝতে হবে না। শুধু স্ক্রিপ্ট ফলো করে যাও সবাই। কাল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় নেক্সট মিটিং, ভেন্যু- বড়দার চায়ের দোকান।

অন্ধকার

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বড়দার চায়ের দোকান। বড়দা আগের মতই চা করছে। চার-পাঁচ জন যুবক-মলয়, পটাই, রতন, বাদল কেউ বসে কেউ শুয়ে - এরা নীনার দলবল)

পটাই : বড়দা! বড় জিভ আর আলজিভ শুকিয়ে এ ওর গায়ে লেপ্টে গেছে।

বড়দা : জল খাও। জগে রয়েছে।

মলয় : **(বড়দাকে)** শাইলক দ্য জু!

বড়দা : যতই ইঞ্জিরিতে গাল দাও দুশো তেত্রিশ কাপ চা এর দাম এখনও বাকী।

পটাই : কি গুল ছাপায় মাইরি! দুশো তেত্রিশ কাপ?

বড়দা : এসো না, এসো হেতায়-দেকে যাও- চায়ের দরুণ ট্যাঁড়া আর নেড়োর দরুণ গোল্লা- গুনে নেবে এসো- গুল না ঘুঁটে বুঝবে অখন-

পটাই : এ্যাই রতন! কাগজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চেক করে আয় না!

রতন : **(মুখের কাগজ সরিয়ে)** তোর ইচ্ছে হয় তুই যা না। আমি বড়দাকে ট্রাস্ট করি। জানিস না, বিশ্বাসে মিলায়ে চা, তর্কে শুধু জল?

বড়দা : পালের গোদা আসুক, ফক্কুড়ি বের করবে তোমার। চুপচাপ বোসো, নীনাদিদি এলে তবে চা পাবে।

পটাই : তবে তাই হোক- তবে তাই হোক- **(একটুক্ষণ উসখুস করার পর)** বাদলা-

এ্যাই বাদলা-

বাদল : **(বই থেকে মুখ তুলে)** তোকে কি বেঞ্চির ছারপোকা কামড়ায় না কি। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারিস না?

পটাই : তুই যে সেই থেকে শুকনো পাতায় মুখ গুঁজে বসে আছিস, বোর লাগে না?

বাদল : তোর মত গোমুখ্যু নই- তাই লাগে না।

পটাই : ওসব বোলো না- গরুর ডিমান্ড জানো এখন? কারেন্ট পলিটিক্যাল শ্লোগান হচ্ছে- পাইলে গরুর হিসি/রাখিবে ভরিয়া শিশি- গোরু যদি ছাড়ে সার/ ভরিবে কয়েক ভাঁড়-

রতন : পটাই, তুই বরং দাড়ি কামানোর সাবানের প্রমোশন নাটকের গানটা প্র্যাক্টিস কর। যা বেসুরো গেয়েছিলি সেদিন-

পটাই : আচ্ছা, মনে মনে করছি না হয়। **(একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে)** মলয়- ঐ মলয়-

মলয় : ইয়াঃ!

পটাই : উফ! বাংলায় সাড়া দিতে কি হয়? বলছিলুম, দাড়ি কাটার সাবানের প্রোমো তো বোধহয় আর হবে না - তারপর?

রতন : (গেয়ে ওঠে) তার আর পর নেই/ নেই কোনও ঠিকানা-

মলয় : নীলাদির ওপর ভরসা নহি হ্যয় ভাইয়োঁ?

বড়দা : নাও, চা ধরো।

পটাই : ওঃ থ্যাঙ্কু বড়দা- দেখি একটা চুমু খাই- **(খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর চুমু খায়)**

বড়দা : এঃ! কি জঘন্য ছাওয়াল!দেলে গাল এঁটো করে- তালে হল গে দুশো তেত্রিশ আর চার- **(নীনা ঢোকে)**

নীনা : তার সঙ্গে আরেকটা যোগ করো আর আধঘন্টা বাদে পুরোটা রিপীট করবে। ভয় নেই, আজই ফুল পেমেন্ট হয়ে যাবে।

বড়দা : এলেন নাটের গুরু মা। থির হয়ে বোসে আগে জগ ধরে জল খাও দিনি, তাপ্পর চা দিচ্চি।

পটাই : বড়দা পুরো ফাদার ইন্ডিয়া মাইরি !

মলয় : নতুন কাজ এসেছে নাকি দিদি? এবারে কি সাবজেক্ট?

নীনা : জমি।

মলয় : জমি? মানে ল্যান্ড? জমি বেচারও প্রমোশান হচ্ছে নাকি আজকাল?

নীনা : রিয়াল লাইফ নাটক করতে হবে। কোন আগে থেকে লেখা স্ক্রিপ্ট থাকবে না। আমি সব বুঝিয়ে দোবো। সেই মত পার্ট করতে হবে। পার্টির কাছে আইডেন্টিটি ফাঁস করা চলবে না। সাকসেস্‌ফুলি করতে না পারলে নো পেমেন্ট, পারলে ডবল পেমেন্ট।

পটাই : জান হাজির হ্যায় লীডারজী।

নীনা : কিছু না শুনেই?

মলয় : তোমায় যখন লিডার বলে মেনেছি তখন শোনাশুনির কি আছে?

নীনা : বড়দা! একবার এখানে এসো তো-

বড়দা : আমায় আবার কেন ? দু বেলা গাল পেড়েও হচ্চে না?

নীনা : তুমি না হলে হবেই না। আরে , ক্যান্ডিডেট যেই হোক, ক্যাডার ঠিকঠাক হলে বদরুদ্দিনের রামছাগলটাকেও ভোটে জিতিয়ে আনা যায়।

বড়দা : এ যে কি কমনে হেঁয়ালি করে বুঝি নি বাপু!

নীনা : এই নাটকে একটাও বাইরের লোক নেওয়া যাবে না। যা হবে সব আমাদের ভেতর। এর বাইরে একটি মাছির কানেও যেন কোন কথা না যায়।

বড়দা : মাছির কান হয় বলে তো শুনি নি। কেবল বিস্তর চোক দেকিচি। কিন্তুন আমায় ডাকতেছ কেন মা জননী? আমি মুরুখ্যু সুরুখ্যু মানুষ-

নীনা : যার সঙ্গে টক্কর সে কি উকিল ব্যারিষ্টার নাকি? তোমার থেকেও বেশী মুখ্যু। আরে বাবা, যার টিম আর প্ল্যানিং ভাল, সাহস বেশী আর লোভ কম সেই তো জেতে।

রতন : বড়দা, প্লীজ আর হেজিও না । বল নীনাদি-

(সবাই নীনাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে প্ল্যান শোনে। খানিকক্ষণ পর-)

নীনা : আজ থেকে ঠিক সাতদিন পর রাজু দালালের কাছে একটা ফোন যাবে, আমেরিকা থেকে। ফোনটা করবে- কে করবে- কে করবে- বাদলা!

(দুদিকে রাজু আর বাদল দুজনকে দেখা যায় ফোন কানে)

বাদল : রাজুবাবু মানে **(রাজীব নস্কর বাবু বলছেন)**

রাজু : বলছি । আম্নি?

বাদল : আমি স্টেটস থেকে সিনহা বলছি।

রাজু : কোত্থেকে?

বাদল : স্টেটস - মানে আমেরিকা-আমেরিকা- নাম শোনেন নি? ফোন নাম্বারটা দেখুন না।

রাজু : **(ফোন দেখে)** আই ব্বাস! এটা অমেরিকান নাম্বার নাকি? আজিব দেখতে বটে নম্বরটা। কি ব্যাপার বলুন তো স্যার? আমার নম্বর কোত্থেকে পেলেন?

বাদল : আমাদের নেটওয়ার্ক পুরো ওয়ার্ল্ড জুড়ে মিঃ নস্কর। আপনার নম্বর আমাদের কলকাতার এজেন্ট দিয়েছে। আমরা একজন ভাল ব্রোকার খুঁজছি। জনা ছয়েকের নাম পেয়েছি, সবার সঙ্গেই কথা বলব, তাই প্রথম আপনাকেই-

রাজু : খুব ভাল করেচেন স্যার। কলকাতায় বোকার অভাব নেই। কিন্তু বেশিরভাগই ফালতু বোকার। আমি জেনুইন বোকার স্যার। যেমনটি চাইবেন তেমনটি জমি পাবেন। আর কারো সঙ্গে কথা বলতে হবে না। কবে কোথায় দেখা করতে

হবে স্যার?

বাদল : আমরা পরশু কলকাতায় পৌঁছচ্চি। হোটেলের নাম, রুম নম্বর সব মেসেজ করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার বস থাকবেন, ডঃ ডি নাগচৌধুরী, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? বিখ্যাত এগ্রিকালচারিষ্ট?

রাজু : হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনবো না কেন? বড় পোমোটার তো? বিল্ডিং বানান?

বাদল : আমার কথা লং ডিস্টেন্সে ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে- বিল্ডিং নয় রাজুবাবু এগ্রিকালচার রিসার্চ -

রাজু : চাষ করেন?

বাদল : চাষ নয় রিসার্চ। যাক গে, বাদ দিন, শুনুন, আমাদের কয়েক শো একর চাষের জমি দরকার। অরগ্যানিক ফার্মিং এর প্রজেক্ট আছে একটা।

রাজু : পৌঁছেই দয়া করে ডেকে নেবেন স্যার। আমার বসকে নিয়ে আপনার বসের সামনে হাজির হয়ে যাব। ওনার হাতে না স্যার জমিই জমি- যত চাইবেন তত-

বাদল : দেখা হচ্ছে তাহলে- বাই- **(ফোন কাটে)**

রাজু : (গান) ও রাজু বন গয়া জেন্টেল ম্যান- ও রাজু বন গয়া জেন্টেল ম্যান- **(নীনাদের অংশে আলো আসে)**

নীনা : খবরটা পেয়ে রাজু প্রথমেই যাবে বাটু পাইকের বাড়ি-
(বাটু নাক টিপে প্রাণায়াম করছে। রাজু আসে)

রাজু : বাটুদা-এ্যাই বাটুদা-আরে ওসব নাক টেপাটেপি ছাড় তো-

বাটু : **(নাক টিপে)** বল।

রাজু : ইম্পোটেন্ট কাস্টোমার। অগাধ জমি লেবে। পরশু আসচে- ফাইব এস্টার হোটেলে- তোমায় আমায় যেতে বলেচে- **(বাটুর প্রাণায়াম বন্ধ হয়)**

বাটু : দাঁড়া দাঁড়া- সক্কাল সক্কাল চুল্লু মেরে এয়েচিস না? মরবি কিন্তু রাজু!

রাজু। : **(হাঁ করে)** শোঁকো- না, না শোঁকো না। চুল্লুর আর কিছু না থাক গন্ধ থাকবে অগাধ। রাজু কোনও খবর আনলে সেটা চুল্লু হয়ে যায় না? এই দ্যাকো, মোবাইলে নম্বরটা দ্যাকো- কোথাকার? বেলেঘাটা বাইপাসের? **(বাটু দেখে)** হল তল্লাসী? আমাকে মাইরি হেব্বি ছোট নজরে দ্যাকো তুমি বাটু দা। কেন আমার কপাল কি খুলতে নেই?

বাটু : ওরা তোর ফোন নম্বর কোতায় পেল?

রাজু : বা রে, আমার আপিসের দরজায় বোড লাগানো আচে না? 'এখেনে সব্ব পোকার জমি বাড়ি সঙ্কান্ত ইয়ে করা হয়' আর তার নিচোনেই তো রাজীব কুমার নস্কর- বোকার। আর তা বাদে ঠিকানা ফোন নম্বর-

বাটু : এত দালাল থাকতে হটাত তোকে কেন? অত জমি যদি লাগবে, ডাইরেক

গরমেন্টের কাচেই যেতে পারত তো-

রাজু : যেচে ঘরে মা লক্ষ্মী আসচেন, আর তুমি তার শাড়িতে ক'টা ফুটো তাই গুনচ। আগে থাকতে কু গাওয়া তোমার স্বভাব। গরমেন্টের জমি ছেলের হাতের মোয়া নাকি? বললেই অমনি পাওয়া যায়? লটারী ফটারী কত কি হয় না। ওদের তাড়া আচে নিশ্চয়ই। আর বলচে বটে, দেখ গে যাও, অত জমি হয়ত নেবেই না। এতে কোশ্চেনের কি আচে বাটুদা? তোমার কি যাচ্চে এতে? মিটিং করবে, দু পাত্তর মালঝাল খাবে, পোষালে জমি বেচবে, না পোষালে ফেটে আসবে , হয়ে গেল।

বাটু : সে না হয় হল- কিন্তু-

রাজু : দেখ বাটু দা, তোমার যদি খিচ লাগে ছেড়ে দাও। সারা লাইফ শালা তোমায় ঝেলছি, আজ যখন নসীব বদলাবার চান্স পেয়েছি- তুমি না যাও অন্য লোক ফিট করছি। জমি তোমার একারই আচে নাকি? আসলে তোমার কিসে ফাটচে বুঝতে পাচ্ছি। আমায় বিলেত থেকেন ফোন করেচে- সেটা নিতে পারচ না। ডায়রেক্ট তোমায় করলে শালা ঠিক যেতে। আমায় ফুটিয়ে দিয়ে একাই যেতে - হারগিজ সঙ্গে নিতে না - তাই না?

বাটু : গরম হচ্ছিস কেন? ছেলেছোকরাদের এই এক দোষ, টাকার গন্দ পেলে কুত্তার মত ছুটতে থাকে। আরে, সবদিক ভেবেচিন্তে নামতে হয় বাবা।

রাজু : আমি কুত্তা আর তুমি শালা সাধু সুকদেব! ঠিক আচে, বসে বসে বগলা মারো, আমি রবিদার কাচে চললুম। এর কাচে কয়েক বিঘের খবর আচে। যা পারি মেরে তো দিই। (যেতে যায়)

বাটু : আবে বোস না রে। আবার রঙ নিচ্ছে। আমি যাব না বলেছি? যাব রে বাবা যাব। পেসাদ খাবি না? দাঁড়া, নিয়ে আসি- (ভেতরে যায়)

রাজু : (বাটুর গমন পথের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে) এবারে কিন্তু পার্সেন্টেজ বাড়াতে হবে বাটু দা- (এই অংশের অলো নেভে। নীনার অংশে আলো আসে)

নীনা : আমাদের দ্বিতীয় হাতিয়ার লোভ- সামলানো সহজ নয়। নীচ থেকে ওপর কেউ সামলাতে পারে না। এবার সিনহা মানে নাগচৌধুরী সায়েবের সেক্রেটারি আর তার দলবল ফাইভ স্টারে উঠবে। রাজুর অফিসে ওনার ড্রাইভার যাবে বিদেশী গাড়ি নিয়ে।

(দেখা যাবে রাজু চেয়ারে বসে ঢুলছে। পটাই ড্রাইভারের পোশাকে আসে-)

রাজু : কে বে! কে?

পটাই : সিনা স্যারের ডাইভার স্যার- পটাই। চলুন- মানে আপনি রাজু স্যার তো?

রাজু : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ- হ্যাঁ-

পটাই : সিনা স্যার গাড়ি পাঠিয়েছেন। কথাবার্তা বলে লাঞ্চ খেয়ে তবে আসবেন-

(নীনার অংশে আলো আসে)

নীনা : রাজুকে খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তি আরও পাকা করে ফেলা হবে।

রতন : বলির পাঁঠাকে কাঁঠাল পাতা খাওয়াবার মত?

নীনা : বলতে পারিস। এবার আসল খেলা। ডঃ ডি নাগ চৌধুরী আর তাঁর মেয়ে-

মলয় : তারা কারা?

নীনা : এই দুটো চরিত্রের মেক-আপ আর রিহার্সাল লাগবে। মলয় আর রতন পার্ট পেলি না, না? লোক তো লাগবে। তোরা আমাদের কলকাতার এজেন্ট, টাই-ফাই পরে মিটিং - এ থাকবি। কলম বের করে প্যাডে নোট নিবি-

রতন : নাগচৌধুরী কে হবে? বিলেত ফেরত চেহারা চাই তো-

নীনা : যথাসময়ে দেখতে পাবে। (রঘু আসে)

মলয় : আরে রঘুদা? রঘুদাকে পার্ট দেবে না?

নীনা : আপাতত রঘু প্রোডিউসার। একটা রিকুইজিশান লিস্ট ধরিয়ে দেব, মালগুলো ঠিকমত কিনে কেটে রাখবে।

রঘু : ও কে বস্!

অন্ধকার

সপ্তম দৃশ্য

(হোটেলের ঘর। বাটু আর রাজু গোমড়ামুখে বসে আছে। নীনা, নাগচৌধুরীর মেয়ের রোলে, মলয় আর রতন টাই পরে ফাইল বগলে বসে আছে। ভেতর থেকে জিনিসপত্র পড়ে যাবার আওয়াজ আসে। সবাই চমকে তাকায়)

রাজা : (মলয়কে) দাদা, স্যার কি খুব রেগে গেছেন?

মলয় : নিজের কানে শুনলেন তো? কি ছুঁড়ে ফেলল কে জানে। **(নীনাকে)** ম্যাডাম, দেখবেন নাকি একবার গিয়ে?

নীনা : যাচ্ছি। But- what is your name?বেঁটে বাবু-

বাটু : বাটু-বাটু পাইক-

নীনা : হোয়াট এবার- আপনাদের কাছে যথেষ্ট জমি নেই এ কথা যদি আগে বলতেন- বাপী হ্যারাসমেন্ট হলে এমন রেগে যায়-

বাটু : একটি বার- ওয়ান মোর সুযোগ যদি দেন- স্যারকে একবার ডাকুন না দয়া করে- আমরা মাপ চেয়ে নিচ্ছি-

মলয় : ম্যাডাম একবার এদিকে আসবেন প্লীজ- **(নীনাকে একপাশে ডেকে নিয়ে)** আবার কি ভাঙল গো? রঘুদার প্রোডাকশন কস্টে এগুলো ধরা ছিল না তো?!

নীনা : ইনসিডেন্টাল এক্সপেন্ডিচার। কিচ্ছু করার নেই। তোরা পটাইকে ঠিকমত শিখিয়ে রেখেছিস তো? ঐ ছোট্ট সিনটা কিন্তু ভাইটাল। নাটকের টার্নিং পয়েন্ট।

রতন : কিন্তু নীনাদি, এ মালদুটো তো একেবারে ফেভিকল হয়ে গেছে। বড় সায়েবকে আর একবার অ্যাপীয়ার হতে হবে মনে হচ্ছে-

নীনা : ঐ খানেই একটি কেলো মতন হয়ে রয়েছে বুঝলি রত্না। এক সীনের ডায়ালগ রেডি ছিল, জমি দেখবে, পছন্দ হবে না। রেগেফেগে গিয়ে - ও দুটো যখন এখান থেকে বেরোবে পটার সিন শুরু। এখন নতুন ডায়ালগ পাই কোথায় বল দেখি-

বাটু : ম্যাডাম! একটিবার স্যারকে ডাকুন না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নোব। যে করে হোক জমি যোগাড় করে দোবই-

নীনা : আসলে বাপী কম কথার মানুষ তো। আপনাদের ঐ এক চামচে জমি দেখে কথাই বন্ধ হয়ে গেল হয়ত।

রাজ : হ্যাঁ-হ্যাঁ- শকে অমন হয়। স্যার শুধু বলছিলেন নাউ- নাউ-

বাটু : চারপাশে অত নাউচায হয়েছে দেখে বোধহয়-

মলয় : হ্যাঁ- না, ইংরিজিতে বলছিলেন - নাউ নাউ মানে এক্ষুনি জমি চাই - এক্ষুনি-

বাটু : তাই? হবে বা। ডাকুন না দাদা একবারটি-

রতন : ডাকছি। কিন্তু লাভ হবে না। প্রচন্ড রেগে গেলে স্যার তো বাংলা ইংরিজি কিচ্ছু বলেন না।

রাজ : তবে?

রতন : হনলুলুর ভাষায় কথা বলেন। আপনারা জানেনও ভাষা? ডাকি ম্যাডাম?

নীনা : চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই- (দুজনে ভেতরে যায়)

বাটু : এ্যাই রাজু, তুই একদম সাইলেন্সার লাগিয়ে থাকবি। খালি ফড় ফড় সব ব্যাপারে। যা বলবার আমি বলব।

রাজু : হলুলুলুর ভাষায়?

বাটু : মারব এক থাপ্পড়। মা বগলাকে স্মরণ করে বাংলাতেই বলব, যা বোঝবের বুঝবে, না বোঝে-

(মলয় আর নীনার সঙ্গে চা-দোকানী বড়দা আসে। ঝাঁ চকচকে স্যুট আর রিমলেশ হাল ফ্যাশানের চশমায় তাকে চেনাই যায় না)

বাটু : সার!

বড়দা : এখানেলে-

বাটু : অ্যাঁ?

বড়দা : বুচাওদু-

রাজু : উলুলুলু-মানে ইয়ে হনু লুলু-

বড়দা : ধচাপাও।

বাটু : একটা দিন সময় দ্যান স্যার।

বড়দা : য়াযায়- উফ!

রতন : এই! আপনারা বাইরে যান তো- স্যার উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন- যান- যান- (দুজনকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়)

নীনা : থ্যাঙ্ক ইউ বড়দা। তোমার মেমারি কিন্তু খুব শার্প।

বড়দা : ঠিক ঠিক বলছি তো? উফ! এবারে আমারে এই ধড়াচুড়োর থে মুক্তি দাও নীনাদিদি।

মলয : বড়দা ওটা কি বলল?

নীনা : হনলুলুর ভাষা। বুঝলিনা?

মলয় : নাঃ ।

নীনা : বড়দার চায়ের দোকানে কি লেখা আছে?

মলয় : (একটু ভেবে) 'এখানে লেবু চা ও দুধ চা পাওয়া যায়'

নীনা : স্ক্যানিংটা একটু গোলমাল করে দে- এখানেলে বুচাওদু ধচাপাও য়াযায়-

মলয় : সুপার্ব!

নীনা : বড়দারই ভাষা, আমি শুধু স্ক্যানিংটা একটু গুলিয়ে দিয়েছি।

রতন : ব্রিলিয়ান্ট!

বড়দা : এবারে আমার ছুটি তো দিদিভাই? এট্টু ফাঁকে যাই-

মলয় : ফাঁকে?

বড়দা : হিসি করতে রে বাবা- ঝা চাপাচুপি পইরে একেচ ত্যাখন থে-(সবাই হেসে ওঠে)

নীনা : তোমার পার্ট শেষ। এবারে পরের সীন - পটাই।
(বাটু ও রাজু ক্ষুন্ন মনে বেরিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভারের পোশাকে পটাই আসে)

পটাই : রেডি ক্যাশ আছে?

বাটু : ক্যাশ?

পটাই : কলকাতার একটু বাইরের দিকে হলে হবে? মনে হয় বায়না হয়ে গেছে- একবার টেরাই নেওয়া যেতে পারে। তবে হার্ড ক্যাশ লাগবে মানে নগদ। বলে কয়ে যদি কিছু করা যায় দেখি- আমার কমিশন লাগবে কিন্তু। এক্ষুণি নয়, ডীল হয়ে গেলে তবে।

বাটু : পাক্কা খবর তো? কত জমি? দাম?

পটাই : সিংজীর খাটাল ছিল। ওরা দেশে চলে যাচ্ছে গরু মুরু বেচবুচে। এতক্ষণে পার্টি ফিট হয়ে যাবার কথা। যদি ক্যাশ হাতে থাকে তবে চল, একেবারে টাকা দিয়ে ফাইনাল করে আসতে হবে অন স্পট। হাতে গরম ধরালে কাজ হয় জান তো? তোমরা এ লাইনের ঘাঘু লোক জানবেই। কাগজপত্তর ধীরে সুস্থে হবেখন।

রাজু : জয় মা বগলা/বাটুদা-শিগগির চল-

পটাই : ওনাদের আবার আমার কথা বলবেন না যেন- আপনারা ঘাঘু লোক জানেনেই তো এ লাইনের সব-

বাটু : এ ছোঁড়াটার সবতাতেই হুড়োহুড়ি। স্যার তো দিন দুই আছেন এখনও। আর টাকার ব্যবস্থা না করে-

পটাই : আমারও তাই মনে হয়, বুঝলে, এ দানটা ছেড়েই দাও। সিংজীর ঐ বিঘের পর বিঘে কি আর পড়ে আছে? কালকেও ব্যাগ বগলে একটা পার্টি ঘুর ঘুর কচ্ছিল। তোমাদের ব্যাড লাক। কি করবে বল? এতবড় দাঁও পেয়েও মারতে পারলে না। যাকগে, আসছে বছর আবার হবে- টিঙ্কু নাকুড় টিঙ্কু নাকুড় - (পটাই যেতে চায়)

বাটু : ও ভাই পটাই, শোনো শোনো- একেবারে বিসজ্জনের বাজনা বাজিয়ে দিলে যে- বলছিলুম এদ্দুর এসে ব্যাকগিয়ার দোব? কাল সকালের মধ্যে টাকা যোগাড় করে ফেললে হবে না? লাখ পাঁচেক অবধি হলে বায়না হবে তো? মানে ইদিকে তো কেনবার পার্টি রেডিই আছে- বায়না করে এসে স্যারকে একেবারে বগলদাবা করে নিয়ে গে- কি রাজু?

রাজু : এই তো- হেডে বেরেন লড়েচে। পটাইদা, আমি স্যারের সঙ্গে কালকের টাইম করে আসি। বিকেলে দেখিয়ে নোব, বায়না তো সকালে হয়েই যাচ্চে?

পটাই : দেখ বাপু, ভাল করে ভেবে নাও। জমি অঢেল আছে, মাঠকে মাঠ, আগে দেখিয়ে পছন্দ করিয়ে তারপর টাকা দিলেও হবে- অবিশ্যি যদি বায়না না হয়ে গিয়ে থাকে -

রাজু : পছন্দ না হলে বায়নার টাকা ফেরত নিয়ে নেব। তোমার হাতের লোক তো? কি জী বললে-

পটাই : সিংজী, হ্যাঁ, সে হবে না কেন। এক কাজ করি, মাল নিয়ে কালকে তোমার অফিসে থেকখনে। আমি স্যারের সেক্রেটারীকে নিয়ে আর পারলে ম্যাডামকে নিয়ে তোমাদের তুলে নোব। কিন্তু ম্যাডাম যেন টের না পায় যে জমিটা সিংজীর। ওরা কিন্তু ডাইরেক্ট করে নেবে, তুমি আমি আঁটি চুষতে রয়ে যাব তখন।

বাটু : জিও কাকা! যদি পারো পটুভাই যা কমিশন দোব না! বাকী লাইফ আর গাড়ী

চালাতে হবে না। শুধু গাড়ী চড়বে!

অন্ধকার

অষ্টম দৃশ্য

নীনা মলয় আর রতন আসে। রঘু সিংজীর মেক-আপে খাটিয়ায় বসে।

নীনা : এবারে লাস্ট সীন। রঘু-না, না, সিংজী। দেখি মেকআপটা— পারফেক্ট! তোমায় তো বাটু কোম্পানী আগে দেখেনি কখনো?

রঘু : নাঃ।

নীনা : কিন্তু ভুলেও বাংলা বলে ফেলো না যেন। সিংজী , ডায়ালাগ ইয়াদ হ্যায়?

রঘু : হান জি।

নীনা : থার্ড বেল!! **(নেপথ্যে হাম্বা-আ-আ-আ- করে গরু ডেকে ওঠে)**

(বাটু ও রাজুকে নিয়ে পটা ঢোকে। সবারই প্যান্ট গোটানো।)

বাটু : ও ভাই পটাই। এ কোতায় আনলে গো? চাদ্দিকে অঢেল গোবর শুদু- এ গন্দে তো শালা যৌবনে টানা মাল অব্দি উটে আসচে।

পটাই : খাটালে কিসের গন্ধ ছাড়বে আবার? গরুতে গোবর দেবে না তো কি মটন বিরিয়ানি দেবে? বললুম তো এ ডীলটা থাক।

বাটু : রবিদা? কোন রবি?

রাজ : কি বলেছিলুম বাটু দা? রবিদা সিনে ঢুকে গেছে। এই পটাদা, বাঘের ভেড়ির রবি তো?

পটাই : হ্যাঁ, তোমাদের কাছে ভাঙ্গিনি, আমি ওরই এজেন্ট। তোমরা বেটার পজিশানে আছ দেখে তোমাদের দিকে ঝুঁকে পড়লুম। খবরদার আমার নাম করবে না। কিন্তু স্যারের কাছে- রবিদার কানে গেলে-

বাটু : কি কান্ড মাইরি! শোন ভাই, ডিলটা করিয়ে দাও, কাকে পক্ষীতে কিচ্ছুটি জানতে পারবে না। এ ব্যবসার কানুন আমরাও জানি-

রাজু : কিন্তু এতদূরে- এই ধ্যাধধ্যাড়া গোবিন্দপুরে স্যার জমি নেবে তো?

বাটু : এবারে তুই কিন্তু ঢ্যামনামো করচিস রাজু। শুনলি তো কিষিকাজ্য। কিষি কি শহরের মাঝমধ্যিখানে হয় নাকি? আর পটাই ভাই, চাদ্দিক কেমন গোবরে গোবর দেখছ, সারফার দেওয়াও চলবে ফিরিতে- কিষির জন্য এর চে' ভাল জমি স্যার পাবেন কোতায়?

পটাই : সিংজীকে আওয়াজ দিই তাহলে? কাগজপত্তর সব রেডিই আছে, বায়নাটা করে যাও-ক্যাশ?

বাটু : এনিছি। তবে সব কিন্তু নগদে- আমাদের বুঝলে না ঐ চেকফেক হেঁ হেঁ হেঁ-

পটাই : বুঝিছি হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ - ও সিংজী-

রঘু : আইয়ে-বৈঠিয়ে- এ কোই হ্যায় তাজা দুধ লেকে আনা মালাই মারকে-

অন্ধকার

নীনা : লোভ বড় বিষম বস্তু- বিষময়ও বলা চলে। অনেকটা পৈটিক গোলযোগের মত। একেবারে কাপড়ে চোপড়ে করে ছাড়ে। বাটু পাইক জমি বায়না করবে ক্যাশ দিয়ে- ডিল হবে পরদিন- মা বগলার উদ্দেশ্যে আজ রাতে ডবল বোতল চড়বে- **(বাটু আর রাজু ডিল করতে যাচ্ছে)**

বাটু : ব্যাগ থেকে সেন্টের শিশিটা দে তো- আর একবার মেরে নি-

রাজু : বললুম অত খেয়ো না। ডিলের আনন্দে শালা পোঁদ খুলে টানলে- মাইলখানেক দূর থেকেও গন্ধ পাওয়া যচ্ছে-

বাটু : থাম তো! গন্দ পাাওয়া যাচ্ছে! তুই বুঝি সাগুবাল্লি খেয়ে আচিস কাল থেকে? সব দেখেছি আমি, নেশার ঘোরে শালা আমার সন্ধেমালতীর ঝোপে মুতেছ। আজ ডিল না থাকলে তোমার-

রাজু : এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। থামবে তুমি? চল এবারে, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

(হোটেলের লবিতে কেতা দূরস্ত একজন লোক ওদের আটকায়)

লোকটি : এক্সকিউজ মি স্যার- কোথায় যাবেন?

রাজু : ডি ন্যাগ চৌধুরী- কিষিকাজ্যবিদ-

লোকটি : **(খাতা দেখে)** স্যরি স্যার, ঐ নামে গত একমাসে কেউ এখানে চেক ইন করেন নি। খাতা দেখতে পারেন ইচ্ছে করলে-

বাটু : ধুস, আপনার মিস্টেক হচ্চে। আজ আমাদের সঙ্গে পয়েনমেন ছিল। আরে সোনার চশমা, স্যুট পড়া, হাতে এব্বড় সোনার ঘড়ি- মেয়ে-হ্যাঁ। সঙ্গে মেয়ে ছিল-

রাজু : ইয়াব্বড় সাদা গাড়ী-ঢাউস নৌকোর মত- ডাইভারের নাম পটাই-

লোকটি।। পটাই? না স্যার, আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। এই তো রেজিস্টার- নিজেরাই দেখে নিন না- আচ্ছা, আমি না হয় আরেকবার দেখছি-

বাটু : রাজু! লম্বা মতন- হেবি দেখতে- রেগে গেলে উলুলুলু-ইয়ে হনলুলুর ভাষা ছাড়া কথা বলেন না।

লোকটি : না - পেলাম না ভাই। আপনারা বোধহয় ভুল হোটেলে এসেছেন। আচ্ছা, ওনার কোন কার্ড আছে? দিন তো, দেখি-

বাটু : ঠিক বলেছেন, বোধহয় ভুল হয়েছে। এই রাজু চল- **(রাজুকে এককোণে টেনে নিয়ে যায়)**

রাজু : কি হল? চল মানে?

বাটু : শালা ছুঁচো! এখেনে দাঁড়িয়ে বাওয়াল করলে কি হবে ভেবে দেখেচো?

থানা-পুলিশ, খবরের কাগজ, টিভি- কেওন হয়ে যাবে রে শালা! চল— তোর মাল কামানোর ইয়েতে আছোলা দিচ্ছি গিয়ে-

রাজু : চিটিংবাজী ! আম্মো রাজীব নস্কর বোকার! দেখে নেব। যেতে হলে তুমি যাও। আমি ঐ বাঞ্চোত সিংজী না কে তাকে দেখে আসছি। কাগজপত্তরগুলো দাও দেখি-

অন্ধকার

নীনা : কোথায় সিংজী? রাজু ওখানে গিয়ে দেখবে গরু গোবর সব সমেত অগাধ জমি তেমনই পড়ে রয়েছে। শুধু সিংজী পালটে গেছে। আগের দিন খাটালশুদ্ধু সব্বাইকে ভিডিও পার্লারে সিনেমা দেখতে পাঠান হয়েছিল, গরুগুলোকে ছাড়া। ওটা তো প্রপার কলকাতার খাটাল তুলে দিয়ে বিস্তীর্ণ যে সব গরু আবাসন করা হয়েছে তারই একটা। **(বাটুর বাড়ি। বিধ্বস্ত অবস্থায় রাজু আসে)**

রাজ : এক রাত্তিরের মধ্যে দুনিয়া বিলকুল বদল গয়া বাটুদা। সিংজী বদল গয়া, খাটিয়া বদল গয়া- সির্ফ গোবর হী গোবর চারো তরফ-

বাটু : যেমন তোর মাথার ভেতর- গোবর হী গোবর! আওয়াজ নীচু- চেঁচিয়েছিস কি :তোর ঐ খোপড়ির গোবরে জোনাক পোকা গুঁজে দোব- শালা এভাবে জ্বলবে, জ্বলবে নিভবে-

রাজ : তাই দাও বাটুদা- জিন্দেগী বরবাদ হো গয়া-

বাটু : এই গাড়োল- বাঙালীর ছেলে বাংলায় কাঁদ না। আগে পুকুরে পা-ফা ধুয়ে আয়- ভর ভর করে গরুর গুয়ের বাস ছাড়ছে মাইরি-

রাজু : কি টুপি দিল বাঞ্চোতগুলো-

বাটু : আরও লোভ কর- ছ্যাঃ! তোর জন্যেই তো- ডীল করবে! টাকার নামে নালঝোল পড়ে যাচ্ছিল একেবারে!

রাজু : কি আমার জন্যে? তুমি ছেড়ে দিলে কেন? তোমার বুঝি টাকা চাই না? নাক ভাঙা বুদ্দদেব আমার! বাটুদা- এ্যাই বাটুদা- পকেটমে মেশিন, মেশিনমে দানা- চলো উড়া দেঁ উস হারামীকা খোপড়িখানা-

বাটু : এঁ- ডায়ালগ মারচে দেখ! বাংলু টানা ভুলভাল মাল যত সব! তোর এখনও শিক্ষা হয় নি, না? গরম কাটেনি এখনও? চুপ থাক। একদম সন্নাটা।

রাজু : কেন বাটুদা?

বাটু : অপোজিশানে এই নিউজটা লীক হলে আমাদের পোজিশান কি হবে দেখেচিস? শালা সাদা জল- পেলেন ওয়াটার-হুইস্কির সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে জিতে গেছে- এ কথাটা জানা হয়ে গেলে মার্কেটে আর কাউকে কোনদিন চমকাতে পারবি? শেয়ারের দাম পড়ে একেবারে মাইনাসে চলে যাবে- ইজ্জত কা সওয়াল বে!

অন্ধকার

নীনা : নাটকটা শেষ করবে কাকু- **(বাটুর বাড়ি। বাবা টাকার ব্যাগ নিয়ে আসেন)**

বাটু : **(চমকে)** কে বে?

বাবা : আজ্ঞে, বাটুবাবু, আমি।

বাটু : রাজু!!

বাবা : ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে ভুলে গেলেন? সেই যে জমি-লাউমাচা- টাকাটা নিয়ে এসেছিলাম।

রাজু : আমরা কাউকে ভয় পাই না কাকা। দিন-

বাবা : বাড়ী করব বলে যেটুকু রেখেছিলাম তার থেকেই নিয়ে এলাম আর কি-

রাজু : বাটুদা! মুখে মশা ঢুকে যাবে যে! হাঁ করে রইলে কেন? কাকার কাগজ ফাগজ ফেরত দাও। মা লক্ষ্মী সেধে চৌকাঠ পেরিয়েচেন- ঘরে তোলো।

বাটু : খিড়কী দিয়ে বেরুল আবার সদর দিয়ে ঢুকল-

রাজু : কে? মা লক্ষ্মী তো? উনির কেসটাই ওরকম-

বাটু : কেসটা গড়বড় লাগছে না রাজু? কোনটা বেরুল আর কোনটা ঢুকল? এ মালটা সেদিন পাঙ্গা নিয়ে গেল আবার আজই মাল্লু লিয়ে হাজির- গুলিয়ে যাচ্ছে বে! যাক গে, টুপি পরার খবরটা লোক জানাজানি না হলেই সব ঠিক আছে।

রাজু : কি বিড় বিড় কচ্চ? মালটা এন্ট্রি করবে না? বয়েস হচ্ছে এবারে বগলা খাওয়াটা কমাও। শেষ কালে অ্যালজামা হয়ে ভেবলে বসে থাকবে-

বাটু : অ্যালজামা? পায়জামা জানতুম কিন্তু- তুইও কি আজকাল হনুলুলুর ভাষা বলচিস?

রাজু : হাবুদার হয়েছে তো, জানো না ? শুধু একটা গান মনে আচে- বসে বসে গাইচে হোল ডে-

বাটু : মনে পড়েছে - **(গান)** দোষ কারো নয় গো মা। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা-

(দেখা যাবে হাতকাটা হাবু গানটা গাইছে। রঘু আর চাঁদু মিলে জমির সামনে সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে-এতটুকু বাসা। মা আর বাবা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দেখছেন। নীনাও তার দলবল নিয়ে আছে। বড়দা কেটলী থেকে চা ঢেলে সবাইকে দিচ্ছে। গান চলতে থাকে, পর্দ্দা পড়ে।)

যবনিকা

শ্যামবাবুর ডায়েরী

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

চরিত্র ঃ শ্যামাচরণবাবু, মন্মথ লাহিড়ী, ঝন্টু

একটা ভাঙ্গা অফিস বাড়ির সামনে এক ভদ্রলোক ইতস্তত ঘুরছেন, যেন কাউকে খুঁজছেন। এমন সময় সেই অফিস বাড়ির ভেতর থেকে আর একজন লোক বেড়িয়ে আসেন। সে প্রথম ব্যক্তিটির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

১ম - আমি মন্মথ ভাদুড়ী। শ্যামপদ মিত্রকে খুঁজছি।

২য় - আমিও শ্যাম তবে পদ নয় চরণ, আর মিত্র নয় গুপ্ত।

মন্মথ - ও! তা উনি কি আছেন?

শ্যামা - আজ্ঞে না উনি বিকেল চারটেয় বেড়িয়ে গেছেন।

মন্মথ - কোথায়?

শ্যামা - ওর বাড়ি দত্তপুকুর। বড় নাতিটার নাকি শরীর খারাপ। তাই বাড়ি চলে গেলো।

মন্মথ - তবে তো...। আচ্ছা আমি চলি।

শ্যামা - কোন বিশেষ দরকার ছিল? (মন্মথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়) আমাকে বলা যায়?

মন্মথ - ওনাকেই তো বলার কথা-

শ্যামা - আমাকেও বলতে পারেন। আমরা দুজনেই শ্যামা। শুধু গুপ্ত আর মিত্রের তফাৎ।

মন্মথ - মানে—

শ্যামা - মানে আমাদের দুজনের মধ্যে কোন কিছুই গুপ্ত নয়। দুজনেই দুজনের কাছে প্রকাশ মিত্র, আপনি যে আসবেন সেটাও আমাকে বলেছিল ও। হঠাৎ ওই নাতির শরীর খারাপের কথা শুনে চলে যেতে হ'ল। তা না হলে এতক্ষণে এখানে বসে শুরু হয়ে যেত আমাদের জমাটি আড্ডা।

মন্মথ - আপনারা দুজনেই কি এখানে থাকেন?

শ্যামা - আর কোথায় যাবো বলুন। আমার বাড়ি বাসন্তী ছাড়িয়ে। এই বয়সে আর

অতদূর থেকে যাতায়াত পোষায় না। দুই সপ্তাহ অন্তর একবার আমি আর একবার মিত্র বাড়ি যাই। তা বসুন না। (একটা চেয়ার দেখায় মন্মথ বসে। আর একটা হাতল ভাঙা চেয়ারে নিজে বসে।)

মন্মথ - অফিসটা চলে তো?

শ্যামা - খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জনা ছয়েক কর্মচারী আছে। তারা সব দশটা পাঁচটা বাবু।

মন্মথ - শুধু আপনারা দুজনেই ....

শ্যামা - মায়া পড়ে গিয়েছে রে ভাই। এতসব পুরোনো খবর, তথ্যভাণ্ডারে জমা রয়েছে এখানে। তা আপনিও তো একজন সোনা খোঁজা মানুষ।

মন্মথ - ওই আপনাদের মতো ... নেশা বলতে পারেন।

শ্যামা - তা আজ কোথা থেকে?

মন্মথ - দমদমে দত্তবাবুর কাছে সন্তোষ বাবুর "কিনু গোয়ালের গলি"র প্রথম সংস্করণটা আছে। সেটা পেলাম। বাড়তি লাভও একটা হলো— 'কৌরব' একটা উৎপল বসু সংখ্যা করেছিল, সেটাও পেলাম।

শ্যামা - তা আপনি এগুলো নিয়ে করেন কি? বিক্রি বাটা?

মন্মথ - আজ্ঞে না । শুধু সংগ্রহ করি।

শ্যামা - শুধুই সংগ্রহ।

মন্মথ - আজ্ঞে হাঁ। এই পুরোনো বই, পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেমন একটা জীবন আছে। একটা বিশেষ সময়, বিশেষ কাল, বিশেষ পর্ব কেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমিও তখন ওই সময়ে ঢুকে পড়ি। এই সময়কালের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াই।

শ্যামা - (উল্লসিত হয়ে ওঠে) আরে মশাই আপনি তো আমাদের মতো একই গোত্রের মানুষ। পুরোণো কালের প্রেমে আমরা এখন মাসতুতো ভাই। দাঁড়ান এক পাত্তর হয়ে যাক্ । (একটা পুরোণো ফ্ল্যাস্ক থেকে মদ ঢেলে নিজে নেয় এবং মন্মথকে দেয়) উল্লাস উল্লাস। এটা আমার ঋত্বিক বাবুর কাছে শেখা।

মন্মথ - আপনি ঋত্বিক ঘটককে দেখেছেন, না।

শ্যামা - আসলে এই বাড়িটায় কত শিল্পী, লেখক কবি যে এসেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব এখন অতীত।

মন্মথ - সেই অতীত আঁকড়ে বসে আছেন। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করে না।

শ্যামা - "যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?" কেমন দিলাম কবির বাণী। আসলে কি জানেন ভাই, স্মৃতি নির্জনতায় কোনো মৃত্যু নেই। আপনিইবা সব ছেড়ে শুধু অতীতের সন্ধানী হলেন কেন বলুন নিশ্চয় প্রেম আছে।

মন্মথ - আপনি বলেই বলছি, এ এক আবেগ। সমাজ সংসারের লোকের নিন্দা-মন্দ পেরিয়ে এ এক নিষিদ্ধ আবেগ।

শ্যামা - তাই এখানে এসে পড়া?

মন্মথ - একদম ঠিক । আচ্ছা একটা কথা বলবো?

শ্যামা - সেই ডায়েরীটার কথা তো?

মন্মথ - আপনি জানেন?

শ্যামা - মিত্র বলে গেছে তো। আপনি যেন থাকেন কোথায়?

মন্মথ - বহরমপুর আর বেলডাঙ্গার মাঝে ভাবতা বলে একটা জায়গা আছে, চেনেন?

শ্যামা - একবার কি একটা কাজে বহরমপুর থেকে ফেরার পথে নেমেছিলাম। বাবুদার এক আত্মীয়দের বাড়ি। এক মহিলা বাবুদার দিদিই বোধহয় - খাইয়েছিলেন ডিম ভাজা, মাছ ভাজা, আলু ভাজা, খিচুড়ি বর্ণনা রহিত উপাচার।

মন্মথ - আমার মা। (শ্যামা তাকায়) এখন নেই; ন'বছর হল চলে গেছেন।

শ্যামা - আপনি বাবুদার নিজের ভাগনে?

মন্মথ - একমাত্র। তাই তো—

শ্যামা - ডায়েরীটা দেখতে চাইছেন? অধিকার অধিকার—। আপনার মত আরও একজন এই অধিকার বলেই একটা পুরোনো পত্রিকার খোঁজে এসেছিলেন। দিল্লির মিহির রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রাংশু' পত্রিকা। মিহিরবাবুর ছেলে।

মন্মথ - আপনার সব কথা মনে থাকে?

শ্যামা - মনে রাখাটাই তো আমার কাজ। আচ্ছা মন্মথবাবু আপনার পেশা কি?

মন্মথ - প্রাইমারী স্কুলে ইংরাজি পড়াই।

শ্যামা - আর মামার মত অভিনয়—

মন্মথ - অবরে শবরে— তবে বাচ্চাদের দিয়ে করাই।

শ্যামা - বাবা, একেবারে পরিচালক। তা পরিচালক মশাই এক কথায় বলুন তো অভিনয় কী?

মন্মথ - "টু এ্যাক্ট ইজ বোথ টু ডু এন্ড প্রিটেন্ড টু ডু"।

শ্যামা - ও আপনি তো আবার ইংরাজি পড়ান।

মন্মথ - বলছি, ডায়ারীটা কি মিত্তিরবাবু রেখে গেছেন?

শ্যামা - হচ্ছে হচ্ছে। এত তাড়া কীসের আজ তো আর বাড়ি ফিরছেন না।

মন্মথ - না কাজ হয়ে গেলে, রাতের লালগোলাটা ধরতাম।

শ্যামা - এত স্বার্থপর কেন মশাই আপনি? দেখছেন মিত্র নেই, একা এই হাফ্ বুড়ো বসে আছি। তাকে সঙ্গ না দিয়ে, কাজ শেষ করেই চলে যাবার মতলব।

মন্মথ - ঠিক আছে, ঠিক আছে উঠছি না এখন। তা বলছিলাম কী, ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

শ্যামা - জিনিয়াস মশাই জিনিয়াস। মানিকবাবু, ঋত্বিকবাবু দুজনকেই সম আসনে রাখি আমি। "কেন চেয়ে আছো গো মা"। শাওঁলির চোখের দিকে তাকিয়ে যখন গেয়ে ওঠেন— আহা— শালা ক্যামেরার লেন্সে মাল ঢেলে দিলেন— বাস্তবতা ছাড়িয়ে পরাবাস্তবতা।

মন্মথ - একটু অগোছালো—

শ্যামা - কাকে অগোছালো বলছেন মশাই। পুরোণো বই তো খুব সংগ্রহ করেন, ঋত্বিকের 'অন কালচারাল ফ্রন্ট' পড়েছেন।

মন্মথ - হ্যাঁ পড়েছি।

শ্যামা - এই যে আপনাদের পলিটিক্যাল লেফ্‌ট রাজনৈতিক বামপন্থা যখন প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ছে, তখন এগিয়ে আসা উচিৎ কালচারাল ফ্রন্টের। তো সেটা কবে বলে গেছেন, ঋত্বিকবাবু— বোহেমিনিয়ানিজমকে অগোছালো বলছেন— তাহলে তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চাটুজ্জে, পল গঁগ্যা, ভ্যানগঘ্ সবাই অগোছালো। আর নজরুল "দে গরুর পা ধুইয়ে"।

মন্মথ - আপনি বিরুদ্ধ মত শুনতে চান না।

শ্যামা - মুর্খের মত, অশিক্ষিত যুক্তিহীন বিরুদ্ধ মত শুনতে চাই না।

মন্মথ - দুঃখিত।

শ্যামা - ঠিক আছে, ঠিক আছে। আসলে কি জানেন না। বুজে সুজে ইদানিং অনেকেই এমনতর কথা বলেন। না জেনে, না পড়াশুনা করে অতীত ইতিহাস অস্বীকার করার একটা পর্ব শুরু হয়ে গেছে এখন, তাই....

মন্মথ - আমি জানি। আমাকেও এমন অবস্থার মুখে পড়তে হয়েছে।

শ্যামা - অর্বাচীনের দল।

মন্মথ - আমি কিন্তু অতীতেই বেশি আগ্রহী। তাই তো এদিক সেদিক থেকে পুরোনো বই-পত্র, ছবি, ফোটোগ্রাফ জোগাড় করি। সেদিন একটা রেয়ার ফোটোগ্রাফ পেলাম— সত্যজিৎ রায় আর ঋত্বিক ঘটকের। ফোটোগ্রাফের পেছনে লেখা আছে "ঋত্বিকবাবুকে ঢ্যাঙা"।

শ্যামা - বললাম না দুজনে দুজনকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

মন্মথ - আর একবার, এক এ্যানথ্রোপলজির অধ্যাপকের কাছ থেকে ১৯৫২ এডিশনের ক্রোবারের বইটা পেয়েছিলাম। আমেরিকান কনস্যুলেটে কাজ করতেন প্রদীপদা, উনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নেওয়া এক আমেরিকান সৈনিকের ডায়েরী। সেখানে একটা ভিয়েতনামী মেয়েকে ধর্ষণের যে বীভৎস বর্ণনা আছে, তা পড়লেই মাথায় রক্ত চড়ে যাবে। মনে হবে এক্ষুণি গিয়ে টুটি চিপে ধরি এই সব সৈনিকদের।

শ্যামা - আবার ভুল জায়গায় আবেগ প্রকাশ করতে চাইছেন। না থাক্। আপনার ছোট বেলার বাবুদাকে কেমন দেখেছেন, বলুন তো।

মন্মথ - আমি তো মামাবাড়িতেই মানুষ। আমি যখন খুব ছোট তখন মামা দেবু মামাদের সঙ্গে নাটক করতে গেলে মেকআপ তুলতো না। বাড়ি এসে মশারী তুলে দিদু'র পাশে শুয়ে থাকা আমাকে, কর্ণাজুনের কর্ণ'র মেকআপ দেখিয়ে তবে তা মুছে ফেলতেন, আবার দুপুরে স্নান করে দিদু যখন পুজোর ঘরে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছে তখন আমাকে বুকে শুইয়ে দিয়ে মামা রবি ঠাকুরের ' দেবতার গ্রাস' বলতে বলতে শেষ লাইনে এসে যখন বলতো "ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি উদ্ধশ্বাসে ব্রাহ্মণ মুহূর্ত মাঝে ঝাঁপ দিল জলে। আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।" তখন মামার চোখে জল আর মামার বুকে মুখ লুকিয়ে আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না; সে কি আমি ভুলতে পারি বলুন।

শ্যামা - আপনি অরুণ রায়ের নির্দেশনায় বাবুদার প্যাট্রিস লুলুম্বা দেখেছেন?

মন্মথ - না

শ্যামা - নট্ট কোম্পানিতে দেব গোপাল, তরুণ কুমারের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত পালায় চাণক্য। স্টারের মঞ্চে পাটাতনে কাল্পনিক কুশ তুলতে তুলতে বিড় বিড় করে সলিলকি বলা; বা অরুণ দাশগুপ্ত, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, চপন রানীর সঙ্গে ভরতবিদায় পালায় ভরতের অভিনয়।

মন্মথ - না দেখিনি।

শ্যামা - ধুর মশাই, তাহলে তো আপনার মামাকে আপনি চেনেনই না।

মন্মথ - সেই জন্যই তো ডায়েরীটা চাইছি।

শ্যামা - হচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা আপনার মামার কোন জিনিসটা বাজারে খেতো বলুন তো?

মন্মথ - (উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, শ্যামা একটু থমকে যায়) হাসি। সব পালায় মামার এই হাসি দেখতে চাইতো লোকে।

শ্যামা - এমনকী চিৎপুরের গদীতে বায়না করতে এসেও, নায়কদের হাসি শোনার বায়না পাগল করে দিতো দলের মালিক, ম্যানেজারকে।

মন্মথ - অথচ জানেন এই হাসিটা কিন্তু মামা নিজে পারতেন না। উৎপল দত্তের কাছে শেখা। এটা পাগল একটা একস্‌সাইজ। অনেকটা গার্গল করার মতো, পেটের ভেতরের হাওয়াটাকে গলা দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

শ্যামা - উঃ! এও জানা আছে দেখি। তবে এটা জানেন কী যে কল্লোলের কিছু রিভাইভাল শোয়ে উনি শার্দুল সিং-এর পার্ট করেছেন। আর একটা বিশেষ শোয়ে উৎলবাবুর অনুপস্থিতিতে উনি *(টিনের তলোয়ারে)* বেনীমাধব সেজেছিলেন।

মন্মথ - "সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেন? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা তো ছিলাম ভায়ে ভায়ে গলাগলি করে হিন্দু মুসলমানে প্রীতির বাহু বেঁধে, বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুল ঢেকে হাজার হাজার ক্রোশ দূরে এদেশে এসে কেনে এ বুট জোড়া মাড়াগে দিলে মোদের এই স্বাধীনতা?"

শ্যামা - "কেন এয়েছে জানো না তিতুমীর? এরা হার্মাদ, জলদস্যু, এয়েছে লুট করতে। নারীর সতীত্ব নাশ করে, সোনার ভারতকে ছাড়খার করে চলে যাবে সপ্তডিঙ্গা ভাস্যে।

মন্মথ - যতক্ষণ এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়ায়ে থাকবে ততক্ষণও এই ওয়ায়বি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে না।

শ্যামা - *(হাততালি দেয়ে। মানুষকে জড়িয়ে ধরে)* বাঃ। এই নাহলে বাবুদার ভাগ্নে।

মন্মথ - মামার ডায়েরীটা পাবো।

শ্যামা - বেশ হচ্ছিল কথাবার্ত। হঠাৎ রসভঙ্গ।

মন্মথ - ডায়েরীটা আমার খুব দরকার।

শ্যামা - কেন, দরকারটা কীসের, কি ধনরত্ন পাবেন ওই দু-তিনটে সুরের ডায়েরীর মধ্যে।

মন্মথ - তিনটে ডায়েরী আছে বুঝি।

শ্যামা - পাঁচটা। মিত্তর তিনটে জোগাড় করতে পেরেছে। আর দুটো বোধ হয় পড়ে আছে ওই ঘেঁটু কুমারীর ঘুঁটের গাদায়।

মন্মথ - সে দুটো যে আমি কোনো মতেই জোগাড় করতে পারবো না, তাতো আপনি জানেন। তাই এই ডায়েরী তিনটে যদি হাতে পাই।

শ্যামা - দেখছি কি করা যায়। আচ্ছা বলুন তো পালা গানের সংগঠনে বাবুদা একটা বিপ্লব নিয়ে এসেছিলো? সেটা কি?

মন্মথ - প্রমপট্ না শুনে পার্ট বলা *(শ্যামা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়)*, কথাকলি মেকআপের মত জৈব রং ব্যবহার করা *(শ্যামা অসম্মতি জানায়)*, তবে গানের আগে সাত্ত্বিক জীবন যাপন করা।

শ্যামা - ধুর মশাই, এর কোনটাই নয়। তবে এমন কাজ করেছিলেন যে এত বছরের পালা গানের ইতিহাসে তা এক যুগান্তকারী বিপ্লব নিয়ে এসেছিল।

মন্মথ - কি কাজ?

শ্যামা - পালা গানের দলগুলোর কাঠামোটা জানেন? সাংঘাতিক এক স্তরবিন্যাসগত অসমতা রয়েছে। মেকআপ করার সময় সব থেকে উঁচু ট্রাংক নায়কের বা দলের প্রধান অভিনেতার, তারপর থেকে অভিনেতাদের ক্রমিক মানও বেতন অনুযায়ী ধাপে ধাপে ক্রমনিম্ন স্তরে বসার আসন। খাবার সময় মাছের মুড়ো ও পেটি পড়বে প্রধান অভিনেতার পাতে। এরপর ওই নামতে নামতে একেবারে শেষে কলাই করা থালায় তেজপাতার মত মাছের টুকরো বা ল্যাজা। এছাড়া এক-আনি, দু-আনি তো আছেই।

মন্মথ - এক-আনি, দু-আনি জানি। নট্ট কোম্পানীর এই দু-আনি বিমল আমার খুব বন্ধু ছিল। কিন্তু এগুলো জানতাম না।

শ্যামা - অথচ এই স্তরভেদই যাত্রা সংগঠনের নিয়ক্লিয়াস।

মন্মথ - তা মামা কি করেছিল?

শ্যামা - বাবুদার তখন লোকনাট্য-এ, নীলমণিদের দলে। একদিন দুপুরে খাওয়ার সময়ে কারো কারো পাতে দুটো তিনটে ডিম, কারো পাতে একটা, আবার

কারো পাতে শুধু আলু, ডিম নেই। বাবুদা ওর সাঙ্গোপাঙ্গো ইন্দ্র, নিরঞ্জন এদের দিয়ে রান্নার জায়গায় গিয়ে ভাতের থালা উল্টে, ম্যানেজার সতীশবাবুর মুখে ডিম সমেত ডিমের ঝোল ছুঁড়ে ফেলেন। রাতারাতি খাবার পরিবেশনে অসমতা দূর। এ এক বিপ্লব তো, না কী বলুন।

মন্মথ - তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়। আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা। আত্মায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতনের শব্দ/ শৈশব থেকে বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস / তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়।

শ্যামা - মামার মৃত্যুর শোকগাথা—

মন্মথ - আজ্ঞে না। চে গুয়েভারার প্রতি, আমার না সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা। আপনার মুখে মামার কথা শুনে লাইনগুলো মাথায় এলো।

শ্যামা - এই মশায় বাড়াবাড়ি করবেন না। বাবুদা মোটেই চে গুয়েভারা নন। তবে হ্যাঁ, পালাগানের জগতে এক প্রতিবাদী মেঠো বাঁশীওয়ালা।

মন্মথ - বলছি হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালার গল্প ছেড়ে আমাকে ওই ডায়েরীটা দেবেন।

শ্যামা - ডায়েরীটা চাইছেন কেন বলুন তো?

মন্মথ - *(একটু ইতস্ততঃ করে তারপর বলে)* দেখুন মামা মারা যাবার পর বহরমপুরের ওই বাড়িটা আমার মামাতো ভাইয়েরা পাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় হচ্ছে। আমার দ্বিতীয় মামিমা, জানি না অবশ্য তাকে মামিমা বলা যাবে কিনা কারণ আমার নিজের মামিমাকে মামা তো ডিভোর্স দেন নি। তা মামা ডায়েরীতে কিছু লিখে গেছেন কিনা সেটা জানা দরকার। তাছাড়া ডায়েরীতে মামা যে ছোট ছোট নাট্যাংশ লিখতো সেটাওতো উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদেরই পাবার কথা।

শ্যামা - ডায়েরীতে কোন নাট্যাংশ নেই। আমি পড়েছি কবে কোথায় গান, শম্ভুবাগ, ভৈরবপুর, উৎপলবাবুদের সঙ্গে কবে কি কথা হল সেসব লেখা আছে।

মন্মথ - কিন্তু -

শ্যামা - ওটা লেখা আছে। বাড়িটা পাবে ওনার প্রথম পক্ষের ছেলেরাই। আপনাদের মামা বাড়ির সিঁড়ির নিচে যে ঠাকুর ঘর, তার মধ্যে কালো রঙের কাঠের বড় বাক্সের মধ্যে বাদাম কাঠের একটা ছোট্ট বাক্সে মামার উইল লেখা আছে। খুঁজুন গিয়ে, পেয়ে যাবেন।

মন্মথ - ডায়েরীতে লেখা আছে। (শ্যামা সম্মতি জানায়) তবে ডায়েরীটা আমায় দিন।

শ্যামা - না এ ডায়েরী আমি দেব না।

মন্মথ - কেনো?

শ্যামা - ডায়েরীটা আমার কাছে আছে আমার কাছেই থাকবে।

মন্মথ - আমার মামার ডায়েরী, আপনার কাছে থাকবে কেন?

শ্যামা - থাকবে, এটা এতদিন আমার কাছে আছে বলে, এখনও আমার কাছে থাকবে।

মন্মথ - একি মামা বাড়ির আবদার নাকি?

শ্যামা - মামা বাড়ির আবদার তো আপনিই করছেন। আপনার যেটা জানা দরকার তাতো বলে দিলাম। যান খুঁজুন গিয়ে—

মন্মথ - ডায়েরীটা নিয়ে তবে যাবো, মিত্র মশাই আমায় কথা দিয়েছিলেন।

শ্যামা - মিত্র দিয়েছে, গুপ্ত ফিরিয়ে নিচ্ছে।

মন্মথ - ডায়েরীটা দিন, প্লীজ।

শ্যামা - বললাম তো দেবোনা।

মন্মথ - আমি কিন্তু জোর খাটাবো।

শ্যামা - আমি বুঝি জোর খাটাতে জানি না।

মন্মথ - শ্যামাবাবু ডায়েরীটা দিন।

শ্যামা - না দেবো না।

মন্মথ - তবে রে বুড়ো। *(শ্যামার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্যামা সরে যায়। মন্মথ ভূমিতে পড়ে যায়। শ্যামা মন্মথকে লক্ষ্য করে ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে। মন্মথ পিছিয়ে যায়, চিৎকার করে ওঠে ....)*

শ্যামা - দেবোনা, দেবোনা এ ডায়েরী আমি দেবো না। *(শ্যামা বাড়ির ভিতরে অন্ধকারে ঢুকে যায়)।*

মন্মথ - ডায়েরীটা দিয়ে যান, শ্যামাচরণবাবু ডায়েরীটা দিয়ে যান ...। শ্যামাচরণবাবু শ্যামাচরণবাবু, শুনছেন শ্যামাচরণবাবু ..... *(মন্মথর ডাক শুনে এক মাঝ বয়সী লোক মন্মথের কাছে আসে)।*

লোক - উনি তো আজ বিকেলে বাড়ি চলে গিয়েছেন। তবে চরণ নয় পদ, শ্যামাপদ।

মন্মথ - না, না সেটা আমি জানি। আমি তো ডাকছি শ্যামাচরণ বাবুকে।

লোক - ভুল লোককে ডাকছেন বাবু।

মন্মথ - ভুল লোক! আপনি কে?

লোক - আমি ঝন্টু। ঐ গলির মোড়ে আমার চায়ের দোকান। দোকানে ঝাঁপ ফেলে খেয়ে দেয়ে শোওয়ার তোড়জোর করছি। এমন সময় আপনার গলা পেলাম। ভাবলাম এই এত রাতে এখানে কে শ্যামাবাবুকে ডাকছেন, এসে দেখি আপনি।

মন্মথ - এই ভাঙ্গা পুরোণো অফিস বাড়িতে কেউ থাকেনা?

ঝন্টু - আগে থাকতো, এখন কেউ থাকে না।

মন্মথ - কি বলছেন কী? শ্যামাচরণ এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললেন!

ঝন্টু - আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি। আপনি ভুল দেখেছেন। বললাম তো উনি বাড়ি চলে গিয়েছেন। শ্যামাচরণবাবু নেই.....।

মন্মথ - শ্যামাচরণবাবু নেই মানে ....?

ঝন্টু - নেই মানে নেই। আজ থেকে তিন বছর আগে এই বাড়িটায় ইলেকট্রিকের তার থেকে আগুন লাগে। সেই আগুনে পুড়ে যান শ্যামাচরণবাবু। শুধু বুকের কাছে হাত দিয়ে আগলে রেখেছিলেন কতগুলো ডায়েরী।

মন্মথ - কি বলছেন কী? *(মন্মথ প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেন। ঝন্টু এসে তাকে ধরে)।*

ঝন্টু - রাত বিরেতে এইসব ভাঙা বাড়ির সামনে না থাকাই ভালো। হঠাৎ হঠাৎ অচেনা কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। *(ঝন্টু গেয়ে ওঠে— আরে ধরবে কোথা মুঠোর মাঝে / বিদেহী সে দেহী খোঁজে)।*

ঝন্টু মন্মথকে নিয়ে চলে যায়। খানিকক্ষণ বাদে শ্যামাবাবুর হাতে আর একটা ডায়েরী নিয়ে ভাঙ্গা চেয়ারে এসে বসেন, তার মুখে স্মিত হাসি—

শ্যামা - এটা মানিকবাবুর ডায়েরী। দেখি, সন্দীপ না সৌরদীপ কে আসে? *(ওর মুখে হযবরল'র নেড়ার মতো অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে)*

স্বীকারোক্তি

সূত্র ঃ মার্টিন নিয়েমোলার

অনুপ রায়

চরিত্র: শান্তা ৪০+ , মাখন-৭০+ , কিংকর ৬৫+ , সেবক ১+ ২-৩৫ , নান্টু ১০+

(কোনও জনপদ প্রান্তে, রাস্তা থেকে ভেতরে গাছতলায় এক ছোট্ট চায়ের দোকান। পুরণো চাদর খাটিয়ে পেছনটা আড়াল করা। টেবিলের ওপর কয়েকটা বয়াম তার ভেতরে কেক্, বিস্কুট, চায়ের সরঞ্জাম। সামনে বাঁশের তৈরী একটা বেঞ্চ, গোটা দুই টুল। বাস করার জন্য একটা কুঁড়েঘর, সেটা দেখা যায় না)। সময় ঃ সন্ধ্যাবেলা

শান্তা : *(গাছ কোমর করে বাঁধা শাড়ি, কোমরে গামছা জড়ানো, ঝুঁটি বাঁধা খোঁপা, ঝাঁটা নিয়ে পরিষ্কার করতে করতে —)* দেকো কান্ড! সব্বত্তর আধপোড়া বিড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একশা! দেশোদ্ধারের তান্ডব চালিয়ে গেছেন তেনারা! ওনাদের কতায় নাকি উদ্ধার হয়ে যাবে দেশ! আবার বলে কিনা এ দোকানটা হলগে গণতন্তরের পাল্লামিন্ট! আসচে, বসচে গুলতানি মারচে, তাপ্পর চলে যাচ্চে নিজির নিজির ধান্দায়। এই খিস্তি খামারি এই গলায় গলায় ভাব। *(হাসি)* পারেও বটে! আচ্চা পাল্লামিন্টেও এমনিধারা কান্ডি হয়? *(পর্দার পেছনে যায় নেপথ্যে কেষ্টকন্ঠ)*

কেষ্ট : এই মিন্তি, আবার জ্বালাতন করছিস্! মাকে বলে দেব দেখবি— *(নেপথ্যে শান্তা কন্ঠ)*

শান্তা : *(নেপথ্যে)* ওই-ওই, লেগে গেল দুই ভাই বোনের খেয়োখেয়ি! এই, এই, ঝগড়া কচ্চিস কঞ্চির বাড়ি খাবি বলে! দু দন্ড যদি শান্তিতে থাকতে দেয় আমারে! (প্রবেশ করে খোলা চুল গায়ে জড়ানো গামছা, হাতে ধূপ) মায়ের দুদ্দশা দেকতে পাওনে তো! কোতায় চাদ্দিকের ঝড়-ঝাপটা সামলে টিকে রয়েচি। কত রিশকাঅলা, সব্জিঅলার ছেলে মেয়েরা মানুষ হয়ে উঠচে— আর এনারা? যেদিন ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দোব সেদিন বুঝবি ঠ্যালা *(ধূপ দেখিয়ে, চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে কুঁড়েঘরের ভেতরে যায়।)*

(ক্ষণ বিরতি। ভারি বুটের শব্দ। প্রবেশ করে ১ , ২)

১ : *(চারিদিক দেখে নিয়ে)* এটাই সেই ঠেক না?

২ : হোয়াটসএ্যাপ খুলে দেখ না। *(পায়চারি করে)*

১ : *(পড়ে নিয়ে)* হিসেব মতো ঠিকই আছে। কিন্তু শুনশান যে!
গন্ধ পেয়ে গেছে?

২ : আছে নিশ্চয়ই। ধূপ জ্বলছে দেখছিস না?

১ : বেশিক্ষণ থাকাটা কি ঠিক হবে, জায়গাটা আমাদের কাছে নতুন।

২ : নতুন নতুন ঠেক খোঁজাইতো আমাদের কাজ।

১ : রিস্কটাও কম নয়।

২ : টাকার বান্ডিলে পকেট ফুলে আছে তা তো জান কবুল করার জন্যই।

১ : তা সত্যি। পড়াশোনার কি পরিণতি! এখন যা হোক কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচা।

২ : পস্তালে হবে গুরু। লেখাপড়া— না আঁতলেমি করে যারা। ওটা বাঁচা—ফুঃ *(গলা খাঁকাড়ি দেয়)*
নেপথ্যে — আসছি
(২ - বয়াম থেরে বিস্কুট নিতে যায়। শান্তা ফ্লাস্‌ক নিয়ে ঢোকে —)

শান্তা : ওকী! না বলে কয়ে বোয়াম খুলে বিস্কুট নিচ্চ যে!

২ : ইচ্ছে হল তাই। *(বিস্কুট নিয়ে খায়)*

শান্তা : তাই? বেশ আবদার তো!

২ : চোপ! ত্যাওড়ামি হচ্ছে!

শান্তা : মস্তানি দেখাচ্চ?

২ : গলাবাজি করলে পেট্রোল ঢেলে সব জ্বালিয়ে দোব!

শা : ওমা! সেকী কতা?

২ : ঠিক কথা। এলাকায় এখন আমাদের রাজ শুরু হয়েছে।

শা : ম্যানে?

২ : যা বলব তাই লোকে নেবে মেনে।

১ : ছাড়না। চুনোপুঁটির পেছনে লেগে কী হবে?

শা : ঠিক বলেচ তুমি— আমি তো এক ছার। গেরাম থেরে সব্বসান্ত হয়ে এই গাচতলায় এসে ঠেকেচি।

২ : এবার এখান থেকে তুলে রেলপারে বসিয়েদি?

শা : সেকী গো! অমন অনাসিষ্টি কতা কইতে আচে?

২ : আমাদের মায়াদয়া নেই।

শা : কেন তোমরা কারা?

১ : ধূমকেতু।

শা : সে তো শুনি কালেভদ্রে আকাশে ওটে।

১ : এখন থেকে প্রায় আমাদের দেখা মিলবে।

শা : এমুনধারা চকরা বকরা খোটো পোষাকে?

২ : একদম অন্য পোশাক। ঝক্কাস।

১ : আসলে আমরা সেবক। মানুষের ভালো মন্দর খোঁজ খবর করি তাই লোকে মান্য করে। যাক, অনেক কথা হয়েছে— চা দেখি—

(শান্তা চা ঢালে ২টো গ্লাসে। ২ - বয়ামে হাত দেয়)

শা : (২ - এর হাতটা ধরে) এঁটো হাত দিচ্চ কেন?

২ : বেশ করেছি। সরকারি জমিতে বসে কামাচ্ছিস— আবার কথা!

১ : আঃ কাজের কথায় আয় তো। এই শোনো—

শা : কী বল ।

১ : তোমার মদত চাই।

শা : কিসের?

১ : *(পকেট থেকে একটাফটো বার করে দেখায়)* এ কে চেন?

শা : হ্যাঁ, চিনিতো।

২ : কেল্লা ফতে গুরু। এই ঠেকে আসে?

শা : ঠেক বলচ কেন? ওটা খারাপ কতা।

২ : চোপ! এসব আমাদের কোড লাঙ্গোয়েজ।

শা : কি জানি । কালে কালে কত হলো, পিটেপুলির ল্যাজ গজালো।

২ : মুখে মুখে জবাব জানিস তো বেশ।

শা : না জানলে এই উদুম জায়গায় করে খেতে পারি?

১ : ব্যস - ব্যস, *(ছবিটায় টোকা মেরে)* খুব আঁতেলবাজ?

শা : সে আবার কী?

২ : বুঝিস না, ছেনালি?

শা : আমার জীবন তো থোড় বড়ি খারা—খারা বড়ি থোড়

১ : কথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্ঠা করলেও লাভ হবে না।

২ : সব টেনে বার করব। বল লোকটা কী করতে আসে?

শা : চা খায়, গপ্‌প করে।

১ : রাজনীতি নিয়ে তো?

শা : গরিব ও বড়োদের ভালো মন্দের কতা।

১ : মিটিং মিছিল নিয়ে কথা?

শা : সে সব জানিনে।

২ : খুব জানিস। ভোটটা কোথায় দিয়েছিস খবর আছে।

শা : সে তো যার যাকে পচন্ধ তাকেই দেবার কতা।

২ : সে খবর জানালি হলে যে উদুম ক্যালানি জোটে তা কি জানিস?

১ : যা যা জানতে চাইছি তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে। কখন আসে?

শা : বলে কি আসে। তবে এ সময়েই আসে।

১ : লোক ক্ষ্যাপানোর কথা বলে?

শা : আমার এসব শোনার সময় কোতায়? দোকান আর সংসার নিয়ে জেরবার।

২ : তুই একটা তুখার ধড়িবাজ, সব জানিস।

শা : দোহাই তোমাদের। আমারে কোনও ভ্যাজালে জইড়নি।

১ : জড়িয়ে তো পড়েছই। সাফ সাফ বললে রশিটাকে আলগা করে দিতেপারি।

শা : খদ্দেরের সঙ্গে বেইমানি কত্তে পারি?

২ : কেন পারবিনে। ছেলে মেয়ে দুটো হেঁটেইতো ইস্কুলে যায়?

শা : *(চমকে ওঠে)* হ্যাঁ, কেন?

২ : ধর যদি গাড়ি চাপা পড়ে?

শা : কী বলচ তুমি!

২ : মগজে ঢোকানোর কথা,

শা : দোহাই রেহাই দাও আমায়। সে যে বাপের মতো।

১ : তোমার বাপ এই অবস্থায় বেগোরবাঁই করত? আর কারা আসে?

শা : একা।

১ : বিপ্লবী জ্ঞান দেয়—দেয় কী না?

শা : ইংরাজিতে বলে । বুজিনা।

১ : ব্যস, এখানকার কাজ শেষ।

২ : খবরদার! আমরা কারা কী জন্যে এখানে এসেছিলাম তা যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়।

(ওরা প্রস্থান করে। বুটের শব্দ। স্থানু হয়ে বসে পড়ে শান্তা। ক্রমে পশ্চাত্তাপে আকুল হয়ে—) হায় ভগবান, এ আমি কী কল্লাম! মরণ হয়না আমার, নিজেরে বাঁচানির জন্যি! না না শুদু কি আমার জন্যি? দু-দুটো বাচ্চা রয়েচে না! ওদের মুক চেয়েইতো শতেক জ্বালা সয়েও, ঝড়-বাদলা মাতায় নিয়ে একেনে টিঁকে রয়েচি। নড়াই করে চলেচি চৌপরদিন! এই মিন্তি, ধুভায় মুড়ি আচে আর বোয়ামে বাতাসা, দুইজনে খেয়ে চুপটি করে ঘরে বসে থাক, আজ ইস্‌কুলে যেয়ে কাজ নেই। একটু বেচাল দেকলে মেরে মাতার ঘিলু বার করে দোব। *(মাখন আসে)*

মাখন : কী রে শান্তা, সকালবেলাতেই রণচন্ডী মূর্তি! কী হয়েছে?

শা : আর বোলোনে কাকা, মরণডা হলে বাঁচতেম।

মা : বালাই ষাট। মরণের কথা কেন?

শা : কেমন যেন বদলে যাচ্চে চাদ্দিক। কেউ কাউরে বেশ্বাস যাচ্চেনে। সব্বাই যেন বুকে বিষঝড় নিয়ে বেরাচ্চে।

মা : সে ঝড় তোর লাগবে না। কপালটা তো বেশ চওড়া দেখছি।

শা : রাক্ষসদের দাপানির শব্দ শুনতে পাচ্চনে?

মা : নাতো। এই শুনশান জায়গায় তাদের কী কাজ?

শা : কী জানি বুকটা কেঁপে কেঁপে উটচে।

মা : তুই তো সহজে ভেঙে পড়ার মতো মানুষ নস।

শা : কী যে বল, পদ্মপাতায় জলের মতো জীবন।

মা : আরে পাগলি, ওসব ভয় ছাড়। তোর দোকানটা হল আমাদের মতো কয়েকজন বুড়ো হাবরার কাছে মরুদ্যান। দোকান তো কত আছে ওলতানি, হুজ্জতির মতো জায়গা। কিন্তু এমন একটা নিরিবিলি, ছায়াঘন পরিবেশ কোথায় পাব বল দেখি। *(হরলিক্‌স পাউচ বের করে)* নে ধর-

শা : *(পাউচটা নিয়ে)* আজ দেকচ একেনে কাল কোতায় যাব নেই তার ঠিকেনে।

মা : কেন কিছু হয়েছে?

শা : ভয় লাগচেগো কাকা।

মা : এসব ঠেলেই তো জীবনতরী বাওয়া।

শা : আর যে টানতে পারচিনে। চলে যাবার মতুন গাঁয়েতে জমিন ছিল। কিন্তু নতুন চওড়া রাস্তাটা কাল হয়ে দাঁড়াল। আগেকার রাস্তাটা ছিল অঞ্চল পোধানের বাড়ির সামনে দিয়ে, নতুনটা হল ঘুরপথ। আমাদের জমিটে পেলে সুবিদে হবে ভেবে কথা পাড়ল বিক্রির। রাজি হলেম নে আমরা, তাই ছোবল বসাল একদিন। জ্বাইলা দিল মাটভর্তি ফসল। পাল্লুমনে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদে। তুমি বল কাকা, অঞ্চল পোধান শত্তুর হলে লড়া যায়? যেটুকু সম্বল ছিল কেষ্টর বাপের অসুকে চলে গেল। তবু বাঁচানো গেল না তাকে। গামচায় বুক বেঁদে ছেলে মেয়ের হাত ধরে সাতঘাট ঘুরে বাসা বাঁদলেম এই সরকারি জায়গায়। তবু কি শান্তি আচে?

মা : বয়স তো গড়িয়ে গেল তবু সত্যিকারের শান্তি এল না। এক একটা জমানা এসেছে শান্তি ধুয়ো তুলে, আমরা রয়ে গেছি তিমিরেই।

শা : তবে আর কী আমরা হাত তুলেই খালাস ।

মা : অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের সময়টাও দেখেছি, তাই সব ছেড়েছুড়ে চৈতন্যের পথটাই আশ্রয় করেছি। *(শান্তি গ্লাসে করে সবটা হরলিক্স দেয়—)* একী! সবটা দিলি যে!

শা : খাও, তুমি খাও।

মা : ন্যাকামি হচ্ছে! যা আরেকটা গ্লাস নিয়ে আয়।

শা : তোমার যে বেশি দরকার কাকা।

মা : যা, অন্যদিনের মতো দুভাগ কর *(শান্তা আদেশ মতো দুটো ভাগ করে)* ওরে দিয়ে থুয়ে খেলে শান্তি পাওয়া যায়। *(চুমুক দেয় গ্লাসে। হঠাৎ চোখে পড়ে শান্তা ভেতরদিকে যাচ্ছে—)* ওকী, কোথায় যাচ্ছিস?

শা : তুমিইতো বল্লে দিয়ে থুয়ে খেলে—

মা : এখন উইথড্র করছি। আয় এখানে। ওরে ওদের তবু তো মিড্ ডে মিল আছে, আধখানা হলেও ডিম জোটে, কিন্তু তোর— *(ফোন আসে)* হ্যালো, কে অনির্বাণ, সকাল সকাল ফোন কেন? বল বল কি বলবি। খারাপ খবর? আরে খোলসা করে বল না। না না আমি বাড়িতে না, শান্তার দোকানে। কে হালিম! কী হয়েছে তার? *(শুনছে বিরতি)* হুম! কিন্তু কী করে ঘটল? *(বিরতি)* ব্যস, ব্যস, বুঝে গেছি। দলাদলি কেস— তাতেই ফেসে

যাওয়াতো? আমি ওকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম কোন্দলে পা না দিতে—জল মেপে চলতে হয় এ সময়ে, কে কাকে কীভাবে ব্যবহার করবে তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। আমি যাব? গেলেইতো ছাপ লেগে যাবে এই বয়সে। তাছাড়া শোন, হালিম খুব একটা কাছের লোক ছিল না আমার। এখানে আসত, বসত, গল্পগাছা হতো ব্যস ঐ পর্যন্তই। দেখি কাল-পরশু একদিন যাব ওর বাড়িতে। বাড়িতে নেই, হাসপাতালে? ক্রিটেক্যাল? ঠিক আছে সময় করি তোকে জানাব— এখন ছাড়ছি।

শা : কি হয়েচে গো হালিম চাচার?

মা : হবে আবার কি? ঝামেলা, হয়তো বাঁচবে না।

শা : কেন?

মা : বুকে গুলি খেয়েছে।

শা : হায় ভগমান! কোথায়, কখন?

মা : কাল রাতে একটা সালিশী সভায় গিয়েছিল। সারারাত খোঁজ মেলেনি। আজ সকালে জীবনতলায় পুকুরপাড়ে পাওয়া যায়। এখন হাসপাতালে, জীবন মরণ সমস্যা।

শা : আহারে, অত ভালো লোকটাকে কিনা—

মা : কে বলেছিল আজকালকার জটিল সমস্যায় নাক গলাতে?

শা : তাহলে আমার কতাই ঠিক।

মা : কি কথা?

শা : চাদ্দিকে অসুরেরা নেত্য কচ্চে,

মা : তুই তো আর মা দুগ্গা হতে পারবিনে।ছাড় ওসব কথা— চা দে।

(শান্তা চা বানাতে যায়)

শা : ঘটনার কতা শুনলে কিচু?

মা : আগের কিছুটা জানি। গাজীপাড়ার এক মুসলিম ছেলের সঙ্গে সরকার পাড়ার কোন এক মেয়ের আশনাই ছিল। মাঝে মাঝে এ নিয়ে ঝামেলাও হত। গত দুদিন ওদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কাল দুপুরে দেখা মিলতেই শুরু হয়ে যায় কাজিয়া। আর হালমের স্বভাব তো জানিস, গিয়ে পড়েছিল ঝামেলায়। (গান গায়) ভুল সবই ভুল, এই জীবনের .... *(প্রবেশ করে কিংকর)*

কিঙ্কর : কী গো দাদা, সকল বেলায় বিষাদের গান?

মা : স্বাদ নেই কিছুতেই — সব তেতো।

শা : তুমি! *(গ্লাসটা পড়ে যায়)*

কি : ফেললি তো? কী হল তোর? আমি কি আজনবি? না কাকা ভাতিজার মাঝে আমার নো এন্ট্রি?

মা : ও আজ হ্যালুসিনেশন দেখছে।

কি : কিসের?

মা : রাক্ষসদের।

কি : হ্যালুসিনেশন কেন হবে? মানুষরূপী রাক্ষসদের কামড়ে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাই আজকাল FOGG-এর চাহিদা খুব বেড়ে গেছে।

মা : এই FOGG আবার কী?

কি : হো হো জানেন না তো? তুমি যে বুড্ডা, সেন্ট - সেন্ট। যেখানেই যাও FOGG- লাগিয়ে যাও, ব্যস। জীবনটা কু-আশায় মাৎ।

মা : যত্তোসব। দে- চা দে- *(গান)* প্রশ্ন করি নিজের কাছে

কি : এইসব প্যানপ্যানে গান করে নিজেকে প্রবোধ দিতে ভালো লাগে দাদা?

মা : তবে কি গণসংগীত গাইব?

কি : সবাই মিলে যদি গাইত তবে কি এমন দুর্দশায় পড়তে হত?

মা : সব অস্ত্র শমীবৃক্ষে তুলে রেখে এখন তোরাই তো চৈতন্য সেজেছিস্।

কি : ব্যঙ্গ করছ?

মা : বাজে বকিসনে। একটানা রাজত্ব করে গেছিস মনে নেই? আজ কেন দূরবীন লাগিয়ে খুঁজতে হয়? হেঁসেল পর্যন্ত রাজনীতিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলি, তা ভাবতে শিউরে উঠি।

কি : যুগ যুগ ধরে যে অর্ধেক আকাশ হেঁসেলে পচে মরেছে তা ভেবে কষ্ট হয় না?

মা : হলটা কী কাজের কাজ কিছু? আবার সেই তিমিরেই।

কি : সমালোচনা কর মাথা পেতে নেব। তবে জগতে সব কিছুরই উত্থান পতন আছে। যদি একজন মানুষ সাচ্চা থাকে কাল তার পেছনে লক্ষ লোকের কাতার লেগে যাবে।

মা : অতীত গেল ধুয়ে মুছে লক্ষ লোকের স্বপ্ন দেখছে!

কি : বলতে পার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জন্তু হয়ে রয়েছি কিন্তু নিজেকে বিকিয়ে দিইনি। *(শান্তা চা আনে)* কীরে, বিস্কুট আনলিনে?

শা : বুলে গেছি কাকা। *(শান্তা বিস্কুট আনতে যায়)*

কি : সত্যি করে বলবি আজ কী হয়েছে তোর?

শা : ভয় - ভয় লাগছে কাকা। *(বিস্কুট দেয়)*

কি : আমরাতো আছি না নেই?

শা : না কেউ নেই। মনে হচ্চে একুনি একেন থেকে পালাই। বনে জঙ্গলে যেখানেই হোক।

মা : আরে শোন, এখন সব একটু এতোল-বেতোল হচ্ছে বটে, দেখবি দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শা : না, যাবেনে গো। রাক্ষস ধেয়ে আসচে যে, যাদের কিচু নেই তাদেরই ছিঁড়ে খুড়ে খাবে।

কি : ঠিক বলেছিস। সেই ইল্বল বাতাপির গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে । ওরা ডেকে আনত ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণদের আর শিল্পপতিরা ডাকছে অসহায় মানুষদের। প্রথমে ইল্বল বাতাপিকে কেটেকুটে রান্না করে ব্রাহ্মণভোজন করাতো, তারপর ডাক দিলেই পেট চিড়ে বেড়িয়ে আসতো বাতাপি। আর ওদের মহাভোজ হত সেই মাংস নিয়ে। আজকের দিনে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের ছিঁড়েছুড়ে মহানন্দে ভোজ চালিয়ে যাচ্ছে। তুমিই বল দাদা, দেশের সর্বময় কর্তারা হওয়া উচিত কিনা first among the equals তা নয় আমাদের equal বলে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না। আমরা আজ শখানেক লোকের খাদ্য হয়ে বেঁচে আছি।

(নান্টু আসে হাতে চায়ের ক্যান নিয়ে)

নান্টু : ২০ টাকার ফাসক্লাস চা দাও পিসি, ফটাফট।

শা : *(ক্যান নিয়ে)* বাবা! এত তাড়া কিসের?

মা : নান্টু মহারাজের বিয়ের পাকা দেখা হয়তো।

না : ধেৎ, কী যে বলনা তুমি দাদু।

শা : মা নেই ঘরে?

না : মা কি তোমার মতো বানাতে পারে।

কি : তা অত টাকার চা দিয়ে কী হবে?

না : কত দূর দূর থেকে লোকজন এসেছে বলে।

কি : লোক লস্কর কেন?

না : বাবাকে সঙ্গে নিয়ে কাটমানির টাকা ফেরৎ আনতে যাবে।

মা : আরে বোকা, একবার টাকা হজম হয়ে গেলে কি উগড়ে দেওয়া যায়?

না : যান না বুঝি? আমাদের বাংলা স্যারকে ইস্কলের মিড-ডে-মিল থেকে চুরি করা ডিমের টাকা ফেরৎ দিতে হয়নি? তার কাছা খুলে দিয়েছিলাম আমি জানো?

কি : শোনো দাদা, শোনো, ধুম লেগেছে কিশোর মনেও!

মা : তোকে তোল্লাই দিতে হবে না। বড় হয়ে যে কি হবে তার ঠিক আছে।

কি : ভালোই হবে। Morning shows the day.

মা : তোকে আর উস্কে দিতে হবে না।

শা : পাকা পাকা কতা শেকা হয়েচে? নে ধর - গরম কিন্তু, সাবধানে নিয়ে যাবি। *(ক্যানটা দিয়ে একটা বিস্কুট বার করে কাগজে মুড়িয়ে দেয়।)*

না : এটা কী দিচ্ছ? চাইনি তো।

শা : ধর ধর, আমি দিলাম।

মা : আমার হিসেব থেকে একটা কেক দে ওকে।

শা : আচ্চা । *(কেকে দেয়)*

না : বাঃ, না চাইতেই এতকিছু? তবে তো তোমার দোকানে রোজ রোজ আসতে হবে।

শা : না ছোটরা কাজ ছাড়া চায়ের দোকানে আসে না।

না : বেশ চলি গো —

কি : একটু শুনে যা নান্টু —

না : কী বল—

কি : *(দুটো চকলেট বার করে)* সেদিন আমাকে চাইনিজ চেকারে হারিয়েছিলি- আজ শোধবোধ।

না : বাঃ, মেঘ না চাইতেই জল! আসি গো *(প্রস্থান)*

মা : নান্টুর বাপটা ঠিক করছে না।

কি : কী সেটা?

মা : ওই যে কাটমানি নিয়ে শোরগোল। যারা এসব করেছে তারা সকলেই

ক্ষমতাবান। এই অপমান সহজে মেনে নেবে? মাঝ থেকে উলু খাগড়ার প্রাণ যাবে। কোথায় কাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেরা তামাশা দেখবে।

কি : এতদিনের অন্যায় সহ্য করার বাঁধ ভেঙেছে বলেই তো

মা : অন্য পথ কি নেই?

কি : কেমন পথ? অন্ধকে পাতালের পথ দেখানোর মতো? —আমি বলছিনা, কোনকালে শেক্সপীয়র লিখে গেছেন।

মা : আবার এটাও ঠিক- When in Rome, do as Romanis do.

কি : তবে আর কি! শান্তার কথামতো রাক্ষসেরা ছিঁড়ে খুঁড়ে খাক। আসলে দাদা, তুমি বড় দুর্বল চিত্তের মানুষ।

মা : হয়তো বা। আমি যে বিশ্বাসে ভক্ত। আজকের বিজ্ঞানও বলছে বিশ্বাস থেকে পজিটিভ এনার্জি তৈরী হয়।

কি : আমরাওতো বিশ্বাস থেকেই কাজ শুরু করেছিলাম—

মা : কিন্তু মানুষের হাতে অন্য কিছুর যোগান না দিয়ে তুলে দিয়েছিলে স্রেফ পতাকা

কি : এটা একেবারে ভ্রান্ত কথা। মানুষের অধিকারের পথ আমরাই দেখিয়েছিলাম কিন্তু এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শরিক হয়ে ধর্ম বিশ্বাসের পিতৃভূমিকে কব্জা করে এক বিরাট চক্রান্তের কাছে পিছিয়ে পড়লাম।

শা : আমারও তেমন মনে হচ্চে কাকা। নাইলে হালিম চাচার ওপরি এমন জুলুম হতি পারে?

কি : *(উত্তেজিত হয়ে)* হালিমের কথা এল কেন ? কী হয়েছে তার?

মা : বলার মতো কথা নাকি? হিন্দু মুসলিম কাজিয়া।

কি : সে যাই হোক, আমার কাছে চেপে গেলে কেন?

মা : এটা কি ঢাক বাজিয়ে বলার মতো কথা? হালিম বলেনি হাজিপাড়া আর সরকার পাড়ার দুটো ছেলেমেয়ের আশনাই-এর কেচ্ছা? ঝামেলা তো বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল তার ওপর গত দুদিন তাদের খোঁজ ছিল না।

কি : তারপর?

মা : কাল নাকি ধরা পড়ে দুজনায়। আগ বাড়িয়ে হালিম গিয়েছিল সালিশিতে।

কি : বেশ তো

মা : বেশ তো মানে? এসব কেসে যা হয়, গুলি লেগে এখন হাসপাতালে। অনির্বাণ

বলল খুব ক্রিটিক্যাল।

কি : পুলিশ আসেনি।

মা : সেসব কিছু বলেনি।

কি : ছিঃ ছিঃ আমরা এখানে বসে গুলতানি মারছি আর হালিমের যমে মানুষে টানাটানি? তুমি যাবে না?

মা : এই মুহূর্তে তো না। কে কোথায় কী রং চাপিয়ে দেয় তার ঠিক আছে।

কি : কী বলছ দাদা, এ সময়ে রং নিয়ে ভাবছ?

মা : এটাই এ সময়ের বাস্তবতা।

কি : আর মানবতা? (বিরতি নিয়ে) বেশ তুমি থাক বসে আমার তো রং লেগেই আছে ভয় কি—

(বুটের শব্দ। প্রবেশ করে ১, ২)

শা : (ওদের দেখে) আঃ মাগো!

কি : কী হল? *(২ শান্তার পেছনে দাঁড়ায়)*

২ : ও কিছু নয় ভয়।

কি : ভয় মানে? কিসের ভয়?

১ : হা, হা। কারণ থাকলেই ভয় হয়।

কি : কেন ভয়? তোমরা কারা? এখানে কেন?

২ : খামোশ!

কি : হিন্দি বলে রোয়াব দেখাচ্ছ?

১ : আহা রাগতে আছে, এখুনি যে হয়ে যাবে কাপড়ে-চোপড়ে

কি : অসভ্যের মতো কথা বলছ কেন?

মা : তোমরা কারা বলতো?

১ : আমরা? শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সেবক। এই অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়েছি।

কি : কে দিয়েছে দায়িত্ব? তোমাদের কথা, পোষাক, চালচলনে শান্তির ছিটেফোঁটাওতো দেখছি না।

১ : কী আর করা যাবে। দুদিন বাদে এখানেই আমাদের কার্য্যালয় হলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শা : এসব কী কতা কইচ!

২ : এই চুপ! এদ্দিন সরকারি জমিতে তোফায় রাজত্ব করে গেলি— এবার আমাদের পালা।

কি : ইয়ার্কি হচ্ছে?

১ : আমাদের সব রকম চাপ নেবার অভ্যেস আছে।

মা : তোমরা কিন্তু আজেবাজে কথা বলে চলেছ।

২ : তবে তো আপনাকেও মাপতে হবে দেখছি।

মা : অসভ্যতা করোনা, তোমরা ছেলের বয়সী ।

১ : তাইতো শান্তভাবে কথা বলছি।

কি : কিন্তু এখানে আসার কারণটা কী

২ : আপসে চন্দ মিনিটোকা বাত।

কি : শ্লীল-অশ্লীল জ্ঞান যাদের নেই, তাদের সঙ্গে কী কথা?

১ : ঠিক বলেছেন। আমরাও খিস্তিবাজ, মেজাজ ঠিক থাকে না। কথা হবে যার সঙ্গে সেখানেই যেতে হবে।

মা : তোমরা কি হুকুমজারি করছ?

১ : দেখুন, আপনি তো মঠ মন্দির, পুজো পার্বন নিয়ে থাকেন, এই মালটার সঙ্গে পিরিত কেন?

কি : কী যা- তা বলছ। সুখ দুঃখের সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্য, সম্পর্ক থাকবে না?

২ : আপনার মতো বিষ কোবরা কখন ছোবল মারবে, কেউ জানে?

কি : কে তোমাদের পাঠিয়েছে বলতো সত্যি করে।

১ : গেলেই বুঝে যাবেন।

মা : দেখো বাবারা, এ অঞ্চলে এক সময় মারামারি খুনোখুনি কম হয়নি। এখন কিছুদিন যাবৎ উপদ্রবহীন হয়ে বেঁচে আছি।

১ : আপনাদের নিশ্ছিদ্র শান্তির জন্যইতো কিছু পথের কাঁটা তুলে ফেলা উচিত।

কি : ও ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর দরকার নেই। আমাদের সমস্যা মেটানোর যোগ্যতা আছে।

১ : তাহলে এলাকায় লাভ জেহাদের মতো ঘটনা শুনেও চোখে ঠুলি দিয়েছিলেন কেন?

কি : ওটা এমন কিছু দোষের ছিল না বলে।

১ : সেটা বিচারের জন্যই তো আপনাকে নিতে আসা।

কি : না এটা তোমাদের জুলুম।

১ : যা ভাবেন তাই।

কি : কোনও অপরিচিত লোকের সঙ্গে আমি কোথাও যেতে রাজি নই।

২ : এই হারামি! রেলাবজি হচ্ছে! তোদের জমানা এখন মায়ের ভোগে, কেলিয়ে শেষ করে দোব!

মা : প্লিজ, ওকে শান্ত করো।

১ : বেশি পিরিত দেখালে আপনিও ফাঁসবেন কিন্তু।

কি : আমি এবার লোকজন ডাকতে বাধ্য হব।

১ : এই ফাঁকা ময়দানে? তাতে যে আপনার আরও ক্ষতি হবে। এই নিরিবিলি জায়গায় একটা মেয়েছেলের চায়ের দোকানেকী করতে আসেন তা চাউর হয়ে গেলে কি হবে ভেবেছেন?

কি : আমি সে সব ভয় পাই না।

২ : *(সামনে এসে)* শুয়ারকা বাচ্চা, যাবি কিনা!

মা : তোমরা কিন্তু খুব অসভ্যতা করছ।

১ : বেশ করছি। নিজেদের ভবিতব্য নিয়ে ভাবুন। চল নিয়ে।

শা : না গো না, ছেড়ে দাও।

২ : চুপ মাগী! এখন পাততাড়ি গোটানোর দিন গোন।

কি : বেশ কোথায় যেতে হবে চল। দেখেছি তোমাদের জার্মানির ঘেটোয়, দেখেছি রোমের মহল্লায় মহল্লায়— তোমরাই দাপাতে অলিতে গলিতে ফ্র্যাঙ্কোর জমানায়— তবু জেনে রাখো মানুষের হয়নিকো সমূহ পরাজয়।

(কিংকরকে নিয়ে ওরা চলে যায়। বুটের শব্দ)।

মা : কিংকর—কিংকর! এমন আগুনবৃষ্টিহেনে গেলি কেন ভস্ম করে গেলি না আমায়! *(ছটফট করে)* প্রভু, বাহুতে দিলে না শক্তি, হৃদয়ে দিলে না বল, দু চোখে আমার পরাজয় গ্লানি কোথায় ফেলব অশ্রুজল!

শা : শান্ত হও- শান্ত হও। বসতো একেনে *(জল এনে চোখে মুখে দেয়)* একন একটু শান্ত লাগচে?

মা : শান্ত হব কিসে? আমারই সামনে দিয়ে—

শা : মরণ হয়না আমার! আমিতো যত নষ্টের গোড়া গো!

মা : তুই! মানে!

শা : আমি যদি ওই রাক্ষসগুলোর খপরটা কিংকর কাকাকে দিতেম তাইলে এমুন সব্বোনাশ হতনে।

মা : ওরা এসেছিল তবে? তাই তোকে অস্বাভাবিক লাগছিল?

শা : কী করতাম বল যা ভয় দেকাল। যেন দুটো ময়াল সাপ পেঁচিয়ে ধরচে আমায়। দুটো বাচ্চা নিয়ে এই আতান্তরে বাস।

মা : কিংকর ঠিকই বলত মৃত্যু আতঙ্কই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তোলে। শহীদ হতে চায়না বলে আত্মসমর্পন করে। (*ফোন*) হ্যালো আমিই মাখন দাস, কী বলছেন দেখা করতে হবে কিলপাড়ে? কিন্তু কেন? না, না, আমি কোনও দল করি না, কোনও দলবাজিতে কেউ দেখেনি আমায়। হ্যালো, নিশ্চয় আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। হ্যালো, প্লিজ; কেটে দিল!

শা : কার ফোন কাকা? কী বলল?

মা : এবার বুঝি আমার পালা! ওরা কারা হাওয়ার আগে চলে?

শা : না। এভাবে ভয় পেয়ে পেয়ে কেঁচো হয়ে গেলে চলবেনে।

মা : তবে? কী করবি তুই?

মা : *(মাখনের হাত দুটো তুলে নিয়ে)* একা আমি না, তুমিও।
একদিন এই হাত শুদু তোমার পা ছুঁয়েচে আজ তুলে ধরলাম কাকা।

মা : কী করতে পারিস তুই? (*বুটের শব্দ*) কোনও শব্দ পাচ্ছিস?

শা : আসুক দেকি মুকপুড়ার দল। এই কেষ্ট, মিন্তি— একনও ইস্কুলের সুময় পেইরে যায়নি। তোরা বেইরে পর তাড়াতাড়ি। এবার আসুক ও-খেগোর বেটারা, দেকি তোমার কি করে? আমরা হলেম মায়ের জাত, জন্ম দিতে পারি আর বাঁচাতে পারবনে?

মা : ওরা আসছে! *(শব্দ কাছে শোনা যায়)*

শা : (ছুটে প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে) আয় তোরা আয় সর্ব্বশক্তি নিয়ে— আগে আমায় বধ করে দ্যাকা তোদের ক্যামন ক্ষ্যামতা— আয় - আয়—
(শব্দ আরও কাছে। একই সঙ্গে মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র চলতে থাকে।)

হেরো রাজার কলন্দর

শুভঙ্কর

Sequence - 1

দলের পক্ষ থেকে দু'জন অভিনয়ক্ষেত্রে আসে। অভিনেতাদের দু'জন দর্শকের মধ্যেই বসে আছে। নাটক শুরু হতে একটু দেরি, তাই একটা আর্জেন্ট অডিশন সেরে নিতে হবে। দর্শকদের বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। একদম রিয়াল স্টেজ সিচুয়েশনই দেওয়া হয়েছে অভিনেতাদের।

১ : এখানে অডিশনের জন্য কারা কারা এসেছেন?

(অভিনেতারা জানায় তারা এসেছে।)

১ : মাত্র দু'জন! (২-কে) আর কেউ টার্ন আপ-ই করলো না !

২ : আরো একটু অপেক্ষা করবে! না শুরু করে দেবে এদের নিয়ে?

১ : না আর কত অপেক্ষা করব ! আবার তো নাটক শুরু হয়ে যাবে। এদের অডিশনটা সেরে ফেলি, ততক্ষণে যদি আর কেউ টার্ন আপ করে!

২ : (অভিনেতাদের) শুরু করে দিই আমরা ? আপনাদের কোন প্রবলেম নেই আই হোপ, মানে, অডিয়েন্সের সামনে অডিশনে? ইন ফ্যাক্ট, ইউ গেট টু পারফর্ম ইন আ রিয়াল স্পেস সেট আপ।

(অভিনেতারা নিমরাজি হয়। একটু দোনামনা করে। কিন্তু দেরীও হয়ে যাচ্ছে, কাজেই আর বসে থেকে লাভ নেই। এই পুরোটা অল্প দুয়েকটা কথায় ফুটিয়ে তোলা যায়।)

(১ আর ২ স্পেসের একধারে বসে। সৌমিককে ডেকে নেয়। ২ অভিনেতাদের একজনকে ডেকে নেয়)।

২ : আপনার নামটা বলুন।

(অভিনেতা নাম বলে। ২ একটা কাগজে/মোবাইলে চেক করে নেয় নামটা। ১-এর সঙ্গে মিলিয়ে নেয়।)

১ : আপনাকে বা আপনাদের যে স্পীচটা পাঠিয়েছিলাম আমরা, পড়ে নিয়েছিলেন তো ? সেইটুকুই আপনাদের অভিনয়ের মাধমে, এক্সপ্রেশন সমেত বলতে হবে। Just to brief it to you, যে চরিত্রটা আপনারা পারফর্ম করছেন, প্রতিপত্তিশালী চরিত্র, সে তো ওই excerpt থেকে বুঝতেই পারছেন। রাজা বা অভিজাত কেউ, ধরে নেওয়াই যায়। The situation is grave !

২ : মানে, বলাই যায় এই মানুষটি একটা ক্যাটাস্ট্রফি ফেস করছেন। And he is basically thinking aloud, soliloquy বলতে পারেন। কাজেই, তার অবস্থান, এবং অবস্থা, দুই সম্পর্কেই মোটামুটি ধারণা পাচ্ছেন আশা করি? এইটুকুই আপনাদের ক্যাপিটাল। এর উপর ডেভেলপ করুন। (১-কে) এই তো more or less? কিছু মিস করলাম না তো? সৌমিকদা কিছু add করবে?

সৌমিক : না না, এটাই মোটামুটি। জাস্ট খেয়াল রাখুন, আমি শুরুতে তিনবার বাজিয়ে একটা কিউ দেবো, তারপর শুরু করবেন। বাকিটা আমি ধরে নেবো, আপনাদের ভাবতে হবে না। আর you can literally do anything to make your performance perfect. আপনি যদি মনে করেন সোলিলকি ভেঙে আমাদের, বা অডিয়েন্সের সঙ্গে interact করে বেশি ভালো ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, you are free to do that!

(রাজার প্রবেশ। বিরক্ত। ঢুকে, আসতে আসতে, বলতে থাকে —)

রাজা : আরে অডিশনে তো কেউই আসেনি ছাতা ! বেকার এতক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করলাম! বোগাস! আমাদের সময়টা নষ্ট, এঁদের ইভেন্টটা নষ্ট!

২ : আরে, এরা দু'জন আছে। এদেরটা জাস্ট নিয়ে নি?

(রাজা দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটু মেপে নেয়। তারপর, ২ -কে —)

রাজা : এরা? (Undertone-এ) কাদের দিয়েছে রাজার পার্ট!

সৌমিক : উফ্, এত খচে আছিস কেন? বোস না। দশ পনেরো মিনিটের তো ব্যাপার। (অভিনেতাদের) আপনারা চাপ নেবেন না, রিল্যাক্সড্ থাকুন।

রাজা : আরে, বাইরে অর্গানাইজাররা তো আমাকে কথা শোনাচ্ছে এরকম ইভেন্টের দিনে অডিশন ফেলা নিয়ে। তার ওপর বলেছিলাম অনেকে আসবে। এসেছে দু'জন! তাও আবার .. ... (বলে আবার অভিনেতাদের দিকে তাকায়, হতাশায় ঘাড় নাড়ে।) মুখঝামটা তো আর তোমাদের শুনতে হয় না!

১ : আচ্ছা, তুই বোস। ইন ফ্যাক্ট, তুই তো প্রয়োজনে ওদের গাইড করতে পারবি, যদি কিছু ভুল হয়।

রাজা : এনিওয়ে, চলো তাড়াতাড়ি করো। শুরু করো।

১ : (অভিনেতাকে) শুরু করা যাক? (সৌমিক কিউ দেয়।)

গৌরব : (সাংঘাতিক গায়ের জোরে) সূর্য নিভে আসে।

রাজা : ও কী! ও কী! কী হচ্ছে এসব!

গৌরব : (থতমত খেয়ে) হচ্ছে না?

রাজা : ওরকম গুঁতো মেরে মেরে কথা বলছো কেন?

গৌরব : রাজা তো ....

রাজা : ষাঁড় মনে হচ্ছে! Behave yourself ! continue!

গৌরব : (একটু দম নিয়ে, প্রায় ওই একই ভাবে) মনের মধ্যে ভিড় করে আসে ধূ-ধূ (আবার জোর দিতে গিয়ে বিষম খেয়ে একাকার কাণ্ড করে, সরু গলায় একবার "মরীচিকা" বলার চেষ্টা করে) একটু জল হবে?

রাজা : হয়েছে! হয়ে গেছে তোমার! এসো, বসো। জল খাও। নেক্সট!

(সোহম আসে)

রাজা : ব্রীফ দিতে হবে?

সোহম : (হ্যাঁ আর না-এর মাঝে) একটু ভেবে নিই?

২ : কী ভাববেন?

সোহম : না, মানে এই গোটা ব্যাপারটা!

রাজা : উফ্ মা গো মা! We don't have much time! Can we please?

সোহম : (ভেতো বাঙালীর উচ্চারণে) সূর্য নিভে আসে।

সৌমিক : লে হালুয়া!

রাজা : ভাই, রাজা হও, রাজা! মাথা লাগাও একটু।

সোহম : (দম বন্ধ করে, গলা ফুলিয়ে, থমথমে) সূর্য নিভে আসে।

রাজা : উফফ্ রোবট কোথাকার! ধুর! একটাকে দিয়েও কিস্যু হবে না! বসো! সব এদের করে করে দেখিয়ে দিতে হবে, তারপর তেনারা পারবেন! Actors! (গজ গজ করতে করতে উঠে পড়ে নিজে দেখাতে যায়) আরে ভাই সময় নাও! রাজার মুডে ঢুকতে টাইম লাগবে! ইয়ার্কি নয়! প্রথম থেকেই হাউ হাউ করে চেঁচালে রাজা হওয়া যায় না। (একটু চুপ করে থেকে নিজেকে শান্ত করে)

সূর্য নিভে আসে। মনের মধ্যে ভিড় করে আসে ধূ-ধূ মরীচিকা। আমার সোনার সাম্রাজ্যে গোধূলির আলো এসে পড়েছে। আমার সোনার সাম্রাজ্য। আমার ভেঙে যাওয়া, ধুলোয় মিশে যাওয়া সাম্রাজ্য! আর আমি আগলে রাখছি আজীবন এই ধ্বংসস্তূপ। আমি

রাজা। আমি প্রহরী। আজ এই পথে এক পথিকের আসার কথা। কথা আছে, সে এসে থামবে আমার মুখোমুখি। জানতে চাইবে, আমার ইতিহাস, আমার জেতা সব দেশের কথা। কিন্তু কই, কেউ তো আসে না। ঝড়ের আভাস আসে ওদিকের আকাশে। কালো মেঘ ঘনায়। কেউ আমার সামনে এসে দাঁড়ায় না। একাকী রাজা লীয়রের মতো আমার বলতে ইচ্ছে করে, "Blow you wind ! ..."

(এমন সময় দরজা খুলে গুটিগুটি পায়ে কলন্দরের প্রবেশ। পোষাক রঙচঙে ফতুয়া আর ঢোলা পাজামা। ঢুকে অবাক হয়ে রাজাকে দেখে। রাজা তাকে খেয়াল করে না। কলন্দর দর্শকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকে, সামনের লোকটা কে, কি করছে, নাম কি, এই জায়গাটা কি, ইত্যাদি। ফিসফাস কথা হলেও একটা গোলমাল তৈরী হয়, এবং অডিশন থেমে যায়।)

রাজা : কি সমস্যাটা কি? এখানে কি হচ্ছে?

কলন্দর : না আসলে, এটা রাজসভা তো?

রাজা : (ধমকে উঠে) এটা অডিশনে আসার একটা সময়? প্রথম দিনেই এই! দারুণ! (একটু দেখে নিয়ে, নিজের মনে মনে) সং সেজে অডিশনে এসেছে! (কলন্দরকে) যেটা করছি, ফলো করো ! irresponsible ! (লীয়রের ডায়ালগ শুরু হতেই কলন্দর লাফিয়ে উঠে বলে)

ক : আরে এটা তো সেই গ্লোবে শুনেছিলাম! রাজার পাশে বসে। তখন সেই ব্রিটিশ রেনেসাঁর প্রায় শেষ সময়। তবু উইলিয়ামের নতুন নাটক নামলে জেমসের সে কি উৎসাহ!

রা : উইলিয়াম ?!

ক : শেক্সপীয়র !

রা : জেমস ....

ক : দ্য ফার্স্ট !

রা : আজব ঝাঁট তো! কি, চান কি বলুন তো আপনি?!
(এতক্ষণে বলার সুযোগ পেয়ে গলা খাকরে কলন্দর শুরু করে)

ক : শুন সুধীজন, শিশুবুড়োগণ, মনের মিতে
শেষ কিছুদিন এই কলকাতা নগরীতে
পায়ে হেঁটে হেঁটে, পায়ে হেঁটে হেঁটে পরে গেল কড়া
এতদিন পর ফিরে এসে দেখি, এ কী মশকরা!

রা : এই এই অডিশন শুরু করতে বলিনি! দর্শক দেখেই শুরু হয়ে গেছে!

ক : ভুল করছেন, রাজা! আমি ওই অডিশন-টনের কেউ নই।

রা : তবে?

ক : বলতে আজ্ঞা দিলে তবে তো বলি! রাজা তো শুধু রাগ করতেই ব্যস্ত!

রা : (কিছুটা থতমত খেয়ে) আজ্ঞা?! মানে?

ক : আপনি রাজাধিরাজ! আপনি আজ্ঞা দেবেন, তবেই তো আপনার এই সামান্য কলন্দর তার জোগাড় করা গান-গল্প-কথা দিয়ে আপনাকে তোষামোদ করবে, তবে না সে নিয়ে যাবে রাজার কল্পনাকে শহরের গন্ডির বাইরে, দেশ থেকে দেশে, সময়ের ওপারে .....

রা : আরে ধুর মড়া! আমাকে রাজা মনে হচ্ছে? আমার মা অব্দি আমাকে কোনদিন রাজা বলে আদর করেনি! রাজা আমার নাম! আমার অডিশনের চরিত্রটা রাজার!

ক : রাজার চরিত্র রাজা নিজে রাজার মতো করবেন, এ আবার আশ্চর্য কি! তার রাজকীয় ঢঙে, রাজকীয় চালে, রাজকীয় ভালোবাসায়, রাজকীয় রাগে যা আপনার আলবাত আছে, মুগ্ধ হয়ে তবে না কলন্দর তার গান-গল্পের শেষে রাজাকে দেবে তার ভাঁড়ার কোনদিন শূন্য না হওয়ার দোয়া, আর ভালোবেসে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি!

রা : সব ট্যান যাচ্ছে কিন্তু আমার! সব ট্যান যাচ্ছে!

ক : তবে খোলসা করে বলা যাক মহারাজ!
মহারাজ ও উপস্থিত প্রজাবৃন্দকে পুনরায় কুর্নিশ জানায় এই নাচিজ কলন্দর!

রা : কে কলন্দর ?

১ : কে কলন্দর?

২ : পেশ করা হোক, কলন্দরের গল্প । শুনি।

ক : বলছি বলছি! সে বলতেই তো আসা এই সভায়! এখন তবে প্রশ্ন হলো, কে কলন্দর? বহু যুগ ধরে, বহু ক্রোশ ঘুরে পেরিয়ে প্রাসাদ আর বাড়িঘড় গল্প শোনায় রাজায় প্রজায় সেই হলো নাচিজ কলন্দর!

রা : আরি শাবাস!

১ : কিন্তু গল্পটা কিসের?

ক : গল্প কিসের? গল্প কিসের?
গল্প ভালোবাসার। বিষের।
কেমন করে মানুষ গড়ে রাজ্যপাট আর
টুকরো করে গুঁড়িয়ে ফেলে বিরাট পাহাড়!
আবার সেই মানুষই কেমন ক'রে

রোজই কাঁটার মুকুট প'রে
নিচ্ছে বুকে ক্ষতের আঁচড়,
গর্জে উঠে বলছে, বাঁচো!
এসব মানুষ যেসব দেশে
সেসব দেশের রাজার কাছে, প্রজার কাছে
কলন্দরের গল্প আছে!
সহস্র এক গল্প আছে!

রা : তা, তোমার তো বয়স অল্পই! এই কদিনে আর কত দেশ ঘুরেছো আর কতইবা গল্প করেছো?

ক : বয়স দিয়ে বিচার কোরো না রাজা!
মানুষের কথা বলি, মানুষের গাই,
মানুষের সুখ দুঃখ বাদ্যে বাজাই,
বয়সে আটকে গেলে চলে নাকি?
এই ধরো,
এইখানে কাজশেষে তোমাকেই দেব ফাঁকি!
চলে যাবো শত বছর উত্তরে, আর কোনো রাজার মহড়ায়!
খুঁজে নেব তার বাড়ি,
মানুষ তখনও দেখে বলবে, কে যায়? কে যায়?
যেমন বলেছে এখানে, এই রিপন স্ট্রীটে।[১]
যারেই জিগাই, কোথায় রাজার ভিটে?
সকলেই বলে —

কোরাস ১।। রাজা? রাজা আবার কি?
এ কোথাকার কে রে? সঙ নাকি?
সঙ নই, শোনো রাজা! উন্মাদও নই!
আপনারা, হে প্রজাকুল, আপনারাও জানুন ---
কলন্দর সময় ও স্থান নিয়ে খেলা করে!
এ তার অহংকার নয়! বলতে পারেন, নিয়তির কানুন।

(গুছিয়ে দর্শকদের মধ্যে বসে)

১ শো অনুযায়ী জায়গার নাম বদলে যাবে। 'কলন্দর'-এর প্রথম শো রিপন স্ট্রীটের প্রসেনিয়াম আর্ট সেন্টারে হয়েছিল, তাই সে জন্য স্ক্রিপ্টে ওই জায়গার নামই দেওয়া

এখানে আসার আগে ভূমধ্যসাগরের তীরে গ্রীসের রিপাবলিক ভ্রমণ, খ্রীষ্টের আগে না পরে, অত খেয়াল থাকে না আর।

সময়ের এমন বিপুল সম্ভার।

সেখানে মন উঠলে চলে যাই চীনে, দেখি প্রাচীর উঠছে সবে

আরো পূর্বে কুবলাই খাঁ-র রাজত্বে বসে মনের হীরা-মানিক আছে যে দেশে, সে দেশের গল্প বলি, বলতে বলতে কানে আসে, বাস্তিল ভেঙে পড়েছে, সাধারণের জয়। কত স্বপ্ন, কত আশা নতুন দিনের। আমরা সেই পথে হেঁটে আসি রাজা, শিরদাঁড়া সোজা করে পথচলা মানুষগুলোর সঙ্গে আমরাও এক আধটা স্বপ্ন কুড়িয়ে নিই সেই যুগের, অন্য যুগকে শোনাবো বলে!

রা : এসবের প্রমাণ কই?

ক : প্রমাণ? প্রমাণ? কই, ভালোবাসার নামে যখন একটা তাজমহল গড়ে ওঠে, তোমরা তো প্রমাণ চাও না, যে তাতে আদৌ ভালোবাসা ছিল কোনো? যখন যুদ্ধের শেষে বিজয়ী রাজা এসে পরাধীনদের বলেন, আজ থেকে আমিই তোমাদের মঙ্গল করবো, একবারও তো তোমরা রাজার কাছে প্রমাণ চাও না, মহারাজ, একটা উদাহরণ দিন, যে দেশে যুদ্ধের শেষে সবার, সব্বার মঙ্গল হয়েছে? অথচ আমার এই গল্পে তোমাদের এত প্রমাণ চাই?

আমি কথক, রাজা। মানুষের আদিতম কাজ — উচ্চারণ। সেই উচ্চারণকে সন্দেহ কোরো না। কথায় স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন বাস্তব তৈরী করে। (একটু থেমে) বাস্তব কিন্তু কথার জন্ম দেয় না। দিলে, বোধ হয় এতদিনে আমরা বোবা হয়ে যেতাম সবাই (Pause)। তোমাদের এই দেশে, এই নিয়ে আমি চারবার এলাম, জানো রাজা! প্রথম যখন এসেছিলাম, শুধু মনে আছে একটা ছোট্ট রাজ্যের রাজা পুরু, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে আলেক্সাণ্ডার। সেই পরাক্রমশালী রাজা শুধু জানতে চাইছেন,

রা : পুরু, তুমি হার মানলে না কেন? আমি তো একদিন না একদিন তোমার এই হাতের তেলোর মতো দেশ জয় করতামই!

ক : মহারাজা, আমি হারিনি, যাতে আপনার মনে হয় দেশজয় শেষ কথা নয়। মানুষকে জিতেছেন তো তার সঙ্গে?

রা : আর দ্বিতীয়বার? সেবার কবে এসেছিলে?

ক : সে খুব অল্প সময়ের জন্য। দীন-এ-ইলাহীর যুগ তখন। মহামতি আকবর সাম্য আনছেন দেশে। অল্প সময়ে আমাদের গানবাজনায় ভারি প্রীত হয়েছিলেন মহারাজা। আর তৃতীয়বার আসি আজ থেকে ঠিক ৯৯ বছর আগে। কোনো

রাজার আস্তানায় আর যাওয়া হয়নি সেবার। তখন শুধু যুদ্ধ স্বাধীনতার, রক্ত। বিদেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে থেমেছে। খবর পেলাম, তোমাদের শহরেরই একজন, সাধারণ মানুষকে নির্মভাবে মারার প্রতিবাদে বহু সম্মানের নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন!

রা : রবীন্দ্রনাথ, মাইরি!

ক : মনে হয়েছিল, কোনো রাজার সঙ্গে দেখা না হলে কি হবে, এই লোকটাই সত্যিকারের রাজকীয়!

রা : আর এবার? এবার প্রথম এই শহরে? গুল মারার জায়গা পাওনি! দিব্যি তো ফটর ফটর বাংলা ফুটছে মুখে! আর এই জামাটা কোত্থেকে? নিউ মার্কেট? এত যে দেশকালহীন তোমার চরিত্র, দিব্যি তো কলকাতার বাঙালি লাগছে! হামকো বুদ্ধু পায়া!

ক : হাতা না পায়া জানি না মহারাজ! আমাকে যে পাত্রে রাখবেন, আমি সেই পাত্রের আকার নেবো। বড় কঠিন সাধনা এসব! প্রমাণ চেয়ে বলবেন না যেন! Haat kangan ko aarsi kya! (একটু হেসে) পেশোয়ারে শেখা। Evidence needs no proof, my Lord! বাংলায় এলে বাংলাই বলবো বৈকি! তেমন চীনে থাকলে কি বলতাম জানেন? Zhenghju bu xuyano zhenghming! ওই একই মানে।

রা : আচ্ছা হলো হলো তা কেমন লাগলো আমার শহর, শুনি!

ক : ঐদ্দ্যাখো, একবিংশ শতাব্দীতেও গল্প শুনতে রাজারা একইরকম ভালোবাসে! হবে, হবে, সব হবে! আপাতত, রীতি এই, কলন্দর গল্পের পূর্বে
রাজা প্রজা সকলের কাছে ঘুরবে, হাতে তুলে দেবে গত দেশের উপহার, যেখানে যার যেমনটা দরকার!

এদিকে তো মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, আমার এত লম্বা ডায়ালগের পরে সবারই অল্পবিস্তর মাথা ঝিম ঝিম, ঘুম ঘুম ভাব! অতএব, উপায়? উপায়?
গল্প শুনতে শুনতে মুখ চালু রাখার জন্য এই আমি আনি মধ্যপ্রাচ্যের তোফা খোবানি!

(সবাইকে খোবানি দিতে দিতে) নির্দ্বিধায় মুখ চালাতে থাকুন। আপনাদের ওই মঞ্চ নাটকের মতো, খাবেন না-ফিস ফিস করবেন না-ঘাড় ঘোরাবেন না-বাথরুম যাবেন না-নিঃশ্বাস নেবেন না-টাইপ নাটক আমরা করি না। কচমচ করে খেতে থাকুন, সশব্দে। পাশের জনকেও ভালোবেসে খাইয়ে দিন। জল খান ঢক ঢক করে। হাসি পেলে হা হা করে হাসুন। যা করবেন, খোলা মনে। ওরকম মুখ টিপে টিপে হাসি বাঙালিদের কে শিখিয়েছিল কে জানে! নিজেরা হেসে ভাবে

খুব ইন্টেলেকচুয়াল, আসলে কনস্টিপেশন।
(রাজার কাছে এসে) সমস্ত প্রজাদের প্রীত করে তবেই না রাজার ভক্ষন! তবেই না সে আহার সুস্বাদু! আসুন, মহারাজ!

রা : দ্যাখো ভাই, তুমি যেই হও না কেন, কলন্দর আর ছাতার মাথা, একটা স্পষ্ট কথা! আমি রাজা নই! আমার শহরে এঁদের মতো আমিও--

ক : Genijalan! Genijalan! এই না হলে রাজার চলন! প্রজাদের এই সম্মান ক'জন দিতে পারে বলুন তো! এত ঝামেলার শেষে আপনাকে দেখে মন ভরে গেল। Zivio Kralj! (রাজা কটমট করে তাকায়)
না, ইয়ে, ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় বলেছিলাম আর কি! আপনার তো প্রমাণ চাই। Long live the King.

রা : ভালো! যা খুশি করো! রাজা বানাচ্ছ, বানাও। রাজার চরিত্র করলে তো মধ্যবিত্ত দুম করে রাজা হয়ে যেতে পারে না! অবশ্য তার ইচ্ছে-অধিকারগুলো একটু রাজসিক বটে! (দর্শকদের) তাই না? সে নিয়ে মজা করবে? করো! না হয় তোমার গল্পের খাতিরে এক সন্ধের রাজা হলাম! শোনাও তোমার গান গল্প, কি কি ওই ঝুলিতে আছে....

Sequence - 2

ক : (নাটকের দলের বাজনদারকে) দেখো তো ভাই, সুন্দর একটা তাল বাঁধতে পারো কিনা এই গানটা! শুরু করি?

এসেছি এক শহরে
আহা, তার গৎ-বহরে
রংচং টাটকা বাসি
হৈ হৈ দেদার হাসি
শিশু বুড়ো চালাক বেবাক
দেখে লেগে যাক তাক।
খুঁজে খুঁজে পথ হয়রান
ক-ল-ন্দর আনচান,
মুঠোভর গপ্পো আছে,
নিবেদন সবার কাছে
এনেছি অনেক খোরাক,
শুনে লেগে যায় যায় তাক!

শুনে লেগে যায় যায় তাক!

রা : উত্তম! অতি উত্তম! এসো। এ হেন পারফরমেন্সের জন্য তোমার সঙ্গে একটা সেলফি তুমি সর্বাগ্রে ! (ফোন বার করে সেলফি ক্যামেরা অন করে। রাজা পাউট করে এবং কলন্দরকে পাউট করা শেখায়। অনভিজ্ঞ কলন্দর পাউটকে চুমু ভেবে রাজার গালে চুমু খেতে গিয়ে এক কাণ্ড বাধায়।)

ক : (দর্শকদের দিকে ঘেঁষে) যত ই রাজা রাজা করি না কেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি, নাম রাজা এদিকে সাইজ .... এগিয়ে গিয়ে রাজার জামার ঘাড়ের কাছটা দেখে। রাজা তখন, ফটোতে ফিল্টার মারছে, ইন্সটায় দেবে বলে।) ... ইশশশ!

রা : কি হলো ?

ক : ইশশশশশশশশশ শ !

রা : আরে হলোটা কি ? (হতভম্ব)

ক : XL -ও নয়!

রা : হ্যাঁ, তো?

ক : ছ্যা ছ্যা! কচি রাজা! নাবালক! জুভেনাইল! দুহ দুহ! এই, দাড়িটা আসল? (এগিয়ে যায় টেনে দেখবে বলে)

রা : (ব্যারিটোনে) খবরদার! আমি এখন হ্যাশট্যাগ দিচ্ছি! একদম ঝামেলা নয়!

ক : ওরেন্না! কি মেজাজ রাজার! কাকে আবার ত্যাগও করে দিল!

রা : আহা ত্যাগ না, ট্যাগ #aneveningwithkalandar # kalandar # bhogobanjaaneke # amarboyeigelo # jibontatoemnikhilli # ekdintomorboi # havingfun # feelingrajaraja! POST! যাক! এবার বলো কলন্দর, আমার শহর নিয়ে এই সুন্দর গানের জন্য কি উপহার প্রার্থনা করো? স্টারবাক্সের এক চামচ কফি? না কি কোয়েস্টে উইন্ডো শপিং?

ক : কিচ্ছু না মহারাজ! উপহার আমার অনেক জুটেছে গান গেয়ে, গল্প বলে। সে কোন কোন দেশ, তাদের উপহারের কি বহর! বেলজিয়ামে পেয়েছিলাম হাতির দাঁতের তৈরী সুরাপাত্র, আফ্রিকায় মাসাইরা তো একটা হাতিই ধরিয়ে দিয়েছিল, সে তো একাকার কাণ্ড! ভাবুন, অন্য দেশে যাচ্ছি কি নিয়ে, না হাতি নিয়ে! দেখতে কেমন লাগতো? অনেক কষ্টে তাদের বিরত করায় খুব রেগে শুধুমাত্র হাতির গা থেকে একটা লোম ছিঁড়ে দিয়ে বললো, এই হলো উপহার ফেরানোর ফল। একটা লোম ধরে আছি, এটাও খুব সুদৃশ্য হলো না যদিও । ভেনিজুয়েলার রাজা একবার

আমায় চাঁদের পাশের এক টুকরো মেঘ উপহার দিয়ে বলেছিলেন, এই মেঘ একমাত্র তখনই ডাকবে যদি এন্টার্কটিকার ধেড়ে এস্কিমো আমায় তার পোষা সিন্ধুঘোটকের ন্যাকাকান্না শোনায়। ইনকারাজ কোপাকনামা উপহার দিয়েছিলেন বাচ্চা এনাকোণ্ডা, গলায় মালার মতো পরে থাকতাম বহুদিন। আর ইংলণ্ডের কথা কি আর বলবো! যা উপহার দিয়েছে, সব এদেশ ওদেশ থেকে নিয়ে আসা !নিজের সালা একটুও কিসু নাই। ফেলে দিয়েছি।

রা : আর এই চশমাটা? এটা কোথাকার?

ক : এরও এক ইতিহাস আছে, মহারাজ! এই যে কাঁচ দেখছেন, এ হল ১২৯০ সালের, ইতালির পিসা শহরের। আর এই ফ্রেম হলো সে-এ-ই হিমালয়ের।

রা : চশমার ফ্রেম হিমালয় থেকে আনা?

ক : হ্যাঁ, কলকাতার ওই সেলিমপুরের হিমালয় অপটিক্যালস্।

রা : (রেগে গিয়ে দর্শকদের) কিছু আছে হাতের কাছে? ছুঁড়ে মারতাম! (নিজের গামছা ছুঁড়ে মারে)।

ক।। না না না না এবার মহারাজ আর উপহার নয়, শুধু কিছু প্রার্থনা করি! কলন্দর তার গল্পরূপী গানের শেষে কিছু প্রশ্ন করবে রাজাকে। রাজা তার উত্তর ঠিকমতো দিতে পারলে তবেই আসবে ভাঁড়ার পূর্ণ হওয়ার আশ্বাস, ভালোবাসা না ফুরানোর প্রতিশ্রুতি।

রা : এ কি! এসব কণ্ডিশন তো আগে দাওনি! এ আবার কি হ্যাপা!

ক : আমার এই তাক লেগে যাওয়ার একটা গতি করুন মহারাজ। এ শহরে চোখ মেলে ইস্তক আমার তাক লেগে যাচ্ছে।

এত বাড়ি ঘর গাড়ি,
এত রংচঙে আলোর সারি
রাস্তায় বিছানো ফ্লাইওভার

রা : মধ্যে মধ্যে টাকার দেমাক করতে একটা দুচো ল্যাণ্ড রোভার,

ক : সুরা আর আহারের এত ঠেক,
এত মানুষ চলাচল, এত ভেক

তবু কারুর মুখে সেই মনের হাসি দেখলাম না এতদিনেও,
রাজা! এত যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞান দিয়ে যদি মানুষ নাও কিনেও,
খেয়াল করেছো, তোমাদের মানুষগুলোও কেমন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে আজকাল? হাসে ছন্দ মিলিয়ে, চুমু খায় মেপে, চোখ মাটির দিকে, ঘোড়া নাকি!
আর এই, তোমরা কি ভাষায় কথা বলো গো?! একটা এতদিনের শহর, কোনো ভাষা নেই!

রা : কেন বাংলা !

ক : ওটা বাংলা? "I was juzt thinking ki re tora oi ravindra sarowar obdi cab korey tzabi re? And Donn get late!
Amar fuckin deri hoye jabi!"
চিত্ত যেথা without fear
উচ্চ যেথা শির,
তোমার দেশে হে my dear
হাঁসজারুদের ভিড়!
এসব দেখে ভাবলাম, ইংরেজিটা হয়তো ভালো বলে! ওমা, সে প্রপার ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলে দেখি তখন বাংলা বেরুচ্ছে "মানে আই মাস্ট হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিন ও ডাইনোসর লাইক ক্যাটাস্ট্রফি" বাবা গো!
তারপর ভাবলাম, রাষ্ট্রভাষা বলবে নিশ্চয়ই ভালো করে?

রা : হ্যাঁ হিন্দি এখন অনেকেরই সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ!

ক : আর সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজের কী থার্ড ক্লাস অবস্থা! ইতনা বড়া বড়া বাক্য ঔর ইতনা আবোল তাবোল ব্যাকরণ কে হাম তো অলমোস্ট অজ্ঞান হো যাতা থা! আর সে এক দোকানে সামান্য জল চাইতে গিয়ে দেখি তুলকালাম হচ্ছে সেখানে।

রা : কেন কি হলো? প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে? বিদ্রোহের সম্ভাবনা? বোমা? রেসিজম?

ক : আরে না, হিন্দিতে বাজার দোকান করছে বাঙালি! ইয়ে চিজ হিঁয়া সে লে কর হঁয়া রাখো, অর হুঁয়া সে উসকো বাজু মে সরা দো। দেখনা বাবা, হামকো ঠকানা নেহি, হাঁটু মে দরদ হ্যায় । আরে ইয়ে কেয়া করতা ? দাঁড়িপাল্লা তো অভি ভি কাত হ্যায়। কারচুপি? আর এই করতে করতেই আমাদের দিন মাস বছর কেটে যায়। সির্ফ হিঁয়া কা চিজ হুঁয়া অর হুঁয়া কা চিজ হিঁয়া করতে করতে

হাম বড়া হো গ্যায়া আউর আব উস বড়া কে ঝোল মে সাঁতার কাট রাহা, লেকিন একূল ওকূল দুকূল হি গ্যায়া মালুম হোতা। না শিখা ভাষা, না হুয়া বাজার।

রা : ইয়ার্কি হচ্ছে কলকাতাকে নিয়ে? এই আমার শহর নিয়ে একদম ভুলভাল বকবে না বলে দিলাম! নস্টালজিয়ায় আঘাত করলে কিন্তু আমরা পিছনে নগরবাউল লেলিয়ে দিই!

ক : Oh pardon Mon Seigneur! Pardon!

রা : এই চুপ করো তো! দেখানেপনার আড়ৎ কোথাকার! আমাদের দেশের, আমাদের শহরের এই সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক এই যা-খুশি-তাই করার অধিকার নিয়ে জানতে, মুখ খুলতে, প্রশ্ন করতে কি কি লাগে জানো?

ক : একটা সন্ধে। প্রসেনিয়াম আর্ট সেন্টার।[২] সাক্ষী হিসেবে গোটা তিরিশেক দর্শক। এই লাগে। মুখ খুললাম, প্রশ্ন করলাম। প্রশ্ন করলাম এই তোমাদের যা খুশি-তাই কে। হলো?

রা : (বক্তৃতার ভঙ্গীতে) বিদ্রূপ করো না! কলকাতা আজও, এত বছর পরেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষাচর্চার কেন্দ্র, তার রক্তে রক্তে বইছে সাহিত্য ও শিল্পের প্রাণপুরুষদের চিন্তা ও বীক্ষণ—

ক : (কানে হাত দিয়ে) বাইরে একটু আগেই মাইকে কে একটা এসব বলে চিল চিৎকার করছিল। আর শুনতে চাইনা, ক্ষমা করো! তার চেয়ে বরং, শহরকে আগলে রাখার যখন এতই চেষ্টা, তার জন্য এতই যদি দরদ, আমার এই প্রশ্ন সহ্য করো! উত্তর দাও! যদি সঠিক হও এবং আমি যদি তোমায় ভুল না প্রমাণ করতে পারি, এই কলন্দর, এই ফকিরের সব দোয়া তোমার হবে!

রা : আর না পারলে?

ক : ভয় পাচ্ছ রাজা? ভয় করছে? ভাবছো, না পারলে যদি অভিশাপে শহরটাকে ধ্বংস করে দিই? তোমার শহর ধ্বংস হওয়ার জন্য যেন আমার অপেক্ষায় বসে আছে? আমার রুশ বিপ্লব মনে পড়ে যাচ্ছে। বুড শো বুডেট ! যা হবার, তা হবেই!

রা : প্রশ্ন করো!

Sequence - 3

ক : বেশ। একটা গল্প দিয়েই শুরু করি না হয়!

২ আবারও, শো অনুযায়ী নাম পাল্টে যাবে।

এই শহর থেকে যাত্রা শুরু করে
সাড়ে তেষট্টি দিন আর একাত্তর রাত্রি ধরে
যদি উত্তরে পেরোনো যায় কারাকোরাম, আরো পরে তিব্বতের দেশ
এবং পৃথিবী প্রান্তে যা-কিছু নদীনালা অবশেষ
দেখা দেয় নীল মাঠ, আর চন্দ্রমল্লিকা রঙের আকাশের এক শহর, নাম ডায়োমিদা! ছিমছাম ঘরদোর, রাস্তাঘাট। সে শহর ছোঁয়নি যুদ্ধপাট! যদি বাড়ি বাড়ি প্রশ্ন করো, ভয় করে না তোমাদের, যদি শত্রু এসে মেরে যায় কোনোদিন? তারা হা হা করে হেসে তোমার কথায়, শহরের সমস্ত শিশুদের বলে, " তোরা আবার স্বপ্ন দেখা দেখি!"
তখন তারা পাতা জুড়ে টলটলে নীল জলের নদী আঁকে,
ঘুড়ি ওড়ায় পথের বাঁকে বাঁকে !
মাঠে মাঠে শুকোতে দেয় সেই নদীর রং, তাই মাঠ হয় নীল
আর চন্দ্রমল্লিকা রঙের ঘুড়িতে আকাশ ছেয়ে যায়।
আর শত্রুমিত্র পাশাপাশি বসে ---
অস্ত্র নয়, সুখদুঃখের গপ্পো শানায়!

রা : চমৎকার রূপকথা!

ক : সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সে দেশের শিশুদের ওপর --- মানো তো রাজা?

রাজা: মানি।

ক : তারা কেমন আছে তোমার দেশে?

রা : বাচ্চারা কেমন আর থাকবে! বাচ্চাদের মতোই আছে। লেখাপড়া, খেলাধুলো করে।

ক : তাদের কার কি ইচ্ছে কিছু জানো?

রা : বাচ্চাদের আজগুবি ইচ্ছের কথা না ভেবে তাদের পড়িয়ে মানুষ করে তারপর ইচ্ছে করতে শেখানোটাই সুস্থ, স্বাভাবিক নয় কি?

ক : কেয়া বাত, রাজা কেয়া বাত! ইচ্ছে করতে 'শেখানো হয় তোমার এখানে? আহা, নতুন শহর বটে! কি ইচ্ছে করতে সেখাও তাদের?

রা : যেন মানুষ হয়ে ওঠে! যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে! ভাতকাপড় জোগাড় করতে শেখে! উপার্জন করার জন্য তাদের দড় করে তোলা এত চাকরি-বাকরি আমাদের দেশে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, সরকার- বেসরকার! সব পথের উপযুক্ত

করে তোলা তাদের, to become ideal citizens!

ক : Un ke dekhe se jo aa jati hain munh pe raunaq
Woh samajhte hain ke bimaar ka haal achcha hain!
Un ke dekhe se jo aa jati hain munh pe raunaq
Woh samajhte hain ke bimaar ka haal achcha hain!
Hum ko maalum hain jannat ki haqeeqat, lekin
Dil ko khush rakhne ko yeh khayal hi achcha hain!

রা : মানে?!

ক : তুমি তো টাকা উপার্জনের কয়েকটা রাস্তা বললে শুধু, রাজা এতে বাচ্চা-গুলোই বা কোথায়, তাদের ইচ্ছাই বা কোথায়, ভবিষ্যতের স্বপ্নই বা কোথায়!

রা : তো সারা জীবন খেলাধুলো করে যাক, নাকি? আর ভাঁড়ে মা ভবানী?

ক : এই তো হয়েছে সমস্যা, রাজা! ভাঁড়ের চিন্তা করতে গিয়ে আমরা ঘরের কথা ভুলে যাই! তারপর একদল স্বার্থপর কিম্ভুত মানুষ তৈরী হয়, আর তোমরাই তাদের দেখিয়ে বলো, ইশ! যুগটা জাহান্নামে গেল পুরো!

রা : এখন যুগটা লড়াইয়ের, কলন্দর! তোমার মতো মন্দার বোস হয়ে গ্লোব ট্রট করা সবার কম্মো নয়! এটা বোঝো? বাঁচতে গেলে ---

ক : মারতে হবে। ছুটতে হবে। ধাক্কা মারতে হবে। ফাউল করতে হবে। যতক্ষণ না অব্দি রেড কার্ড দেখাচ্ছে, মেরে শালা হাত পা ভেঙে দাও। তবে না মানুষ! বলো?

রা : তো কি করবো টা কি?!

ক : কি শেখাও বাচ্চাদের?

রা : প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কবে হয়েছিল? আকবরের কজন রাণী ছিলেন? এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কত? থিওরি অফ প্রবাবিলিটি? আঠারোশ শতকে ইংলণ্ডের সমাজ কেমন ছিল? কৃষ্ণনগরের তাপমাত্রা বেশি কেন? গম কোন দেশের প্রধান ফসল? থানকুনি পাতার বিজ্ঞানসম্মত নাম কি?[৩]

ক : এসব? কি লাভ হয় ওদের? 'মানুষ' হয়?
আচ্ছা, কেন সহজ পাঠ পড়াও না ওদের? কেন জানতে চাও না, ওদের ইচ্ছেগুলো কেমন? পড়াশুনার বাইরে ওদের খুব গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে কিনা যেমন তেমন! মনে মনে অলিম্পিকে ভারতের হয়ে ছুটতে ইচ্ছে করে? তিনদিন বৃষ্টির পর রোদ উঠলে কবিতা মনে পড়ে? ওরা দেশ ঘুরতে, পাহাড়ে যেতে চায়?

[৩] এই প্রশ্নগুলোই যে করতে হবে, এমন নয়। তবে প্রশ্ন উদ্ভট, এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া হওয়া কাম্য। যে সব প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় লেখা হয়, আর তারপর কোনও কাজে আসে না, এমন প্রশ্ন।

তুমি আর কি জিজ্ঞেস করবে, হায় রাজা! কারণ এতে টাকা নেই। এসব প্রশ্ন 'মানুষ' করতে পারে বড়জোড়। কিন্তু তোমাদের গল্প তো অন্যরকম!

ইচ্ছে যদি বলবে তুমি,
ডাক্তারিঞ্জিনিয়ার!
অ-এ অজগর হিসেব কষে
ফরেন ট্রিপ দশবার
কিম্বা যদি দশটা পাঁচটায়
ডাক দিল গরমেন্ট,
ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স কেন
হয়না সেন্ট পার্সেন্ট!
আ হা হা হা এমন হাওয়ায়
বন্ধু বাঁচাও মন
ইচ্ছেগাড়ি, ইচ্ছেগাড়ি
অনিশ্চেটাই শোন!
আমার প্রিয় কোলের বালিশ
মরাল পুলিশিং!
ভালোবাসার ইচ্ছে খাসা,
দিন দশেকের ঋণ ।
কিন্তু ভালো বাসছে না তো
আসলে কেউ আর,
পায়ের তলায় ই এম আই টাই
খুব বেশি দরকার !
আ হা হা হা এমন হাওয়ায়
বন্ধু বাঁচাও মন
ইচ্ছে গাড়ি, ইচ্ছে গাড়ি
অনিচ্ছোটাই শোন!

(রাজা থুম্বো মেরে বসে থাকে। একদম চুপ।)

ক : পারলে না রাজা, আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তোমার দেশের ভবিষ্যৎকে আগলে রাখতে তো পারলে না।

রা : ঠিক আছে তুমি পরের প্রশ্নটা করো না!

Sequence - 4

ক : জো হুকুম! তাহলে, আমার পরের প্রশ্নের ভূমিকায় বলি, এ কথা তো মানবেন হুজুর যে কোন দেশে শুধু বিজ্ঞান আর বাণিজ্য দিয়ে দেশ রক্ষা হয় না? সার্বিক বিকাশের জন্য চাই সুন্দর মনন, যার মূলে থাকে অবশ্যই সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ?

রা : ঠিক ।

ক : তাহলে জাহাপনা, বলুন তো আপনার দেশে যাঁরা এই সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, যারা এই মনন পৌঁছে দিতে চান মানুষের কাছে, তারা কেমন?

রা : Oh they are brilliant minds ! Scholarly people with their .....

ক : কি বললে কি বললে? স্কলার? মানে ওই যারা "অরিজিনাল" কাজ টুকে, আর রেফারেন্স ম্যানুফাকচার করে এদিক ওদিক ছেপে বেড়ায়? যাদের নিয়ে এই চার লাইন বলাই যায়----

বিদঘুটে স্কলার ওই কিমাকার কিম্ভুত
সারাদিন ধরে তার শুনি শুধু খুতথুঁত ।
ইস্কুল চেয়ে বেশি কলেজেই প্রেফারেন্স
ঘ্যানঘ্যানে লেকচার, ঘন ঘন রেফারেন্স!

রা : Excuse me! আমাদের সাহিত্যের স্কলারদের সামনে পড়লে এই সমস্ত জারিজুরি না তোমার, বেড়িয়ে যাবে! As for example, if I name, / Prof. Dr. M.Phil, D. Litt, D.Sc. M.A., B.Sc. H.S. Madhyamik 8-pass. অনন্যোপায় গাঁইগুঁই ----

ক : বাওয়া, নাম না বারো বগির লোকাল ট্রেন?!

রা : How dare you? Prof. গাঁইগুঁইয়ের ক্রিটিকাল থিওরি এবং রিডার রেসপন্স ডিসিপ্লিনের ওপর যা দখল না! প্রতি মাসে বত্রিশটা সেমিনারে রিসোর্স পার্সন হিসেবে যান! বছরে ছোট বড় মিলিয়ে ৯৮১টা পেপার।

ক : থিওরি! ডিসিপ্লিন! রিসোর্স! এই সব মিলিয়ে সুন্দর মনন? উরে বাবারে বাবা! কি খিল্লি! ৯৮১টা পেপার! মানবসভ্যতায় কাগজ আবিস্কার করা সার্থক, বলুন?

রা : চোপ রও! (তুতলে) শিক্ষক ছাড়াও আমাদের তাবড় তাবড় কবি!

ক : ফেসবুকে লেখে যারা?

রা : তো কি ফেসবুক বলে কি বুক নয়?

ক : বটেই তো! বটেই তো! সে এক ব্যাপার! সাতসকালে পিল পিল করে লোকজন কবির লেখা ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। মানে পোষ্ট শেয়ার করছে আর কি। কবি সদ্য মানববোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে লিখেছেন-

"দেশ তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মানববোমার তোড়ে মম সারা মনে বিবমিষা।"

রা : চারিদিকে তুমুল উও-উও ধ্বনি। সাত হাজার লাইক। একশোবিরাশি শেয়ার। সেখানে অনেকে স্বরচিত কবিতা-উত্তর দিয়েছেন।

ক : সে মানে সমর-সুমন-সীগার মেলানো এক দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ভাব। খালিপেটে সে'সব পড়েছেন কি অম্বল হবেই হবে। কয়েকজন কমেন্ট করেছেন, "অহো, কি দুর্দম কাব্য!/ তোমাকে কি লরিয়েট ভাববো?

কবি ভাবেন, খেলা তো মন্দ নয়। আমি বিদ্রোহী কিন্তু বয়কটী নই, এই একটা ভালো ইমেজ হয়েছে। কোথাও যাবো না, শুধু বাড়িতে বসে ফোঁৎফোঁৎ করবো যে আমার হাসি পাচ্ছে না— আমি সে টাইপ নয়। আমি হলাম পপুলিস্ট বিদ্রোহী। ছোট বয়সের তিরস্কার আর বড় বয়সের পুরস্কার গেঁড়িয়ে সার বুঝেছি, সাধারণ বাঙালী পাঠক আসলে— বেবোদ। তাদের জীবন-মৃত্যু হল পাঞ্চলাইন, আর কবি হলেন পাঞ্চিং মেশিন। তারা সবচেয়ে খুশি হয় "ওহ কি দিলে গুরু!" বলতে পারলে। কবি রাস্তায় নামতে বললেও সবাই কি সাংঘাতিক অনলাইন রাস্তায় নামে দেখেছেন? কেমন লেখে দেখেছেন, "ইশ্ আমি শুধু আজকের জন্যই দেশের বাইরে, কাল রাস্তায় নামলেই চলে যেতাম!" ভাগ্যিস যায় না শেষ অব্দি। শিওর চাক্কাজ্যাম হয়ে যেত। এই-ই বেশ। বৃষ্টি হোক কি অনাসৃষ্টি,

নারীবাদ কি হার্মাদ, কবির কলমের ডগায় বাঙালীর চারশোচল্লিশ ভোল্ট নাচছে। আবার রাত পোহালে মাঘ মাসে স্কুলের সরস্বতীদের স্মরণে কবি দৈনিকে লেখেন নরম, ভেজা ভেজা, মনকেমনিয়া শব্দসমূহ, সেই বিদ্রোহীরাই এবার বলেন, "আহ্ হা! Naughty কবি!"

সবাই পান আনন্দ বাজার পান কবি!

(রাজার ভুরু ক্রমেই কুঁচকে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না।)

ক : আর মুখ খুলো না রাজা তোমার বিদ্বজ্জনদের নিয়ে । মনন গুবলেট হয়ে যাবে। দুটো প্রশ্নেই যে হেরে গেলে রাজা! এত প্রিয় শহর তোমার, এত প্রিয় রাজ্য! এভাবে হেরে গেলে চলবে?

Sequence - 5

আচ্ছা এবার শেষ প্রশ্ন। এখনও জিততে পারো, দেখো। এই প্রশ্নের কোনো ভনিতা নেই। শুধু মনে পড়ে, এক সন্ধ্যায় আমাকে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস তার প্রাসাদোপম

বাড়ির বারান্দায় জিজ্ঞেস করলেন, "Ni Zhuol shengme gonghzuo?"

রা : তোমার ক্ষমতা কিসে, কলন্দর? আমার ক্ষমতা রাজকার্য, ওই শ্রমিকের ক্ষমতা শ্রম, ওই যে চাষী, ওর কৃষিকাজ, আমার যুবরাজের শিক্ষকের, শিক্ষকতা! তুমি কোন ক্ষমতা ফলাও এই তোষামোদের মধ্য দিয়ে?

ক : (দর্শকদের) ভারী কঠিন প্রশ্ন, ভেবে দেখুন! এতদিন গান গল্প করতাম আনন্দে, আপনাদের ওই গুগাবাবার মতো! চেঙ্গিস আমায় ফেললেন মহা মুশকিলে। একদিকে আমার সেই যাত্রার শেষ দিনের সন্ধে তখন নেমে আসছে। রাজার এই প্রশ্নের উত্তরে তাকে খুশি না করতে পারলে না জানি কি আছে কপালে! ভাবতে লাগলাম। আর আমি ভাবতে ভাবতে তাহলে রাজা, তোমার কাছেও এই প্রশ্ন, তোমাদের এই প্রিয় শহরে তোমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা কী, রাজা? ভেবে উত্তর দাও।

(রাজা ভাবতে বসে। কোরাসও কিছুটা উৎকণ্ঠায়)।

ক : ভাবো রাজা, আরো ভাবো। তোমার সোনার সাম্রাজ্যের ইট-বালি বেরিয়ে যাতে না আসে, খেয়াল রাখো!
রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা—
ঠোঙাভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা;
রাজা বলে "বৃষ্টি নামা— নইলে কিচ্ছু
মিলছে না।"

কিচ্ছু মিলবে না হে রাজাধিরাজ। হিসেব যতই কষ, কোনো অঙ্কই মিলবে না। তোমরা সবচেয়ে সক্ষম কিসে জানো?

রা : আরে সময় দাও, একটু সময় দাও!

ক : হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো আদর্শ পথে এগোচ্ছ! এই তো চাই!

রা : আমাদের ক্ষমতা---- বিজ্ঞান! বাণিজ্য! শিল্প? সংস্কৃতি! আদর্শ? রাজনীতি! বক্তৃতা! মনে মনে প্রতিবাদ জানানো! রবীন্দ্রপুজো! চাঁদা তোলা! ঘুষ! লেট করা! পা-চাটা? পি এন পি সি?? Whatsapp-এ গুড মর্নিং মেসেজ পাঠানো? ফেসবুকে নিজেকে 'সেফ' মার্ক করা? [4]

[4](এখানে একটা ভিশ্যুয়াল তৈরি করা হবে। রাজা হয়ে উঠবে একটি অটল ইন্সটিটিউশনের প্রতীক। সাংঘাতিক শ্লেষ নিয়ে তার উচ্চারিত প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে কলন্দর চেষ্টা করবে, সেই স্ট্রাকচারকে ভাঙার। প্রথমে পারবে না, বহু চেষ্টায় রাজাকে ভাঙতে পারবে।)

ক : (দর্শকদের) তোমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা কি জানো?
অপেক্ষা
অনেকে অবশ্য এটাকে ক্ষমতা বলতে চায় না। আমি বলি।
ক্ষমতা নয় এটা, বলো রাজা? বুকে হাত রেখে বলো,
তোমার ছোটবেলায় মনে হয়নি একবারও, এ কেমন সময় বেঁচে আছি?
সময়টাকে পাল্টাই, চলো!
কিন্তু না পাল্টে অপেক্ষা করোনি সময় পাল্টানোর?
এতদিন পর,
হে রাজ-রাজেশ্বর,
তোমার এই মনের রাজাধিরাজ,
অপেক্ষা করছো না আবার সময় পাল্টানোর আজ?
অপেক্ষা করোনি যাকে ভালোবাসো, তার? আমার হিংসা যত সহজে জানাতে পারি, ভালোবাসা তত সহজে জানাতে পারি না। তাই, অপেক্ষা করোনি, যে সে নিজেই একদিন বুঝে নেবে তোমায়?

(এখানে একটা ভিস্যুয়েল তৈরী হবে। রাজা হয়ে উঠবে একটা অটল ইন্সটিটিউশনের প্রতীক। সাংঘাতিক শ্লেষ দিয়ে কলন্দর চেষ্টা করবে ভাঙ্গার। প্রথমে পারবে না, পরে পারবে)

অপেক্ষা করোনি রাজা, নিজের মাথায় মুকুট তুলে নেওয়ার?
তারপর সময় যখন পেরিয়ে গেছে সময় পাল্টে দেওয়ার
আর বুঝেছো মুকুট খুলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার মতো সাহসীও তুমি নও,
অপেক্ষা করোনি ম্যাজিকের? যে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে?
রাজ্যপাট বেঁচে থাকবে সম্ভবে অসম্ভবে?

তোমার এই প্রজাদের জিজ্ঞেস করো তো, রোজ তারা কোন একটা জিনিস সবাই করে? দেখো, সব্বাই বলবে অপেক্ষা। কেউ অপেক্ষা করছে দেশ ছাড়ার। কেউ, ভালো হওয়ার। কেউ ভালোবাসার। কেউ, অর্থের। কেউ, ক্ষমতার। কিন্তু অপেক্ষা সবাই করছে । তোমার সমস্ত সাম্রাজ্য, তোমার গোটা শহর অপেক্ষা করে থাকে রাজা, দিনের পর দিন, কিসের অপেক্ষা কে জানে। তাই, সেই শহরে কিছু আর হয় না বুঝি?

হায় রে রাজা,
হায় রে রাজা
মুকুট পরার
দিন কি যায়

বসন্তবায়
ছড়িয়ে দেবে
আমের মুকুল,
দিন যায় যায়
মনখারাপে
নিজেই মরো
মন জানো না
কি সুখ চায়
ব্যথার চাদর
একার আদর
জড়িয়ে রাখো
নিজের গায়ে
হায় রে রাজা,
হায় রে রাজা
মুকুট পরার
দিন কি যায় ....

(রাজা ভেঙে পড়ে থাকে অভিনয়ক্ষেত্রে)।

রা : তুমি সেদিন চেঙ্গিসকে কি বলেছিলে, কলন্দর?

(কলন্দর রাজার কাছে যায়, কথা বলতে শুরু করে তাকেই চেঙ্গিস খাঁ মনে করে)

ক : সন্ধে হয়ে আসছে হুজুর! তাও, একটু কষ্ট করে দেখুন তো, দূরের ওই আকাশরেখায় আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?

রা : আমার রাজত্বের সীমানা।

ক : আমার কাজ ওর ওপারে শুরু হয়, মহারাজ! যা আপনার চোখের বাইরে, পরিধির বাইরে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এর বাইরে, আমার কাজ সেটুকুর খবর আপনাকে দেওয়া, যাতে আপনি কোনোদিন একা না হয়ে যান! ওটুকুই আমার ক্ষমতা!

রা : কিন্তু আমার শহরের তবে কি হবে, কলন্দর?

ক : তোমার সাম্রাজ্যের সীমানা বোধ হয় তুমি দেখতে পাচ্ছ না রাজা, তাই না?

(রাজা চুপ করে থাকে। আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে)

ক : কি ভাবছো? হেরে গেলে? আমার তিনটে প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে? দূরে শুনতে পাচ্ছ, তোমার প্রজারা তোমাকে হেরো রাজা বলে দুয়ো দিচ্ছে?

কানে আসছে সেই শব্দ? গায়ে মেখো না ওসব। আসল কথা, তুমি ভালোবেসেছ তোমার শহরকে, আপ্রাণ চেষ্টা করেছ আমার প্রশ্নের মুখে তাকে আগলে রাখার । পারোনি হয়তো। তবু, ঠিক আছে। উত্তর তো দিয়েছো, চেষ্টা তো করেছো। অপেক্ষা করে থাকনি, যে আর কেউ তোমার হয়ে উত্তর দিয়ে দিক।

রা : কিন্তু .... এবার?

ক : এবার আর কী! বিদায় নেবার পল!
তোমার দরবার থেকে আরেক দরবারে যাওয়ার কল, আর কি!
দেখি, আবার কোথায় এরকম রাজার খোঁজে যাওয়া যায় ।

রা : এখনই যেও না, কলন্দর দাঁড়াও।

ক : জাঁহাপনা ...

রা : পথ দেখিয়ে যাও। এত যে হারালে আমায়, এত যে স্বপ্ন দেখতে বলে যাচ্ছ, কি নিয়ে স্বপ্ন দেখবো, বলে যাও। নতুন কোন গল্প শোনাও কলন্দর।

ক : কেমন গল্প, জাঁহাপনা?

রা : একখানা সব-পেয়েছির গল্প শোনাও দেখি। যেখানে আমাদের এই হেরে যাওয়াগুলো নেই, কারণ কোনো যুদ্ধই হয়না সে বিশ্বে, কারুর সঙ্গে কারুর। সেখানে এই রাজা রাজা খেলা নেই। এমন কোনো গল্প বলো, কলন্দর। অন্য দেশের, অন্য সময়ের। তুমি তো সময় নিয়ে খেলতে জানো!

ক : গুস্তাখি মাফ হুজুর,
এত দেশ ঘুরে এত কাল ধরে
ঐটি আমি এখনো পাইনি কোনো ঘরে ---
সব-পেয়েছির গল্প।
বরং উল্টোটা তবু আছে অল্পস্বল্প।
আমি দেখেছি, দেশের রাজারা, মনের রাজারা কিভাবে ধরে নেন, সব তাঁদের। তাঁদের অধিকার সর্বগ্রাসী। কিন্তু জাঁহাপনা, ওই দেখুন, আপনার কলকাতার বুকে রাত্রি হচ্ছে। আর আপনার এবং আপনার মতো সব রাজার মনে হচ্ছে এত অধিকারের পরেও কি যেন একটা নেই, কোথায় যেন সব কিছু অপূর্ণ রয়ে গেল। ওইটুকু আর চাইবেন না হুজুর, ও'টুকু বাঁচিয়ে রাখবেন। এই যে আমরা সব পেলাম না, বা পেয়েও হারালাম— সে জন্যই আজও নতুন করে বাঁচার ইচ্ছে, জিততে চাওয়া, নতুন দেশের স্বপ্ন!
হায় হায়, এত গম্ভীর মুখ কেন? কলন্দর গান-গল্পে তো আনন্দই দিতে চায়! তাই বলে দোষ কি একটুও ধরবে না? (দর্শকদের) আচ্ছা ঢের গপ্পো শুনেছেন

আমার! এবার আপনাদের এই শহর নিয়ে, আপনাদেরই ভাষায়, সুরে শেষ হোক না হয়! চিন্তা নেই, আপনাদের শহরের ভালোবাসার ভাঁড়ার ফুরোবে না!

মনে বড় সাধ ছিল বলে
হেঁটে হেঁটে বনে যাই চলে
তারি দেখা পাব বলে
আশারো পিদিম জ্বালি

পরম ধর্ম মনে রয়
আশার বড় অপচয়
কলুষ-রঙ ধরে কোন শরীরে

মনে মধ্যে লালসা
খন্ড ক্ষুদ্র যাতনা
অন্তরেরো একি পরিচয় রে

ব্যথাহত চিত্তে মম
আতঙ্কিত প্রকাশ তব
নিভৃতে মন-কুঠিতে জ্বলিতেছে জ্বালা

দিবারাত্রি জ্বলে কন্যার নয়নপ্রদীপ দুটি
আমারো অন্তরে ভাসে প্রেমভরা রতি

স্মৃতিজুড়ে জলামাঠের ধূসর সাদা গন্ধ
তদোপরে প্রিয়তমা মৃণ্ময়ী বসন্ত

যুগের ধর্ম অবক্ষয়
বিরহে তাই অধিক ভয়
সাঁজ-গুল্মের একি সুরভীরে।

প্রথম অভিনয় : ৪ঠা আগষ্ট, ২০১৮ (প্রসেনিয়াম আর্ট সেন্টার, কলকাতা)

ইঁদুরের গপ্পো

অপূর্ব দে

(পাহাড়, বন, নদীর পরিবেশ মঞ্চ জুড়ে। মঞ্চের বাঁদিকে একটি টিলার সাজেশন। রহস্যময় পরিবেশে গা ছমছম অবস্থা। একটা ইঁদুরের আর্ত চিৎকার শোনা যাবে। পর্দা খুললে দেখা যাবে শান্তনীল পাথর ছুঁড়ে একটা ইঁদুর মারছে। পিছন থেকে প্রবেশ করে একজন লোক। মাথায় টুপি চোখে সানগ্লাস ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পোষাকও উদ্ভট ধরণের।)

শান্তনীল : শালা নেংটি ইঁদুর। বড্ড জ্বালাচ্ছিলি। দিয়েছি শেষ করে। রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো মুখ নিয়ে ভেটকি মেরে পড়ে থাক।

লোক : ইঁদুরটা কি মরলো?

শান্তনীল : (চমকে উঠে) কে?

লোক : বলছি, ইঁদুরটা কি মরলো?

শান্তনীল : একেবারে ফিনিশ।

লোক : মরার সময় নিশ্চয়ই খিঁচুনি দিয়েছে।

শান্তনীল : ইয়েস, দিয়েছিল। কিন্তু আপনি— মানে আপনার পরিচয়?

লোক : ভ্রমণ পাগলা বলতে পারেন। জানেন ভ্রমণ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। বাঙালির জীবন থেকে ভ্রমণকে আলাদা করা অসম্ভব। আমার মনের ঘরে ভ্রমণের নিশির ডাক। শুনতে পেলেই ছুটে আসি পাহাড়ে, জঙ্গলে। কী দেখছেন অমন করে? — আরে মশাই, ইঁদুরটা এখন মৃত। লাশ হয়ে গেছে। থ্যাঁতলানো, রক্তাক্ত ইঁদুরটার জীবন এখন অতীতকাল।

(হঠাৎ ইঁদুরের চিৎকার শোনা যায়। শান্তনীল ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়।)

লোক : কী হলো? চমকে উঠলেন কেন?

শান্তনীল : না, কিছু না।

লোক : (বুক পকেট থেকে সিগারেট আর প্যান্টের পকেট থেকে লাইটার বের করে) বুক পকেটে সিগারেট রাখলে বেঁকেচুরে যায় না, কী বলেন? নিন, ধরুন।

শান্তনীল : ধন্যবাদ।

লোক : খান না?

শান্তনীল : খেতাম। ছেড়ে দিয়েছি।

লোক : পেরেছেন? আমি কিন্তু পারলাম না পার্বতীর মন্দিরে উঠে রিল্যাক্স করে সিগারেট খাব ভেবেছিলাম। হঠাৎ দেখি নো স্মোকিং নোটিশ। যাই বলুন, এটা স্রেফ মার্কিন কালচার। আপনি আমার কথা শুনছেন না।

শান্তনীল : শুনছি।

লোক : জানেন, ইঁদুর বিষয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি। শব্দ, গন্ধ, রঙ সম্পর্কে ওরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সেন্সেটিভ। ইঁদুর মা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে বাচ্চাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখে। হ্যাঁ ওরা টের পায়। ইঁদুরটাকে মারলেন কেন?

শান্তনীল : ওটাকে আমি মারলাম কেন?

লোক : হ্যাঁ ।

শান্তনীল : মেরেছি বেশ করেছি। আপনি কে মশাই? আপনাকে কেন কৈফিয়ত দিতে যাব? কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।

লোক : অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি বলছি— আপনি ওটাকে মেরেছেন কেননা আপনি নিশ্চিতভাবে ভেবেছিলেন— ওটা আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে। ঠিক কিনা?

শান্তনীল : ঠিক জানি না।

লোক : আমরা অনেক সময় জানি না কী করছি? কেন করছি? আসলে আমরাও তো প্রাণী। প্রাণী মাত্রেরই আত্মরক্ষার বোধ থাকে। আমি কিন্তু খুশি হয়েছি।

শান্তনীল : কেন?

লোক : আপনি ইঁদুর মেরেছেন বলে।

শান্তনীল : তাজ্জব ব্যাপার। আপনারও ইঁদুরের উপর রাগ আছে।

লোক : আছে বৈকি।

শান্তনীল : কিন্তু কেন?

লোক : ইঁদুরের সঙ্গে প্লেগ রোগের সম্পর্ক আছে জানেন তো। গুজরাটে সেবার প্লেগের মহামারি হয়েছিল। সে সময় আমরা গুজরাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী প্লেগে মারা গিয়েছিলেন। **(বিষন্ন আবহ বাজে)** কাজেই আপনি একটা ইঁদুর মেরেছেন দেখে আমার ভালো লাগছে। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল। তবে একটা বিষয়ে আমার

এখনও খটকা আছে জানেন।

শান্তনীল : কী?

লোক : বিজ্ঞানীদের মতে ইঁদুর খুবই সেনসেটিভ প্রাণী। অথচ খাদ্যে বিষ মিশিয়ে রাখলে ইঁদুর তা টের পায় না কেন। জানেন , বিষ দিয়ে অনেক ইঁদুর মেরেছি। আমার হাত তো আপনার মতো লক্ষ্যভেদী নয়।

শান্তনীল : পাথরটা দৈবাৎ লেগে গেছে।

লোক : লেগেছে তো। আর ইঁদুরটা মরেও গেছে। আমি কিন্তু চেষ্টা করেও পারিনি। তাই বিষ দিয়ে মেরেছি। আচ্ছা, আপনি তো ইঁদুরকে ভয়ে মারলেন তাই না?

শান্তনীল : (রেগে গিয়ে) তখন থেকে উল্টো পাল্টা বকছেন কেন বলুন তা? আপনি কি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করছেন? যত্তোসব।

লোক : এটা খেয়াল করেছেন কি— মরা ইঁদুরটার পাশেই রক্তমাখা পাথরটা পড়ে আছে? ওটা ইঁদুর মারার অস্ত্র । এভিডেন্স এভাবে ফেলে রাখতে নেই মশাই।

শান্তনীল : আপনি একটা পাগল। কমপ্লিটলি ম্যাড।

লোক : ঠিক বলেছেন আমি একটা পাগল। পাগল হয়েই বনে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। জানেন তো পাগলের কোন সমস্যা নেই। একমাত্র পাগলামি ছাড়া (হাসি)

শান্তনীল : আপনার পাগলামি আমি সহ্য করতে পারছি না। আই কান্ট টলারেট দিস্। প্লীজ আপনি এখন আসুন।

লোক : **(শান্তনীলের কাঁধে হাত রেখে)** কী আশ্চর্য দেখুন— আমরা কথা বলছি অথচ পরস্পরকে চিনি না। ওই হতচ্ছাড়া বজ্জাত ইঁদুরটা আমাদের দুজনের মধ্যে একটা পাঁচিল তুলে রেখেছে। সেটাকে ভাঙা যাক। কী বলেন?

শান্তনীল : বেশ তো আগে আপনার পরিচয় দিন।

লোক : আমি সুরপতি ব্রহ্ম। বয়সে আপনার চেয়ে বড়ই হব। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করতাম। এখন আর করি না। এখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই। মানে আমি আর র‍্যাট রেসে নেই। আপনি?

শান্তনীল : আমি — আমি শান্তনীল সোম।

লোক : বাহ্। বেশ চমৎকার নাম। শান্তনীল সোম। কী করেন।

শান্তনীল : তেমন কিছু নয়। একটা বেসরকারী ফার্মে চাকরী করতাম।

লোক : করতেন? এখন করেন না কেন?

শান্তনীল : ছাড়িয়ে দিয়েছে। যাকে বলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক।

লোক : সর্বত্র ছাঁটাই লে-অফ চলছে। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকারি তো দূর-অস্ত। বেসরকারি চাকরি পাওয়াও খুব কঠিন। তা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক তো অনেক মালকড়ি পেয়েছেন।

শান্তনীল : যৎসামান্য। সেই টাকা দিয়ে স্বাধীনভাবে কিছু একটা করবো ভাবছি।

লোক : আমার সাহায্য লাগলে বলবেন। এই নিন আমার নেমকার্ড। (বুক পকেট থেকে একটা কার্ড দেয়। শান্তনীল না দেখেই মানিব্যাগে রেখে দেয়।) কার্ডটা দেখলেন না?

শান্তনীল : না। পরে দেখে নেব। আচ্ছা চলি।

লোক : আর একটু বসুন প্লীজ।

শান্তনীল : আমার স্ত্রী হোটেলে একা আছেন।

লোক : সে কী ? ওনাকে সাথে নিয়ে বের হননি?

শান্তনীল : ও একটু অসুস্থ। বেশি হাঁটাচলা বারণ। তাই

লোক : আই সি। তার মানে ডাক্তারের পরামর্শে চেঞ্জে এসেছেন।

শান্তনীল : আজ্ঞে হ্যাঁ। (ইঁদুরের চিৎকার শোনা যায়। শান্তনীল ভয় পায়। লোকটা খেয়াল করে কিন্তু কিছু বলে না।)

লোক : চেঞ্জের পক্ষে এই জায়গাটা কিন্তু আদর্শ জায়গা। স্বাস্থ্যকর বলেই ট্যুরিষ্টদের মরসুম এখনও চলছে। কদিনের জন্য এসেছেন আপনারা?

শান্তনীল : এক সপ্তাহের জন্য।

লোক : সময় বাড়িয়ে নিন। এখন তো আমার মত আপনারও হাতে অঢেল সময়।

শান্তনীল : আমার স্ত্রীর সিক-লিভ মাত্র দশদিনের।

লোক : উনি তাহলে চাকরি করেন ?

শান্তনীল : হ্যাঁ। একটা স্কুলে পড়ায়।

লোক : বাহ্ স্কুল টিচার। মাইনে তো বেশ ভালো। ছুটিছাটাও প্রচুর।

শান্তনীল : না, না। এখন স্কুল টিচারদের প্রচণ্ড চাপ।

লোক : কোন সাবজেক্টের?

শান্তনীল : বটানির

লোক : তাই কি আপনারা বনানী হোটেলে উঠেছেন?

শান্তনীল : (চমকে উঠে) আপনি কি করে জানলেন?

লোক : ঘাবরাবেন না। সকালেই আপনাকে ওই হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

শান্তনীল : ওহো! আপনার হোটেল কোনটি?

লোক : আমি ইরিগেশন বাংলোতে উঠেছি। আপনার পেছনেই আছি। নীচে ওয়াটার জ্যাম। কাল সকালে চলে আসুন। ভালো লাগবে।

শান্তনীল : ধন্যবাদ। সকালে গেলে যোগাযোগ করে নেব। এখন উঠি। মিসেস একা আছেন। টেনশন করবেন।

লোক : শান্তনুবাবু

শান্তনীল : শান্তনু নয় আমি শান্তনীল।

লোক : শান্তনীলবাবু দেখেছেন ইঁদুরটা কেমন আগের থেকে মোটা হয়ে গেছে। ওর শরীরে একটা বুনো শুয়োরের আদল একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

শান্তনীল : আঃ আপনি থামুন। থামুন দয়া করে। ওটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। ওর চোখ দুটো এত তীব্র কেন? কেন কুৎসিতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে আসবে আমার দিকে। কামড় দেবে আমার গলায়। আমার শ্বাসনালীতে ওর ছুঁচালো দাঁতগুলি আটকে যাবে। কে আছো বাঁচাও। বাঁচাও আমাকে।

(আবহে অনেকগুলি ইঁদুরের চিৎকার শোনা যাবে)

লোক : শান্তনীলবাবু আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন। ওটা ওকটা নেংটি ইঁদুর। পাহাড়ি ইঁদুর নয়। পাহাড়ি ইঁদুর ফ্যামিলি হয়। ওরা দল বেঁধে থাকে। দলের কেউ মারা গেলে অন্যরা অ্যাগ্রেসিভ হয়। এদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে মশাই। সে যাক, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চলুন একসাথে ফেরা যাক।

শান্তনীল : আমার একটু তাড়া আছে।

লোক : তাতে কি? আমি যে কোন যুবকের সঙ্গে হাঁটা প্রতিযোগিতায় নামতে পারি। জগিং-এর অভ্যাস আছে মশাই।

শান্তনীল : আমাকে রেহাই দিন। দয়া করে আমাকে একাই যেতে দিন।

লোক : ইঁদুর সম্পর্কে আপনাকে আমার আরও কিছু বলার আছে।

শান্তনীল : (চিৎকার করে) আমি শুনতে চাই না।

লোক : প্লীজ ধৈর্য ধরে শুনুন একটু।

শান্তনীল : আপনি কিন্তু আবারও পাগলামি করছেন।

লোক : আচ্ছা আপনি জীবনে কতগুলো ইঁদুর মেরেছেন?

শান্তনীল : আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।

লোক : চটে যাচ্ছেন কেন? সহজ একটা প্রশ্ন। উত্তরও সহজ হবে।

শান্তনীল : (বিরক্তি সহকারে) এই একটা মাত্র।

লোক : তার মানে আপনি জীবনে এই প্রথম একটা ইঁদুর মারলেন। অথচ সারা পৃথিবীতে ইঁদুর ছুটাছুটি করছে। যাকে বলে ইঁদুর দৌঁড়। আজকাল রেট-রেস কথাটা বেশ শোনা যাচ্ছে। একটা বইতে অদ্ভুত একটা ঘটনা পড়েছিলাম।

শান্তনীল : আমি শুনতে চাই না।

লোক : আরে মশাই পাগলের প্রলাপ একটু শুনেই যান না। খুব বেশি সময় নেব না। কোন দেশে নাকি কোন সময়ে লাখ লাখ ইঁদুর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে রেট রেস কথাটা চালু হয়। মানুষও ইঁদুরের মতো টাকার লোভে, ক্ষমতার লোভে, সমাজে উচ্চপদে বসার লোভে পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাহলে ধরে নিতে হয় আপনি ইঁদুর নয় একটা মানুষ খুন করেছেন।

শান্তনীল : আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ। আপনাকে, আপনাকে পাগলা গারদে চালান করা দরকার। সরে যান আমার সামনে থেকে । আপনার ইঁদুরের গপ্পো শুনতে শুনতে আমিও পাগল হয়ে যাব।

লোক : ইঁদুরটা কিন্তু আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওর নীল চোখ দুটো

শান্তনীল : আমাকে গিলতে আসছে। কী সাংঘাতিক। ইঁদুরটার মুখ থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। সত্যি, সত্যি ইঁদুরটা বুনো-শুয়োরের আকার নিচ্ছে। ইঁদুরটা আমাকে ফলো করছে কেন? কেন আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে? আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। নাহলে আমি বাঁচব না। আমি বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচতে দাও। বাঁচতে দাও আমাকে।

(উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। লোকটা মিডল স্টেজে এসে লাইটার বের করে সিগারেট ধরায়। রহস্যময়ভাবে ধোঁয়া ছাড়ে। এই অংশের আলো নেভে।) (বনানী হোটেলের একটি ঘর। তিথি বসে আছে বিষন্ন মুখ করে। নেপথ্যে ভেসে আসে একটি গান — আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান। ডোরবেল বাজে।)

তিথি : দরজা খোলাই আছে, চলে আসুন।
(ওয়েটারবয় রঘু ঢোকে)

রঘু : ম্যাম, ডিনারে কী খাবেন? চিকেন চাপাটি না মটন বিরিয়ানি?

তিথি : আজ বাইরে খেয়ে নেব।

রঘু : ঠিক আছে ম্যাম। এখন চা, কফি, স্ন্যাক্স কিছু লাগবে?

তিথি : না

রঘু : মিনারেল ওয়াটার?

তিথি : এখন কিছু লাগবে না। লাগলে তোমাকে খবর দেব।

রঘু : ও.কে ম্যাম।

তিথি : ভাই, শহরে যাওয়ার জন্য এখন রিক্সা টিক্সা পাওয়া যাবে তো?

রঘু : ম্যাম, এখানে সন্ধ্যা হলেই লোকজন ঘরে ঢুকে পড়ে। হিল এরিয়া তো। রিক্সা পাওয়া যাবে, তবে একটু বেশি ভাড়া হাঁকাবে।

তিথি : তা হোক পাওয়া গেলেই হবে।

রঘু : একটা কথা জিজ্ঞেস করব ম্যাম?

তিথি : বল, কী বলতে চাও? এত ইতস্তত করছ কেন?

রঘু : আপনারা কি আজ হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?

তিথি : একথা বলছ কেন? হোটেল ছাড়ার প্রশ্ন উঠছে কেন?

রঘু : না, মানে জিনিসপত্র সব গোছানো দেখছি। ট্রলিটাও সামনে। তাই বলছিলাম।

তিথি : **(ট্রলির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে)** বললাম না, বাইরে যাব।

রঘু : ট্রলি নিয়ে?

তিথি : আরে না না। একটা ইঁদুর ঢুকেছিল। ওই কোনায়। আমার হাজবেন্ডের ইঁদুরে খুব অ্যালার্জি। এটাকে তাড়াতেই ট্রলিটা এখানে এনেছে। আর সরানো হয়নি।

রঘু : ইঁদুর কি পাওয়া গেল?

তিথি : না । কোথায় ঢুকে পড়েছে কে জানে?

রঘু : একটা কথা বলি ম্যাম। আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানায় ইঁদুর-বেড়াল কিছু পাবেন না। সে যাক, তাড়াতাড়ি ডিনারে চলে যান ম্যাম। দিনকাল ভালো না। বলা তো যায় না কখন কী হয়?

তিথি : আমি খুব শক্ত মনের মেয়ে ভাই। ছোটবেলা থেকেই ভয়ডর কম।

রঘু : তাহলে আমি চলি ম্যাম। দরকার হলে বেল বাজাবেন। বান্দা হাজির হয়ে যাবে।

তিথি : ঠিক আছে তুমি এখন এসো।

রঘু : গুড নাইট ম্যাম এন্ড সুইট ড্রিম।

তিথি : থ্যাঙ্ক ইউ । গুড নাইট।

(রঘু চলে গেলে তিথি অস্বস্তি বোধ করে)

তিথি : ও নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করেছে। আমিও এক হাঁদারাম, ট্রলিটা চোখের সামনেই রেখেছি। শান্তু এখনও এল না কেন? কোথায় যায়, কী করে? কে জানে? লোকটার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী গল্প করছে?

(উত্তেজনা এড়াতে পায়চারি করে। শান্তনীল ঢোকে)

তিথি : কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

শান্তনীল : স্টেশনে গিয়েছিলাম। ফেরার টিকিট কনফার্ম করতে। — কী ব্যাপার? এত হাপাচ্ছ কেন? ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে যেন। কী হয়েছে?

তিথি : দাঁড়াও বলছি। দরজাটা আগে দিয়ে দিই।

(দরজা বন্ধ করে, শান্তনীল একটা সিগারেট ধরায়)

শান্তনীল : স্থির হয়ে বস এখানে।

তিথি : স্থির হয়ে বসার সময় নেই শান্তু।

শান্তনীল : কী হয়েছে বলবে তো। নিশ্চয়ই বাইরে বের হয়েছিলে? তিথি তোমাকে বাইরে যেতে মানা করেছিলাম।

তিথি : তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। দূর থেকে দেখলাম, তুমি একটা লোকের সাথে বসে গল্প করছিলে। চলে এলাম। আর তুমি বলছ স্টেশনে—

শান্তনীল : ঠিকই দেখেছ। আগে স্টেশনে গিয়েছিলাম। তারপর—

তিথি : চুপ কর। আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

শান্তনীল : (সিগারেটের শেষ অংশটা মেঝেতে ফেলে) আহা। প্লীজ এভাবে কথা বল না। কী হয়েছে বল?

তিথি : শান্তু

শান্তনীল : বল।

তিথি : আমার না — মানে আমি খুব বিপন্ন,

শান্তনীল : এ আর নতুন কথা কী হল? তুমি তো রিক্স নিয়েই এসেছ।

তিথি : একটা সাংঘাতিক মিসহ্যাপ হয়েছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

শান্তনীল : কী হয়েছে বলবে তো?

তিথি : তুমি বেরিয়ে যাবার পর রত্না ফোন করেছিল।

শান্তনীল : রত্না জানল কী করে তুমি এখানে?

তিথি : আমি আসার সময় ওকে বলে এসেছিলাম।

শান্তনীল : ভুল করেছ তুমি। রত্নাকে আমি জানি। সারা রাজ্যে রটিয়ে বেড়াবে। যাই হোক মিস্‌হ্যাপটা কী?

তিথি : ..... অলোক খুন হয়েছে।

শান্তনীল : খুন হয়েছে কবে?

তিথি : জানি না । তবে আজ ভোরে ওর বডিটা উদ্ধার করেছে পুলিশ। অলোককে কেউ মার্ডার করে লেকের জলে ফেলে দিয়েছিল। আজ বডি ভেসে উঠেছে। শান্তু আমাকে যেভাবে হোক এক্ষুনি কোলকাতায় ফিরতে হবে।

শান্তনীল : ড্যাম ইট। তোমার হাজবেন্ড অলোক মিত্র মারা যেতেই পারে। একদিকে ভালোই হয়েছে। তুমি এবার ফ্রিলি আমার বউ হতে পারবে। ডিভোর্সের প্রয়োজন হবে না।

তিথি : শান্তু, তুমি ড্রিংক করেছ। তাই তুমি বুঝতে পারছ না।

শান্তনীল : অলোক মোটেই ভালো লোক ছিল না। সেটা তুমি ভালো করেই জান। তোমার উপরে কম টরচার করেনি। তাছাড়া ওর নানা ধান্দাবাজি ছিল। ও র‍্যাট রেসে নেমেছিল। মানি ছাড়া কিছু বুঝত না।

তিথি : আমি আসানসোলে দিদির বাড়ি যাচ্ছি, এখানে চলে এসেছি। ওরা আমাকে খুঁজবে।

শান্তনীল : কারা খুঁজবে?

তিথি : পুলিশ। অলোকের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুরা। আমি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করব না।

শান্তনীল : তিথি।

তিথি : (চোয়াল শক্ত করে) আর ও নামে নয়।

শান্তনীল : বেশ। নীলা ডাকব তো। অলক যে নামে ডাকত।

তিথি : নীলা নামটা আমার বেশি পছন্দ। এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। (ঘড়ি দেখে) এখন বাজে সাড়ে আটটা। রিসেপশন থেকে স্টেশনে ফোন করেছিলাম। রাত সাড়ে দশটায় একটা ট্রেন আছে। তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও।

শান্তনীল : আমি এখানে একা থাকব?

তিথি : হ্যাঁ। তুমি বরং পরের কোনো ট্রেনে চলে এসো।

শান্তনীল : ঠিক আছে, তাই হবে।

(তিথি ট্রলি নেবার জন্য পা বাড়ায়। এমন সময় ডোরবেল বাজে)

শান্তনীল : আমি দেখছি। মনে হয় ডিনার অর্ডার নিতে চলে এসেছে।

তিথি : না ডিনার নেব না বলে দিয়েছি। দেখ কী জানতে এসেছে? লোকটাকে আমার সুবিধের বলে মনে হয়নি। সাবধানে ডিল করো।

শান্তনীল : টেনশন নিও না।

(আবার ডোরবেল বাজে)

তাড়া দিচ্ছে দেখ। অভদ্র, ছোটলোক একটা। দেখাচ্ছি মজা।

(দরজা খুললে প্রবেশ করে লোকটি)

শান্তনীল : আপনি? এখানে কেন এসেছেন?

লোক : ইঁদুর বিষয়ে একটা জরুরি কথা ছিল।
আপনি শুনলেন না তাই চলে এলাম।

শান্তনীল : পাগলামি করলে ইঁদুরের মতো .....

লোক : থ্যাঁতলে দেবেন তাই তো। **(সিগারেটের টুকরো তুলে)** তাহলে সিগারেটও ছাড়তে পারেন নি। সামান্য ব্যাপারেও আপনি মিথ্যা বলেন। আপনি তো ডেনজারাস মশাই।

তিথি : আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কার পারমিশনে আপনি ঘরে ঢুকলেন? আমরা স্বামী-স্ত্রী যখন কথা বলছি একান্তে, তখন বলা নেই, কওয়া নেই ঘরে ঢুকে পড়লেন?

লোক : ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করবেন না ম্যাডাম। শান্তনুবাবুকে .....

শান্তনীল : **(চিৎকার করে)** অনেকবার আপনাকে বলেছি, আমি শান্তনু নই। শান্তনীল।

লোক : নো নো। আপনি শান্তনীল নন। আপনি শান্তনু। শান্তনু সমাজদার। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনাকে কী নামে ডাকব? তিথি না নীলা?

তিথি : মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি? আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এই ঘর থেকে বের হয়ে যান। গেট আউট।

লোক : কুল, কুল ম্যাডাম। ইঁদুরের গল্পটা বলেই চলে যাব।

শান্তনীল : পাগলামি করার আর জায়গা পেলেন না? অপনি যাবেন, না লোক ডাকব?

লোক : শান্তনুবাবু আপনাকে আমার নেমকার্ড দিয়েছিলাম। ওটা নিশ্চয় পড়ে দেখেননি। তারপর না হয় ইঁদুর বিষয়ে শেষ কথাটা বলব।

শান্তনীল : **(পকেট থেকে কার্ড বের করে পড়ে)**
আপনি সি.আই.ডি ইন্সপেক্টর সুরপতি ব্রহ্ম।

তিথি : সি.আই.ডি? এখানে কেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

লোক : ম্যাডাম, কলেজ লাইফে আপনি ভালো অভিনয় করতেন। আপনার অভিনয় দেখেই অলকবাবু আপনার প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেমে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার কলেজ ফেস্টে আপনারা একটা নাটক করেছিলেন। মনে পড়ে ম্যাডাম?

তিথি : হ্যাঁ, মনে পড়ছে।

লোক : কী নাটক ম্যাডাম?

তিথি : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যু সংবাদ'।

লোক : এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ম্যাডাম, কলকাতা থেকে এখানে ছুটে আসার কারণ। মৃত্যু সংবাদ দিতেই.....

তিথি : স্যাড নিউজটা আমি পেয়েছি। তাই রাতের ট্রেনেই কলকাতা ফিরতে চাইছি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে আমরা এখানেই আছি।

লোক : আপনাদের মোবাইল ট্রেক করে। শান্তনুবাবু ঘন ঘন সিম পাল্টাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি । আমাদের অনুমান অলকবাবু খুন হয়েছেন গত পরশু রাতে। আর আপনারাও সেই দিন থেকে এলাকায় নেই। ফলে আপনাদেরই সন্দেহ করা হয়েছিল। বাদ-বাকি কোর্টেই জানতে পারবেন।

তিথি : বিশ্বাস করুন আমি চাই অলকের খুনি ধরা পড়ুক।

লোক : খুনি আপনার পাশেই আছে ম্যাডাম। কী শান্তনুবাবু, কেন খুন করলেন অলকবাবুকে?

শান্তনীল : সাট আপ। মিথ্যে বলছেন আপনি। বানিয়ে বলছেন। আমি অলকবাবুকে খুন করব কেন?

লোক : ফর ইনফরমেশন— যে পাথরটা দিয়ে অলকবাবুকে খুন করেছেন— আই মিন থ্যাঁতলে মেরেছেন সেই রক্তমাখা পাথরটা আমরা উদ্ধার করেছি। লেকের পাশে পাথরটি পাওয়া গেছে। আপনার ফিঙ্গার প্রিন্টই বলে দেবে ..

শান্তনীল : আবারও মিথ্যে বলছেন। লেকের ধারে আপনারা কিছু পেতে পারেন না।

লোক : পেয়েছি । ভারী একটা পাথর। তাতে রক্তের দাগ।

শান্তনীল : অসম্ভর। ইম্পসিবল।

লোক : শান্তনুবাবু, ইম্পসিবল্ বলে আমাদের ডিকসেনারিতে কোনও শব্দ নেই।

ইম্পসিবল্ শব্দটাতেই আছে— আই এম পসিবল। আমি আপনাকে বিষ দিয়ে ইঁদুর মারার কথা বলেছিলাম। এবার বলতে এসেছি ফাঁদ পেতে ইঁদুর মারার পদ্ধতি। আপনার ব্যবহার করা ছুরিটাও আমরা পেয়ে গেছি।

তিথি : পাথর? ছুরি? এসব আপনি কী বলছেন?

লোক : প্রথমে অলোকবাবুকে পাথর মেরে মুখ থ্যাঁতলে দেওয়া হয়। তারপর খুন নিশ্চিত করতে ছুরি দিয়ে গলার নলি কেটে দেওয়া হয়।

তিথি : ও মাই গড! মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

লোক : পারে নীলাদেবী, পারে। স্বার্থের জন্য মানুষ সব পারে।

শান্তনীল : এই মশাই, তখন থেকে ভাট বকে যাচ্ছেন। পাথর, ছুরির গপ্পো ফাঁদছেন। পাথর, ছুরি কিছুই পাননি। তাছাড়া—

লোক : তাছাড়া?

শান্তনীল : আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন, আমিই করেছি।

লোক : (হেসে) আপনিই বা কী করে জানলেন? লেকের ধারে কিছুই পাওয়া যায়নি।

শান্তনীল : কী করে পাবেন? ওগুলো আমি লেকের জলে ..... (ভুল করে ফেলেছে বুঝতে পেরে অস্বস্তিতে পড়ে যায়।)

লোক : থামলেন কেন? লেকের জলে ফেলে দিয়েছেন, তাই তো। দেখলেন শান্তনুবাবু, সত্য কখনো গোপন থাকে না। ঠিক বেরিয়ে পড়ে। স্বীকার করে নিলেন— আপনিই খুন করেছেন।

তিথি : সোয়াইন। তুমিই অলককে খুন করেছ? আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।

(ছুটে এসে শান্তনুর গলা চেপে ধরে। লোকটা ছাড়িয়ে দেয়। রাগে তিথি বার বার ছুটে আসে শান্তনুর দিকে। আর লোকটা আটকায়)

লোক : কী করছেন ম্যাডাম? আইন নিজের হাতে নেবেন না। দোষ আপনিও করেছেন। গরম কড়াই এড়াতে ফুটন্ত তেলে হাত দিয়েছেন। সাজা আপনাকেও পেতে হবে।

তিথি : (কান্নায় ভেঙে পড়ে) বিশ্বাস করুন আমি কখনও চাইনি অলোক খুন হোক। অলোক ইঁদুর দৌড়ে নেমেছিল। টাকাই ওর জীবনের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। যা আমার পছন্দ নয়। এ নিয়ে অশান্তি লেগেই ছিল।

লোক : শান্তি পেতে যে রাস্তায় হেঁটেছেন ম্যাডাম সেটাও ভুল।

তিথি : আমি অলোককে হারিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, এবার নিজেই হেরে গেলাম।

লোক : ইঁদুরের গল্পটা বলা শেষ হয়নি এখনও। নীলাদেবী আপনি কি খেয়াল করেছেন, শান্তনুবাবু ইঁদুরকে ভয় পাচ্ছেন?

তিথি : হ্যাঁ। ঘরের আনাচে কানাচে ইঁদুর দেখতে পাচ্ছে, ইঁদুর দেখলেই তেড়ে মারতে যাচ্ছে।

লোক : কিন্তু কেন? ওনার মত একজন ডাকাবুকো লোক ইঁদুর দেখলেই আঁতকে উঠছেন কেন? ব্যাপারটা আপনাকে অবাক করেনি?

তিথি : হ্যাঁ করেছিল। কিন্তু

লোক : কিন্তু আপনি মাথা ঘামাননি। আমাদের মাথা ঘামাতে হয়।—এবার একটু মাথা ঘামান। মৃত্যু সংবাদ নাটকটির কথা মনে করুন। খুনি ভয় পাচ্ছে কাকে? একটা টিকটিকিকে। কেন? খুনি বাবাকে যখন খুন করেছিল তখন একটা টিকটিকি ডেকে উঠেছিল। খুনির মনে হয়েছিল তার খুনের সাক্ষী রয়ে গেল টিকটিকিটা। সেই থেকে টিকিটিকি দেখলেই খুনি ভয়ে কুঁকড়ে যেত। ঠিক সেরকমই। খুনের স্পটে আমরা একটা মরা ইঁদুর পাই। আর বিকেলে শান্তনুবাবুকে দেখলাম—একটা নেংটি ইঁদুরকে তাড়া করে মারতে। ব্যস দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল। মৃতুসংবাদ নাটকটা আপনিও তো দেখেছিলেন শান্তনুবাবু, তাই না?

(শান্তনু হঠাৎ পকেটথেকে রিভলবার বের করে লোকটার দিকে তাক করে)

শান্তনীল : ইঁদুরের শেষ গল্পটা আমি বলব ইন্সপেক্টর সুরপতি ব্রহ্ম।

লোক : ভুল করছেন। আমিই বলব।

শান্তনীল : হ্যান্ডস্ আপ। হাত উপরে তুলুন। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ান।

(লোকটা এমনভাবে দাঁড়ায় যে, ওর হাতের বড় ঘড়ির ডায়াল রিভলবারের দিকে।)

তিথি : কী করছ কী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

শান্তনীল : চুপ শালী। এক পা নড়বি না। নড়লে গুলি চালিয়ে দেব।

লোক : ডবল ভিক্টিম। জোড়া খুন। আপনার ফাঁসি কেউ আটকাতে পারবে না।

শান্তনীল : তার আগে তোকে ফিনিশ করে দেব শালা। মুভ, মুভ।

লোক : কোনদিকে মুভ করব।

শান্তনীল : দরজা ছেড়ে ওই কোনের দিকে।

(শান্তনুর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়)

শান্তনীল : স্টপ। এক পা এগোলে এর একটা দানা বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে কিন্তু।

লোক : শান্তনুবাবু কী করে ভাবলেন - সিংহের ডেরায় ঢুকব অথচ খালি হাতে। এই ঘড়িতে একটা মাইক্রো ভিডিও ক্যামেরা আছে। রিভলবার হাতে আপনার ছবি ধরা রইল ক্যামেরায়। তাছাড়া——

শান্তনীল : তাছাড়া?

লোক : পুরো হোটেলটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রঘু।

তিথি : রঘু?

লোক : ইয়েস পুলিশ ইন্সপেক্টর রঘুবীর সর্দার। রঘু প্লীজ কাম ইন।

(পুলিশের পোষাকে বিভলবার তাক করে রঘু ঢোকে)

তিথি : রঘু তুমি!

রঘু : বান্দা হাজির ম্যাডাম। স্যারের পরামর্শে ওয়েটার বয় সাজতে হয়েছিল আপনাদের উপর নজরদারী চালানোর জন্য।

(লোকটি আচমকা কাছে গিয়ে শান্তনীলকে থাপ্পর মারে। রিভলবার কেড়ে নেয়)

লোক : শান্তনুবাবু, ইঁদুর বিষয়ে শেষ কথা হল, ইঁদুর প্রখর অনুভুতিশীল প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই টের পায় না, কখন কোন মুহূর্তে প্লেগের জীবাণু তার শরীরে প্রবেশ করছে। রঘু শান্তনুবাবুকে এবার নিয়ে যাও।

রঘু : (হেসে) প্লেগ রোগ খুব সংক্রামক স্যার।

লোক : রোগটা সারাতে হবে রঘু। যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। খুন, বেআইনি অস্ত্র রাখা, নারীকে ফুসলিয়ে আনা, সরকারী কাজে বাধাদান- নানা ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। যাতে বাকী জীবনটা অন্ধকার কুঠুরিতেই কাটে।..নীলাদেবী।

তিথি : বলুন।

লোক : আপনাকে কিন্তু রাজসাক্ষী হতে হবে। তাহলে হয়ত সাজা কিছুটা মুকুব হতে পারে।

(তিথি কান্নায় ভেঙে পড়ে। রঘু হাতকড়া লাগায় শান্তনুর হাতে, আলো এসে পড়ে সুরপতি ব্রহ্মর মুখে। উজ্জ্বলহাসি ফুটে ওঠে তার মুখে)

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের একটি গল্প অনুপ্রাণিত

ফালতু

শিবংকর চক্রবর্তী

চরিত্র : বিভাস, চিত্র, বিশ্বরূপ, লোকটা

(১)

(এটা বিভাসের ড্রয়িংরুম। বিভাস উচ্চ মধ্যবিত্ত। তার ড্রয়িংরুম কাম লিভিংরুম যেমন হওয়া উচিত তেমনটাই। সময়টা সন্ধ্যের কাছাকাছি। বিভাস টেবিলে চায়ের কাপ ক্যাজুয়াল ড্রেসে খবরের কাগজ পড়ছে। নেপথ্যে কলিংবেল বাজে একবার দুবার- ধীরে সুস্থে উঠতে যায় বিভাস। নেপথ্যে চিত্রা ডাকে)

চিত্রা : এই খোল — খোল তাড়াতাড়ি খোল— প্লীজ- আরে এই বিভাস পড়ে যাবো যে তাড়াতাড়ি—

বিভাস : ও - এ মেয়েকে নিয়ে— আরে খুলছি রে বাবা খুলছি। — (দ্রুত গিয়ে যেন দরজা খোলে) একি?

চিত্রা : আরে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? ধরো - ধরো—

বিভাস : আরে এ কে —?

চিত্রা : সব কথা পরে বলছি— আগে নিয়ে গিয়ে বসাও তো— ধরো (বিভাস একজন প্রায় অজ্ঞান লোককে সাথে করে নিয়ে মঞ্চে ঢোকে সাথে চিত্রা)

বিভাস : কিন্তু এ কে ?

চিত্রা : চুপ- আগে এনাকে বসাও - একটু শুশ্রূষা করতে দাও - তারপর (বিভাস লোকটাকে ডিভানে বসায়)

বিভাস : কিন্তু —

চিত্রা : আঃ - (দ্রুত জলের বোতল নিয়ে লোকটাকে) জল খাবেন - জল - নিন্ - (লোকটাকে জল খাওয়ানোর চেষ্টা করে। প্রথমে কষ্ট করে তারপর ঢক ঢক করে খায়) বসতে কষ্ট হচ্ছে? - শোবেন- শুয়ে পড়ুন না এখানে - নিন - নিন- আমি ধরছি। (শুইয়ে দেয়) (বিভাসকে) এই ফ্রিজে দুধ আছে একটু গরম করে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি— গরম দুধ খেলে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বিভাস : কিন্তু চিত্রা—

চিত্রা : আঃ বিভাস — একটা মানুষের বাঁচা মরার প্রশ্নটা বড় না কৌতুহলটা বড়?

প্লীজ তুমি দুধটা একটু গরম করে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি— দেখি ওনাকে একটু খাওয়াতে পারি কিনা? তারপর তোমার সব কথার উত্তর দেবো। প্লীজ—

বিভাস : হু— (মুভ করে। দর্শকের দিকে তাকিয়ে)আমার বৌ চিত্রা। মাষ্টারনী- এবং সমাজসেবী। মাথার মধ্যে সব সময় কিলবিল করে সমাজ সেবার পোকা। আমাকে এগুলো প্রশ্রয় দিতে হয়- হ্যাঁ দিতেই হয়— কারণ আমি ওকে ভালোবাসি— সেই ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে - সো - (চলে যায়)

চিত্রা : শুনছেন ? কী হয়েছে আপনার - ? শরীর খারাপ লাগছে? কষ্ট হচ্ছে? কোথায়?

লোকটা : (কষ্ট করে) জ - ল—। জ-ল খা - বো—

চিত্রা : জল খাবেন— হ্যাঁ হ্যাঁ- এই যে (জলের বোতল থেকে জল দেয়। একটু খায় তারপর হাত দিয়ে আটকায়) আর খাবেন না? ঠিক আছে খেতে হবে না । (বোতলটা রেখে) এখন কেমন বোধ হচ্ছে ।

লোকটা : ভা-লো - ভা --লো

চিত্রা : আপনার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ঠিকানা বললে আপনাকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি। কোথায় থাকেন আপনি?

লোকটা: কোথায় -- কো-থা-য় থা-কে-ন আ-প-নি ---?

চিত্রা : হ্যা হ্যা বলুন- কোন ঠিকানা- বাড়ির পরিচিতের — আপনার ছেলে মেয়ের নাম

লোকটা : ছে-লে মে-য়ে-র না--ম — (মাথা হেলিয়ে দেয়)

চিত্রা : এই যে দাদা — না না - দাদা না— এই কাকা শুনছেন— কাকা — না বাপী

লোকটা : এ্যা - কে ? কে? মনু- না -- না -- ভুল -- ভু-ল) ঝিমিয়ে পরে)

চিত্রা : বাপী - বাপী - বাপী - (ঝাঁকিয়ে দেয়। লোকটা রেসপন্স করে না। এক গ্লাস দুধ নিয়ে ঢোকে বিভাস)

বিভাস : এই নাও তোমার গরম দুধ -- এবার বল তো কেসটা কি?

চিত্রা : (দুধটা নিয়ে) বাবা ও বাপী - আমি - আমি - কি কি যেন নামটা বললো— -ও হ্যা মনু— বাপি আমি মনু - দুধটা খেয়ে নাও তো—

লোকটা : মনু - ম--নু-- দু-ধ দে -- (দুধটা দেয়। খেয়ে নেয় কাঁপা কাঁপা হতে। খাওয়া হলে গ্লাস নিয়ে টেবিলে রাখে।)

বিভাস : নেশা - টেশা করেছো নাকি? বাপী - মনু - এ সব তো মনে হচ্ছে নতুন

কোনও গল্প।

চিত্রা : একদম ঠিক তাই—নতুন একটা গল্প - । (লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে) নাও এবার বলো —

বিভাস : এ বাপীটি কে?

চিত্রা : এ বাবা তোমাকে কাল রাতে বললাম না— ও রাতের কথা তো তোমার আবার দিনে মনে থাকে না। কটা বাজলো — ৭টা - ঠিক আছে তাহলে অন্ততঃ এক ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে তোমাকে বোঝাতে— কারণ ৮টার পর তো—

বিভাস : আঃ সোজা কথায় আসো - লোকটা কে?

চিত্রা : গত পরশু স্কুল থেকে ফেরার সময় থেকে দেখছি মানুষটা আমাদের পাড়ার নতুন বাস ষ্ট্যান্ডটার একটা চেয়ারে বসে পা নাড়াচ্ছে। দেখলেই মনে হয় ভদ্র ঘরের কোন বৃদ্ধ— ভেবেছিলাম হয়তো এ পাড়ায় এসেছেন— নিজের ছেলে বা মেয়ের সাথে দেখা করতে—।

বিভাস : তারপর —

চিত্রা : কাল স্কুলে যাবার পথে আর ফেরার পথেও ওনাকে দেখলাম— ঐ একইভাবে বসে থাকতে। আমার অবাক লেগেছিল— কৌতুহল জেগেছিল—ফিরে এসে তোমাকে বলেছিলাম।এও বলেছিলাম এখুনি আমাদের কিছু করা উচিৎ। তুমি পাত্তাই দিলে না— কি করে দেবে—তখন তো তুমি অন্য জগতে—

বিভাস : না - না - সে সব কিছু নয় - আসলে আমি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিই নি —

চিত্রা : কিন্তু আমাকে দিতে হলো। আজ সকালেও যখন দেখলাম উনি একইভাবে বসে আছেন— আমার সারথী ছগনকে বললাম এই ছগন রিক্সাটা একটু দাঁড় করাও তো? (ছোট আলোয় চিত্রাকে) এই যে শুনছেন আপনি এভাবে এখানে বসে আছেন কেন? আপনার বাড়ি কোথায়? আপনি কে? শুনছেন এই যে— আমি ওকে ধাক্কা দিলাম— ওনি কোনও সাড়া দিলে না— শুধু জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠলেন—

লোকটা : যাবো না—বাড়ি যাবো না— চলে যা— তুই এখান থেকে—

চিত্রা : চলে না গিয়ে তখন আমার কোন উপায় ছিলো না। ক্লাস নাইনের খাতা জমা দেওয়ার ছিলো— ইলেভেনের দুটো ক্লাস ছিলো-। সব ছেড়ে ফেরার পথে ছগনকে বললাম - এই শোন ঐ বাসষ্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়াবি—

বিভাস : আর ঐ লোকটা যদি এখনও ওখানে থাকে তাহলে রিক্সায় তুলে আনতে আমাকে হেল্প করবে—

চিত্রা : এই জন্যেই তোমাকে এতো ভালোবাসি— আমার মনের কথাটা তুমি আমার আগেই জেনে নাও।

বিভাস : সেতো গেলাম। কিন্তুএই লোকটার না জানি কোনও পরিচয়, না জানি কোনও হদিস- দুম করে তুমি তাকে ঘরে তুললে- যদি সমস্যা হয়—?

চিত্রা : হয় কেন - হতেই পারে। কিন্তু কি কি সমস্যা হতে পারে- এই হিসেব নিকেশ করতে করতে লোকটাকে যদি আমি ঐ বাস ষ্ট্যান্ডে মরতে দিতাম সেটা কি খুব ভালো হতো?

বিভাস : সেটা হয়তো হতো না কিন্তু এখন এখানে যদি মারা যান তবে তো আমাদের ঘাড়ে একশো হ্যাপা ।

চিত্রা : চোখ বুঝে না থাকতে পারলে হ্যাপা ঘাড়ে উঠবেই। রাস্তার একটা কুকুর বেড়াল অসুস্থ হয়ে পড়লেই মানুষের এগিয়ে যাওয়া উচিৎ অবশ্য সে যদি মানুষ হয়। আর উনি তো একজন মানুষ। অসুস্থ - তিনদিন পড়ে আছেন- তাকে সাহায্য করবো না—?

বিভাস : কিন্তু সাহায্য করা মানে কি? তাকে সোজা এনে ঘরে তোলা—?

চিত্রা : তবে তুমি কি করতে বলো? আমার কি করা উচিৎ ছিলো?

বিভাস : হয় পুলিশে খবর দেওয়া—

চিত্রা : পুলিশ—পুলিশ এখানে কি করবে?

বিভাস : ওঁর বাড়ি খুঁজে বার করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

চিত্রা : হুঁ- তুমি তো দেখছি এখনও সত্য যুগেই পড়ে আছো। পুলিশ আসবে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে—?

বিভাস : তাহলে কোনও সমাজসেবী সংস্থাকে খবর দিতে- তারা যা করার করতো

চিত্রা : মানে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া—

বিভাস : পৃথিবীর সব ভার নিজের একার কাঁধে নিতে যাওয়ার মতো বোকামী করো না চিত্রা—

চিত্রা : তাহলে কি করবো? একজন নারী ধর্ষিতা হলে মোমবাতি জ্বেলে প্রতিবাদ করবো? একজন রাজনৈতিক কর্মী খুন হলে শুধু শহীদ বেদী বানিয়ে শ্লোগান তুলবো—?

বিভাস : সব মানুষেরই একটা সীমাবদ্ধতা থাকে।

চিত্রা : না- বেশিরভাগ মানুষই চায় নিজের গায়ে আগুনের আঁচ না লাগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শুধু মাত্র লোক দেখানো কিছু কাজ করে নিজের দায়িত্ব সমাধা করতে। তুমি তো জানো আমি সে গোত্রে পড়ি না। আমার কাছে মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো - এই কথাগুলোর মানেটা খুব সহজ- এক পা এগিয়ে সত্যিই তার বিপদে তাকে সাহায্য করা—।

বিভাস : এটা হটকারিতা — অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে—

চিত্রা : হলে তাই। কাল সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে যদি দেখতাম মানুষটা মরে গেছেন - আমি কি খুশি হতাম? তুমি?

বিভাস : তাই বলে—

চিত্রা : আঃ বিভাস- একটা দুটো দিন — উনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন—

বিভাস : যদি না হন - যদি আরো খারাপ কিছু— তাছাড়া তোমার স্কুল আছে - আমার অফিস আছে।

চিত্রা : কালকের দিনটা আমি স্কুলে যাচ্ছি না। ঘটনাটা কি হতে পারে আগাম আঁচ করে আমি স্কুলে বলে এসেছি—

বিভাস : তারপর পরশু—?

চিত্রা : তুমি ডুব মারবে —

বিভাস : আমি—?

চিত্রা : আরে দেখছো না ভদ্রলোক আমাকে ওর মেয়ে ভাবছেন—মনু—আরে শ্বশুরের জন্যে একদিন অফিস কামাই করতে পারবে না?

বিভাস : চিত্রা—

চিত্রা : চিত্রা না— চিত্রা না—ম-নু- মনু বলো—

লোকটা : ম-নু— ম-নু

চিত্রা : কি হয়েছে বাপী—?

লোকটা : বাথ— রু-ম — বা- থ- রু- ম —যা - বো (কষ্টে বলে)

চিত্রা : এসো — এসো— এই ধরো তো ওনাকে বাথরুমে নিয়ে যাও—

বিভাস : আরে - আমাকে নিয়ে যেতে হবে?

চিত্রা : বেশি কথা বলো না— তাড়াতাড়ি ওনাকে ধরো— এখানে কিছু করে ফেললে তোমাকেই তো আবার সামলাতে হবে। তুমি তো আবার তোমার চিত্রাকে কিছুতেই বেশি খাটাতে চাও না— যাও নিয়ে যাও—*(বিভাস কিছুটা নিম রাজী হয়ে লোকটাকে নিয়ে এগোয়)*

চিত্রা : বাপী - যাও বাথরুমে যাও— এই শোন আমি ডঃ মুখার্জ্জীকে একবার ফোন করে কল দিই এখুনি।

বিভাস : যা ভালো বোঝ করো—কিন্তু এখুনি উনি আসবেন কি করে? এখন তো ওনার চেম্বার আছে—

চিত্রা : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—

বিভাস : কিন্তু—

চিত্রা : ভয় নেই তোমাকে ডিসটার্ব করবো না— আমাদের গেষ্টরুমে আপাতত ওনাকে রাখবো— বাথরুম করিয়ে ওনাকে ও ঘরে নিয়ে যাও—

লোকটা : বা-থ- রু-ম — যাবো —

চিত্রা : যাও নিয়ে যাও— *(লোকটাকে নিয়ে বিভাস বেড়িয়ে যায়। চিত্রা মোবাইল ফোনে ফোন করে)* হ্যা আমি চিত্রা বলছি বটতলা থেকে—হ্যা শরন্যা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে—। আপনি একবার যদি আসেন? আমার এক আত্মীয় অসুস্থ - একটু পড়ে আসবেন? আচ্ছা ঠিক আছে— ধন্যবাদ—

(আবহের সাথে আলো কাটে। মঞ্চে নিলাভ আলো জ্বলে সাথে নেপথ্যে গান ভেসে আসে -'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী—পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশ— মঞ্চে ঢোকে চিত্রা, হাতে একটা বড় কাপ)

চিত্রা : এটা আমার আর বিভাসের সংসার— বেশ ভালোই আছি— কিন্তু ছোট একটা সমস্যাও আছে। হ্যা সমস্যাটা হলো আমাদের কোন সন্তান নেই। বিয়ের পর একবার আমি কনসিভ করেছিলাম বাট ছোট একটা ভুলে বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেলো। তারপর অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোন ফল পাইনি— (বিভাসকে) কিগো আজ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? (আবার নিজের মতো করে) আমাকে বিভাস খুব ভালোবাসে। আমরা দুজনে স্বাধীন। তাই স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি আমাদের মত করে । আমি সমাজসেবা নিয়ে থাকি— ও কখনো আমাকে বাঁধা দেয় না। এই একটু আগে ডাক্তারবাবু ভদ্রলোককে দেখে গেলেন। তার ওষুধ ভিজিট সব বিভাসই দিয়েছে। আমাকে দিতে দেয়নি। আমি এই কমপ্ল্যান নিয়ে বসলাম। আর বিভাস— (বিভাস ঢোকে হাতে গেলাস)

বিভাস : এটা (গেলাস দেখিয়ে) আমি মাতাল নই—

চিত্র : কি হলো টলছো মনে হচ্ছে—

বিভাস : এইটুকু খেয়ে টলবো? তোমার ডাঃ মুখার্জ্জী কি বললেন?

চিত্রা : এমনিতে বড় কোন গোলমাল চোখে পড়েনি - কিছু টেষ্ট দিয়েছেন- কাল সকালে ওনার চেম্বারের মানস এসে ব্লাড নিয়ে যাবে। তবে উনি বলেছেন ঠিক মতো খাওয়া ঘুম না হওয়ার জন্যই এটা হয়েছে। তাছাড়া—

বিভাস : তাছাড়া—

চিত্রা : কোন কারনে ওনার লস অব মেমরী হয়েছে। কিছুই মনে করতে পারছেন না। হয়তো এটা টেমপোরারী। অনেকদিন ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া হয়নি বলে। আমি ওনাকে কমপ্ল্যান খাইয়েছি। এই শোন কাল সকালে অফিস যাওয়ার আগে একটু চিকেন, ডিম, মাখন, ছানা আর—

বিভাস : আর একটা হুইস্কির বোতল—

চিত্রা : ইয়ার্কি হচ্ছে—?

বিভাস : বাঁশ তুই কেন ঝাঁড়ে— আয় মোর —

চিত্রা : (চিৎকার করে থামিয়ে দেয়) এই - এই বলবে না বলবে না—

বিভাস : ছিঃ—এতা জোড়ে চিৎকার করো না— আমার শ্বশুরের ঘুম ভেঙে যাবে—

চিত্রা : তোমার শ্বশুর মানে আমার বাবা— বাপী— ওনাকে কমপ্ল্যান খাইয়ে এলাম। শুয়ে আছে মশাই। ঘুমাচ্ছে না। হাঃ হাঃ হাঃ— (অন্তরঙ্গ মুহুর্ত, নেপথ্যে আবহ বাজে। এমন সময় টলমল পায়ে প্রবেশ করে লোকটি)

লোকটা : ম—নু— ম- নু— কো - থা - য়—?

চিত্রা : একি বাপী তুমি উঠে এলে কেন?

লোকটা : ভা- লো— লা - গ - ছে - না

চিত্রা : এসো এসো বাপী —

লোকটা : (বসার জায়গা দেখিয়ে) ব স বো —

চিত্রা : হ্যা হ্যা এইখানে বসো — (বসিয়ে দেয়)

বিভাস : চিত্রা - এখানে বসালে—? (আমি ওনার সামনে খাবো কি করে (গ্লাসটা দেখায়)

চিত্রা : বিভাস- তুমি ভিতরের ঘরে যাও- (বিভাস একটু বিরক্ত হয়ে চলে যায়)

লোকটা : ভা- লো— লা - গ - ছে - না

চিত্রা : এমন করলে চলবে না বাপী—তোমাকে অনেক স্টেডি হতে হবে। তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে হবে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। বাজার দোকান

সব করতে হবে— নাতিকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে— হ্যা বাপী তুমি তো এখনও ইয়ং অ্যাট ৬০— কিগো বয়স টা ঠিক বললাম তো বাপী— ?

লোকটা : ম - নু—ম - নু

চিত্রা : এই তো আমি বাপী— আচ্ছা বাপী তোমার কিছু মনে পড়ে না? তোমার নাম- তোমার ঠিকানা- তোমার বাড়ি— *(লোকটা আস্তে আস্তে চোখ তোলে)*

লোকটা : বাড়ি আমার ভাঙন ধরা / অজয় নদীর বাঁকে / জল যেখানে সোহাগ ভরে / স্থলকে ঘিরে রাখে-

চিত্রা : অজয় নদী— অজয় নদী— তবে কি কাটোয়া— শ্রীখন্ড চটি? বাপী—

লোকটা : ঐ'যে গাঁ টি যাচ্ছে দেখা / আইড়ি খেতের আড়ে / প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে / ঐ আমার গ্রাম আমার স্বর্গপুরী / ঐখানে তো হৃদয় আমার গেছে চুরি (হাঁ করে যায়)

চিত্রা : কোথায় --কোথায় সেটা— ?

লোকটা : জানি না- জানি না— সব কেমন ঝাপসা - এলোমেলো- মনু –ম নু রে— কেন যে আমার এমন হলো— ? (এলিয়ে পড়ে)

চিত্রা : বাপী—বাপী- কোথায় বাপী— ও বাপী— *(ঝাঁকায় লোকটা আরো এলিয়ে পড়ে)*

(চিত্রা ওর কথাগুলো বিপিট করে। আবহ বাজে)

চিত্রা : ঐ'যে গাঁ টি যাচ্ছে দেখা / আইড়ি খেতের আড়ে / প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে / ঐ আমার গ্রাম আমার স্বর্গপুরী / ঐখানে তো হৃদয় আমার গেছে চুরি ।

কোথায়? কোন গ্রাম? কোথায় তোমার আমার হৃদয় চুরি হয়ে যায়? সে হৃদয়পুর কোথায়? কোথায় গো মনের মানুষ? কোন হৃদয়পুরের সন্ধানে ছুটে বেড়ালাম এতো দিন— এতো কাল—*(নেপথ্যে ভেসে আসে - নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী - পৃথিবীর পরে ঐ নীল আকাশ)*

(নেপথ্য থেকে ডাকতে ডাকতে ঢোকে বিভাস)

বিভাস : চিত্র - চিত্রা - রাত হয়েছে

চিত্রা : ওঃ বিভাস — বলো -

বিভাস : মনে হচ্ছে কোনও সিনেমা দেখছিলে?

চিত্রা : না গো — স্বপ্ন দেখছিলাম —

বিভাস : স্বপ্ন — এই গরমে —?

চিত্রা : ক্ষতি কি? যারা স্বপ্ন দেখার সাহস করে তারা প্ল্যাটফরমে চা বিক্রি করতে করতেও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাহস দেখাতে পারে—

বিভাস : তা তোমার স্বপ্নটা কি আমি শেয়ার করতে পারি?

চিত্রা : হোয়াই নট—বাড়ি আমার ভাঙন ধরা / অজয় নদীর বাঁকে / জল যেখানে সোহাগ ভরে / স্থলকে ঘিরে রাখে-

বিভাস : কাটোয়া—?

চিত্রা : না — শ্রীখন্ড চটি — কোন গ্রাম

বিভাস : তোমার আমার শিকড়—

চিত্রা : চলো যাই এই ফ্ল্যাট ছেড়ে—এই ধোঁয়া—এই কোলাহল ছেড়ে অনেক দূরে শান্ত কোন গ্রামে—

বিভাস : তুমি যাবে?

চিত্রা : চলো না কালই চলে যাই—

বিভাস : কাল কি করে হবে? এম ডি-র ঘরে জরুরী মিটিং আছে বরং পরশু—

চিত্রা : পরশু ? কি করে? ইলেভেনের খাতা জমা দিতে হবে—

বিভাস : হ্যা হবে— সব কিছু সামাল দিতে হবে— কিন্তু তার মাঝেও আমরা স্বপ্ন দেখছি—দেখবো একদিন এই শহুরে সভ্যতা ছেড়ে গোধূলী আলোয় আমরা পৌঁছে যাবো কোন এক গাঁয়ে যেখানে নেই কোন মোহ- নেই কোন ধান্দা, হিংসা, হানাহানি—আছে শুধু প্রেম আর ভালোবাসা—

লোকটা : মনু—মনু—

বিভাস : ওঃ লোকটা জ্বালিয়ে খেলো তো— একটু শান্তিতে প্রেমও করতে দেবে না —

চিত্রা : আঃ বিভাস— কি হয়েছে বাপী —এই তো আমি—

বিভাস : দুর ছাই— আমি ভিতরে চললাম। তুমি তোমার বাপীকে সামলে এসো যদি সময় পাও— (বেড়িয়ে যায়)

লোকটা : মনু—মনু—কোথায় গেলো আমার মনু—

চিত্রা : এই তো আমি বাপী—কিছু বলবে?

লোকটা : সব হারিয়ে গেছে আমার কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনা।—

চিত্রা : কি হারিয়ে গেছে বাপি?

লোকটা : কি হারিয়ে গেছে—? কি হারিয়ে গেছে বল তো— আমি জানি না — মনু—মনু —

চিত্রা : এই তো আমি মনু—

লোকটা : ও মনু— তুমি মনু- (কাছে এগিয়ে আসে। ভালো করে দেখে) না- মনু *(চিৎকার করে ওঠে)*
(আবহের সাথে আলো কাটে) (আলো জ্বলে। দেখা যায় লোকটাকে কিছু খুঁজতে)

লোকটা : কোথায় যে রেখেছি— খুঁজে পাচ্ছি না— হারিয়ে গেলো তাহলে— মনুকে জিজ্ঞেস করবো-? কিন্তু মনুকে কোথায় পাবো — সে তো এখন— সব যে কেন হারিয়ে যায়— দেখি ওদিকে যদি পাই- *(খুঁজতে খুঁজতে বেড়িয়ে যায় বাইরে) (চিত্রা ফোনে ডাঃ-এর সাথে কথা বলতে বলতে ভিতরে ঢোকে)*

চিত্রা : হ্যা হ্যা— জাক্তারবাবু এখন আগের থেকে অনেক ভালো আছে । তবে কিছু মনে করতে পারছে না— খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করছেন— হাঁটা চলা করছে— আচ্ছা আপনি কাল একবার আসবেন— ঠিক আছে ডাক্তারবাবু— *(ফোনটা কাটে এমন সময় বিভাস ঢোকে ভিতর থেকে)*

বিভাস : তুমি এখনও এখানে—? তোমার বাপি তো বেশ খোশমেজাজে রয়েছে দেখছি—

চিত্রা : আগের থেকে এখন বেশ ভালো ওনি— আচ্ছা তুমি থানায় গিয়েছিলে?

বিভাস : হ্যা- কাল অফিস ফেরতা গিয়েছিলাম। ওঃ থানায় যে এতো হ্যাপা কে জানতো—

চিত্রা : কি রকম—?

বিভাস : প্রথমে তো পাত্তাই দিতে চায় না। এ বলে ওর কাছে যান— সে বলে তার কাছে যান — তারপর একজনকে ধরে বেঁধে হয় উনি এস.আই হবেন— তাকে সব খুলে বললাম। শুনে বল্লেন— দেখুন মশাই কেউ হাড়িয়ে গেলে তাকে খুঁজে দেওয়ার দায় নিশ্চয়ই আমাদের। সে রকম কেউ আপনার পরিবারের হাড়িয়ে গেলে এফ.আই.আর করে যান। কিন্তু যাকে আপনি ঘরে তুলেছেন তাকে তাঁর নিজের ঘরে পৌঁছে দেওয়া তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা কাজ করে যান- অপরিচিত ভদ্রলোককে বাড়িতে রাখছেন। যদি কোনও গন্ডগোল হয় আগাম একটা খবর আমাদের

কাছে থানার ইনচার্যকে অ্যাড্রেস করে লিখে যান।

চিত্রা : কি রকম ভাবে?

বিভাস : ভদ্রলোককে আমরা আশ্রয় দিয়েছি— তার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচয় পেলে অথবা তার আত্মীয়রা কেউ খুঁজতে এলে আমরা তাদের হাতে ওনাকে ছেড়ে দোবো —

চিত্রা : ব্যাস আর কিছু নয়—?

বিভাস : আবার কি—?

চিত্রা : ওনারা কোন দায়িত্ব নেবে না?

বিভাস : নিতে পারে—যদি তুমি ওনাকে থানায় জমা করে দিয়ে এসো—

চিত্রা : তারপর—

বিভাস : ওনারা থানায় বা জেল হাজতে রেখে দেবে— আর অসুস্থ হলে কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে

চিত্রা : কিন্তু ওর বাড়ির খোঁজ —

বিভাস : কেউ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বাড়ি ছেড়ে চলে এলে আর সে যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাকে ঘরে ফেরাবে কি করে—

চিত্রা : চমৎকার—

বিভাস : হ্যা- চমৎকার— এখন তোমার হটকারিতায় এই বুড়োটাকে আমাদের ঘাড়ে নিয়ে চলতে হবে।

চিত্রা : ঠিক আছে ওনি কোনও অসুবিধা তো করছেন না। তুমিও দিব্যি অফিস যাচ্ছো— আমিও স্কুলে যাচ্ছি ওনাকে খাইয়ে তালা বন্ধ করে—

বিভাস : কিন্তু কতোদিন— কতোদিন এভাবে টানবে?

চিত্রা : যতদিন না ওনি বলতে পারছের ওনার ঠিকানা—

বিভাস : যদি সারা জীবনে কোনও দিনও না বলতে পারেন?

চিত্রা : তাহলে—

বিভাস : তাহলে—?

চিত্রা : মাঝ পথ থেকে দায় ঝেড়ে ফেলে লোকটাকে আবার রাস্তায় তো নামিয়ে দিতে পারবো না।

বিভাস : আমি বুঝতে পারছি না এর পরিণতিটা কী? শেষে আমরা কোনও বিপদে পড়ে যাব না তো?

চিত্রা : বিপদ —

বিভাস : হতে পারে না- ? লোকটা হয়তো বড়সব কোনও ক্রাইম করে পালিয়ে এসেছে - শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্যই অভিনয় করে চলেছে।

চিত্রা : এমনও তো হতে পারে লোকটা জেল থেকে পালিয়ে আসা কোনও কয়েদী — অথবা পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা কোনও বদ্ধ উন্মাদ—

বিভাস : হতেই পারে— এটাও হতে পারে লোকটার অন্য কোনও ধান্দা আছে—।

চিত্রা : ধান্দা—?

বিভাস : তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার ঘরে ঢুকে তোমার বাড়ির ঘোঁতঘাত সব দেখে নিচ্ছে—। তারপর একদিন সময় বুঝে—

চিত্রা : দলবল ডেকে এনে তোমার ঘরের সব লুট করে পালাবে। হাঃ হাঃ হাঃ—। সত্যি তোমার কল্পনা শক্তিকে সেলাম জানাতে হয়।

বিভাস : হয় না— এমন কোনদিন হয়নি—?

চিত্রা : হয়েছে—হয়ও— কিন্তু এ মানুষটা— এইভাবে শুয়ে থাকা অথর্ব মানুষটা চোর, ডাকাত, বদমাইশ - এটা আমি ভাবতে পারছি না। কারণ আমি মানুষ চিনি - মানুষের সাথে মেলামেশা করি - তাই আমি বুঝেছি এ মানুষটা জীবনে একটা ভাঙাচোরা মানুষ - যার সামনে পিছনে সবটাই সাদা পাতা। তাকে এভাবে আমি হারিয়ে যেতে দিতে পারি না বিভাস—

বিভাস : তোমার সাথে কথায় কেউ পেরে উঠবো না— থাকো তোমার বাপীকে নিয়ে— *(ভেতরে চলে যায়)*

চিত্রা : বিভাস শোন আমার কথা— ওঃ - মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষি করে না— শেষে সব মেনেও নেবে- আর পাশেও থাকবে—তাও কেন যে এমন করে -- *(ভেতরে চলে যায়)*

(লোকটা প্রবেশ করে কথা বলতে বলতে)

লোকটা : হারিয়ে যায়— কতো কি যে হারিয়ে যায়— কোথায় যায়—কেন যায়। কেউ কি খুঁজে দিতে পারে? কিন্তু হারিয়ে যায় কেন? মনু— মনু কি হারিয়ে গেছে-? ও কি আর ফিরে আসবে না—? কতো কি যে হারিয়ে যায় জীবন থেকে— *(এদিক ওদিক খোঁজে - শেষে টেবিলে রাখা একটা মানি পার্স দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নেয়। এমন সময় বিভাস ঢোকে)*

বিভাস : একি? আপনি আমার পার্সে হাত দিয়েছেন কেন?

লোকটা : পার্স—?

বিভাস : ইয়েস পার্স— যেখানে টাকা থাকে।

লোকটা : ও এখানে টাকা থাকে - তাই বুঝি - ? *(পার্সটা নামিয়ে রাখে)* তাহলে

মনটা কোথায় থাকে? হৃদয় - এই হৃদয়—?

বিভাস : ঢপবাজী হচ্ছে—ধরা পড়ে পাগল সাজা হচ্ছে? ডাকবো—ডাকবো আপনার মনুকে?

লোকটা : মনুকে—ডাকবে? ডাকো না - ডাকো না—কোথায় যে গেলো—কতদিন হলো তাকে দেখি না - মনু—আমার মনু—'হে অনন্ত অতীত কথা কও - কথা কও— *(চলে যেতে থাকে)* মন হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যায়—? তুমি খুঁজে দিতে পারবে—?

বিভাস : দাঁড়ান—*(লোকটা দাঁড়িয়ে যায়)* কে আপনি? কেন এসেছেন আমাদের ঘরে? কেন?

লোকটা : কেন এলাম বলো তো? কে আনলো আমাকে?

বিভাস : আপনার মনু —

লোকটা : ম -নু— ধ্যাৎ— সে তো—ও *(চলে যেতে থাকে)* মন হারিয়ে যায়—

বিভাস : *(পথ আটকে)* দাঁড়ান - নাটক অনেক করেছেন। এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ- ডাক্তার আপনার কোন রোগ খুঁজে পায়নি - আপনাকে বলতেই হবে আপনি কে - আর যদি বলতে না চান প্লীজ- আপনি চলে যান আমাদের এখান থেকে— চলে যান—। আমাদের মুক্তি দিন। একজন নন-আইডেনটিটিকে নিয়ে দিনের পর দিন এভাবে আমরা আর পারছি না— আপনি যান প্লীজ—

লোকটা : যাবো—? কোথায় যাবো?

বিভাস : আপনার বাড়ি—আপনার ঘর—আপনার সংসারে—

লোকটা : সংসার—স ং সা র—। হাঃ সারা জীবন শুধু সং সেজেই কাটিয়ে দিলাম- সার যে কি কোথায় কিছুই তো খুঁজে পেলাম না।

বিভাস : এগুলো পাগলামী নয় — ভোগলামী বুঝলেন।

লোকটা : উহু— বুঝলাম না—

বিভাস : নাটক করা বন্ধ করে এবার বিদেয় হোন—

লোকটা : এবারও যে বুঝলাম না—

বিভাস : কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে সময় দিলাম। আজ রাতের মধ্যে যদি আপনার নাম ঠিকানা বলেন তো ভালো— আপনাকে আমি যেভাবে পারি আপনার বাড়ি পৌঁছে দেবো— আর বলতে না পারলে—

লোকটা : না বলতে পারলে—?

বিভাস : আপনাকে বসিয়ে দিয়ে আসবো - সেই বাসষ্ট্যান্ডে - যেখানে থেকে আপনি এসে এ ঘরে ঢুকেছেন — বুঝেছেন এবার ?

লোকটা : না বুঝি নি—

বিভাস : তা বুঝতে চাইবেন কেন? ফ্রি তে রাজভোগ জুটছে - নরম বিছানার আয়েশ জুটছে—চলে যাওয়ার কথা বোঝা তো আপনার একদম উচিৎ নয়। ঠিক আছে বুঝবেন যখন সকালে ফের ঐ বাসষ্ট্যান্ডে বসিয়ে দিয়ে আসবো—। ঠিক আছে ততক্ষণ যা পারেন করে নিন। আর নিজের ভালো চাইলে নিজের নাম ঠিকানা স্পষ্ট করে বলে দিন—

লোকটা : নাম— না ম— ঠিকানা - --। ঠিকানা—ঠিকানার সন্ধান তো করছি- কি যেন নাম ছিলো—কোথায় যে হারিয়ে এলাম— নাম — ঠিকানা—

বিভাস : হ্যা - হ্যা— ঠিকানা - ঠিকানা - পতা—

লোকটা : পতা শব্দটা কোথায় যেন শুনেছিলাম— ঐ শব্দগুলো থেকে পালিয়ে যাবো বলে—না না আমি আর একটু ভালো করে ভাবি— *(গেয়ে ওঠে)* ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু ঠিকানার সন্ধান - - -

বিভাস : চুপ - একদম চুপ - চার আনার মাল টেনে ষোল আনার ভোগলামী— ছোটাচ্ছি—একবার *(লোকটাকে চেপে ধরে)* এই বল শালা তোর নাম কি- কোথায় থাকিস্ বল—*(জোরে ঝাঁকায়)*

লোকটা : (চিৎকার করে) মনু—ম নু — *(মঞ্চে ঢোকে চিত্রা)*

চিত্রা : কি হলো — কি হলো—?

বিভাস : কিছু হয়নি—তুমি ভেতরে যাও— আমাকে এই লোকটাকে বুঝে নিতে দাও—

চিত্রা : মানে—

বিভাস : মানেটা খুব স্পষ্ট—। একটা নন্-আইডেনটিটিরি সাথে দিনের পর দিন আমি পেরে উঠছি না। ওনাকে স্পষ্ট করে জানিয়েছি কাল সকালের মধ্যে উনি যদি ওনার নিজের পরিচয় না জানান—

চিত্রা : উনি কি করে জানাবেন বিভাস— উনিতো কিছুই মনে করতে পারছেন না—

বিভাস : ঢ্যাঁমনামো কাকে বলে জানো কি ম্যাডাম-। একটা মানুষ খাচ্ছে—ঘুমোচ্ছে —নিজের আন্ডার ওয়ার নিজে নিজেই ধুয়ে শুকাতে দিচ্ছে—অথচ সে নিজের নাম ঠিকানা বলতে পারছে না—হয় - হতে পারে?

চিত্রা : মানে—?

বিভাস : এ লোকটা জালিয়াত - ফ্রড - এ যদি নিজের নাম ঠিকানা না বলতে চায় —তাহলে আমাদের ভেবে নিতে হবে এর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। এবং সেটা সৎ কোনও উদ্দেশ্য অবশ্যই নয়। সো --

চিত্রা : সো ---

বিভাস : কাল সকালের মধ্যে ও নিজের নাম ঠিকানা না বললে ওকে আমি ওর সেই ফেলে আসা বাসস্ট্যান্ডে আবার পৌঁছে দেবো — হ্যা হ্যা দেবো—

চিত্রা : বিভাস ।

বিভাস : কি ভেবেছেন উনি? কি ভেবেছেন? তোমার সফট্‌নেস্‌কে কাজে লাগিয়ে সারাটা জীবন আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে থাকবেন? মামাবাড়ি নাকি এটা ?

লোকটা : মামাবাড়ি — মা মা - বাড়ি ভারি মজা— আম কাঁঠাল দুধ— কি মজা— কি মজা— আমারও ছিলো মামা বাড়ি - মামাবাড়ি কোথায়— তোমরা জানো আমার মামাবাড়ি কোথায়? *(চিৎকার করে)* মনু মামাবাড়ি কোথায়-? বল্‌ তো আমার মামাবাড়ি কোথায় ? কোন সে সবুজ দেশে। বল্‌ না মনু - মনু-

বিভাস : দোখো— দেখো—একশো ভাগ সেন্স রয়েছে—লোকটা আদৌ পাগল নয়—প্রমান চাই- প্রমান - এই দ্যাখো *(হঠাৎ লোকটাকে ধাক্কা মারে)*

লোকটা : কে বে শালা—

বিভাস : লুক - লুক চিত্রা— তুমি সমাজসেবী ঠিক আছে— মানুষের সাথে একসাথে বাঁচতে চাও ভালো। সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে জীবনের সবটুকু এনার্জি খরচা করে একটা সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখো সে আরো ভালো। কিন্তু কামচোর ধান্দাবাজ—লোভী মানুষকে, একটা প্রতারককে প্রশ্রয় দেবে- এটা কি সমাজসেবা? বলো এটা কি সমাজসেবা?

চিত্রা : বাপী - বাপী - তুমি কে আমি জানি না— তুমি কি আমি জানি না-। খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। বিধবা মা আমাকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন। এখন তুমি বলো বাপী— *(কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)*

লোকটা : লাল নীল সবুজের খেলা চলেছে / লাল নীল সবুজের খেলা রে— মাঝে মাঝে মনে হয় এ সংসারটা মরুভূমি। অনন্ত পথ শুধু বালি শুধু বালি— একটুও জল নেই - একটুও সবুজ নেই—কিন্তু তোদের দেখলে তোকে দেখলে বাঁচতে ইচ্ছে করে রে—এ পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর বাঁচতে ইচ্ছে করে। পারলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখিস্‌—বোঝা মনে হলে ছুড়ে ফেলে দিস—যেমন আমাকে সবাই ছুঁড়ে ফেলেছে।

চিত্রা : কে বলেছে তোমাকে আমরা ছুঁড়ে ফেলেছি— তুমি থাকবে আমাদের সাথে— আমার আর বিভাসের সাথে- । যতদিন বাঁচবে ততদিন থাকবে তুমি। তুমি যে আমাদের বাপী—

লোকটা : বড় লোভ হয় রে- বড় লোভ হয়—'যাহা চাই - তাহা ভুল করে চাই-? যাহা পাই - তাহা চাই না—

চিত্রা : বাপী —

বিভাস : সরি— এটুকু বুঝেছি যে আপনি ফ্রড নন্। যতদিন মন চায় আপনি থাকুন আমাদের ঘরে আমাদের আপনজন হয়েই থাকুন। স্যরি আমাকে ক্ষমা করবেন। *(বেড়িয়ে যায় মাথা নিচু করে)*

চিত্রা : হ্যা থাকো বাপী - আমাদের নিজের মানুষ হয়ে- কাছের মানুষ – যতদিন না—

লোকটা : যতদিন না সকালের সূর্যটা ওঠে— যতোদিন না পৃথিবীটা সবুজ হয়—যতদিন না মনু - আমার মনু - ঘুম থেকে আমাকে ডেকে তোলে বলে ওঠে—'ওঠো - ওঠো সকাল হয়েছে— নতুন সকাল - কাজে নামতে হবে না? তোমাকে আমাকে সবাইকে —। নতুন সকাল ডাকছে যে — ওঠো ওঠো ---

(নেপথ্যে আবহ -- আলো কাটে)

(আলো জ্বলে - দেখা যায় লোকটি ডিভানে বসে পেপার পড়ছে। এমন সময় প্রবেশ করে বিভাস)

বিভাস : কি কেমন আছেন—?

লোকটা : ভালো -- খুব ভালো—

বিভাস : আপনার মেয়ে আপনাকে খাওয়ার জন্যে ডাকছে— যান খেয়ে নিন—

লোকটা : আমাকে ডাকছে— তাহলে যাই— *(বেড়িয়ে যায়)*

বিভাস : *(পেপার তুলে নিয়ে)* আশ্চর্য। অতোগুলো কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম - দেড় মাস ধরে ধরে সমস্ত কাগজ আঁতিপাতি করে খুঁজছি কোন রেসপন্স্ নেই? (দর্শকের দিকে) অচ্ছা আমরা কি এতোটাই ফেলনা? আমি - আপনি? যতদিন পারছি রোজগার করছি - নিজের প্রিয়জনের মুখে রুটিটা ভাতটা মাছটা জোগাড় করে এনে দিচ্ছি— তারপর সেই ক্ষমতাটা চলে গেলেই আমি আপনি ফালতু - এ সংসারে - এ সমাজে? যদি তা নাই হয় এই মানুষটা এই লোকটা কি এখন সমাজে বাতিল? ফালতু? দু-দিন - দু-বছর পরে আমি বা চিত্রা—আমরাও কি বাতিল হয়ে যাবো? এ সংসারে — এ জীবনে—?

(ড্রপ সিনের শেষ প্রান্তে একটা লাঠি হাতে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলে যায় লোকটা। নেপথ্যে আবহে ভেসে আসে—'কতদূর আর কত দূর বল মা') (চিত্রা এসে ঢোকে)

চিত্রা : কি গো ? কি ভাবছো- ?

বিভাস : একটু ঠান্ডা জল হবে?

চিত্রা : এখনই - -? হুঁ (জল নিয়ে আসে। বিভাস ড্রিংক্স ঢালতে ঢালতে)

বিভাস : নিজের বিশ্বাস — নিজের চেতনা— যখন নিজেকেই পরিহাস করে — সমস্ত জগৎ জুড়ে—এই সমাজ এ সংসার জুড়ে — কেউ কোথাও কাউকে কাছের মানুষ বলে মনে হয়না যখন থাকে শুধু অন্ধকার - মুখোমুখি বসিবার—

চিত্রা : বনলতা সেন—

বিভাস : না চিত্রা— কাব্য নয়— নিঃসঙ্গতা— একাকিত্ব— যে একাকিত্ব তোমাকে আমাকে—

চিত্রা : ঐ লোকটাকে—

বিভাস : দাঁড়াও নেশাটা একটু চড়তে দাও তার পর তো বলবো ঐ লোকটা নয়— ও তোমার বাপী - আমার শ্বশুর — হাঃ হাঃ হাঃ —

চিত্রা : কিন্তু বাস্তবে এই মুহূর্তে —?

বিভাস : জানি না চিত্রা - আমি জানি না— শুধু জানি সংকট সবার জীবনে - তোমার আমার সবার জীবনে— আর সেই সংকটের কোন এক বাঁকে ঐ মানুষটা আটকে গেছে— পথ খুঁজছে- যেমন খুঁজছি তুমি আমি—
(লোকটা এসে ঢোকে। এবং নিজের মনেই বলতে থাকে)

লোকটা : মনু - মনু -- মনু জানো আজ আমি অনেক খেয়েছি— কতো কি খেতে দিয়েছিলো— তুমি কোথায় মনু? কোথায় তুমি? এতো অন্ধকার কেন - এতো অন্ধকার— কিছুই যে বুঝে উঠতে পারছি না আমি। কোথায় যে যায় কে জানে? মনু - মনু—

বিভাস : কে তুমি? কে? তুমি কি মানুষ? তুমি কি দেবতা না তুমি আমার মধ্যে এখনও বেঁচে থাকা আমিটা? কে তুমি? বলো না দোহাই- তুমি কে?

লোকটা : আমি - আমি - আমি অমৃতের পুত্র - আমি ঈশ্বরের সন্তান - আমি তুমি ও সে- আমরা সবাই—

বিভাস : ওঃ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না— সব কেমন হেয়ালী মনে হচ্ছে— আমি পাগোল হয়ে যাবো। না না তুমি মানুষ নও— কিন্তু কে তুমি—কে?
(বেড়িয়ে যায়)

চিত্রা : বিভাস শোন - শোন বিভাস— কে তুমি?

লোকটা : সবাই বোকা - আমি কে-? আমি কে চিনতে পারে না— একবার নিজের দিকে ভালো করে দেখার সময় কারোর নেই— কারোর না— আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান— অমৃতের পুত্র—

(আবহের সাথে আলো কাটে। আলো জ্বলে। দেখা যায় লোকটা আপন মনে উপরে তাকিয়ে মাইমে কথা বলছে। এমন সময় মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে ঢোকে বিভাস)

বিভাস : হ্যা বলুন আমি বিভাস চ্যাটার্জি বলছি—

নেপথ্যে: আমি কাটোয়া থেকে বিশ্বাস বলছি

বিভাস : হ্যা বলুন *(এমন সময় লোকটা বেড়িয়ে যায়)*

নেপথ্যে: আমি পেপারে আপনার দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করছি—

বিভাস : কি বলছেন আপনি পেপার দেখেছেন?

নেপথ্যে: ছবি দেখে মনে হচ্ছে আমার দাদা— নাম অংশুমান বিশ্বাস

বিভাস : আচ্ছা। কি নাম বললেন অংশুমান বিশ্বাস।

নেপথ্যে: উনি কি মাঝে মাঝে বাংলা কবিতা বলেন?

বিভাস : হ্যা হ্যা মাঝে মাঝে বাংলা কবিতা বলে।

নেপথ্যে: আমি কাল সকালে আপনার ওখানে যাবো

বিভাস : আপনি আসবেন? চলে আসুন আমাদের কোন অসুবিধা নেই— আচ্ছা-ঠিকানা পেপারে দেওয়া আছে। কোন অসুবিধা হলে ফোন করবেন। আচ্ছা ধন্যবাদ *(ফোনটা কেটে দেয়) (চিৎকার করে)* চিত্রা—চিত্রা— তাড়াতাড়ি শোন— *(চিত্রা ঢোকে)*

চিত্রা : কি হলো ? চিৎকার করছো কেন?

বিভাস : পেয়েছি— পেয়েছি—

চিত্রা : কি পেলে স্বপ্নপুরের চাবি?

বিভাস : না — ঐ ভদ্রলোকের হদিস—

চিত্রা : কার?

বিভাস : আমাদের অতিথি—

চিত্রা : বাপী —

বিভাস : উনি তোমার বাপী নন চিত্রা— উনি কাটোয়ার বাসিন্দা — ওনার নাম অংশুমান বিশ্বাস।

চিত্রা : কি করে জানলে?

বিভাস : আমাদের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ওর এক ভাই আমাকে ফোন করেছিলেন এই মাত্র— ভদ্রলোক কাল সকালেই আসছেন ওনাকে নিয়ে যেতে —

চিত্রা : বাপীকে— সে কি করে হয়—? বাপী চলে যাবে-- না না তাহলে আমরা থাকবো কাকে নিয়ে?

বিভাস : বাচ্চাদের মতো কথা বলো না তো--। কে তোমার বাপী? কে? ঐ ভদ্রলোক

- ওনার নাম অংশুমান বিশ্বাস— ওনি কাটোয়ার বাসিন্দা—

চিত্রা : না - না - উনি আমার বাপী — হ্যা আমার বাপী— আমি ওকে কিছুতেই কারোর কাছে ছেড়ে দেবো না। না - কিছুতেই না—

বিভাস : এবার দেখছি তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল—। আরে বাবা বাস্তবকে মেনে নিতে হবে তো? ঐ মানুষটা ওর ওতো ঘর আছে— সংসার আছে- ছেলে মেয়ে বৌ আছে—। আমাদের কোনও অধিকার আছে কি ওনাকে ওনার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে আটকে রাখার— ওঁনার পরিবার সেটা মেনে নেবে কেন—?

চিত্রা : কে পরিবার—? কার পরিবার? কারা তারা? যারা নিজের স্বামী - বাবা - কিংবা দাদাকে এভাবে সংসার থেকে হারিয়ে যেতে এলাউ করে— দীর্ঘ দুটো মাস কোনও খোঁজ খবর করে না— তারা পরিবার? কোন হিসেবে? কোন সম্পর্কে-?

বিভাস : ওহ্ চিত্রা — আইন কখনো আবগেকে প্রশ্রয় দেয় না - সে চলে তার নিজের নিয়মে—। ঐ ভদ্রলোক উনি তোমার বাপী নন- আমার শ্বশুর নন্ - উনি অংশুমান বিশ্বাস - এটাই বাস্তব - এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে।

চিত্রা : না আমি মনি না — মানবো না — কিছুতেই না— উনি আমার বাপী— সেটাই সত্যি- একমাত্র সত্যি-। এর বাইরে আমি আর কিছুই মানবো না। বাপীকে আমি কোথাও যেতে দেবো না। কিছুতেই না—
(লোকটা আবার খুঁজতে খুঁজতে ঢোকে)

লোকটা : চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি / ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি / প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে / আনন্দধারা বহিছে ভুবনে — *(নেপথ্যে এই গানের টিউন ভাসতে থাকে)*

বিভাস : এই যে মি: অংশুমান বিশ্বাস - ইয়োর গেম ইজ ওভার। শেষ আপনার ভাই বিশ্বরূপ বিশ্বাস আপনাকে নিতে আসছেন কাল সকালেই - গেট রেডী -

লোকটা : কে বিশ্বরূপ—?

বিভাস : আপনার ভাই—

চিত্রা : আঃ বিভাস কি হচ্ছে—

লোকটা: আমি — আমি কে—?

বিভাস : আপনি অংশুমান বিশ্বাস —

চিত্রা : না - না - তুমি অংশুমান বিশ্বাস নও— তুমি আমার বাপী— হ্যা - হ্যা -

তুমি শুধুই আমার বাপী— বলো না - বলে দাওনা তুমি ওদের বলে দাওনা— তুমি অংশুমান বিশ্বাস নও— তুমি আমার বাপী — শুধু আমার বাপী—

লোকটা : তুমি কে --?

চিত্রা : আমি -- আমি - তোমার মেয়ে - আমি মনু—

লোকটা : *(চিৎকার করে)* মিথ্যে কথা— তুমি মনু নও— কিছুতেই নও— কিন্তু আমি—

বিভাস : অংশুমান বিশ্বাস —

চিত্রা : না বাপী —

বিভাস : অংশুমান —

চিত্রা : না - বাপী—

লোকটা : না - আমি অংশুমান নই — আমি বাপী নই— আমি কেউ না— আমি এ সমাজে - এ পৃথিবীতে বাতিল ফালতু একটা মানুষ *(হাঁপিয়ে যায় টাল খেয়ে পড়ে যায়)*

চিত্রা : বাপী- বিভাস তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে ফোন করো যাও— *(বিভাস দ্রুত ঘর থেরে বেড়িয়ে যায়)* বাপী কথা বলো - ওঠো -- এই দেখ আমি -- তুমি বাতিল নও—বাপী-- ই *(চিৎকার করে ওঠে) (নেপথ্যে আবহ। আলো কাটে)*

(কলিং বেলের আওয়াজে আলো আসে। মঞ্চে ঢোকে চিত্রা বাইরে গিয়ে দরজা খোলে। বিশ্বরূপ প্রবেশ করে)

চিত্রা : আপনি—

বিশ্ব : আমি বিশ্বরূপ বিশ্বাস। কাল ফোন করেছিলাম। বিভাস বাবু আছেন?

চিত্রা : আপনি বসুন । আমি ডেকে দিচ্ছি— *(বেড়িয়ে যায়। বিশ্বরূপ চেয়ারে বসে। ঢোকে বিভাস)*

বিভাস : আপনি— নমস্কার (হাত জোড় করে নমস্কার করে)

বিশ্ব : *(হাত জোড় করে)* নমস্কার। আমি বিশ্বরূপ বিশ্বাস—

বিভাস : বাড়ি চিনে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

বিশ্ব : না - না - কোলকাতায় ব্র্যাবোন রোডে পি.এন.বি র জোনাল অফিসে চাকরী করেছি - কতো জায়গায় ঘুরেছি। আপনার শ্রীরাম পুরের এই শরন্যা অ্যাপার্টমেন্টে খুঁজে পাবো না—? বলুন দাদা কোথায়?

বিভাস : চিত্রা - চি - ত্রা (ডাকে)

(চিত্রা এসে ঢোকে হাতে চায়ের কাপ ও মিষ্টির প্লেট)

চিত্রা : কতদূর থেকে আসছেন— একটু মিষ্টি হোক - তারপর কথা—

বিশ্ব : সে না হয় হলো— কিন্তু আসা মাত্রই চা মিষ্টি —

চিত্রা : আপনি অতো দূর থেকে আসছেন তাই রেডী রেখেছিলাম। যাতে আপনি আসা মাত্রই দিতে পারি।

বিশ্ব : সত্যি কথা বলতে কি জানেন- আমি চাকরী যতই কোলকাতায় করিনা কেন আদতে আমি গ্রামেরই ছেলে— ক্ষিদেটা বেশ পেয়েছে— ধন্যবাদ *(খেতে খেতে)* কিন্তু তিনি কই — শ্রীযুক্ত অংশুমান বিশ্বাস— *(সেই মুহুর্তে বিভাসের মোবাইলটা বেজে ওঠে। বিভাস ফোনটা ধরে)*

বিভাস : হ্যালো -- হ্যা - হ্যা - বলছি - তাই -- ঠিক আছে— হ্যা হ্যা আমরা যাচ্ছি - হ্যা যাচ্ছি - জাষ্ট দশ মিনিট - ওকে -- *(মোবাইলটা রাখে)*

চিত্রা : কার ফোন --?

বিভাস : কিছু না - হ্যা বিশ্বরূপবাবু আমরা তো পুরোপুরি ডার্ক-এ যদি আপনি আপনার দাদার ব্যাপারে আমাদের কিছু আলোকপাত করেন—

বিশ্ব : কিন্তু দাদা অংশুমান বিশ্বাস তিনি কোথায়?

চিত্রা : ছিলেন কাল রাত অবধি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন—

বিশ্ব : তারপর আবার চলে গেছেন— এখান থেকে হারিয়ে গেছেন—?

চিত্রা : না উনি এখানে ভালোই ছিলেন। আরামেই ছিলেন। কিন্তু কাল আপনার ফোন পাওয়ার পর —

বিশ্ব : আমার ফোন পাওয়ার পর কি?

চিত্রা : উনি খুব আপসেট্ হয়ে পড়েন - না আপসেট্ বললে ভুল হবে ভীষণ ভায়োলেন্ট হয়ে পড়েন- তাই বাধ্য হয়ে আমরা ওনাকে আমাদের এখানের সেরা নার্সিং হোম নর্সিসাসে ভর্তি করি কাল রাতে -- উনি এখন সুস্থ আছেন—

বিশ্ব : দাদা নার্সিং হোমে—

চিত্রা : না না টেনশন নেবেন না। জাষ্ট একটা চেক আপ- । তাছাড়া বুঝতেই তো পারছেন নিজের বাবা হলে হয়তো কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু ওনাকে বাপী বলে ডেকেছি উনি এই দু'মাস রেসপন্স্ করেছেন আর আমার বাবা—

বিশ্ব : ঠিক আছে ঠিক আছে- এতোটা ইমোশানাল না হলেও চলবে। কিন্তু কাকে কি বলি। আপনি বলছেন বাপী- আপনার সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই-- কিন্তু আমার এই দাদাটি -- না - না - আপন দাদা নয় - কিন্তু না হয়েও নিজের দাদা থেকেও কাছের - আমার অংশুদা - আমরা বলতাম সেজদা - একান্নবর্তী পরিবারে যেমন হয় আর কি --।

চিত্রা : হ্যা - একান্নবর্তী পরিবারে যেমন হয় - হাড়ি আলাদা - কিন্তু ভাই বোন

তারা তো আলাদা নয় - কাকার ঘরে সকালে লুচি - দুপুরে মায়ের সাথে ডালভাত বিকেলে জ্যেঠিমার পাশে মুড়ি আর ডালমুট। কি যে অসাধারণ ছিলো সেই সব দিনগুলো --

বিভাস : চুরি করে চিলেকোঠায় গিয়ে জ্যাঠতুতু দাদার সাথে ভাগ করে ঠান্ডা চায়ে চুমুক মারা - সেটা বলো

বিশ্ব : সবটাই ছিলো - ছিল আমাদের জীবনে। সেজদা লেখাপড়ায় ভালো ছিল। একটা মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীতে কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়ারের চাকরী নিয়ে প্রচুর উপরে উঠেছিলো। শেষ বয়সে হয়েছিলো চিফ সাইট ইঞ্জিনিয়ার।

চিত্রা : তাই বুঝি— তার মানে উনি তো বেশ উঁচু দরের মানুষ—

বিশ্ব : হ্যা তা বলতে পারেন — দিন নেই রাত নেই শুধু পরিশ্রম করেছে। মনে স্বপ্ন ছিলো রিটায়ার করার পর বৌকে নিয়ে গ্রামে এসে আয়েস করে দিন কাটাবে । দুটো মেয়েকে ভালো লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে বিয়ে দিয়েছে - বড় মেয়েকে রায়পুরে - সেখানে মেয়েকে একটা ফ্ল্যাটও কিনে দিয়েছে।

চিত্রা : রায়পুর —?

বিশ্ব : ছত্রিশগড় - রায়পুর -- দাদার বড় জামাই ওখানেই চাকরী করে - বড় মেয়েও- । ছোট মেয়েটার বিয়ে হয়েছে বম্বেতে। সারা জীবন বাংলার বাইরে চাকরী করেছেন কিন্তু বাংলাকে ভোলেননি- সব সময় সঙ্গে থাকতো বাংলা গানের ক্যাসেট আর কবিতার বই। ইচ্ছে ছিল শেষ জীবনটা বাংলা সাহিত্য চর্চা করে কাটাবেন- কিন্তু --

বিভাস : কিন্তু—

বিশ্ব : দাদার রিটায়মেন্টের একবছর পার হলো না বৌদি চলে গেলেন—

চিত্রা : কোথায়—?

বিশ্ব : ওপরে -- আর তারপর থেকেই দাদা আমার —

বিভাস : লস্ অফ মেমরি —

বিশ্ব : ঐ আর কি - মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে কথা বলেন— কখনো কখনো কাউকে চিনতে পারে না— কোথাও মন বসে না - আজ এখানে তো কাল সেখানে। ভাবুন একটা মানুষ যার কাছে ৭০- ৮০ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে। রায়পুরে ফ্ল্যাট - আমাদের গ্রামে দু-বিঘে জমির ওপর বাড়ি - সারাদিন শুধু মনু - মনু - আর মনু -

চিত্রা : মনু - মনু কে ?

বিশ্ব : ওঁর স্ত্রী - ভালো নাম জানি না - মনু বলে ডাকতেন আর তার মৃত্যুর পরই

চিত্রা : বিভাস - মনু বাপীর মেয়ে নয় — বিভাস --

বিভাস : বি স্টেডী - আমাদের আরো অনেক পথ চলতে হবে —

চিত্রা : ওঁনার মেয়েরা ওনাকে চিকিৎসা করায়নি - ?

বিশ্ব : চিকিৎসা করাবে ওনার মেয়েরা? ভালো বললেন-- । যারা নিজের অসুস্থ বাবাকে নিজের কাছে রাখতে চায়নি তারা চিকিৎসা করাবে--?

চিত্রা : সেকী - এটাও হয় নাকি--?

বিশ্ব : হয় হয় -- এ পৃথিবীতে অনেক কিছুই হয় -- জানেন বৌদি মারা যাবার পর দাদা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন বড় মেয়ের কাছে গিয়েছিলো । কিন্তু মেয়ে জামাই দাদাকে ঘার ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলো।

চিত্রা : কিন্তু ছোট মেয়ে তো —

বিশ্ব : সে আরো বেশী চালাক — বাবার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে রাস্তায় বের করে দিয়েছে। দুমাস আগে দাদার যা সম্পত্তি ছিলো দুই মেয়ে মিলে জোর করে দাদাকে দিয়ে লিখিয়ে সব বেচে দিয়ে টাকা পয়সা সব নিয়ে নিয়েছে। দাদা এখন পথের ভিখারি । তখন থেকেই দাদার আর কোন খোঁজ নেই— আপনাদের পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে জানতে পারলাম দাদা এখন ---

চিত্রা : এখন ওনি ভালোই আছেন --

বিশ্ব : কিন্তু আমার দাদা - মানে যাকে দেখতে এত দূর এখানে আসা --

বিভাস : তাকে আপনি দেখতে পাবেন - কিন্তু ওনাকে আপনার গ্রামে নিয়ে যেতে পারবেন না—

বিশ্ব : কেন পারবো না কেন? ও বুঝেছি ওর মেয়েরা নিয়ে যাবে? তা রাখবে কোথায়? ওর কিনে দেওয়া ফ্ল্যাটে ওর মেয়ে জামাই ঢুকতে গেলেই দূরছাই করে তাড়িয়ে দেয়। আর ছোট মেয়ে তো এখন বাবার নামটাই শুনতে চায় না। বাবার টাকা পয়সা সব বাগিয়ে নিয়ে তো -

বিভাস : আপনি তো এসেছেন নিতে --

বিশ্ব : আমি —আমি তো দাদাকে সারা জীবন আমার কাছে রেখে দিতে পারবো না। আমার অফিস আছে। ছেলে মেয়েরা সবাই কলেজে চলে যায়। আমার বৌও একটা স্কুলে চাকরী করে - বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থটা— কিছুদিন আমি রাখতে পারবো —

চিত্রা : তারপর —

বিশ্ব : দাদার দুই মেয়েকে বুঝিয়ে তাদের কাছে রেখে আসবো —

চিত্রা : কোন দরকার নেই — বাপী আমাদের কাছেই থাকবে — ওঁনাকে কোথাও

যেতে হবে না। আপনি এসেছেন ওনাকে দেখে চলে যান। আমরাই ওনার সব দায়িত্ব নেবো।

বিশ্ব : ঠিক আছে নেবেন-- যাক এসেই যখন পড়েছি তখন দাদাকে একবার দেখেই চলে যাই—

বিভাস : হ্যা হ্যা চলুন— চিত্রা তুমি তাড়াতাড়ি ড্রেস করে এসো -- তুমিও যাবে আমাদের সাথে —

চিত্রা : আমি এখন যাবো ? বাপীর খাবারটা বেডী করে, পরে গিয়ে খাইয়ে আসবো - তোমরা যাও

(বিভাস ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলে। চিত্রাকে ডাকে)

বিভাস : চিত্রা -- চিত্রা -- তোমর বাপী মানে বিশ্বরূপবাবুর দাদা যাকে শেষ কটা দিন বাপী বলে ডেকেছো আমি আমার শ্বশুর মশাই বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম উনি আজ একটু আগে নার্সিং হোম ছেড়ে চলে গেছেন, ওনার মনুর কাছে - মাসিভ হার্ট অ্যাটাকে - সো -

চিত্রা : বাপী - বাপী - নেই -- না -- *(কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)*

বিশ্ব : সেকী একথাটা আপনি এখন বলছেন —

চিত্রা : বাপী তুমি কেন চলে গেলে — আমরা তো তোমার সেবায় কোন ত্রুটি রাখিনি -- কেন --

বিভাস : ভেঙ্গে পড়লে হবে না চিত্রা -- আমি গাড়ি নিয়ে আসছি -- তাড়াতাড়ি রেডী হয়ে নাও। আমাদের নার্সিং হোমে যেতে হবে — *(বেরিয়ে যায়)*

বিশ্ব : এটা বোধহয় ভালোই হলো। যে মানুষটাকে নিজের আত্মীয়রা কেউ চায় না- তাকে আমি বা আপনি কত দিন সামলে রাখতাম, তাই না ? ঠিক আছে ওর মেয়েদের একটা খবর দিই - ওরা এসে যা করার করুক—

চিত্রা : না কাউকে খবর দিতে হবে না —

বিশ্ব : কিন্তু মুখাগ্নি - শ্রাদ্ধশান্তি --

চিত্রা : আমি করবো -- আমরা -- আমরাই ওনার আপনজন -- আমরাই ওকে আপন করে রাখবো - হ্যা ওর মৃত্যুর পরেও — আমরাই ওনার সৎকারের ব্যবস্থা করবো - চলুন শেষ দেখা দেখে যাবেন —

বিশ্ব : এ্যাঁ — হ্যা চলুন —

(নেপথ্যে বেজে ওঠে গান -- পথের শেষ কোথায় কি আছে শেষে প্রাণের -- হেমন্ত মুখার্জ্জীর গান। পিছনে খুব ছোট আলোয় দেখা যায় লোকটা হাঁটছে - হাঁটতে চাইছে কিন্তু --)

ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অবলম্বনে

খোলা জানালা

সমীর বিশ্বাস

পারমিতা : আটান্ন মিনিট হলো

বান্টি : ও মা তুমি? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো?

পারমিতা : আটান্ন মিনিট

বান্টি : স্যরি । তুমি কি ফোন করবে?

পারমিতা : ইচ্ছে তো ছিলো

বান্টি : সে কথা বলবে তো

পারমিতা : সুযোগ পাইনি।

বান্টি : আচ্ছা মা ফোনের পাশে একটা বসার জায়গা রেখো তো। ঘাড় উঁচু করে কথা বলা যায়? ঘাড় ব্যাথা হয়ে যায় না?

পারমিতা : বসার জায়গা না রেখেই এই, আর বসার জায়গা রাখলে যে তোমার কখন কথা শেষ হবে কে জানে। সেই কখন থেকে ভাবছি একটা জরুরী ফোন করবো .....

বান্টি : ও মাই গড সে কথা বলবে তো

পারমিতা : ফুরসত পেলাম কই? কথা বলায় যা ব্যস্ত ।

বান্টি : তা হলে জরুরী ফোন করার থাকলে বলবে না?

পারমিতা : তা এতক্ষণ ধরে কার সাথে কথা হচ্ছিল শুনি

বান্টি : একটা জরুরী ফোন ছিলো। খুব দরকারী। নাও ***(রিসিভারটা এগিয়ে দেয় বান্টি)***

পারমিতা : তুমি যেও না। কথা আছে ***(রিং করার চেষ্টা করে)***

বান্টি : নাহলে কি আমার এখন বেড়োনো চলবে না?

পারমিতা : তুমি কি এখন আবার বেড়োবে নাকি?

বান্টি : আবার মানে? একবারই তো। এখন সকাল মা।

পারমিতা : ঠিক আছে দাঁড়াও কথা আছে। হ্যাঁ। কে? রীতা? ও রীতা বাড়ীতে নেই? তা তুমি কে বলছো? মিষ্টি? ও নন্দিনী? বুঝেছি। তা তোমার বৌদি কোথায়? কোথায় বললে? হাসপাতালে? কেন? কার কি হলো? দাদার? কি হয়েছে? ও। আচ্ছা আচ্ছা। কোন হাসপাতালে?

লাইফ কেয়ার? সঙ্গে কে আছে? ওনার বন্ধুরা? ঠিক আছে ঠিক আছে। তুমি সাবধানে থেকো। মিষ্টি কোথায়? কলেজে? পরীক্ষা আছে? আচ্ছা তুমি রাখো। আরে বাবা কান্নাকাটি কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর দিনকাল ভালো নয়। হুটহাট যাকে তাকে দরজা খুলে দিওনা। ও শোনো কোনো খবর পেলে জানিও। হ্যাঁ হ্যাঁ রাখো।

বান্টি : রীতা মাসীর হাসব্যান্ডের কিছু হয়েছে মা? কি হয়েছে?

পারমিতা : নন্দিনী তো সে বিষয়ে কিছু বলতে পারলো না।

বান্টি : তুমি যাবে না?

পারমিতা : যাওয়া তো উচিৎ। রীতাটা একা। এই সময় পাশে না থাকলে চলবে?

বান্টি : যাওয়া উচিৎ যখন যাও। হেজিটেট করছো কেন?

পারমিতা : না ভাবছিলাম .....

বান্টি : হাইকমান্ডের পারমিশান পাবে কিনা ভাবছো? নিজের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে অন্তত তোমার ঐ হাইকমান্ড স্বামীর অনুমতির তোয়াক্কা কোরো না মা। যাক এবার বলো। ***(হাত জোড় করে দাঁড়ায়)***

পারমিতা : এটা আবার কি?

বান্টি : যদি একটু তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা করে ফেলো।আমার একটু তাড়া আছে

পারমিতা : বান্টি আমি তোমার ইয়ার-বন্ধু নই।

বান্টি : আমি ইয়ার বন্ধুদের সামনে এইরকম হাত জোড় করে দাঁড়াই সে কথা তুমি কি করে ভাবলে বলোতো? চিমটি কেটে শেষ করে দেবো না?

পারমিতা : আমার ক্ষেত্রেও তো তাই। চিমটি না কেটে কথা বলিস তুই?

বান্টি : প্লীজ মা গলাটা অতোটা স্যাঁতস্যাঁতে কোরোনা। বোল্ড এন্ড ক্লিয়ার কথাই আমার ভালো লাগে। হ্যাঁ কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলে? কার সাথে কথা বলেছিলাম? একটা ছেলের সাথে।

পারমিতা : সেটা তো বুঝতেই পেরেছি।

বান্টি : কি করে বুঝলে?

পারমিতা : কোনো মেয়ের পক্ষে যে একতরফা কথা শুনে যাওয়া সম্ভব নয় সেটা আমি বুঝি। তা ছেলেটা কে?

বান্টি : বললে তুমি চিনবে?

পারমিতা : চেনার মতো করে বললে চিনতে পারি।

বান্টি : অতোজনকে চিনতে গেলে তো সিগারেটের ধোঁয়ায় তোমার অ্যাজমা বেড়ে যাবে মা। তুমি যে অ্যাজমার পেসেন্ট সেটা তো আমার মনে

রাখতে হয়। তবে চিন্তা কোরো না শেষ পর্যন্ত যাকে জানার দরকার হবে আমি নিজেই জানিয় দেবো।

পারমিতা : এটা কি হচ্ছে বান্টি? ওই জেনারেশানের তোরা কি সবাই এইভাবে কথা বলিস?

বান্টি : সবাই নয় মা। কত গুডি গুডি ছেলেমেয়ে আছে। এই তোমার রীতামাসীর মেয়ে মিষ্টি কিংবা অতুলমামার ছেলে অভিষেকের মতো। যারা তোমাদের জমার ঘরে পড়ে। আমাদের মতো উড়নচন্ডীরা তো খরচার খাতায় মা।

পারমিতা : বান্টি তুই যে আমার একমাত্র সন্তান সেটা কি ভুলে যাচ্ছিস?

বান্টি : না মা ভুলিনি। কি করে ভুলবো বলো তো? কথাটা যা সত্যি। আমি তোমার একমাত্র মেয়ে। নো ব্রাদার, নো সিস্টার। সেটাই তো আমার একমাত্র জ্বালা মা। আগের দিনের মহিলাদের মতো পাঁচ দশটাকে জন্ম দিতে পারলে তো এতো টেনশান থাকতো না। আমিও মুক্ত থাকতাম। তোমাদের মনপ্রাণের সব সখ-আহ্লাদ, স্বপ্ন পাওয়া না পাওয়া পূরণ করার দায়িত্বটা এই একটা কাঁধে নিতে হতো না। সমস্ত না পাওয়ার যন্ত্রণাগুলো চাপিয়ে আমাদের জীবনটাকে ধোপার গাধার মতো করে ফেলতে পারতে না।

পারমিতা : তোর নিজের জীবনটাকে ধোপার গাধার মতো মনে হলো বান্টি?

বান্টি : আমার স্বাধীনচেতা মন সেটা হতে দেয়নি। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ভালো করে দাঁড়াতে পারার আগেই বইয়ের বোঝা আঁকা, নাচ, আবৃত্তি, সাঁতার আর প্রাইভেট টিউটরের বোঝা বইতে শুরু করে। মা ঠাকুরমার কোলে বসে বা দাদুর পিঠে চেপে রূপকথার রাজকন্যা আর ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প শোনার আনন্দটাই তারা পায় না। মা একবার মনে করে দেখো তো ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে তুমি ক'দিন আমায় ঘুম পাড়িয়েছ ?

পারমিতা : ছেলেমেয়েকে ঘিরে মা বাবার স্বপ্নটাকে তুই বোঝা চাপিয়ে দেওয়া বললি? আর ছোটবেলায় তোর শরীর খারাপ হলে কত রাত আমি ঘুমাইনি সেটা তো বললি না? স্কুল থেকে ফেরার সময় পার হয়ে গেলে দরজা ধরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার উৎকন্ঠা? কিংবা আকাশে মেঘ করলে কিংবা কোথাও কোনো গন্ডগোলের খবর কানে এলে তোদের ঘরে না ফেরা পর্যন্ত এক মিনিটও যে স্থির থাকতে পারিনি সেটা তোর একবারও মনে আসে না?

বান্টি : মা - ওমা - আসে। কিচ্ছু ভুলিনি আমি। আমি তো আমার কথা বলছি না, যাদের কথা বলছি তারা তো জন্মাবার পর থেকে ধোপার গাধা বইতে বইতে হারিয়ে ফেলে নিজেদের। মা বাবার ইচ্ছে পূরণ করতে করতেই ফুরিয়ে যায়।

পারমিতা : মা বাবার ইচ্ছের কথা বলছিস? তোর ক্ষেত্রে অন্তত সে কথাটা ওঠে না। মেয়ের কেরিয়ার নিয়ে তোর বাবার কোনো দিনই কোনো মাথাব্যাথা ছিল কি?

বান্টি : কি করে থাকবে? তিনি তো মস্ত সেলিব্রিটি। নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে তুলতেই তো সময় কাবার। আমাকে নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? তা ছাড়া আমাকে নিয়ে মাথা ঘামালে তো আর সেলিব্রিটি হয়ে ওঠা হোত না মা।

পারমিতা : আমি তো তোকে মানুষ করার ক্ষেত্রে কোনোদিন কোনো কার্পণ্য করিনি। কোনো কম্প্রোমাইজ করিনি বান্টি।

বান্টি : মানুষ আর হলাম কোথায় মা? শিব গড়তে গিয়ে যে বাঁদর গড়ে ফেললে।

পারমিতা : কে বললে? কার এতো সাহস? লেখাপড়ায়, নাচে-গানে, খেলাধূলায় কোনদিকে তুই কম ? কত সম্মান পেয়েছিস বলতো?

বান্টি : সেটাও তো আর এক যন্ত্রনা মা। এত করেও তো আমাকে সবাই সেলিব্রিটির মেয়ে বলেই চেনে। মানুষের কাছে আমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই মা।

পারমিতা : সেটাও তো কম সম্মানের নয়? বাবা একজন সেলিব্রিটি সেটা তোকে গর্বিত করে না?

বান্টি : না মা করে না। আর তুমি যাকে সম্মান বলছো সেটা যে আমার কাছে লজ্জা। আমার বন্ধুরা কেউ হ্যাংলা নয় মা । তারা নিজেরাও কেউ কম যায়না। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদেরও যোগ্যতা কম নেই।

পারমিতা : তাহলে তো তাদের কাছে তোর বাবার আলাদা একটা সম্মান আছে।

বান্টি : না নেই। বরঞ্চ আমার বাবার সেলিব্রিটি হয়ে ওঠার কৌশলকে নিয়ে ওরা হাসাহাসি করে, বাবার চাটুকারিতাকে তারা হ্যাটা করে মা।

পারমিতা : বান্টি যার কথা বলছো তিনি তোমার বাবা হন। সম্মান করতে না পারো অসম্মান কোরো না।

বান্টি : অসম্মান করিনি তো। যা সত্যি তাই তো বলছি। আচ্ছা মা একটা কথা বলবে? বাবা একজন সাধারণ মানের সাহিত্যিক। সাংবাদিকতা পেশা।

তো তার জন্যে দুদিন অন্তর তাকে সম্মানিত করতে হবে? মানুষ সব বোঝে মা। কাউকে অত বোকা মনে কোরো না। চাটুকারিতা করে শাল, মানপত্র পাওয়া যায়, সম্মান নয়। আর আমরা কারোর দয়ায় নয় দাক্ষিণ্যে নয়, কারোর আনুগত্যেও নয়, নিজেদের মতো করে নিজেদের যোগ্যতায় আমরা বাঁচতে চাই মা।

পারমিতা : সেটা কি রকম? দাঁড়া এক নিনিট ***(ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে কাজের লোকের উদ্দেশ্যে বলে)*** সন্ধ্যা, সন্ধ্যা ফ্রিজ থেকে গলদা চিংড়ির গামলাটা বার করে রেখো তো, আমি পরে রান্না করবো। তুই শুধু নারকেলটা কুড়ে রাখিস। কি রে শুনলি তো?

নেপথ্যে : ***(মহিলা কণ্ঠ)*** হ্যাঁ মা ।

বান্টি : আর কি, যাও ডিউটি পালন করোগে যাও। যাদের নিজের মতো করে বাঁচার অধিকারটা নেই জাল ফেলে ধরে এনে ফ্রিজে পুড়ে রাখা হয় সময়মতো তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাবার জন্যে। যাও তাদের একটা সদগতি করোগে যাও।

পারমিতা : বান্টি আজকাল সব বিষয়টাই অমন ব্যাঁকা চোখে দেখিস কেনো বলতো?

বান্টি : ব্যাঁকা জিনিসকে সোজা চোখে দেখার অভ্যাসটাই যে রপ্ত করতে পারলাম না মা, কি করবো বলোতো?

পারমিতা : ব্যাঁকা জিনিস মানে?

বান্টি : তুমি তো আবার সব কিছুই সোজা চোখে দেখতে অভ্যস্ত। আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। এই যে গলদা চিংড়ি, ইলিশ মাছ, জলভরা সন্দেশ, সরপুরিয়া, সরভাজা, পূজোর পোষাক ইত্যাদি ইত্যাদি বাবাকে পাঠায়, কারা পাঠায়? কেনো পাঠায়?

পারমিতা : কারা পাঠায় তা তো জানি না। তবে যারা পাঠায় তারা তোর বাবাকে ভালোবাসে। তাই পাঠায়।

বান্টি : আচ্ছা এই ভালোবাসা টালোবাসাটা শুধু মন্ত্রী, আমলা, কিংবা সেলিব্রিটিদের ওপরই থাকে কেনো বলো তো? এদের তো এই সব জিনিস কিনে খাবার ক্ষমতা আছে। যাদের ক্ষমতা নেই তাদের ওপর কারোর একটুও ভালোবাসা থাকেনা কেনো বলোতো?

পারমিতা : তোর সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

বান্টি : আসলে তোমরা না সবসময় সেফ সাইডে থাকতে ভালোবাসো মা।

কোনো দায়ও নেই। দায়িত্বও নেই। ***(এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে)***

বান্টি : দাঁড়াও আমি দেখছি। ***(বান্টি ধরতে যায়)*** হ্যালো কে বলছেন? হ্যাঁ বলুন। আমি বান্টি বলছি। কি বললেন? কখন? মা। রীতামাসীর হাসবেন্ড ....

পারমিতা : রীতামাসীর হাসবেন্ড?

বান্টি : রীতামাসীর হাসবেন্ড মানে অবিনাশ মেসোমশাই আর নেই মা।

পারমিতা : কি বললি বান্টি? অবিনাশদা ? নেই?

বান্টি : না মা। অবিনাশ মোসোমশাই নেই।

(পুরো পরিবেশটাই বদলে যায়। পারমিতা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। বান্টি মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকে। দুজনেই কাঁদতে থাকে। আলো নেভে)

নিখিলেশ : না না বললাম তো ওসব জায়গায় তোমার যাবার দরকার নেই।

পারমিতা : তার মানে? রীতা র এই দুঃসময়ে .....

নিখিলেশ : সো হোয়াট? আর তাছাড়া দুঃসময়ে দাঁড়াবার মতো ওদের আর কেউ নেই নাকি?

পারমিতা : কেউ এর মধ্যে আমি পড়ি না? তুমি পড় না?

নিখিলেশ : না । পড়ি না । আমি অন্তত পড়ি না। দুনিয়া শুদ্ধ মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াবার মতো ইচ্ছে বা সময় কোনোটাই আমার নেই।

পারমিতা : অবিনাশদা তোমার বাল্যবন্ধু নিখিলেশ।

নিখিলেশ : এক স্কুলে পড়লেই কেউ বাল্যবন্ধু হয়ে যায় না পারু।

পারমিতা : কি করলে হয়? একসাথে পার্টিতে গেলে? একসাথে মদের গ্লাসে ঠোক্কর মারলে?

নিখিলেশ : আচ্ছা পারু কি ব্যাপার বলোতো? একটা লোয়ার মিডিলক্লাস পরিবারের সরকারী কেরানীর ওপর তোমার দরদ দেখি উথলে উঠছে।

বান্টি : ***(হাততালি দিতে দিতে প্রবেশ করে)*** চমৎকার। চমৎকার। লোয়ার মিডিলক্লাস পরিবারের সরকারী কেরানী বলে ঘেন্না হচ্ছে? আপনার বাবা মানে আমার মায়ের শ্বশুরমশাই, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে আমার গ্র্যান্ডফাদার লেট নিকুঞ্জবিহারী সেনও তো তাই ছিলেন। সেকথাটাও কি ভুলে গেছেন নাকি মিঃ নিখিলেশ সেন?

নিখিলেশ : দেখেছ? কি তৈরী করেছ মেয়েকে? বাবাকে নাম ধরে ডাকছে।

পারমিতা : বান্টি কি হচ্ছে কি?

নিখিলেশ : যা হবার ছিলো তাই হচ্ছে।

পারমিতা : হবার ছিলো মানে?

নিখিলেশ : সে বোঝার মতো আই কিউ তো তোমার নেই পারু।

বান্টি : প্রশ্নটা এড়িয়ে না গিয়ে উত্তরটা দিন মিঃ সেন।

নিখিলেশ : অতীত আঁকড়ে বসে থাকার মতো মিডলক্লাস সেন্টিমেন্ট আমার নেই।

বান্টি : কি করে থাকবে? বস্তি থেকে ওঠে এসে বস্তির দিকে তাকালে তো হাইরাইজ স্ট্যাটাসের মান থাকে না। তাই না।

নিখিলেশ : ***(পারমিতাকে)*** এতো কথা বলার তো দরকার নেই। আমি যখন বলেছি তুমি ঐ থার্ড-গ্রেডের একটা হাসপাতালে যাবে না, তখন যাবে না। পিল পিল করছে হাভাতের দল। নোংরা পরিবেশ। সেখানে তোমার যাবার দরকার নেই।

পারমিতা : শ্বশুরমশাইয়ের যখন সেরিব্রাল অ্যাটাক হোলো তখন ঐ নোংরা পরিবেশের ঐ হাভাতের দলের মধ্যেই রাতের পর রাত কাটিয়েছ নিখিলেশ। আর তখন তোমার পাশে কেউ ছিলো না। ঐ মিডলক্লাস কেরানী অবিনাশদাই ছিলেন।

নিখিলেশ : আমার প্রেজেন্ট স্ট্যাটাসের কথা মাথায় রেখে কথা বলছো তো পারু?

বান্টি : প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস? সেটা কি খায় না মাথায় দেয়।

পারমিতা : বান্টি ?

বান্টি : দাঁড়াও না মা। ঐ যে মিডলক্লাসের কথা বলছিলেন না মিঃ সেন, আপনি তো তাদের কাঁধে ভর দিয়েই আপনাদের ঐ তথাকথিত সেলিব্রিটি হয়ে ওঠা। ওরা না থাকলে তো আপনাদের কোনো অস্তিত্বই নেই মিঃ সেন। আপনাদের লেখা পড়লে তো মনে হয় আপনারাই মিডলক্লাস আর লোয়ার মিডলক্লাস মানুষদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। মানে এদের সমস্যা, এদের ব্যাথা যন্ত্রণা আপনারা ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

নিখিলেশ : হোয়াট ডাজ ইট মিন ?

বান্টি : আই মিন্ আপনি যতগুলো পুরস্কার পেয়েছেন মানে দেওয়া হয়েছে সে সব উপন্যাসগুলো তো এইসব হাভাতে ঘরের মানুষদের নিয়েই লেখা। তাহলে ধরে নিতে হবে যাদের নিয়ে লিখে পুরস্কার বাগানো যায় তাদের আর যাই হোক বন্ধু ভাবা যায় না। তাই না মিঃ নিখিলেশ সেন?

পারমিতা : বাবার সাথে ওভাবে কথা বলতে নেই বান্টি।

বান্টি : তা কিভাবে কথা বলতে হয় মা? তোমার মতো? চিরদিন একপেশে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়গুলো মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া? একজন হিপোক্রিটের কথায় ওঠবোস করা?

নিখিলেশ : তোমার মেয়েকে চুপ করতে বলো পারু। না হলে?

পারমিতা : না হলে ? না হলে কি করবে তুমি?

নিখিলেশ : মেয়ে বলে ওকে স্পেয়ার করবো না বলে দিলাম।

বান্টি : এইতো আস্তে আস্তে আস্তিনের নীচ থেকে পচাগলা কদাকার শরীরটা

বেড়িয়ে পড়ছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের অনিন্দ্যদের নিয়ে উপন্যাস লিখে সরকারী বেসরকারী খেতাব নেওয়া যায় কিন্তু বিপদের দিনে অনিন্দ্যদের পাশে দাঁড়াতে স্টেটাসে লাগে। এখনতো সরকারী আমলা মন্ত্রীদের বদান্যতায় মুর্হুমুহু উপঢৌকনের ছড়াছড়ি। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক নিখিলেশ সেন আজ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মুখপত্র। গরীব মানুষের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। শিট্। মা আমি বেড়োচ্ছি। তুমি কি যাবে।

পারমিতা : তুইও কি যাবি নাকি বান্টি ?

বান্টি : আমি তো আর সেলিব্রিটি নই। গেলে আমার জাত যাবার ভয় নেই মা।

নিখিলেশ : হোপলেশ্। ***(রেগে প্রস্থান)***

পারমিতা : কিন্তু .....

বান্টি : কিসের কিন্তু মা? রীতামাসী তোমার সুখ দুঃখের সাথী। আর তার স্বামী অবিনাশ মেসো একজন আইডিয়াল মানুষ। যে মানুষটা কোনো কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয়নি। আজ এই দুঃসময়ে যদি তুমি ওদের পাশে না দাঁড়াতে পারো তাহলে কিসের বন্ধুত্ব? মা এইসময় তোমার বন্ধুর পাশে থাকবে না? তুমি এক মিনিট দাঁড়াও আমি রেডি হয়ে আসছি।

পারমিতা : বান্টি আমি বলছিলাম আজ থাক। ঐ ভীরভাট্টা-কান্নাকাটির মধ্যে না গিয়ে আমি বরঞ্চ কালই যাবো। বাড়ীতে।

বান্টি : হুকুম তামিল?

পারমিতা : কেন?

বান্টি : মা হাওড়া স্টেশনে ঢোকার আগে একটা দেওয়ালে একটা লেখা খুব চোখে পড়ে । রোজ । কেউ চুন দিয়ে লিখে রেখেছে। হয়তো পাগল-টাগলই হবে। পাগল না হলে তো সত্যি কথাটা বলা যায়না। তবে জানো, আমার মনে হচ্ছে কথাটা বড় খাঁটি।

পারমিতা : কি কথা?

বান্টি : দাসত্ব আমাদের জন্মগত অধিকার। রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে গেছে আমাদের মনে। শত চেষ্টা করেও ছাড়ানো যাচ্ছে না। ***(হঠাৎ জ্বলে ওঠে)*** তোমাদের দেখলে আমাদের করুণা হয় মা করুণা। বিশ্বাস করো মা করুণা হয়। ***(ছুটে বেড়িয়ে যায়)***

পারমিতা : বান্টি বান্টি শোন শুনে যা .... ***(আলো নেভে)***

নিখিলেশ : ***(বাজতে থাকা টেলিফোন তুলে)*** হ্যালো। হ্যাঁ নিখিলেশ সেন বলছি। হ্যাঁ। কে বলছেন? কোন সংস্থা? প্রয়াস? না না ও রকম কোনো সংস্থার কথা আমার জানা নেই। আচ্ছা আপনাদের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা

ছিলো? ছিলো না? ঠিক আছে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে নিয়ে আসবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া নিখিলেশ সেন কথা বলে না। টাইমটা সেক্রেটারীর কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। সেক্রেটারীর নম্বর? আমার নম্বর যেখানে থেকে পেয়েছেন সেখান থেকেই নিয়ে নেবেন। নমস্কার (***ফোন নামিয়ে রেখে***) রাবিশ্ (***বান্টি হাততালি দিয়ে প্রবেশ করে***) এটা কি হচ্ছে?

বান্টি : বহিঃপ্রকাশ।

নিখিলেশ : বহিঃপ্রকাশ। মানে?

বান্টি : ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

নিখিলেশ : বুঝলাম না।

বান্টি : বুঝতে গেলে যে মনটা থাকা উচিৎ সেটা কি আর আপনার আছে? মে আই হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড?

নিখিলেশ : হেঁয়ালী না করে বলোতো কি বলছো।

বান্টি : আমি তো হেঁয়ালী করিনি। কারণ হেঁয়ালী টেয়ালী আমার আসে না।

নিখিলেশ : হোপলেশ্ (***প্রস্থানোদ্যত***)

বান্টি : ভালোলাগার ব্যাপারটা জেনে যাবে না?

নিখিলেশ : না। প্রয়োজন নেই।

বান্টি : বেশি সময় লাগতো না।

নিখিলেশ : (***ফিরে আসে***) আমার এক মুহুর্ত সময়ের দাম জানো?

বান্টি : এখন কত রেট যাচ্ছে? সময়ের? মানে মেয়ের সাথে কথা বলতে গেলেও রেট কত আপনার?

নিখিলেশ : তুমি আমার সাথে তামাসা করছো?

বান্টি : না। অতটা গভীর সম্পর্ক তো আমাদের নেই।

নিখিলেশ : তুমি কি বলতে চাচ্ছো বলোতো?

বান্টি : বলতে চাইছি নিজের তৈরী সংস্থাটাকেই চিনতে পারলেন না?

নিখিলেশ : নিজের তৈরী সংস্থা? ঐ আজেবাজে সংস্থাটা আমার তৈরী?

বান্টি : অফভিয়াসলি। ঐ আজেবাজে সংস্থাটা আপনার হাতেই তেরী। পঁচিশ বছর আগে।

নিখিলেশ : আমার মনে হয় কোনো সাইকিয়াট্রিকের সাথে কনসাল্ট করার সময় এসে গেছে।

বান্টি : কার? আমার না আপনার মিঃ সেন?

নিখিলেশ : তোমার। আর ইট'স হাই-টাইম টু কনসাল্ট।

বান্টি : আমার তো মনে হয় হাই-টাইমটা আপনার। কারণ ইদানিং পাস্টের কোনো কথাই আপনার মনে থাকছে না।

নিখিলেশ : ***(চিৎকার করে ওঠে)*** স্টপ ইট। আই সে স্টপ ইট। ইউ আর গোইং টু ফার বান্টি। তুমি নিজেকে কি মনে করছো? লায়েক হয়ে গেছো ?

পারমিতা : ***(হন্ত-দন্ত হয়ে প্রবেশ)*** কি হয়েছে? এত চিৎকার চেঁচামেচি কীসের?

নিখিলেশ : তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করো।

পারমিতা : বান্টি কি হয়েছে?

বান্টি : প্রয়াস সংস্থার এবার সিলভার জুবিলী। তাই ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে ওনাকে ইনভাইট্ করতে চাইছিলেন।

পারমিতা : আমি তো জানি তোর বাবা প্রয়াসী বলে একটা পত্রিকা বের করতেন।

বান্টি : সেই পত্রিকার নাম দিয়েই প্রয়াস বলে একটা সাংস্কৃতিক সংস্থাও তৈরী হয়েছিলো। যে সংস্থার প্রথম সম্পাদক তো উনি নিজেই ছিলেন যে কথাটা উনি ভুলে গেছেন । সেই কথাটাই আমি মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম। আর যে চিৎকারটা শুনেছো সেটা হলো এই মনে করিয়ে দেবার রিঅ্যাকশান।

পারমিতা : আচ্ছা তুমি কি দিন দিন বাচ্চা হয়ে যাচ্ছো? এই সামান্য বিষয়টা নিয়ে ..... সত্যি বাবা .....

নিখিলেশ : অ্যাই শোনো। এইসব বাজে কাজে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আর আমি কোথায় যাবো, কোথায় যাবোনা, সেটা কি তোমরা বলে দেবে?

বান্টি : আজেবাজে কাজের জন্যে সংস্থাটা তৈরী করেছিলেন কেন বলুন তো?

নিখিলেশ : তোমার মেয়ে আজকাল আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে শিখেছে পারু।

বান্টি : কৈফিয়ৎ চাওয়া আর জানতে চাওয়া দুটো জিনিস তো এক নয়। যদিও উত্তরটা আমার জানা।

পারমিতা : উত্তরটা তোর জানা?

বান্টি : শুধু আমার কেনো ? উত্তরটা তোমারও জানা।

পারমিতা : বুঝলাম না।

বান্টি : দেখো মা যে সময় প্রয়াস তৈরী হয়েছিলো তখন তো নিখিলেশ সেন সেলিব্রিটি হননি। দু-একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উঠতি লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন বা ছিলেন না। আজে বাজে সময় নষ্ট করার মতো অঢেল সময় হাতে ছিলো । তাই অকাতরে সময় আর পরিশ্রম মেলাতে অসুবিধা হয়নি।

নিখিলেশ : ওরা আমার সেলিব্রিটি ইমেজটা এনক্যাশ করতে চাইছে এটা তোমাদের বোঝা উচিৎ।

পারমিতা : তোমাদের ব্যাপার স্যাপার আমি বুঝিনা বাবা। আমি চলি। আমার

কাজ আছে।

বান্টি : আসলে কি জানো মা এই প্রয়াসের মতো সংগঠনকে কেউ কেউ ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। আর ওপরে ওঠে গিয়েসেটা তারা ভুলে যায়। কিন্তু জানো মা, অবিনাশ মেসোদের মতো কিছু মানুষ আছেন যারা হাজার প্রলোভন ত্যাগ করে প্রয়াসের মতো সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যান। পঞ্চাশ - পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর - পঁচাত্তর থেকে একশোর দিকে । যারা সময়কে টাকার মূল্যে বিচার করেন না।

নিখিলেশ : বড়দের মুখের ওপর কথা বলাটা একটা বদ অভ্যাসের মধ্যে পড়ে বান্টি।

বান্টি : সত্যি কথার তো কোনো বয়স হয় না মিঃ সেন।

নিখিলেশ : বাবাকে মিঃ সেন বলছে । কি তৈরী হয়েছে বোঝো। আদর দিয়ে বাঁদর তৈরী করেছ।

পারমিতা : আদর দিয়ে বাঁদর তৈরী করেছি আমি? ছেলেমেয়েদের কুশিক্ষা সব মায়েরাই দেয় তাই না? আর বাবারা ধোয়া তুলসীপাতা?

বান্টি : তুলসী না মা বিচুটীপাতা।

পারমিতা : বাবাকে বাবা বলতে কি খুব অসুবিধা হচ্ছে বান্টি?

বান্টি : আমি তো আমার বাবার সাথে কথা বলছি না। আমি তো মিঃ নিখিলেশ সেনের সাথে কথা বলছি। আমার বাবা মায়াকোভস্কি পড়েন, গোর্কী পড়েন, গড় গড় করে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাসের কবিতা মুখস্ত বলতে পারেন। শামসুর রহমান, নির্মলেন্দু গুণ কিংবা বীরেন চট্টোপাধায়ের কবিতা আবৃত্তি করেন। উদাত্ত কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর ও আলোর পথযাত্রী কিংবা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের শঙ্খচিল গাইতে পারেন। অসার যুক্তিহীন কথাতো আমার বাবা বলে না। ***(চোখ মুছে বলে)*** যাক আমি বেড়োচ্ছি মা।

পারমিতা : এই অ-বেলায় কোথায় যাচ্ছিস?

বান্টি : বিপদের বেলা অবেলা হয় না মা। আমি রীতা মাসীদের বাড়ী যাচ্ছি। মিষ্টির সাথে একটু দেখা করে আসি। **(প্রস্থান)**

পারমিতা : মেয়ে মেয়ে করলেই হয় না নিখিলেশ। ছেলে মেয়েদের বুঝতে হয়। তাদের কষ্টটা ফিল্ করতে হয়। তাদের ভালোলাগা - মন্দলাগা গুলোকে বুঝতে হয়।

নিখিলেশ : আমি মেয়েকে বুঝি না?

পারমিতা : আগে বুঝতে। এখন বোঝ না। বুঝলে বুঝতে পারতে বান্টি তোমার মধ্যে ওর বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পারলে ওর বাবা হয়ে উঠতে চেষ্টা করো। ***(প্রস্থান)***

(নিখিলেশ চশমাটা পড়ে পারমিমতার চলে যাওয়াটা দেখে। আলো নেভে)

পারমিতা : কি রে এখনো ঘুমোসনি ? এখানে বসে আছিস?

বান্টি : না ঘুম আসছে না মা।

পারমিতা : আমার ওপর রাগ করেছিস?

বান্টি : না।

পারমিতা : ডাইনিং টেবিলে একটু খাবার নাড়াচাড়া করে উঠে এলি? কিচ্ছু তো খেলি না। অত সুন্দর করে চিংড়ির মালাইকারী রাঁধলাম। মুখে দিয়েও দেখলি না।

বান্টি : ওটা খেলে আমার হজম হোতো না মা।

পারমিতা : তোর বাবা কত দুঃখ পেয়েছেন জানিস?

বান্টি : ওনার আবার দুঃখ-টুঃখ হয় নাকি? আমি যতদূর জানি অনুভূতি ব্যাপারটাই ওনার নেই।

পারমিতা : ছিঃ উনি তোর বাবা হন বান্টি।

বান্টি : হতেন, পাস্ট টেন্স।

পারমিতা : ওভাবে বলিস না মা। উনি তোকে কতো ভালোবাসেন জানিস?

বান্টি : কি বললে ? ভালোবাসেন? উনি নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে জানেন?

পারমিতা : ওনাকে তাহলে তুই চিনতেই পারিস নি। উনার ওপরটা ওইরকম। ভেতরটা খুব নরম।

বান্টি : তাই? বুকে একটু লিখে ঝুলিয়ে রাখতে বোলো। নাহলে তো বোঝার উপায় নেই।

পারমিতা : তুই আজকাল বড্ড ফেমিনিষ্টদের মতো কথা বলিস।

বান্টি : ফেমিনিষ্ট? আমি? আমাদের সংগঠনে কত ছেলে আছে জানো?

পারমিতা : সংগঠনে? মানে? তুই আজকাল রাজনীতি করছিস নাকি?

বান্টি : সত্যি কথা বলা যদি রাজনীতি করা হয় তাহলে করছি। তবে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। আমাদের সংগঠনের নাম খোলা জানালা। যেখানে কেউ কারোর ওপর খবরদারী করে না। একবুক খোলা আকাশের মতো স্বাধীন। নিজেই নিজের মালিক।

পারমিতা : এ পৃথিবীতে সত্যিই কি কারোর নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার আছে? প্রতি পলে পলেই তো নিজেকে বিসর্জন দিতে হয়। আইনের শাসন, সমাজের শাসন, পরিবারের শাসন, সর্বোপরি নিজের অভ্যাসের শাসন।

বান্টি : সেই অভ্যাসের শাসনটাকেই বদলাতে হবে। পচাগলা ধ্যান-ধারণা

গুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে মা।

পারমিতা : নতুন পৃথিবী? ***(দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে)*** নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নতো আমরাও দেখতাম।

বান্টি : নতুন পৃথিবী, যে পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষ হবে নিজেই নিজের মালিক। জাত-পাত, ধর্ম বর্ণ, উঁচু নীচু বলে কিছু থাকবে না। শুধু থাকবে ভালোবাসা আর একের প্রতি আর একজনের বিশ্বাস। একজনের সাথে আর একজনের একটাই পরিচয় থাকবে বন্ধু। হ্যাঁ মা ব-ন-ধু।

পারমিতা : যুগে যুগে তো এই চলে আসছে রে মা। কয়েকজন তাদের ধ্যানধারণা আর বিশ্বাস থেকে মশাল জ্বালিয়ে ডাক দেয় এসো, সবাই চলে এসো, আমাদের আলোর পথ চেনো। দেখো আমরা পচা পুরোণো পৃথিবীটাকে আমূল বদলে ফেলে নতুন পৃথিবী গড়বো। যেখানে কারোর কোনো অভাব থাকবে না, দুঃখ থাকবে না। সবাই সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। কখনো ধর্মের জিগিরে আবার কখনো কোনো রঙিন মতবাদ দিয়ে। ভাঙ্গাচোরা মানুষদের এ স্বপ্ন দেখানো তো চলছেই। এর জন্য কতো না মূল্য দিতে হয়েছে, দিতে হচ্ছে। রক্তের বন্যায় ভেসে যায় পদ্মা, গঙ্গা বা ভল্গা বা মিসিসিপি। মানুষ রক্তের বিনিময়ে মুক্তি কেনার দুরন্ত নেশায় মেতে ওঠে। কখনো সফল হয় আবার কখনো সময় বদলায়, দিন বদলায়, কিন্তু পৃথিবী বদলায় না।

বান্টি : তোমার সেই দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ছে তাই না? সেই সব কথা যেখানে দুঃখ-দুর্দশা অভাব অনটনকে অগ্রাহ্য করে একে অন্যের হাতে ধরাধরি করে হেঁটে এসেছো অনেক পথ।

পারমিতা : জানিস সেই সব দিনে আমাদের পথ চলার সামনের সারিতে থাকতো তোর বাবা। গলায় সলিল চৌধুরী কিংবা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান।

বান্টি : সেই মানুষটা কোথায় হারিয়ে গেলো মা? মানুষ এতো বদলায়? বদলাতে পারে?

পারমিতা : সময় মানুষকে বদলে দেয় রে মা।

বান্টি : তাহলে অবিনাশ মেসোদের মতো মানুষরা? তারা তো বদলাননি? আসলে লোভ বোধহয় মানুষকে বদলে দেয়।

পারমিতা : হয়তো । এক এক সময় কি ভাবি জানিস?

বান্টি : কি?

পারমিতা : ভাবি আমরা তখন গরীব ছিলাম? না আজ গরীব হয়েছি?

বান্টি : মা তুমি শুতে যাবে না? কত রাত হলো খেয়াল আছে?

পারমিতা : আমার ঘুম আসছে না।

বান্টি : রীতা মাসীর কথা ভাবছো তাই না মা?

পারমিতা : হ্যাঁ কি যে হয়ে গেলো। সংসারটা ওলোটপালোট হয়ে গেলো। কিভাবে যে চলবে ওদের।

বান্টি : কোনোকিছুর জন্যে কিছু আটকে থাকেনা মা। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

পারমিতা : তোকে নিয়েও বড় চিন্তা হয় মা।

বান্টি : আমাকে নিয়ে? কেন আমি কি সন্ত্রাসবাদী দল করছি ? না ড্রাগের নেশা করছি?

পারমিতা : সবসময় মনে হয় তুই কোনো ভুল করছিস না তো? কোনো কিছুতে ঠকে যাবি না তো?

বান্টি : আচ্ছা মা তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

পারমিতা : মা হয়ে মেয়েকে বিশ্বাস করবো না?কি যা বলিস না।

বান্টি : তবে?

পারমিতা : তবু মায়ের মন তো। তুই যখন মা হবি তখন বুঝবি। চারিদিকে যা ঘটছে। শুনলে গা শিউরে ওঠে।

বান্টি : তুমি শুতে গেলে ? খালি আজে বাজে চিন্তা। ওঠো তো। ***(মাকে ধরে তুলে দিতে চেষ্টা করে এমন সময় ফোনের রিং বেজে ওঠে)***

পারমিতা : এতোরাতে আবার কে ফোন করল? রীতার কিছু হোলো না তো?

বান্টি : দাঁড়াও দেখছি। (রিসিভার তোলে) হ্যালো? হ্যাঁ। বান্টি বলছি। তুমি কে বলছো? সুমি? এতো রাতে কি ব্যাপার? কোথা থেকে ফোন করছিস? আমাদের ফ্ল্যাটের নীচ থেকে? কেন? কি হয়েছে বলবি তো? কি? কি বলছিস? কখন? কি করে?

পারমিতা : কি হয়েছে?

বান্টি : শ্রীলেখা আর অয়নদা গাড়ী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে মা। ***(হাউ হাউ করে কেঁদে বলে)***

পারমিতা : কেন? কি ভাবে?

বান্টি : ওরা দুজনে প্রোগ্রাম করে ফিরছিলো । উল্টোদিক থেকে একটা টাটা ৪০৭ এসে.... (হাউ হাউ করে কেঁদে) ওরা ফ্ল্যাটের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে যেতে হবে মা।

বান্টি : তালা খুলে দাও।

নিখিলেশ : এত রাতে কোথাও বেড়োতে হবে না।

বান্টি : আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আবার বলছি তালাটা খুলে দাও।

নিখিলেশ : একবার বললে শুনতে পাও না ? যাও ঘরে যাও। কত রাত হয়েছে খেয়াল আছে?

বান্টি : রাত দেড়টা। আমার বন্ধুর এক্সিডেন্ট হয়েছে। যত রাতই হোক আমাকে যেতে হবে। চাবিটা দাও।

নিখিলেশ : কতবার বলবো দেবো না।

বান্টি : দেরী হয়ে গেলে দেখতে পাবো না। বন্ধুরা নীচে ওয়েট করছে।

নিখিলেশ : চলে যেতে বলো। আর বলে দাও এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। রাতবিরেতে ভদ্রবাড়ীর মেয়েরা রাস্তায় বেড়োয় না।

বান্টি : ওরা আমার বন্ধু।

নিখিলেশ : বন্ধু না কি সেটা কোর্টেই প্রমাণ হবে। এক্ষনি চলে না গেলে আমি ওদের পুলিশে দেবো। বেলেল্লাপনা আমি বরদাস্ত করবো না।

বান্টি : চাবি দেবে না চিৎকার করবো?

নিখিলেশ : তুমি কি আমাকে শাসাচ্ছো? আমি জানতে চাই তুমি ঘরে যাবে কিনা? ***(পারমিতার প্রবেশ)***

পারমিতা : এত রাতে লোক না হাসালে চলছে না?

নিখিলেশ : আমি লোক হাসাচ্ছি? না তোমার মেয়ে?

পারমিতা : মেয়েটা তো তোমারও।

নিখিলেশ : সেই জন্যেই তো ঘরে যেতে বলছি।

বান্টি : মা গো তুমি দরজা খুলে দাও না।ওরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বলোতো ? বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

পারমিতা : চাবিটা দাও।

নিখিলেশ : মানে?

পারমিতা : গেটের চাবিটা দিতে বলছি।

নিখিলেশ : গেটের চাবি দিয়ে তুমি কি করবে?

পারমিতা : প্রশ্ন না করে যেটা বললাম সেটা করো, চাবিটা দাও।

নিখিলেশ : তার মানে ? তুমি কি করতে চাও?

পারমিতা : বললাম না গেটের চাবিটা দাও ***(নিখিলেশের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে বেড়িয়ে যায়)***

নিখিলেশ : কাজটা ভালো হচ্ছে না পারু। আমি কিন্তু বারণ করছি। গেটটা খুলো না। পারু তুমি গেট খুলো না।

পারমিতা : ***(প্রবেশ করে)*** কিরে তোর না দেরী হয়ে যাচ্ছে? ওরা নীচে অপেক্ষা করছে বান্টি। যা আর দেরী করিস না। ***(বান্টি অবাক হয়ে মার কাছে***

এগিয়ে আসে) যা মা তাড়াতাড়ি যা। ***(মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়) সাবধানে যাস। (বান্টি দ্রুত প্রস্থান করতে গিয়েও বাবার কথায় থেমে যায়)***

নিখিলেশ : এটা কিন্তু ঠিক করলে না। আস্কারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলেছো। এর ফল একদিন বুঝবে। শোন তোমার মেয়েকে বলে দিও, ও যেন নিখিলেশ সেনের বাড়ীতে আর না ঢোকে।
(প্রস্থানোদ্যত)

পারমিতা : ওকে বলার আগে তো তাহলে নিজেকেই বলতে হয়। কারণ গেটটা তো আমিই খুলে দিয়েছি। হ্যাঁরে মা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? যাবি না? ওরা দাঁড়িয়ে আছে যে।

বান্টি : থ্যাংক ইউ মা, থ্যাংক ইউ। ***(চোখ মুছতে মুছতে প্রস্থান)***

নিখিলেশ : এত রাতে মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিলে? তুমি না মা? ওর নিরাপত্তাটার কথা একবারও ভাবলে না?

পারমিতা : মেয়ের নিরাপত্তার কথা মায়েরাই ভাববে কেনো বলতে পারো? হাই-প্রোফাইল সেলিব্রিটি হয়েছ, এত বড় বড় মানুষের সাথে ওঠাবসা। তোমাদের মনে হয় না এ বিষয়টা নিয়ে তোমাদেরও ভাবা দরকার? প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মেয়েরা যাতে নিশ্চিন্তে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা তোমাদেরও দায়িত্ব মনে হয় না ? মনে হলে কিছু করো, না হলে এসির সুইচটাকে বাড়িয়ে দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাওগে যাও। আর মেয়ের ভাবনাটা মেয়েকেই ভাবতে দাও। না হলে ঐ শাসনের কোনো মূল্য পাবে না। আর যদি তোমার মনে হয় মেয়েটার সাথে থাকা দরকার তাহলে বুকনি না মেরে এগিয়ে দেখো। শুধু শাসন না করে সোহাগ করতে শেখো।আমি শুতে গেলাম। ***(প্রস্থানোদ্যত)***

নিখিলেশ : পারু।

পারমিতা : কিছু বললে?

নিখিলেশ : বলছিলাম গাড়ীর চাবিটা একটু এনে দেবে?

পারমিতা : ঐতো টেবিলের এপরই তো রয়েছে।

নিখিলেশ : দাও না।

পারমিতা : ***(চাবিটা ছুড়ে দিয়ে)*** এই নাও। ***(চাবিটা নিখিলেশ লুফে নেয়)***

পর্দা

বঙ্কিমচন্দ্র'র 'বিড়াল' অবলম্বনে

আচমন

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র : কমলাকান্ত, নশীবাবু, গিন্নী,মধু, পূজারী, কবিরাজ, (নশীবাবুর বৈঠকখানা। ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন নশীবাবু। পাশে হুঁকো হাতে নিয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল কমলাকান্ত। একটি সেজল্যাম্পের আলো ঘরটি মৃদু আলোকিত। আলো-আঁধারি পরিবেশ। দেয়ালে আসবাবপত্রর ছায়ায় রহস্যময়তা। নেপথ্যে সন্ধ্যারতির ঘন্টাধ্বনি অস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।)

কমলাকান্ত : (খুব জোরে হুঁকোয় টান দিয়ে) আ: !! (আরামসূচক শব্দ করে) আচ্ছা কত্তাবাবু —

নশী : হুঁ! (গড়গড়ায় ধূমপান করতে থাকে আর ঝিমায়)

কমলা : এ্যাতো মধুর লাগে কেন?

নশী : কি?

কমলা : এই আফিঙ সেবন।

নশী : সবই নেশার কারসাজি।

কমলা : কি রকম?

নশী : গঞ্জিকা সেবনে চিত্ত স্থির, তা দেখে অন্যের চক্ষু স্থির—কেন জানো?

কমলা : কেন?

নশী : এই নেশায় সগ্গে যাবার গুপ্ত পথের সন্ধান মেলে।

কমলা : তাই?

নশী : সেজন্যই ত চারধারে শুধু নেশা আর নেশা। বুঝলে কমলাকান্ত— এ জগৎ নেশাময়।

কমলা : তাহলে ঐ নেশার ঘোরেই, ঐ কন্সটেবল ব্যাটা দিব্যি রুল ঘোরাচ্ছে, আর মুখ ভেংচাচ্ছে।

নশী : ওরও কী আমাদের মতো আফিমের নেশা?

কমলা : এই আফিমের মতোই ঘুমের নেশা। সে নেশায় চোখ রাঙায়, ভয় দেখায়।

নশী : কিন্তু ভয় দেখানো ত ওর কাজ নয়। এর কাজ হল ভয় ভাঙানো।

কমলা : আসলে নেশাখোরদের যা স্বভাব।

নশী : কি স্বভাব?

কমলা : ভয় পায়, ভয় দেখায় এবং ভয় ভাঙায়। আর সে কারনেই ফাটকে পুরে

দেয়।

নশী : ফাটক কেন?

কমালা : ফাটকের পরের ইষ্টিশন হল এজলাসের কাঠগড়া।

নশী : ঐ কাঠগড়ায় তোলার পর কি হল, সেটা বলো।

কমলা : তারপর এক শামলাওয়ালা— পাকাঠির মতো শরীর নাচিয়ে নেশার ঘোরে গরগর করে কি যেন বললো। আর এরপরই বিপত্তিটা ঘটল।

নশী : বিপত্তি?

কমলা : আমি যতো বলি— পরমেশ্বর কি, তা জানি না। ঐ মাতাল মুহুরি ততো বলে — তামাশা না করে হলপনামা পড়।

নশী : ঠিকই বলেছে। ওটাই ত আদালতের নিয়ম।

কমলা : তাহলে বলছেন— ভগবানের নামে শপথ নিয়ে, ভুরি ভুরি মিথ্যে বলাটাই আদালতের আইনি নেশা?

নশী : আরে বাপু— ঐ নেশাটাই ত ওখানকার পেশা।

কমলা : আর সে পেশায় আইনের আফিম সেবন এমনটাই মাত্রা ছাড়ায়, ব্যাটারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে।

নশী : সেজন্যই আদালতে মাতালরা সব সময় গো-বধের আনন্দে দিব্যি মেতে থাকে।

কমলা : তাহলে সেই আনন্দে কোন ধর্মাবতার যদি কখনো অধর্মবতার হয়ে পড়েন, তখন তার বিচার করবে কোন অবতার?

নশী : শোন হে কমলাকান্ত! আদালতজীবীকে নানা উপলক্ষে নানা ধরণের পুজো অর্চনা করতে হয়। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভের জন্য বিশেষ সম্ভ্রমের আসন পেতে দিতে হয়। এরাই এখন পূজ্য দেবতা। সিদ্ধিদাতা গণেশের যা কিছু পাওনা ছিল, এখন এরাই সেটা পেয়ে থাকে। (বাড়ীর চাকর মধুর প্রবেশ)

মধু : বাবু !

নশী : কে?

মধু : মা ঠাকরুন আপনাকে ডাকতেছেন।

নশী : কেন রে?

মধু : পুরুতঠাকুর এয়েচেন।

কমলা : (চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে উচ্ছ্বাসে) পেয়েছি কত্তাবাবু! পেয়েছি।

নশী : কি পেয়েছ?

কমলা : আর এক নেশার পেশা। পুরুত মশায়ের পুজোর নেশা।

নশী : বলো - বলো, সেটা আগে বলো। আমার মন এখন তোমার ঐ নেশার

গপ্পে মজে রয়েছে।

কমলা : কিন্তু এই হতভাগাটা কেমন হাঁ করে গিলছে দেখুন।

নশী : (ধমকে) এই ভাগ, ভাগ এখান থেকে, ভাগ বলছি—
(থতমত মধুর প্রস্থান ভিতরে) হ্যাঁ এবার বলো।

কমলা : কি বলবো?

নশী : ঐ যে বললে — পুরুতের নেশা।

কমলা : পুরুতের একটাই নেশা— ধম্মের নামে লোক ঠকানোর পেশা।

নশী : তাহলে বলচ— ধম্মটা ওর কাছে আফিম।

কমলা : অবশ্যই। ঐ নেশায় উনি যেমন সব সময় বুঁদ হয়ে থাকেন, তেমনই অন্যদেরও বুঁদ করে রাখতে চান। (গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী : ওগো শুনছ?

নশী : কি ব্যাপার গিন্নী?

গিন্নী : (ঝাঁঝিয়ে ওঠে) তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু।

নশী : আহা গিন্নী! অতো চটছো কেন?

গিন্নী : পুরুতমশায়কে বসিয়ে রেখেছি।

নশী : সে বসে থাকবে না দাঁড়িয়ে থাকবে, তা জেনে আমি কি করব?

গিন্নী : কি করবো মানে? কেন তুমি জানো না? আজ সকালে অত কথা হলো।

নশী : কি কথা বলতো।

গিন্নী : নেশাটা মনে হচ্ছে আজ একেবারে সপ্তমে চড়িয়েছ?

কমলা : একদম ঠিক বলেচে। গপ্পের নেশা যখন উড়ে এসে জুড়ে বসে—

গিন্নী : (ধমকায়, এরা চমকায়) তুমি থামো। যত্তসব আফিমখোর এখানে জুটেছে ।

নশী : তোমার গলাটা বড্ড কর্কশ লাগছে কেন গিন্নী?

গিন্নী : ডাব ঝুনো হলে জলে মিষ্টতা কমে।

নশী : তা যা বলেছো বটে।

কমলা : আসলে নতুন বউ হল কচি ডাব। আর—

গিন্নী : (চেঁচিয়ে ওঠে) চোপ! একদম চুপ! এই লোকটাকে এতখানি মাথায় তুলেছ, যা খুশি তাই বলছে।
(কমলা ও নশী দুজনেই ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে চুপ থাকার ভঙ্গিমা করে)

নশী : এই কমলাকান্ত মুখে কুলুপ এঁটে থাক।

কমলা : কেন কত্তা?

নশী : তুমি আমার পোষ্য বটে। কিন্তু গৃহিনীর সেটা নিতান্ত অপছন্দ।

কমলা : কিন্তু আমি যে নিরুপায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে, এমনিতেই আমার মতো

নিষ্কর্মার দু-মুঠো জোটানো খুবই মুশ্‌কিল। তাছাড়া আপনার দৌলতে এই নেশার আসর— এ যে কি সুখ—

গিন্নী : নেশা করতে তোমার লজ্জা করে না? (নশী দুজনের কথায় সায় দিয়ে অভিব্যক্তি জানায়)

কমলা : লজ্জা! কি যে বলেন! আমার ত রীতিমত গর্ব হয়।

গিন্নী : গর্ব হয়?

কমলা : অবশ্যই কেন হবে না। চন্ডুখোর বাঙালির চন্ডুমন্ডু কী ভাবে চন্ডীমন্ডপ হয়েছে, তা জানেন? (নশী হাসে)

গিন্নী : তার মানে?

কমলা : ভেবে দেখুন মা— দেশে বিদেশে চন্ডুর এমনই দর, প্রিন্স দ্বারকানাথ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অহিফেন বিভাগের দেওয়ানী লাভ করার জন্য রীতিমত দরবার করেছেন।

নশী : তাহলে? এবার বলো। উত্তর দাও— আমার কমলাকান্ত এবার যে মোক্ষম চালটা দিয়েছে—

গিন্নী : ও এসব কি বলছে? আমি ত মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

নশী : পারবে কি করে? চন্ডুখোর না হলে চন্ডেশ্বরের মাহাত্ম্য বোঝা অসম্ভব।

কমলা : তাছাড়া অন্দরমহলে যারা সুফলা, বাইরে তাঁরা নিষ্ফলা।

গিন্নী : কি বললে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা— আমি নিষ্ফলা? (কোমরে আঁচল জড়ায়) তোমার সাহস ত কম নয়—

নশী : একি অশান্তি বাধালে কমলা?

কমলা : আজ্ঞে আমি নই। আপনার আপত্তিকারিনী স্ত্রী।

নশী : (জোরে ধমকায়) চোপ! (ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে) এক্কেবারে চুপ থাক। যেখানে সুবিধা ভোগ করো, সেখানে মুখে কুলুপ এ্যাঁটে থাকবে, বুঝেছো?

কমলা : বুঝলাম। আপনিও তাহলে নীরবতার ষড়যন্ত্রে সামিল করছেন।

নশী : কেন করছি? তোমার স্বার্থে ওটাই এখন প্রয়োজন। তাই গৃহবিবাদ এড়াতে আমিও নির্বাক থাকবো।

কমলা : আসলে এটাই আপনার ভবিতব্য।

নশী : একথা বলছ কেন?

কমলা : কেন আপনি জানেন না? গিন্নী যখন মোড়ল, কর্তা তখন গাঁড়ল।

গিন্নী : কথাটা শুনলে?

নশী : ও কি কিছু ভুল বলেছে গিন্নী? (হাতটা টেনে ধরতে চায় দু-হাতে)

গিন্নী : (ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে) আ মরণ! কতো ঢং— হুঁ! (ঘোমটা টেনে দ্রুত

ভিতরে প্রস্থান)

নশী : *(খুক খুক্ করে হেসে ওঠে)* তুমি যাই বলো কমলাকান্ত—আমার গিন্নীর গৃহিনীপনা বেশ রসালো বটে।

কমলা : কিন্তু কত্তামশায়— দাঁত যে ওখানে বসে না।

নশী : *(অট্টহাসি হাসতে থাকে)* হাঃ— হাঃ— হাঃ—

('নসি' 'নসি'— ডাকতে ডাকতে পূজারীর প্রবেশ। গিন্নী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে নজর রাখে, উঁকি মেরে দেখে। নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে)

পূজারী : কি ব্যাপার নসি — এমন অট্টহাসি?

নশী : আমি খুশী ঠাকুরমশায়। বড্ড খুশী।

পূজারী : ভাল ভাল, সেটা ত খুবই ভাল। দাও। এবার তোমার হাতটা দাও।

নশী : হাত?

পূজারী : হ্যাঁ, তোমার হাতটা এখন দেখবো। কদিন ধরেই বৌমা বলছে—ইদানিং যা সব ঘটছে– (কথা বলতে বলতে ঝোলা থেকে একটা কাঁচের লেন্স বার করে)

নশী : কি ঘটছে?

পূজারী : চারধারে ভূত-প্রেতের তাণ্ডব বেড়েই চলেছে।

নশী : তাহলে কি দেবতাদের চন্ডনীতি ব্যর্থ হচ্ছে?

পূজারী : তা নয়। আসলে সুর-অসুর উভয়েরই মাথায় দেবতার প্রতিনিধি কোন না কোন মুনি-ঋষি *(নশীর হাতটা টেনে নেয় ও মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে)*

নশী : যেমন?

পূজারী : যেমন শুক্রাচার্য দৈত্যগুরু, তেমনই বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। কাজেই সুর-অসুর উভয়েরই সমাজে প্রভাব আছে, থাকবে। তাই অসুরের প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রনে চন্ডিকার আরাধনায় চন্ডবিক্রম অর্জনই চন্ডনীতি।

কমলা : ঐ চন্ডনীতি বর্তমানে চন্ডুবিক্রমে পরিণত হয়েছে।

(পূজারী হাত দেখায় ব্যস্ত থাকায় কমলার 'চন্ড' আর 'চন্ডু'র পার্থক্য খেয়াল করে না)

পূজারী : *(ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোমটায় মুখ ঢাকা গিন্নীর দিকে তাকিয়ে নেয়, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলে—)* হুঁ! খুবই সাংঘাতিক *(কমলাকান্তের ঝিমুনি লক্ষ্য করে পূজারী)*।

কমলা : কে?

পূজারী : শনি

নশী : এ্যাঁ!!

পূজারী : হ্যাঁ, আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

গিন্নী : সে কি *(ঘরের ভিতরে এক কদম এগিয়ে আসে)*

পূজারী : হ্যাঁ, হাত জুড়েই দেখছি, ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন—

কমলা : ফুটে বেরুচ্ছে। *(পূজারী কমলাকে এক নজর দেখে নেয়)*

পূজারী : তবে বৃহস্পতি একটু সহায় থাকলে বড়োসড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা এড়ানো যায়।

গিন্নী : কিন্তু ছোটখাটো ত হতে পারে।

পূজারী : তা অবশ্য

গিন্নী : তাহলে উপায়?

পূজারী : চিন্তার কোন কারণ নেই। কালই একটা মাদুলি দিয়ে যাবো। ওটা ধারণ করলেই বৃহস্পতি জাগ্রত হবে।।

গিন্নী : যেটা ভালো হয় সেটাই করুন

পূজারী : সেজন্যই ত তোমায় বলছি—সামনের মাসে একটা ভালো দিন দেখে বাড়ীতে শান্তি স্বস্তয়নটা করিয়ে দেব, তাহলেই পরিবেশ আসুরিক দোষমুক্ত হবে। সকলের মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে সংসার।

কমলা : *(সোৎসাহে)* কত্তাবাবু ! খেয়াল করুন — কি বলেছিলুম? নেশা। নেশা যার পেশা, মেজাজটি তার খাসা।

পূজারী : *(একটু হকচকিয়ে)* কি বলছে?

গিন্নী : ছাড়ুন ত ওর কথা।

নশী : হ্যাঁ, ছাড়ুন। ওর কথার কোন ছিরি আছে?

গিন্নী : ঠিকই। যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সেটাই তাড়াতাড়ি করুন ঠাকুরমশায়।

পূজারী : করবো বৈ কি। নিশ্চয়ই করব। কিন্তু নসি! শান্তি স্বস্তয়ন ত আর রোজকার পুজো-অর্চনা নয়। একসঙ্গে এক ডজন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বিশাল যাগযজ্ঞের আয়োজন। মানেই বুঝতে পারছো— যথেষ্ট খরচপত্তর।

নশী : খরচ নিয়ে আপনি ভাববেন না।

গিন্নী : তাহলে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলুন।

পূজারী : ঠিক আছে। দু-এক দিনের মধ্যে ফর্দটাও ঠিক করে দেব।

গিন্নী : বেশ। *(গিন্নী ঘোমটা টেনে ভিতরে চলে যায়)।*

কমলা : ঠাকুরমশায়! আমার হাতটা যদি একবার দেখেন—

পূজারী : তোর হাত দেখে কি হবে? নসির ভাগ্যে তোরও পুন্যি।

নশী : *(হেসে ওঠে)* ঠিক বলেছেন।

কমলা : আসলে আমি হলুম ধানগাছ। ঠাঁইনাড়া করে রোপন না করলে ফসল হয় না, বুঝেছেন?

নশী : বুঝলেন— এমন উজবুক আত্মঘাতী আমি দুটি দেখিনি।

কমলা : এটা মূলত আমার জাতের দোষ।

পূজারী : তার মানে?

কমলা : বাঙালি চিরকালই কোন না কোন নেশায় আত্মঘাতী।

পূজারী : তাবর তাঁতী গোবর খায়, পরের কথায়া মরতে যায়।

কমলা : হয়তো সেটাই। তবে—

পূজারী : এসব আঁটি চোষা কথা হল গিয়ে, সত্যিটাকে পাশ কাটাবার ফন্দিফিকির। তা হলে কমলাকান্ত! তুমি কমলা না অবলা, কোনটা?
(নশীও পূজারীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে)

নশী : একেবারে ঠিক কথা বলেছেন পুরুত মশায়। একটু আগেই এখানে এই কমলাকান্তর চিলচিৎকারে ভূমিকম্প। আর এখন দেখুন— পাতি শেয়ালের হুক্কা হুয়া। এ ব্যাটা তাহলে আসলে কি?

পূজারী : কি আর বলবো— যার নেশায় বুক ফাটে, কুকুরে তার মুখ চাটে।

কমলা : তা এই অধমকে পরিত্রাণের একটা উপায় যদি বাৎলে দেন—

পূজারী : কান্ডজ্ঞান বাড়াও হে! শুনে রাখো— ন্যাকা, বোকা আর ঢলঢলে কাছা— এই তিনে কেউ প্রত্যয় করে না বাছা।

কমলা : তাই?

পূজারী : এ হল শাস্ত্রের বচন। তাই কালো বামুন, কটা শূদ্র আর ঘরজামাই-পোষ্যপুত্র— এরা সমান।

কমলা : তাহলে উকিলের গায়ে যে ঢলঢলে পোষাকটা থাকে—সেটা ত শুধু কালো নয়, ঘোর কালো, কিন্তু কেন?

পূজারী : এতো দেখছি আচ্ছা আহাম্মক।

কমলা : আর আপনি? আপনি আসলে কি, তা জানেন?

পূজারী : কি বলতে চাও তুমি? *(ক্ষুব্ধ পূজারীর স্বর গম্ভীর)*

কমলা : জজ সাহেবের হাতে যে গুপিযন্ত্রটা থাকে, আপনি হচ্ছেন ঠিক সেইরকম।

পূজারী : কি ব্যাপার নশী? *(নাকে নস্যি নেয়)* তোমার কমলাকান্ত দেখছি— দু-দিন জেল খেটেই আইন নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিয়েছে।

কমলা : আইন! ওটা ত মস্তবড় তামাশা মাত্র। বড়লোকেরা পয়সা খরচ করে, সে তামাশা দেখে। তাবলে আমার সে সুযোগ কোথায়?

(চাকর মধুর প্রবেশ। হাতে এক গ্লাস দুধ। পুরুতকে দেয়। পুরুত গ্লাসটা নিয়ে গন্ধ শোঁকে)

পূজারী : আঃ! বুঝলে নশী! একেই বলে নেশা। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর তোমার বাড়িতে এই দুধ খাওয়ার নেশা আমায় রীতিমত পেয়ে বসেছে।

কমলা : (হাততালি দেয়) তাহলে কত্তাবাবুর বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় আফিমের নেশায় যেভাবে বুঁদ হয়ে থাকি, সেটা কি তবে মঙ্গল না অমঙ্গল?

পূজারী : *(কটমট করে কমলাকে দেখে। কিন্তু কিছু বলতে গিয়েও বলে না। চুমুক দিয়ে পুরো দুধটাই খেয়ে নেয়। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে মধুর হাতে গ্লাসটা দেয়। মধু ভিতরে প্রস্থান করে)* সত্যি নশী! গাই বটে তোমার শ্যামলী। আহা! দুধ তো নয়, যেন বটের আঁঠা। ওঃ! যেমন স্বাদ, তেমন গন্ধ। একেবারে মাতাল করে দেয়।

নশী : আমার সৌভাগ্য।

পূজারী : কিন্তু আমার গিন্নীর বড় দুর্ভাগ্য।

নশী : কেনো?

পূজারী : জানেনেই ত— সে বেচারি বড় রুগ্ন। সেজন্য কোবরেজ মশায়ের নির্দেশ রাখতে খাটালের জল খাওয়াচ্ছি।

নশী : কাল থেকে এক গ্লাস দুধ ওনার জন্য নিয়ে যাবেন।

পূজারী : এটা কি বলছো বাবা?

নশী : যা বলছি, সেটাই সত্যি। এই নির্দেশের অন্যথা হবে না।

পূজারী : ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। *(কমলা ঢেঁকুর তোলে, হেঁচকি তুলতে থাকে হঠাৎ)* কি হল কমলাকান্ত? ঝিমোচ্ছ, আবার ঢেঁকুর তুলছ?

কমলা : নেশা। আপনার যেমন দুধের নেশা, আমার তেমনি আফিমের নেশা।

পূজারী : বেশ ভালোই আছো হে! যত্রতত্র বিনিপয়সায় ভোজন, আর নসির এই বৈঠকখানায় দিব্যি আরামের শয়ন।

কমলা : বাড়তি পাওনা আপনার এই শ্রীচরণ দর্শন। *(যাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে এবং পূজারীর দু-পা আঁকড়ে ধরে)*

পূজারী : এই! এই হারামজাদা! কি হচ্ছে এটা? ছাড়, ছাড় বলছি— ধ্যাৎ— ধুত্তোরি, আরে কি মুশকিল! পায়ে সুরসুরি লাগছে।

(পুরুত যত পেছোয়, কমলা তত এগোয় হামাগুড়ি দিতে দিতে। পূজারী তারপর কমলাকান্তকে গালিগালাজ করতে করতে প্রস্থান করে। কমলা হা হা করে হেসে ওঠে। নশী ধমকে থামায়।)

নশী : থাম্ হতচ্ছারা। নেশার আমেজটা সবে মাথায় চড়ে বসেছে— অমনি তার পিণ্ডিটা চটকে দিল হতভাগা।

কমলা : আজ্ঞে— আপনার পুরুত মশায় , যতো নষ্টের গোড়া

নশী : *(ধমকায়)* চোপ্! *(মুখে আঙ্গুল ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে)* চু-উ-উ-প!

কমলা : বাব্বা! কি মেজাজ! আপনিত দেখছি— নেপোলিয়ান বনে গেছেন।

নশী : তাহলে বলছিস— এবার আমিও ওয়াটারলু জিততে পারি?

কমলা : অবশ্যই। সেজন্য এই আফিম অস্ত্রে এবার নিজেকে সুসজ্জিত করুন।

নশী : ঠিক বলেছিস। *(আফিম নেয়)*

কমলা : বুঝলেন কত্তাবাবু! আফিমের নেশা আর গল্পের নেশা— এ দুটো যদি এক সঙ্গে জুটে যায়—

নশী : আজ তাহলে সেটাই হোক না।

কমলা : সেজন্য দরকার কড়া আফিম আর রগরগে গল্প।

নশী : তাহলে কমলা, আফিম আমার, আর গল্প তোমার। কেমন? নাও শুরু করো। বেশ রসিয়ে জমিয়ে দাও ত। দেখি তোমার মুরোদ!
(নেপথ্যে 'ধর' 'ধর', 'মার' 'মার' হৈ হল্লা, চিৎকার-চেঁচামেচি ও ছুটোছুটির আওয়াজ শোনা যায়— নেশায় আচ্ছন্ন ওদেরও একটু ঘোর ভাঙ্গে)

নশী : কি ব্যাপার, শোরগোল কীসের?

কমলা : মনে হচ্ছে চোর ঢুকেছে।

নশী : কি বললে? চোর?
(নশী ঘরময় ছুটোছুটি করতে করতে 'চোর' 'চোর' বলে চেল্লায়, নশীর দেখাদেখি কমলাকান্তও নেশার ঘোরে চিৎকার করতে থাকে এবং নশীর পিছু পিছু ছুটে বেড়াতে থাকে। ওদের চিৎকারে গিন্নী ও মধু ছুটে আসে, মধুর হাতে লাঠি।)

মধু : কোথায়? কোথায় চোর?

গিন্নী : (নশীর কাছে গিয়ে) তাড়াতাড়ি বল, কোনদিকে গেল?

নশী : *(গিন্নীর দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়)* আগে বলো— চোর তোমার কি সর্বনাশ করেছে? বলো গিন্নী, বলো। তোমার জন্য আমার যে কী উৎকণ্ঠা।

গিন্নী : আ মরণ। মিন্‌সের বুড়ো বয়সে ভিমরতী দ্যাখো—*(তফাতে সরে যায়)*

কমলা : ওদিকে মালপত্র হাতিয়ে সে এতোক্ষণে চম্পট দিয়েছে।

মধু : কোনদিকে গেছে?

কমলা : কোনদিক? য্যা, তাইতো? বাবু!কোনদিকে গেলো?
(একবার এদিক, আর একবার অন্যদিতে দ্রুত সরে যায় ভীত বিহ্বল ভাব)

গিন্নী : *(নশীকে)* ও কার কথা বলছে?

নশী : তোমরা যাকে ধরার জন্য ছুটোছুটি করছিলে।

গিন্নী : সে ত একটা বিড়াল। রান্নাঘরে ঢুকেছিল।

নশী : তাহলে ঠিক ধরেছি, রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর— সেখান থেকে—
(চেঁচিয়ে ওঠে) এ্যাই কমলাকান্ত—

কমলা : হুঁজুর! *(দ্রুত নশীর কাছে চলে আসে)*

নশী : শিগ্‌গির পেয়াদাকে খবর দে। বল্— নশীবাবুর বৈঠকখানায় ডাকাত পড়েছে।

গিন্নী : এসব কি বলছো তুমি?

নশী : যা বলেছি— ঠিক বলেছি— ও নির্ঘাত ডাকাত।

কমলা : ওরে বাবারে—*(দ্রুত টেবিল বা চেয়ারের ফাঁকে অথবা অন্য কোন আড়ালে চলে যায়, বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে। এই সময় গিন্নী ও মধুর সঙ্গে নশীর কথা চলতে থাকে।)*

গিন্নী : ধুত্তোর! যত্তসব মাতালের প্রলাপ। *(ঘোমটা টেনে, মুখ ভেংচে ভিতরে প্রস্থান)*

নশী : প্রলাপ নয় গো মহারাণী, এ হল নেপোলিয়ানের বিলাপ। যার সর্বস্ব খোয়া যায়, তার ব্যাথা-বেদনার আলাপ, *(কান্না জড়ানো স্বরে)*

মধু : শুনুন কত্তামশায়! বেড়ালটা দুধ চুরি করে খাচ্ছিল—

নশী : ওটা চুরি নয়রে হারামজাদা— ওটা ডাকাতি, ডাকাতি।

মধু : আমি লাঠিপেটা করেছি।

নশী : বেশ করেছিস। এজন্য আমি তোকে বক্‌শিস্ দেবো।

মধু : *(উৎসাহিত)* মাথায় এমন ঘা মেরেছি— বেশিদূর পালাতে পাড়েনি।

কমলা : (ঘরের মধ্যে আড়াল থেকে) 'ম্যাও', 'মিয়াও' *(বিড়ালের সুরে ডাকতে থাকে)*

নশী : মনে হচ্ছে সেই বিড়ালটা।

মধু : অসম্ভব।

নশী : তুই জানিস না—ঠেলায় পড়লে বেড়াল মাথায় চড়ে বসে।

কমলা : মিয়াও! *(মধু এদিক ওদিক তাকায়)*

নশী : খবরদার! কোনঠাসা বেড়াল কিন্তু বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

কমলা : মিয়াও!

মধু : *(কমলার দিকে এগিয়ে)* এটা কি হচ্ছে?

নশী : কি হচ্ছে?

মধু : ঐ দেখুন! আপনার কমলাকান্ত!

নশী : *(চেঁচিয়ে ওঠে)* কমলাকান্ত?

কমলা : (সমান তালে চেঁচায়) ম্যাঁও!

নশী : তুমি কোথায় কমলাকান্ত? শুনতে পাচ্ছো বেড়ালের ডাক? *(বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে আড়াল থেকে বেড়িয়ে আসে। ডাকতে*

থাকে 'ম্যাঁও' 'ম্যাঁও'। কমলার মুখ এখন বিড়ালের মুখের মতো প্রতীকী মুখোশে আঁটা! সেটা দেখামাত্র মধু রেগে যায়। চেঁচিয়ে বলে—)

মধু : কি মুশকিল! আরে ওটা দাদাবাবুর খেলার জিনিস। *(মুখোশটা দেখিয়ে বলে)* এটা পড়েছেন কেন? খুলে ফেলুন বলচি—

(নেপথ্যে গিন্নীমার ডাক শোনা যায়— 'মধু', 'মধু'— ও মধু—)

মধু : যাচ্ছি মা! এই দেখুন না—এখানে— *(হাসতে হাসতে প্রস্থান)।*

কমলা : আমি এখন তোমার দাদাবাবুর সখের বিড়াল। বুঝেছো? 'মিয়াও'—

নশী : *(কমলাকান্ত ডাকতে ডাকতে কাছে আসে)* এ্যাই এটা কি হচ্ছে?

কমলা : ম্যাঁও!

নশী : *(ভয়ার্ত স্বরে)* একি এটা কি হল? আমার চারপাশে এমন ঘোর অন্ধকার কেন? আমার কেমন যেন ভয় করছে।

কমলা : *(ভয়ার্ত স্বরে)* ম্যাঁও !ম্যাঁও! মিয়াও!

নশী : এই! কে? কে তুমি? বলো কে তুমি?

কমলা : প্রেতাত্মা!

নশী : এ্যাঁ? (ভয়ে কাঁপতে থাকে)

কমলা : হ্যাঁ! আমি ঐ রক্তাক্ত মরা বিড়ালের প্রেতাত্মা।

নশী : সর্বনাশ! (ভয়ার্ত চিৎকার করে) কে আছো? বাঁচাও— আমাকে বাঁচাও!

(গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে) (ভয়ার্ত গিন্নীর দ্রুত প্রবেশ)

গিন্নী : *(উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত)* কি হয়েছে?

নশী : ভূ-ভূ-ভূত!

গিন্নী : *(আৎকে ওঠে)* ভূত? কোথায়?

নশী : বিড়ালের ভূত। ঐ দ্যাখো—*(টেবিলের নীচে গুটিসুটি মেরে থাকা কমলাকে দেখায়)*

কমলা : *(ডেকে ওঠে)* ম্যাঁও, মিয়াঁও! *(গিন্নী চমকে ওঠে)* দুধ দাও। দুধ। মিয়াঁও

গিন্নী : দুধ?

কমলা : ফিরিয়ে দাও আমার দুধ খাওয়ার অধিকার।

নশী : ইস্‌স্ মামার বাড়ির আব্দার!*(গিন্নী এদের কথায় বিস্ময়ে হকবাক হয়ে যায়)*

কমলা : মনে রেখো আমি মার্জার।

নশী : কুলাঙ্গার!

কমলা : *(গর্জন করে ওঠে)* খবরদার।

গিন্নী : *(ধমকায়)* খুব সাবধান। কি হচ্ছে এটা?

কমলা : *(গর্জায়)* ম্যাঁও!

গিন্নী : খোকার খেলনা মুখোশ এঁটে সং সেজেছো, সং? একদম ঢং করবে না, বলে দিচ্ছি— বুড়ো ধাড়ী! ছেলেমানুষী ঘুচিয়ে দেবো।

কমলা : জানো আমি কে?

নশী : ও বিড়ালের ভূত। ওর ওপর ভর করেছে বিড়ালের প্রেতাত্মা। কিন্তু আমিও তেমনি ওঝা— *(এগিয়ে যেতে চায়)*

কমলা : আর বেশি এগিয়োনা। তাহলে এই ধারালো নখ দিয়ে এক্ষুণি তোমাদের আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো।

গিন্নী : ওগো এ আমার কি সর্বনাশ হল— ও মধু! মধুরে—
(কাঁদতে কাঁদতে ছিটকে বেড়িয়ে যায়)

নশী : নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার— আমার দুধ খেয়েছে, আবার আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছে।

কমলা : দুধ যেমন তোমার নয়, তেমনি আমারও নয়। দুধ শ্যামলীর। দুইয়েছে মধু।

নশী : কিন্তু আমি টাকা দিয়ে শ্যামলীকে কিনেছি। টাকা দিয়েই মধুর মতো চাকর রেখেছি।

কমলা : তাতে কি। টাকার জোড়ে ত ভগবানও কেনা যায়। কিন্তু তাকে বশ মানানো যায় কি?

নশী : তোর ত দেখছি— ভারি আস্পর্ধা। চুরি করে দুধ খাবি, আবার গলার শিরাও ফোলাবি?

কমলা : সখ করে কেউ চোর হয় না।

নশী : সে না হোক, তবে চুরি, জোচ্চুরির মতো অধর্ম কোন মতেই বরদাস্ত করা যায় না।

কমলা : কিন্তু চোরের অধর্মের জন্য দায়ী কে? আমরা চুরি করি খিদের জ্বালায়। আর তোমার মতো ধনিরা চুরি করে ধনসঞ্চয়ের নেশায়। এটা অধর্ম নয়? (মধু ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়ায়)

নশী : তার মানে?

কমলা : মানে একটাই। তোমার মতো যারা ভোগী আর লোভী— তারাই ত সবচেয়ে বড় পাপী।

নশী : তোর এতোখানি স্পর্ধা? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

কমলা : তুমি কাপুরুষ। তাই এই ক্ষুদ্র বেড়ালের উপর বীরত্ব ফলাতে চাও।

নশী : তোকে শায়েস্তা করতে আমার মিনিই যথেষ্ট।

কমলা : মিনি?

নশী : আমার পোষা বিড়াল। 'মিনি' আয় 'মিনি'! (ডাকতে ডাকতে এগোয়)
(নশী ভিতরের দরজার দিকে এগোতেই মধু প্রবেশ করে। মধুকে দেখা

মাত্রই—) আয় মিনি আয়, কাছে আয়। তোকে দুধ দেব, মাছের কাঁটা দিব।

মধু : কত্তাবাবু! *(বিড়ালের পোষাক ও মুখোশ) (চুক চুক শব্দ করে)*

নশী : ঐ দেখ *(কমলাকে দেখিয়ে মধুকে বলে—)* তোর স্বজাতি। আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করছে, হুমকি দিচ্ছে।

কমলা : ও! এই বুঝি তোমার আদরের মিনি? ওকে ত এখন চেনাই যায় না। লেজটা দেখছি বেশ ফুলেছে, সারা শরীরে ঝিলিক মারছে রূপের ছটা, নশীবাবুর সখের সোহাগী বলে কথা।

মধু : মুখ সামলে কথা বল।

কমলা : আহা! চটছ কেন? নশীবাবুর দুধ খেয়েছ। তাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এখন দিব্যি বুক ফোলাচ্ছ। কিন্তু মনে রেখো— যেদিন তোমার ইঁদুর ধরার ক্ষমতা থাকবে না, সেদিন তোমার কপালেও এ লাঠিপেটা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। বুঝেছো? *(গিন্নী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে)*

মধু : এসব কি কথা বলছো তুমি?

কমলা : যা বলছি, ঠিক বলছি। ভুলে গেছিস—এক টুকরো মাছ চুরির অপরাধে তোর বাবাকে ওরা কিভাবে পিটিয়ে মেরেছিল? *(মিউজিক)*
(মধু আর গিন্নীর চোখাচোখি। নশীবাবু বিড়বিড় করে, হেঁচকি তুলে নানা শব্দ করে, ঝিমোয়। মাঝমধ্যে ধরফর করে সোজা হয়, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো বসে)

কমলা : ওরে মিনি! এরই মধ্যে ভুলে গেলি— ওদের দুয়ারে পড়ে থাকা তোর মায়ের অসুস্থ শরীরটা। পাকা রাস্তায় টানতে টানতে ওরা যখন ডাস্টবিনে ফেলে দিল, সেসময় রাস্তার জমাত বাঁধা রক্ত শুঁকে তুই কি শপথ নিয়েছিলিস্?

মধু : এতো দেখছি আবোল তাবোল বকছে।

কমলা : আবোল তাবোল? ওদের আক্রমণে বাঘা বাঘা বেড়াল প্রাণ হারিয়েছে। সেই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ এখন আমি সোচ্চার হয়েছি — তখন তুই মানুষের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের লোভে গৃহপালিত মার্জার বনে গেছিস। ছিঃ মিনি ছিঃ! তোকে ধিক্! শতবার ধিক্। মধু নশীর কাছে সরে যায়)

মধু : কত্তাবাবু! নেশার ঘোরে এ ব্যাটা নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে।

নশী : তুই ঠিক বলেছিস মিনি।

মধু : আমি মধু। আপনার চাকর।

নশী : *(মধুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে)* তুই আমার বড় আদরের মিনি বিড়াল।

মধু : এসব কি বলছেন আপনি?

নশী : যা বলছি, সেটাই করবি।

মধু : কি করবো?

নশী : যে নখ আর দাঁত দিয়ে ইঁদুরের পেট ছিঁড়ে দিস, সেইভাবে ঐ বেড়ালটাকে *(কমলাকে দেখায়)* টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফ্যাল, তোর জন্য দুধের বরাদ্ধ আরও বাড়িয়ে দেব।

মধু : মা! কত্তাবাবুও কী তাহলে—

গিন্নী : *(কাঁদতে কাঁদতে দরজার গোড়ায় বসে পড়ে)* ওরে মধু! একটু আগে দেখে গেলাম— দিব্যি ভালো মানুষ। হঠাৎ এ কী হয়ে গেল রে?

মধু : আস্তে মা ঠাকরুন, আস্তে। লোক জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

গিন্নী : সেটাই হোক। তাতে যদি শিক্ষে হয়। এই অশান্তি আর ভাল লাগে না।

মধু : একটু অপেক্ষা করুন। কোবরেজ মশায় এক্ষুনি এসে পড়বে। চলুন মা। *(গেটের কাছে বসে গিন্নী আঁচলে চোখ মোছে)* ওদিকে চলুন। *(মধু ও গিন্নীর প্রস্থান)।*

নশী : *(বিকট ঢেঁকুর তোলে আওয়াজ করে)*

কমলা : ভূতের বেগার অনেক খেটেছি; আর নয়।

নশী : এবার চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ কর বেয়াদপ।

কমলা : উপদেশ দেবার আগে দু-দিন নিজে উপোস করে দ্যাখো।

নশী : কি বলতে চাস?

কমলা : আমার চুরির দণ্ড আছে। কিন্তু তোমার নিষ্ঠুরতার দণ্ড নেই কেন?

নশী : আমার নিষ্ঠুরতা?

কমলা : অবশ্যই। মানছি— শুধুমাত্র টাকার জোরে অঢেল দুধের মালিক হয়েছে। তাবলে তার ক্ষীর-ননী, ছানা-মাখন— সব একাই ভোগ করবে? এই স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা নয়? অধর্ম নয়? আর এজন্যই সমাজবাদে তোমার এতো ভয়।

নশী : তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি— খুব সাবধান। এখানে রাজনীতির কথাবার্তা একদম চলবে না।

কমলা : আরে তুমি নিজেই ত রাজনীতির ধারক-বাহক।

নশী : মোটেই না।

কমলা : আসলে তোমার মতো ধনীদের এটাই চরিত্র। যে অন্যায়-অধর্ম পথে তোমাদের নিত্য বিচরণ, তা আড়াল করতেই তোমাদের এই ছলনা।

নশী : ছলনা।

কমলা : অবশ্যই। যাতে তোমাদের বিরোধীতার কোন পথ কেউ চিনতে না পারে,

সেজন্যই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীতি আলোচনায় এত আপত্তি।

নশী : আমি কোন রাজনীতির ধার ধারি না।

কমলা : এটা তোমার মুখের কথা।

নশী : মনেরও কথা।

কমলা : মিথ্যা কথা। অমন ছলনায় নিজেকে যতোই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করো না কেন—তোমার রাজনীতিটা কি, সেটা আমি ভালোই জানি।

নশী : কি জানো?

কমলা : একই সঙ্গে দু-ধরণের পলিটিক্স তুমি রপ্ত করেছ।

নশী : তাই নাকি?

কমলা : আলবাৎ। এক কুক্কুর জাতীয়, অন্যটি বৃষ জাতীয়।

নশী : তার মানে?

কমলা : কুক্কুর জাতীয় পলিটিক্সের মূলমন্ত্র হল খোশামোদ ও তোষণ। আর বৃষ-জাতীয় পলিটিক্সের মূলনীতিই হল দস্যুতা। এ-দুটোর একটাই লক্ষ্য—অন্যকে শোষণ।

নশী : *(জোরে ধমকায়)* থামো। থামো বলছি। তোমার আস্পর্ধা ত দেখছি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তোমাকে সাবধান করছি—

কমলা : ধমকাচ্ছেন?

নশী : এখন চমকাচ্ছি। এতে কাজ না হলে আরও অনেক উপায় মজুত আছে।

কমলা : তাই?

নশী : অবশ্যই। কারণ, এই জাতীয় কথাবার্তাই সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়।

কমলা : সেজন্য দায়ী আপনাদের উচ্ছৃঙ্খল কাজকর্ম

নশী : তার বিচার করবে আইন-আদালত।

কমলা : বটেই ত! তবে খুনী আর বিচারক যেখানে হাত ধরাধরি করে চলে—সেখানে বেড়ালের কান্নার একটাই অর্থ—অমঙ্গল, বিশৃঙ্খলা।

নশী : কারণ বেড়ালের কান্না অশুভ প্রেতাত্মার আর্তনাদ

কমলা : তা সত্বেও মানুষের কাছে বিড়াল আস্কারা পায়।

নশী : কেন পায়?

কমলা : কারণ মানুষ জানে— বিড়ালের ডাক, বিড়ালের গর্জন মানুষের কাছে কীসের আতঙ্ক ছড়ায়?

নশী : তুমি কি এখানে সেই আতঙ্ক ছড়াতে এসেছ?

কমলা : না। আমি এসেছি— মানুষের মধ্যে যে মানবধর্ম আছে, তার কাছে আবেদন জানাতে।

নশী : কীসের আবেদন?

কমলা : যদি শান্তি চাও, তাহলে অন্যকে শান্তিতে থাকতে দাও। সেজন্য শত্রুতা নয়, মিত্রতার জন্য মিটমাট করে নাও।

নশী : মিটমাট?

কমলা : ত্যাগ কর অর্থের অহঙ্কার, বর্জন করো ক্ষমতার লিপ্সা আর অন্যের উপর প্রভুত্বের নেশা।

নশী : জ্ঞান দিচ্ছিস?

কমলা : এ জ্ঞান ত তোমাদের মানবধর্মের। তাই মানুষের কাছ থেকেই শিখেছি— মিত্রতায় যতো সুখ, শত্রুতায় ততো দুখ্।

(কাশির শব্দ শোনা যায়। নেপথ্যে 'হ্যাক থু', 'থু'— বৃদ্ধ কবিরাজের থুথু ফেলার শব্দ। মধুর প্রবেশ। নশী-কমলার কথা শোনা যায় না, কিন্তু অঙ্গ-ভঙ্গিতে বোঝা যায়, এদের বিতর্ক চালু রয়েছে। মধু ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বলে—)

মধু : মা! কবিরাজ মশায় এয়েছেন।

(বাইরে থেকে কাশতে কাশতে বৃদ্ধ কবিরাজের প্রবেশ। ওদের কথা শুনে থমকে যান)

কবিরাজ: কি হয়েছে? *(কাশি)* এ্যা!! কৈ দেখি—

কমলা : (নশীকে) ভেবে দ্যাখ— তোমরা আমাদের মারছ, আমরাও দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ ছড়িয়ে তোমাদের মারছি।

কবিরাজ : তাই নাকি? বাবা কমলা! এসব কি বলছিস?

নশী : না-না! আর মারামারি নয়। ওটাই অশান্তির মূল। কিন্তু তোমার মতো পতিত আত্মাকে উদ্ধার করার মন্ত্র ত আমার জানা নেই। তবে দুধ আছে। মিটমাটের জন্য যদি চাও— একা ভোগ না করে, কয়েক ফোঁটা ত্যাগ করতে পারি আত্মশুদ্ধির অভিপ্রায়ে আচমন করার জন্য।

(গিন্নীর প্রবেশ ঘটে, ঘোমটায় মুখ প্রায় ঢাকা)

কবিরাজ: হুঁ! এতো দেখছি জ্ঞানপাপী। *(কাশতে কাশতে)* দাঁড়াও। এবার আমি তোমাদের আচমন করাচ্ছি।

মধু : কেমন বুঝছেন?

কবিরাজ: শিগ্‌গির দু-বালতি জল নিয়ে আয়।

মধু : কেন?

কবিরাজ: *(ধমকে ওঠে)* ওরে হতভাগা! যা বলছি, সেটা আগে কর। *(মধুর প্রস্থান)*

গিন্নী : অসুখটা কী খুব মারাত্মক?

কবিরাজ: সেটা জেনে তুমি কি করবে?

গিন্নী : না, মানে— আজ যা হল—

কবিরাজ: মধুর কাছে সব শুনেছি। *(কাশতে কাশতে)*

গিন্নী : বড্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

কবিরাজ : দেখি— আগে ত মাথায় জল ঢালি, তারপর না হয়— *(কাশতে থাকে)*

গিন্নী : কি হয়েছে?

কবিরাজ : *(জানালার দিকে অথবা বাইরের দরজার দিকে কাশতে কাশতে এগিয়ে যায়। খ্যাক্-থু-থু করে জানালা বা দরজার বাইরে কফ ফেলে)* শ্লেষ্মা! খুউব শ্লেষ্মা। মাথায় জল পড়লেই— *(কাশি)*

গিন্নী : সর্বনাশ। শ্লেষ্মায় জল ঢাললে যদি নিমুনিয়া ধরে যায়?

কবিরাজ : বলি— তুমিও কী নশীর মতো নেশার ঘোরে আছো?

গিন্নী : আজ্ঞে!

কবিরাজ : *(খিটখিটে মেজাজ)* শ্লেষ্মা জমেছে আমার বুকে, অথচ—*(কাশি) (মধু বালতিতে জল আর মগ নিয়ে প্রবেশ করে)* এজন্যই বলে, অবুঝ মেয়েমানুষের সব ব্যাপারে নাক গলানো চিরকালের বদ্ স্বভাব।

গিন্নী : আসলে আমি—

কবিরাজ : থামো। বেশি ট্যাক - ট্যাক করো না ত।

গিন্নী : মনের যা অবস্থা, মাথার ঠিক নেই।

(ইতিমধ্যে কিছু বলার চেষ্টা করে নশী ও কমলা, কবিরাজের ধমক খেয়ে চুপ মেরে যায় এবং যে যার অবস্থানে ঝিমোতে থাকে নির্বিকারভাবে।)

কবিরাজ : মাথায় জল পড়লেই নেশা বাপ্ বাপ্ বলে দৌঁড়বে।

গিন্নী : আমার হয়েছে যতো জ্বালা।

কবিরাজ : তুমি ত ভাগ্যবতী। আফিম বাবাজির এমন ভক্ত ক-জন মেলে?

মধু : *(কবিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'মগ' তুলে দেখায়)* কবিরাজ মশায়!

কবিরাজ : হ্যাঁ ঢাল! দু-জনের মাথায় জল ঢাল। এই জলই এখন নেশা মোচনের আচমন। *(মিউজিক)।*

(কবিরাজ প্রচণ্ড জোরে কাশতে থাকে। মধু মাথায় জল ঢালতে উদ্যত হয়। সকলে যে যার অবস্থানে বিশেষ ভঙ্গিমায় নিশ্চল হয়ে যায়। মিউজিক উচ্চগ্রামে পৌঁছায়)

ভেসে আসে সঙ্গীত :

'পুরাণো বিরহ হানিছে নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে।'

পর্দা

সাহায্য সূত্র : রবীন্দ্রনাথ

সাহায্য সূত্র : রবীন্দ্রনাথ

ম্যাও সংকেত্তন

মলয় ভৌমিক (বাংলাদেশ)

(অভিনেতা, অভিনেত্রীরা নেচে নেচে গান গায়)
আমরা সবাই এঁদুর
বিলাই আইলো এঁদুর রাজত্বে
ভয়ে মোগের ঘোম আইসে না
থাহি যে গত্তে!
কুচি কুচি কুচি করে কাট
বার্গার হটডগ ভূট্টার মাঠ
ক্যাটা ক্যাট ক্যাটা ক্যাট কাট!
আমরা নেংটি ইঁদুর
আমরা ধেড়ে ইঁদুর!
আমরা প্যাটের খিদায় মরি
খালি বিলাই দেইহে ডরি
আমরা যাই মইরে যাই
বিলাইয়েরই ত্রাসের রাজত্বে!

(আসপাশ থেকে বার বার 'ম্যাও' ডাক শোনা যায়। ভয়ে ছোটাছুটি করে সবাই। এক পর্যায়ে পালিয়ে যায়। প্রবেশ করে মোড়ল।)

মোড়ল : সে কি! এখানে কেন? (আবার ম্যাও ডাক শোনা যায়) ওরে বাবা! এটা কী হচ্ছে। ইয়ার্কি নাকি আমার সাথে? (আবার ম্যাও শোনা যায়)আবার ম্যাও! না, এ তো আলামত সুবিধার মনে হচ্ছে না। আমার দরবারের আশেপাশে ম্যাও। (আবার ম্যাও ডাক শোনা যায়) এই আমি, আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না? আমি মোড়ল। বেয়াদব হুলো কোথাকার! কী বললাম? হুলো? না না মেচি, মেচিও হতে পারে? স্ত্রী লিঙ্গকে বোধহয় বেয়াদব বলা ঠিক হলো না! এই বেয়াদপ- না না বেয়াদবি- মানে বেয়াদবি হচ্ছে আমার সাথে? দেখতে পাচ্ছিস না, আমি কে? আমি হলাম গিয়ে মোড়- (আবার শোনা যায় ম্যাও) ওরে বাবা! আবার! আর তো সহ্য করা যায় না। এবার তো বলতেই হচ্ছে যে, বেশ অপমানিত বোধ করছি। এ্যাঁ, আমার আস্কারা পেয়ে আমাকেই অপমান। এ আবার কী বললাম? আমার আস্কারা পেয়ে- না, না, কথাটা সর্বসমক্ষে বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। না, মাথাটা একেবারে গেছে। এখানে

সর্বসাধারণ নেই সেটাও ভুলে গেছি! হ্যাঁ, এবার কিন্তু চিৎকার করেই বলব, তোরা আমারই খেয়ে আমার সাথেই- (আবার ম্যাও শোনা যায়) ওই যে আবার। না, এবার তো মনে হচ্ছে কিঞ্চিত ভয় পেতে শুরু করেছি ! কিন্তু ভয় একবার ঢুকে গেলে তো বিপদ! আমিই যদি ভয় পেয়ে যাই, তাহলে সকলে আরও বেশি ঘাবড়ে যাবে। আর এর জন্য আমার ব্যর্থতাকেই দায়ী করবে। কাজেই ব্যবস্থাটা নিতে হবে এখনই। এই যে দফাদার! আরে কাজের সময়, মানে ভয়ের সময় কোথায় থাকো? দেখতে পাচ্ছ না, আমি ভয় পেয়ে গেছি? কই, দফাদার কোথায়?

(দফাদারের প্রবেশ।)

দফাদার : বলেন, কী করতে হবে?

মোড়ল : কী করতে হবে মানে?

দফাদার : আমি সব দেখেছি।

মোড়ল : এ্যাঁ! দেখেছ মানে, কী দেখেছ? পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া- মানে দেখার স্বভাব তোমার গেল না দেখছি।

দফাদার : দেখেছি মানে, আপনি ভয় পেয়ে গেছেন, সেটা দেখেছি। তবে শুনিনি কিছু, শুধু দেখেছি।

মোড়ল : যাক, শোননি সেই যা রক্ষে- এ্যাঁ, শোননি মানে? আমি কিছু বলেছি যে শুনবে?

দফাদার : না, ওই সর্বসাধারণ না কী যেন বলেছিলেন- সেটা শুনিনি।

মোড়ল : শোননি? যাক বাঁচালে। শুনলে ব্যাপারটা একেবারে কেঁচে যেত। যাকগে, শোননি ভালো করেছ, এখন ব্যবস্থা নাও!

দফাদার : ব্যবস্থা নেব মানে? কী ব্যবস্থা?

মোড়ল : বেটাকে ঘরে আনো, বেঁধে রাখো!

দফাদার : মুখের কথা নাকি! বললেই ধরা যায়! ওরা সর্বত্র একেবারে ত্রাস ছড়িয়েছে!

মোড়ল : ছড়াবে না! তোমার পরামর্শেই তো এতটা মাথায় উঠেছে। এখন আমার মোড়লিটাও দখলে নিতে চাইছে।

দফাদার : আমার পরামর্শ মানে! শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য পরামর্শটা চেয়েছিল কে? আপনি তো, না কি?

মোড়ল : যাকগে, বাদ দাও সে সব কথা। এখন যা বলছি তাই কর! ধরে আনো!

দফাদার : ধরে আনব মানে! কোনো ধারণা আছে আপনার, সর্বত্র কতটা জাল ওরা বিছিয়েছে? ধরতে পারলে তো পরিস্থিতি কবেই শান্ত হতো। এখন তো আপনার শত্রু মিত্র সবাই ওদের উসকে দিচ্ছে- যথেচ্ছ ব্যবহার করছে ওদের। সাধারণ ইঁদুরেরা সব আমাদের ওপর খেপে যাচ্ছে।

মোড়ল : সে জন্যেই তো বলছি ধরে আনো। সাধারণকে তো একটা সান্তনা দিতে হবে

না কি?

দফাদার : আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আমি ইচ্ছা করে ধরছি না? আমার ওপর কোনোই আস্থা নেই আপনার? ধরতে পারলে তো কবেই ধরতাম।

মোড়ল : আরে বাবা ওই গেছোটাকে ধরে আনো!

দফাদার : গেছো? সেটা আবার কে? আর তাকে কেন ধরব? এর সাথে গেছোর সম্পর্ক কী?

মোড়ল : তোমার মাথায় কি ভুসিমাল ছাড়া কিছু নাই নাকি?

দফাদার : কথায় কথায় ভুসিমাল, ভুসিমাল করবেন না তো! সবাই জানে ভুসিমালের ব্যবসা করতো আপনার বাবা।

মোড়ল : আমার বাবা মানে? একজন সম্মানিত মৃত ইঁদুরকে আবার এর মধ্যে টেনে আনছ কেন? তোমার মনে নেই সেই গেছোটার কথা? কয়েক বছর আগে যে ম্যাও সেজে সবাইকে ভয় দেখাত। গণমাধ্যম, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই নিয়ে কত হৈ চৈ।

দফাদার : ও সেই গেছো? এবার মনে পড়েছে। আর বলতে হবে না। সব বুঝতে পেরেছি। আমি যাচ্ছি- এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি (চলে যায়)।

দপ্তরি : (নেপথ্যে) ম্যাও-

মোড়ল : ওরে বাবা! আবার ম্যাও! (দরবারের আসনটা শক্ত করে ধরে থাকে।) এখন তো দেখছি, একা থাকা যাবে না। একা থাকলেই আমার ওপর আছড় করছে। বেশ গুরুতর ব্যাপার মনে হচ্ছে। কিন্তু বাবা আমিও ছাড়ছি না। ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে - ইয়ে, মানে কী বলে- হ্যাঁ, ইয়ে ছিনিয়ে নেয়া যাবে না। যতই ভয় দেখাও, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র-কেঁদেনি- (কাঁদতে থাকে)।

(দপ্তরির প্রবেশ।)

দপ্তরি : কথাটা সুচ্যগ্র কেঁদেনি নয়, সূচ্যগ্র মেদেনী।

মোড়ল : ভয় পেলে কি আর মেদেনী মনে থাকে- কান্নার কথাই তখন মনে আসে। দাঁড়াও, আর একটু কেঁদেনি!

দপ্তরি : তা চেয়ার আগলে ধরে কাঁদতিছ কেন?

মোড়ল : আগলে ধরে কাঁদতিছি না, চেয়ারের তলায় লুকানোর চেষ্টা করতেছি।

দপ্তরি : লুকানোর চেষ্টা করতিছ, নাকি চেয়ার হারানোর ভয়ে শক্ত করে ধরে আছ?

মোড়ল : কী যে বল না। ওই যে বললাম, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-সূচ্যগ্র-

দপ্তরি : মেদেনী।

মোড়ল : হ্যাঁ, মেদেনী। আসলে হয়েছে কি, আমার দরবারের চারপাশে ম্যাও, মানে ওই ম্যাও ওঁত পেতে আছে!

দপ্তরি : ম্যাও! মানে ওই ম্যাও? ওঁত পেতে বসে আছে ? কী সাংঘাতিক কথা!

তাহলে তো আমাকেও কাঁদতে হয়।

মোড়ল : থামো তো! এই বিপদে আমার সাথে ঠাট্টা করছ!

দপ্তরি : তা করব কেন? আমার মোড়ল কাঁদবে আর তার দপ্তর- প্রধান হয়ে আমি যদি একটু না কাঁদি, মোড়লের সম্মান থাকে কোথায়?

মোড়ল : খোঁচা মেরো না দপ্তরি। তোমার স্বভাব আমি জানি না ভেবেছ। আমি থাকি আর না থাকি, তোমার চেয়ারখানা তো ঠিকই থাকবে। কাজেই তোমার আর চিন্তা কী।

দপ্তরি : সে হচ্ছে গিয়ে আমাদের পেশাটাই তো ওরকম। তাই বলে তোমার দপ্তর প্রধানকে তুমি দপ্তরি বলবে?

মোড়ল : দপ্তরি বলেছি নাকি? দেখো তো, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আসলে প্রথম জীবনের অভ্যাসটা এখনো যায় নাই। জানো তো, ছিলাম ইসকুলের নাইট গার্ড। ওই ইসকুলের দপ্তরি ছিল আমার সমবয়সী- আমার সাথে তুইতোকারি সম্পর্ক ছিল-

দপ্তরি : যাকগে, সম্মানিত ব্যক্তিদের অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। শেষে আবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।

মোড়ল : কেঁচো সাপ হলো মানে?

দপ্তরি : ওই যে ম্যাও-

মোড়ল : আবার ম্যাও! কই, কোথায়?

দপ্তরি : আরে আমি বলছি ম্যাওগুলো তো কেঁচো হয়েছিল। এখন হঠাৎ সাপ হয়ে ওঁত পাততে শুরু করলো কী করে? ওদের কর্মকান্ডে তো মূষিককূলের অস্তিত্ব বিপন্ন!

মোড়ল : মূষিককূল আবার কী?

দপ্তরি : কী আশ্চর্য! নিজের জাতকূলের নামও ভুলে গেলে দেখছি!

মোড়ল : আরে ম্যাওয়ের ভয়ে তো নিজের বাপের কথাই ভুলে যাচ্ছি। এই যে একটু আগে দফাদার আমাকে মনে করিয়ে দিল, আমার বাবা ভুসিমালের ব্যবসা করতো। ওটা তো আমি প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম।

দপ্তরি : ওটা এমন কিছু দোষের নয়। ছোট হোক, বড় হোক, মোটামুটি একটা গদিতে বসলেই সকলে অতীত ভুলতে শুরু করে। গদিনসিনদের জন্যে এটা এখন বেশ মানানসই একটা গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওই বেটা দফাদারের মুখে একথা মেনে নেয়া যায় না। ওর বাপ কী করতো, তা কি কারো জানতে বাকি আছে? ওর গাফিলতির জন্যেই আজ ম্যাওদের আস্ফালন এত দূর গড়িয়েছে।

মোড়ল : ঠিক আছে। তুমি মাথা ঠান্ডা কর! আমার দফাদার ইতিমধ্যেই একটা মোক্ষম ব্যবস্থা নিয়েছে।

দপ্তরি : মোক্ষম নয়, ওটা হলো অক্ষমের ব্যবস্থা। ওটা অনেক পুরনো কৌশল।

মোড়ল : ঠিক ধরেছ, অনেক প্রাচীন একটা কৌশল। যুগ যুগ ধরে ওই কৌশলই ফল দিয়ে আসছে।

দপ্তরি : ফল দিয়ে আসছে? দেখবে ওই ফলে সাধারণ ইঁদুরেরা জল ঢালবে।

মোড়ল : কী সব অশ্লীল কথাবার্তা বলছ বল তো?

দপ্তরি : বলব না, ঘটনা ঘটাচ্ছে ম্যাও, আর ধরে আনা হলো কোথাকার এক গেছোকে। এটা নিশ্চয় ওই বেটা দফাদারের কুপরামর্শ!

মোড়ল : কুপরামর্শ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই দফাদারই তো দিল পরামর্শটা। কী করব বলো তো?

দপ্তরি : কী আর করবে- নাচো, দফাদারকে মাথায় তুলে নাচো।

মোড়ল : আসলে আমার মনে হচ্ছে, এটা হলো আমার বিরুদ্ধে য-

দপ্তরি : স্!

মোড়ল : আরে য-য কী বলে ওকে?

দপ্তরি : কী স-স- করতিছ?

মোড়ল : আরে য-আর ড়-

দপ্তরি : স আর র-মানে সর? দুধের সর?

মোড়ল : আরে না, না, সর খেতে খেতে তোমার মাথায় সর ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না।

দপ্তরি : সর আমি একা খাচ্ছি? তুমি ভাগ পাচ্ছ না?

মোড়ল : সে সরের কথা হচ্ছে না। এ হচ্ছে য আর ড়, মানে যড়-

দপ্তরি : কী ভয়ানক, কোনদিকে সরব?

মোড়ল : ধ্যাৎ, য আর ড় মানে হচ্ছে যড় আর যন্তর-

দপ্তরি : ও যন্ত্র। সে তো তোমার বাড়িতেও আছে আমার বাড়িতেও আছে। ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব, নানারকম ইলেকট্রনিক চিপ- এসবই তো যন্ত্র। তারপর ধরো, ধান, গম, ভুট্টার খেত আর বাসায় বাসায় আমাদের জন্যে পেতে রাখা ইঁদুর মারার ফাঁদ- সেটাও তো যন্ত্র।

মোড়ল : ইঁদুর মারার ফাঁদ! ঠিক বলেছো, এরকমই একটা যন্ত্র পাতা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে।

দপ্তরি : তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, এই ম্যাও হচ্ছে একটা যড়যন্ত্র?

মোড়ল :এতক্ষণে বিষয়টা তুমি ধরতে পেরেছ। য়ড়যন্তর কথাটা মনে করতে না পেরে শুধু কী সব দুধের সর- *(প্রবেশ করে ঋষিকেশ।)*

ঋষিকেশ : আসব বাবু?

মোড়ল :ওই যে বললাম যড়যন্তর। দেখ, তার নমুনা দেখ। দরবারের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা একেবারে ঝরঝরে। বিনা বাঁধায় যে কেউ যখন তখন ঢুকে পড়ছে।

ঋষিকেশ : ভেতরে আসব বাবু?

মোড়ল : ভেতরেই তো এসেছ বাবু। কী যেন নাম তোমার?

ঋষিকেশ : আজ্ঞে ঋষিকেশ।

মোড়ল : হ্যাঁ, ঋষিকেশ! বেশ বেশ! তা ঋষিকেশ, সকলের জন্যেই তো আমার দরবার উন্মুক্ত। তোমার জন্যে আলাদা করে অনুমতি লাগবে কেন ব্যোমকেশ?

ঋষিকেশ : আমি হলেম ঋষিকেশ।

মোড়ল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঋষিকেশ। তা বল ঋষিকেশ বাবু, কী হেতু আগমন এই দীনের দরবারে?

ঋষিকেশ : আজ্ঞে লজ্জা দিবেন না বাবু। আমি এক সাধারণ ইঁদুর- আপনি হলেন বাবু-

মোড়ল : বাবু এখন কাবু। সে যাক্, এবার তোমার কথা বল তো ব্যোমকেশ!

ঋষিকেশ : ব্যোমকেশ নয়, আমি ঋষিকেশ।

দপ্তরি : এ তো আর এক মুশকিল! আচ্ছা মানলুম তুমি হলে দেবতুল্য ঋষি। তা আসল কথাটা এবার বলে ফেল তো!

ঋষিকেশ : আজ্ঞে আমার ছেলেটাকে আপনার ওই রফাদার ধরে এনেছে।

মোড়ল : রফাদার নয় ব্যোমকেশ, দফাদার।

ঋষিকেশ : ব্যোমকেশ নয় বাবু, ঋষিকেশ। *দপ্তরি হাসতে থাকে।*

মোড়ল : না না হাসির ব্যাপার নয়। কী সাংঘাতিক ঘটনা! তার মানে গেছো- ওই বদমাশটা তোমার ছেলে? কতবড় সাহস ম্যাও সেজে আমাদের ভয় দেখায়!

ঋষিকেশ : মানছি যে ছেলেটা একটু দুষ্টু এ গাছ ও গাছ করে বেড়ায়। যাত্রা-থেটারও করে। সেই একবার কী এক যাত্রায় ম্যাও সেজে ভয় দেখানোর পাঠ করেছিল বটে। তাই বলে আপনাদের ভয় দেখান, এমন ছেলে তো ও নয়। আমার মনে হয় আপনার ওই রফা- মানে দফাদার ওকে শুধু শুধু-

মোড়ল : না না দফাদার ঠিক কাজই করেছে। আমি নিজের কানে- মানে নিজের চোখে দেখেছি, সে আমাকেও ভয় দেখাচ্ছে।

ঋষিকেশ : কথাটা বিশ্বাস করতে আমার মন সায় দেচ্ছে না বাবু!

মোড়ল : দেখ ব্যোম- মানে ঋষিকেশ, তুমি কিন্তু আমার কথার ওপরে কথা বলছ!

ঋষিকেশ : তা যদি বলে থাকি তো ভারী অন্যায় কাজ করেছি। কিন্তু আমি বলি কি বাবু, ছেলেটাকে আমার ছেড়ে দিন!

মোড়ল : না, এবার তো দেখছি তোমাকেই আটকে রাখতে হবে। আমার সিদ্ধান্তের ওপর কথা!

দপ্তরি : এই তুমি যাও তো, বাইরে যাও!

ঋষিকেশ : বাবু ছেলেটা আমার-

দপ্তরি : যাও বলছি! *(ঋষিকেশ বাইরে যায়।)*

দপ্তরি : হ্যাঁ, তুমি বলছিলে যে, এটা একটা ষড়যন্ত্র-

মোড়ল : ষড়যন্তর মানে- গভীর ষড়যন্তর!

দপ্তরি : কিন্তু মূষিককূল- অর্থাৎ সাধারণ ইঁদুরেরা ষড়যন্ত্র বুঝতে চায় না, তারা

চায় ম্যাও- এর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি। আর এই চাওয়াটা তোমার কাছেই, কেন না তুমি তাদের মোড়ল।

মোড়ল : কেন আমার কাছে চাইবে কেন? মোড়লের কাছে তো তাদের কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। নিয়ম হলো, মোড়লই তাদের কাছে চাইবে- ভোট চাইবে, খাজনা-ট্যাক্স চাইবে, হাততালি-বাহবা চাইবে। আদাব-সালাম-আনুগত্য চাইবে। ওদের যদি কিছু চাওয়ার থাকে তো তোমাদের কাছে চাইবে। তোমরা তো দপ্তরের হত্তাকত্তা, তারপর মাঠে-ঘাটে ওদের সাথে আছ।

দপ্তরি : তা আছি, কিন্তু আমাদের মাধ্যমেই তো তোমার চাওয়া - পাওয়াটা পূরণ হচ্ছে। হিসাব করে দেখ। দায়টা শেষ পর্যন্ত তোমার ওপরই চাপছে।

মোড়ল : তাই নাকি? তাহলে কী করা যায়?

দপ্তরি : করা যায় মানে? ওই বেটা দফাদার আছে কী করতে? বেটা শুধু বসে বসে বেতন গুণছে আর ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

মোড়ল : ওর অত সময় কোথায়? এমনিতেই সময়ের অভাব, তার মধ্যে আবার একটা বিরাট পরিশ্রমের কাজ করে ফেলেছে। ওই গেছোটাকে বেঁধে এনেছে।

দপ্তরি : সময়ের অভাব মানে? সারাদিন কী করছে বেটা?

মোড়ল : ওই যে তুমি বললে, ছড়ি ঘুরাচ্ছে, ছড়ি ঘুরানো কি সহজ কাজ?

দপ্তরি : ছড়ি ঘুরানোর জন্য তাহলে বাহিনী পুষে কোনো লাভ আছে?

মোড়ল : এটা তুমি কী বললে? মোড়ল থাকবে আর মোড়লের বাহিনী থাকবে না, তা হয় নাকি? দেখো তো আমার কত বাহিনী, ধেড়ে বাহিনী, গেছো বাহিনী, নেংটি বাহিনী- আরও একটা করবো ভাবতিছি। না হলে পেরেসটিজ থাকে?

দপ্তরি : প্রেসটিজ থাকে না?

মোড়ল : তুমি বলো, থাকে কি না?

দপ্তরি : ঠিক আছে, থাকো তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে। আমি চললাম।

(দপ্তরি চলে যাচ্ছিল এসময় নেপথ্যে ম্যাও ডাক শোনা যায়।)

মোড়ল : ওরে বাবা, আবার ম্যাও। *(দপ্তরি ছুটে পালানোর চেষ্টা করে।)*

মোড়ল : বাহিনী চুলোয় যাক। এই বিপদে তুমি আমাকে ফেলে যেও না দপ্তরি! বিপদেই তো প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়। মনে করে দেখ, তোমার বাবা আর আমার বাবা এক সাথে ভুসিমালের ব্যবসা করতো।

(নেপথ্যে আবার ম্যাও শোনা যায়। মোড়ল ও দপ্তরি দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। অদৃশ্য ম্যাওয়ের উদ্দেশ্যে ধমকে কথা বলে মোড়ল।)

মোড়ল : এই আমরা কিন্তু-

ঋষিকেশ : (নেপথ্যে) ম্যাও!

মোড়ল : আমরা কিন্তু ভীষণ!

ঋষিকেশ : আমরা কিন্তু ভীষণ-ভয় পাচ্ছি- *(প্রবেশ করে ঋষিকেশ।)*

ঋষিকেশ : বাবুরা কি ভয় পাচ্ছেন?

মোড়ল : তা একটু পাচ্ছি।

ঋষিকেশ : কাকে ভয় পাচ্ছেন?

মোড়ল : ওই যে বললাম গেছো- তোমার ছেলে গেছো, ম্যাও সেজে ভয় দেখাচ্ছে!

ঋষিকেশ : গেছোকে তা বেঁধে রেখেছেন, সে কী করে ভয় দেখাবে বাবু?

মোড়ল : হ্যাঁ, তাই তো-

ঋষিকেশ : আমার মনে হয়, ভয় দেখানোর পেছনে অন্য একটা অশুভ শক্তি আছে। গেছোর কোন দোষ নাই। ওকে আপনারা ছেড়ে দিন বাবু!

মোড়ল : হ্যাঁ, ঠিক। এই ছেড়ে দাও গেছোকে!

দপ্তরি : দাঁড়াও, দাঁড়াও! (ঋষিকেশকে) তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর তো! আমরা দেখছি কি করা যায়। *(ঋষিকেশ বাইরে যায়।)*

দপ্তরি : তোমার মাথায় বাপের ভুসিমালই রয়ে গেছে দেখছি।

মোড়ল : কেন কেন? তোমার বাপই তো ভুসিমাল-

দপ্তরি : থামো! গেছোকে এখনই ছেড়ে দিলে কি হবে ভেবে দেখেছ?

মোড়ল : কেন কী হবে? ও বাপের সাথে হেঁটে হেঁটে বাড়ি চলে যাবে।

দপ্তরি : হেঁটে হেঁটে বাড়ি পৌঁছার আগেই তোমার বাড়ি সাধারণ ইঁদুরেরা দখল করে নেবে। জানতে চাইবে, আসল অপরাধী কে?

মোড়ল : তাই তো, তাহলে কী করা যায়?

দপ্তরি : কী আর করবে, তোমার ওই ছড়ি -ঘোরানো দফাদারকে ডাকো!

মোড়ল : ডাকবো? মানে গেছোকে ধরে অনেক পরিশ্রম করেছে তো। এ রকম পরিশ্রান্ত মানুষকে ডাকলে যদি আবার না আসে।

দপ্তরি : সে কি! মোড়লের কথা দফাদার শোনে না, কী অরাজকতা! অবশ্য ডেকেও কোনো লাভ নেই। ও বেটা এসে সেই পুরনো রেকর্ড বাজাবে।

মোল : পুরনো রেকর্ড মানে?

দপ্তরি : এসেই বলবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে।

মোড়ল : নিয়ন্ত্রণে থাকলে তো আর চিন্তার কিছু নেই। তাহলে ডাকি?

দপ্তরি : ডাকো-

মোড়ল : কই, দ-ফাদার!

(দফাদার ম্যাও শব্দ করে প্রবেশ করে।। ম্যাও ডাক শুনে মোড়ল ও দপ্তরি ভয় পায়।)

দফাদার : (ধমক দেয়) এটা কী হচ্ছে? *(মোড়ল ও দপ্তরি স্বাভাবিক হয়।)*

দফাদার : দেখলেন, সব কিছু কেমন আমার নিয়ন্ত্রণে!

দপ্তরি : বলেছিলাম, এসেই পুরোনো রেকর্ড বাজাবে।

দফাদার : এটা কে রে? নেংটি না কি রে?

দপ্তরি : বেটা ধেড়ে! মাথা মোটা!

দফাদার : বিপদের সময় এসব আজেবাজে লোককে ডেকেছেন কেন?

দপ্তরি : কী, আমি আজে বাজে লোক? দপ্তর-প্রধান আজে বাজে লোক! ঠিক আছে আমি চললাম।

দফাদার : থামেন! এবার ধরলে কিন্তু পা ওপরে বেঁধে সাতদিন ঝুলিয়ে রাখব। মনে নেই আগের বারের কথা?

মোড়ল : হ্যাঁ, বলতো আগের বার কী হয়েছিল?

দপ্তরি : কী সাংঘাতিক! আমার সাতশ' খানা বাস। তার অর্ধেকটাই সেবার মেরে দিল এই দফাদার! মূষিককূলের টাকায় বেনামে কেনা আমার সাতশ'খানা এসি বাস!

মোড়ল : মেরে দেবে না, সাধারণ ইঁদুরের টাকায় বাসের ব্যবসা করবে, তাও আবার বেনামে? বেনামে ব্যবসা আমি করছি না?

দপ্তরি : তোমার হেলিকপ্টারের ব্যবসা। করতে তো ভুসিমালের ব্যবসা । বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে গর্তে গর্তে ভুট্টার দানা কুড়িয়ে খেতে- এতো টাকা এল কেথেকে?

মোড়ল : কেন ব্যাংকের টাকা। আমি তোমার মতো সাধারণ ইঁদুরের টাকা মেরে ব্যবসা করছি না।

দপ্তরি : ব্যাংকের টাকা কি সাধারণ ইঁদুরের টাকা নয়? সে টাকা তো সুদ-আসলে এক পয়সাও শোধ করনি। ব্যাংকের লালবাতি জ্বলে গেছে।

মোড়ল : লালবাতি জ্বলুক আর নীল বাতি জ্বলুক, কেউ বিশ্বাস করবে না যে, সাধারণ ইঁদুরের টাকা আর ব্যাংকের টাকা এক।

দফাদার : নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করে এবার বলুন তো, আমাকে কী জন্য ডেকেছেন, আমার সময় কম। হাতে অনেক কাজ।

মোড়ল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাছাড়া তুমি আবার একটা বড় কাজ করে ফেলেছ। ওই গেছো ব্যাটাকে ধরে এনেছ! কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঘটনা তো ঘটেই চলেছে-

দফাদার : ঘটেই চলেছে মানে? বললাম তো সব কিছু নিয়ন্ত্রণে আছে।

মোড়ল : না তা আছে। তবে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রণে আছে, আবার ধর নিয়ন্ত্রণে নাই।

দফাদার : সেটাই তো সুবিধের। এ রকম একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি থাকলে দরবারের কাজ চালানো সহজ হয়।

মোড়ল : তাই নাকি? তাহলে তো ব্যাপারটা গোপন রাখতে হয়। কিন্তু-

দফাদার : আবার কিন্তু কী?

মোড়ল : মানে অঘটনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেটাই শঙ্কার বিষয়।

দফাদার : সংখ্যা দিয়ে নিয়ন্ত্রণের বিচার হয় না। বিচার হয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিয়ে। দেখছেন না, সব কেমন শুনসান। কোনো হৈ চৈ নেই, টু শব্দটি নেই। প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই- সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

মোড়ল : কিন্তু এতটা ঝিমিয়ে পড়া কি ঠিক?

দফাদার : ঝিমিয়ে পড়লে সমস্যা কী? আপনি আপনার কাজ করে যান।

মোড়ল : সেই কাজ করা নিয়েই তো শঙ্কা। ঝিমিয়ে পড়া ব্যাপারটা একটা নেশাগ্রস্ত ঘোরের মতো। আমার ওই শঙ্কা হয়, শেষে আমরাও যদি আক্রান্ত হই, যদি সবাই ঝিমিয়ে পড়ে, তোমার মত করিৎকর্মা মানুষটাও যদি ঝিমিয়ে পড়ে-

দফাদার : না না, এটা কিন্তু ঠিক নয়! আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?

দপ্তরি : অবিশ্বাস করবে না? দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তো অবিশ্বাস করবেই।

দফাদার : আমি দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছি? কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?

দপ্তরি : আসল অপরাধীদের ধরার নাম নেই, কোথাকার কোন এক নিরপরাধ গেছোকে এনে বেঁধে রেখেছে। এতে কাজ হবে? সাধারণেরা কি এ চালাকি বুঝবে না? এই তো একটু আগে ঋষিকেশই ব্যাপারটা প্রমাণ করে দিল। ছি, ছি, কী লজ্জা। ঋষিকেশের চেয়ে ঢের চালাক ইঁদুর সাধারণের মধ্যে রয়েছে।

দফাদার : গেছো যদি নিরপরাধ হয়ে থাকে তো তাকে ছেড়ে দেই।

মোড়ল : সেই ভাল। ছেড়ে দাও।

দপ্তরি : থামো তো তুমি; ! আমি ছেড়ে দেয়ার কথা বলছি না। কৌশলটা যতদিন পারা যায় কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সাধারণের চোখে গেছো যে একজন অপরাধী সেটা তো প্রমাণ করতে হবে।

দফাদার : কে বলেছে গেছো অপরাধী নয়?

মোড়ল : কিন্তু ঋষিকেশ যে প্রমাণ করে দিয়ে গেল।

দফাদার : ঠিক আছে, ওই ঋষিকেশকেই ডাকুন। আমি উল্টো সব প্রমাণ করে দিচ্ছি। কই হে ব্যোমকেশ! *(ঋষিকেশের প্রবেশ।)*

ঋষিকেশ : আজ্ঞে আমি ব্যোমকেশ নই, ঋষিকেশ।

দফাদার : হ্যাঁ ঋষিকেশ, তা তোমার ছেলের নাম গেছো হলো কেন?

ঋষিকেশ : আমার ছেলের নাম বিশ্বজিৎ।

দফাদার : তাহলে সবাই তাকে গেছো বলে ডাকে কেন?

ঋষিকেশ : ছোটবেলায় গাছে গাছে একটু বেশি থাকত তো, তাই সকলে ওকে গেছো বলে ডাকতে শুরু করল।

দফাদার : গাছে গাছে থাকত মানে, নিশ্চয় গাছের ফল চুরি করত?

ঋষিকেশ : তা বাবু, একটু-আধটু-

দফাদার : দেখেছেন, তার মানে তোমার ছেলে চুরি করত।

ঋষিকেশ : কিন্তু এর জন্য কেউ তো কোন অভিযোগ করেনি বাবু।

দফাদার : সাধারণেরা কি অভিযোগ করতে জানে? অভিযোগপত্র মানে- মানে হল-

দপ্তরি : মানে চার্জশীট।

দফাদার : হ্যাঁ, চার্জচিট। চার্জচিট দেওয়ার কাজ হলো পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তার। কাজেই সাধারণেরা অভিযোগ করেনি বলেই প্রমাণ হয় না যে, তোমার ছেলে চোর নয়, জানো, চুরি করা একটা বড় অপরাধ? ছেলে ইসকুল-কলেজে যায়?

ঋষিকেশ : আজ্ঞে না। তবে এক সময় যেত বাবু। আমার তো পড়ানোর সামর্থ নাই। তাই এখন আর যায় না।

দফাদার : কী সাংঘাতিক ! ইসকুলে যায় না!

ঋষিকেশ : ইসকুলে না গেলে কী হবে বাবু, ছেলে আমার অনেক বই পড়ে। কত সব বড় বড় লেখকের লেখা আমাকে পড়ে শোনায়। তাছাড়া আমি এই যে হাড়ি- পাতিল বানাই- এই কাজটা ও খুব ভালো করতে পারে। তারপর ধরেন কৃষি কাজ, ব্যবসার কাজ, আরও কত কাজ। আবার এলাকায় অন্যায়-অত্যাচার হলে তার প্রতিবাদও গেছোই করে।

দফাদার : এতো আরও ভয়াবহ! এক সাথে এতগুলো অপরাধ! পড়ালেখার ব্যাপারেই তো দুটো অপরাধ! একে তো স্কুলে যায় না, তার ওপর সিলেবাসের বাইরের বই পড়ে! আর কী বানাতে সাহায্য করে বললে?

ঋষিকেশ : আজ্ঞে হাড়ি-পাতিল।

দফাদার : তোমার ছেলেকে যদি লেখাপড়া না শিখিয়ে ওইসব হাড়ি-পাতিল বানাতে শেখাও, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের - কী বলে হ্যাঁ, মৃতশিল্প বিভাগ চলবে কী করে?

ঋষিকেশ : কিছু মনে করবেন না বাবু, ওই মৃত্যু না কী শিল্প বললেন-

মোড়ল : আবার কে মারা গেল?

ঋষিকেশ : কেউ মারা যায়নি বাবু। উনি মৃত্যু না কী শিল্প বললেন তাই।

মোড়ল : ও বুঝেছি, মানে মৃতশিল্প। বলো বলো-

ঋষিকেশ : সেই শিল্পের ছেলে-মেয়েরা তো আমার কাছেই অসে। বলে ওদের ওখানে কিছু শিখোয় না।

দফাদার : না না, এটা আরও খারাপ। তোমার মৃতশিল্পে কোনো ডিগ্রি নেই, আর তুমি কি না শিক্ষক সেজে বসে আছ! দরবারের আইন কি সব শিথিল হয়ে পড়ল?

মোড়ল : না, না, দরবারের আইন বড় কড়া।

দফাদার : তাহলে আইন জারি করে দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাট্রিফাইট ছাড়া-

দপ্তরি : আচ্ছা, তোমার মাথার মধ্যে কি সব সময় ফাইট ঘোরাফেরা করে? সবকিছুর মধ্যে শুধু ফাইট খুঁজে পাও? ওটা সাট্রিফাইট না, সার্টিফিকেট।

দফাদার : হ্যাঁ, সাট্রিফিকেট, সাট্রিফিকেট ছাড়া এখন থেকে কেউ হাড়ি-পাতিল বানাতে পারবে না। আর তাছাড়া ওই যে বললে, আরও কী সব কাজ পারে গেছো- বিশেষ করে কৃষিকাজ। এখন থেকে সাট্রিফিকেট ছাড়া কেউ কৃষিকাজও করতে পারবে না।

দপ্তরি : আমার মনে হয়, এতগুলো আলাদা আইন না করে, একটা আইন করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মোড়ল : সেটা কী রকম?

দপ্তরি : সবকিছু শুনে আমার মনে হচ্ছে, গেছো ও ঋষিকেশের মতো ইঁদুরেরা আসলে স্বশিক্ষিত- অর্থাৎ নিজে নিজেই ওরা সব কিছু শিখেছে। কথা হলো, সবাই যদি নিজে নিজেই শেখার চেষ্টা করে তাহলে, প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টারের কর্মকান্ড, গাইড বই, সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- মানে এই ঠেকনামারা প্রতিষ্ঠান-

মোড়ল : ঠেকনামারা প্রতিষ্ঠান আবার কী?

দপ্তরি : ঠেকনামারা প্রতিষ্ঠান হলো প্যালা-প্যালা-দেওয়া প্রতিষ্ঠান। তো এই প্যালা-দেওয়া প্রতিষ্ঠান ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কী হবে?

মোড়ল : তাই তো, কী হবে?

দপ্তরি : তাই আইন করা হোক, এখন থেকে কেউ স্বশিক্ষিত হতে পারবে না।

ঋষিকেশ : বাবু, তাহলে তো হাড়ি-পাতিল বানিয়ে আমিই অপরাধ কইরেছি। আপনি আমাকে আটকে রেখে, আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন!

দফাদার : দেখ, তুমি অপরাধী কী না সে বিচার করার ভার বিচার বিভাগের। আমাদের কাজ হলো অপরাধের অভিযোগ আনা। আগে গেছোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের কাজ শেষ হোক, তারপর তোমারটা ভাবা যাবে। হ্যাঁ, তুমি বলছিলে তোমার ছেলে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এটা তো তোমার ছেলের দেখার কথা নয়, এ দায়িত্ব আইন-শৃখলা রক্ষা বাহিনীর। কিন্তু তোমার ছেলে আইন হাতে তুলে নিয়েছে। অর্থাৎ সে আরও একটা অপরাধ করেছে।

ঋষিকেশ : বাবু, আমি আইন-কানুন অত বুঝিনা। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এটা বুঝি যে, আমার ছেলে গুরুতর কিছু করেনি।

দপ্তরি : দেখ, এমনি কি বলেছি যে স্বশিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। এখন হলো তো!

মোড়ল : ঋষিকেশ! তুমি এখন যাও তো! প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব হলো অপরাধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করা। তুমি তা না করে, উল্টো ছেলের পক্ষে সাফাই গাইছ। অর্থাৎ তুমি নিজেও অপরাধ করছ। তুমি যাও, আমাদের আর বিরক্ত করো না! না হলে তোমাকেও আমরা আটকে রাখতে বাধ্য হব।

ঋষিকেশ : বাবু, একটু দয়া করেন-

দফাদার : বাবু দয়া করেছেন বলেই তো তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যাও বলছি। যাও তাড়াতাড়ি। *(ঋষিকেশ চলে যায়।)*

দফাদার : আচ্ছা! আমিও যাই। আমার অনেক কাজ।

দপ্তরি : যাই মানে? আবার দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা।

দফাদার : সমস্যার সমাধান তো করলাম। আবার কী?

দপ্তরি : সমাধান তো ওই গেছোর মূলা ঝোলান। এ দিয়ে কয়দিন পার পাওয়া যাবে? আসল ম্যাও যখন এক সময়ে আমাদেরও ঘাড় মটকে ধরবে তখন কী করবে?

দফাদার : আমাদের যা লাঠি-সোটা যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে আসল ম্যাও ঠেকান যাবে না।

দপ্তরি : আবার যন্ত্রপাতি কেনার ধান্দা। মানে কমিশন খাওয়ার ব্যবস্থা।

দফাদার : আপনি কমিশন পাবেন না? ফাইলটা তো আপনার দপ্তর হয়েই যাবে।

দপ্তরি : দেখেছ কী বলছে? আমি ভাবছি এই চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা। আর ও কি না কমিশনের খোঁচা দিচ্ছে। আসল সমস্যার কথা ভাবছে না?

মোড়ল : দেখ, আরও লাঠিসোটা লাগলে কিনতে হবে।

দফাদার : হ্যাঁ, আমিও সে কথাই বলছিলাম। আর উনি আসল সমস্যা খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশ্য অরো যন্ত্রপাতি কেনা-বেচার ব্যবসাটা টিকিয়ে রাখতে হলে ইঁদুর-বিড়াল খেলাটাও টিকিয়ে রাখতে হবে।

দপ্তরি : তাই বলে ব্যাপারটা একটা ,সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে না? এটা তো একটা - কী বলে- অসম্ভব রকমের বাড়াবাড়ি ম্যাও হচ্ছে। দেশের ইঁদুরেরা অস্থির। আমাদের দরবারের অবস্থাও নড়বড়ে।

মোড়ল : কে, কে বলে নড়বড়ে? এই যে শক্ত, শক্ত দরবার।

দফাদার : কিন্তু নিয়ন্ত্রণ তো আমার একার হাতে নেই।

মোড়ল : তারমানে? তাহলে আরও লাঠি সোটা কিনে কী লাভ?

দফাদার : লাভ হোক আর লোকসান হোক, বাঁচার চেষ্টার জন্য তো প্রতিনিয়ত লাঠি-সোটা কিনেই যেতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখুন, লাঠি-সোটা কিনবেন কার কাছ থেকে?

মোড়ল : কেন? যার কাছে ভালো লাঠি-সোটা আছে তার কাছ থেকেই কিনব।

দফাদার : তাহলে আসল ম্যাও-এর লাটাইটা যে তার কাছে থাকবে না, এটা কী করে ভাবলেন? আসলে এটা হলো একটা বিশ্ব-

মোড়ল : বিশ্ব! ও হ্যাঁ, ওই ঋষিকেশের ছেলে বিশ্বজিৎ। মানে ওই গেছোটা- ওটাই তো নাটের গুরু-

দফাদার : আরে ধ্যাৎ। এটা হলো বিশ্ব- মানে কী বলব, এটা হলো একটা গোলমাল ফেলখেলনা-

মোড়ল : গোলমাল ফেলখেলনা! ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে।

দপ্তরি : গোলমাল ফেলখেলনা! আমার মনে হয় ও বলতে চাচ্ছে গ্লোবাল ফেনমেনা।

মোড়ল : তাই নাকি! তা বাবা দফাদার! গোলমাল ফেলখেলনা- এমন এটা গোলমেলে-মানে ওজনদার কথা তুমি কোথা থেকে শিখলে?

দফাদার : না, মানে ইদানিং একটু টকশো বেশি শুনি তো- তাই মাঝে মধ্যে এ সব শব্দ একটু-আধটু বেরিয়ে যায়।

মোড়ল : তা বেশ। তুমি যেন গোলমালের কথা কী বলছিলে?

দফাদার : বলছিলাম যে, এটা যেহেতু একটা বিশ্ব সংকট, তাই একা আমার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়।

মোড়ল : তাহলে উপায়?

দফাদার : এই সংকটে বিশ্ববাসীকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে।

দপ্তরি : বিশ্ববাসীর কথা রাখো। আমরা কী করতে পারি তাই বলো।

দফাদার :তাহলে আমাদেরও সম্মিলিতভাবে-

মোড়ল : কেন? সম্মিলিতভাবে কেন? তুমি আছ, আমি আছি, আমাদের দপ্তরি আছে- এর বাইরে আবার অন্যরা কেন?

দফাদার : না, সংকট তো কেবল আমাদের তিন জনের নয়। সংকট যখন সকলের, তখন সবাইকেই এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাছাড়া এর সাথে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষানৈতিক এবং সর্বোপরি মোড়লনৈতিক সংকট যুক্ত। এর সাথে আবার-

মোড়ল : মোড়লনৈতিক? তার মানে আমাকেই এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে।

দপ্তরি : মোড়লনৈতিক মানে হলো রাজনৈতিক। তাছাড়া তোমার তো দায় আছেই।

মোড়ল : যাকগে- দফাদার! তুমি আর যেন কী বলছিলে?

দফাদার : বলছিলাম যে, এর সাথে আবার রয়েছে আমাদের রিলিজিয়াস সেনসিটিভিটি-

মোড়ল : রিলেরেন্স! টকশো শুনে তোমার মাথা একেবারে গেছে, আরে বাবা সাধারণ ইঁদুরীয় ভাষায় বল!

দফাদার :ধর্মীয় সংবেদনশীলতা।

মোড়ল : সঙ!

দফাদার : মানে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি-

মোড়ল : বুঝেছি বুঝেছি, এখন কী করতে হবে তাই বলো!

দফাদার : আমাদের গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, যুবসমাজ, নারীসমাজ, ধর্মীয়গুরু সবাইকে এ বাপারে যার যার স্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

মোড়ল : বেশ বেশ, তাহলে দপ্তরি সবাইকে তাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দাও! এ ক্ষেত্রে কাল বিলম্ব করলে ঠিক হবে না। যাও লেগে পড়ো!

দপ্তরি : হ্যাঁ, যাচ্ছি। সুশীলবাবু, ধর্মগুরু, গণমাধ্যমবাবুরা সব শুনুন- ফেলে কাজ, ভুলে খাওয়া, মোড়ল আজ্ঞা পালন করুন! তবে তার আগে- না, কথাটা কিছুতেই আসছে না বাগে- ও হ্যাঁ, তার আগে স্বশিক্ষা বিষয়ক বিধানটা জারি করা জরুরী।

মোড়ল : স্বশিক্ষা! ও হ্যাঁ, দিচ্ছি, এখুনি দিচ্ছি-

স্বশিক্ষায় বিদ্যালাভ মহা অপরাধ
ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যু তার হইবে নির্ঘাত!
গাইড বই কোচিং ছাড়া যে করিবে পাঠ
বিধান বলে বিদ্যা তার হইবে লোপাট!
এতদ্বারা মোড়ল জারি করিল বিধান
শিক্ষার মেরুদন্ড ভেঙে কর খান খান!

(২)

(গণমাধ্যম কর্মী পাঁচালির সুরে নেচে নেচে মোড়লের বিধান প্রচার করে।)

অতঃপর অন্য বিধান শুনহে সকলে
ম্যাও নিন্দা দেখি এখন সকালে বিকালে!
নিন্দা-মন্দ ভালো নয় বুঝিলেন মোড়ল
ম্যাও কান্ডে অহেতুক কেন সোরগোল?
পরাক্রম ম্যাও শুনে রুষ্ট যদি হন
একূল ওকূল দুকূল যাবে বুঝিবে তখন!
আগে ভক্তি নিয়ে কর তাকে আদর সোহাগ
সঙ্গে একটু মৃদু নিন্দা থাকে যদি থাক।
গণমাধ্যম এই বিষয়ে রাখিবে খেয়াল
অন্যথায় প্রচার যন্ত্রের হইবে বেহাল!
পুরুষ-নারী কৃষক-জেলে কর অবধান
সকল কর্মে থাকে যেন ম্যাও দেবতার মান!
ধর্মশালায় ধর্মগুরু আছেন যত জন

শ্রদ্ধাভরে ম্যাও চর্চার করেন আয়োজন!
এতক্ষণ মোড়ল প্রচার করে গেলাম ভাই
বিধান মতে এই প্রচারে বিরতি যে নাই।

গণমাধ্যম : (পাঁচালি শেষে) একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। ও! (মুখে ফাউন্ডেশন, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়ার অভিনয় করে।)
(ঋষিকেশের প্রবেশ। সে গণমাধ্যমকর্মীর কাজে এসে দাঁড়ায়।)

গণমাধ্যম : সে কি! আপনে ফেমের মদ্দে ঢুক্যা পইড়লেন ক্যা? সর‍্যা যান, সর‍্যা যান!
(ঋষিকেশ কিছু বুঝতে না পেরে একটু সরে দাঁড়ায়।)

গণমাধ্যম : দর্শকমন্ডলী ধেড়ে চ্যানেল থেকে- একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। (চুল ঠিক করে)। বিরতির পর এলাম। ধেড়ে চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানানো বাকি ছিল। স্বাগত জানাচ্ছি এবং একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। (চা খাওয়ার অভিনয় করে) বিরতির পর আবার ফিরে এলাম। দর্শকমন্ডলী, আমাদের এই অনুষ্ঠানের নাম টক থেকে স্পট শো-অর্থাৎ- একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। (মেকআপ ঠিক করে) বিরতির পর আবার বলছি- কী যেন বলছি? ও হ্যাঁ টক থেকে স্পট শো- মানে আমরা কথার চেয়ে ঘটনায় বেশি বিশ্বাসী এবং যেখানেই ঘটনা সেখান থেকেই আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু। দর্শকমন্ডলী এখন আমরা স্পটে আছি। এখানে একটু আগে একটা- বিজ্ঞাপন বিরতি। (বডি স্প্রে ব্যবহার করার অভিনয় করে)
(ঋষিকেশ আবার গণমাধ্যমকর্মীর কাছে এসে দাঁড়ায়।)

গণমাধ্যম : বিরতির পর শুরু করছি। এ কি! আপনে আবার ফেমের মদ্দে ঢুক্যা পইড়লেন?

ঋষিকেশ : কিসের মধ্যে ঢোকার কথা কচ্ছেন? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

গণমাধ্যম : আপনের বোজার কোনো দরকার নাই। হ্যাঁ, এখানে একটু আগে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। সবাই ধারণা করছে, যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার নাম-

ঋষিকেশ : আমার নাম ঋষিকেশ।

গণমাধ্যম : আমি কি আপনের নাম জিজ্ঞেস করচি নাহি?

ঋষিকেশ : না, আমি বলতি চাচ্ছি যে, ওই ম্যাও-

গণমাধ্যম : হ্যাঁ ম্যাও। ওই ম্যাও ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ঘটনাটি খুবই হৃদয় বিদারক- এবং একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর আবার ফিরে এলাম- ফিরে এলাম বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। কেননা বিজ্ঞাপনটি এখনো শেষ হয়নি। আপনারা আপনারা জানেন যে, ধেড়ে চ্যানেলের রয়েছে একটি মানব কল্যাণমুখী বিজ্ঞাপন গীতিমালা। এজন্যে এখানে কথার চেয়ে বিজ্ঞাপনকে-

না না কথার চেয়ে ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এবারে বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর ফিরে এলাম- আপনে এহনো ফেমের মদ্দে খাড়ায়্যা আছেন? কেডো আইসফ্যার ক্যলো আপনেক?

ঋষিকেশ : ওই সকলে আপনাকে দেখিয়ে বললো, ওই যে সাজুগুজু করছে যে দিদিমণি, ওই দিদিমণিকে তোমার ছেলের সমস্যাটা বলো। তাই-

গণমাধ্যম : কেডো ক্যলো আমি সাজুগুজু করচি? সাজুগুজু আমি পছন্দ করি ন্যা।

ঋষিকেশ : না সকলে দূর থেকে দেখে বললো তো-

গণমাধ্যম : সহলে দূর থাক্যা যেডো দেইকচে সেডো মিকাপ, আমার পপেশনাল ডিউটি-

ঋষিকেশ : পচামাল বিউটি! সিডা কী?

গণমাধ্যম : পচামাল বিউটি নয়, প্রফেশনাল ডিউটি। দর্শকমন্ডলী, ধেড়ে চ্যানেলের টক শো অনুষ্ঠানে কথা বলছি। আগেই বলেছি, আমাদের স্পট নিয়েই কাজ বেশি- একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর ফিরে এলাম। স্পট থেকে বলছি। যদিও স্পটে কী ঘটছে, সেটা দেখার সুযোগ আমাদের হচ্ছে না। তবে আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে স্পটে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন দু'জন টক থেকে স্পট বিশেষজ্ঞ। আমার বা দিকে রয়েছেন -মিস্টার ডুয়েল পাম্প।

ঋষিকেশ : পাম্প না, আমার নাম ঋষিকেশ।

গণমাধ্যম : আপনে এহানো এহানে খাড়ায়্যা আছেন? সর‍্যা খাড়ান! ওনাক আইসফ্যার দ্যান! আসুন মিস্টার ডুয়েল পাম্প।

(পাম্প গণমাধ্যমকর্মীর বামে এসে দাঁড়ায়।)

গণমাধ্যম : দর্শকমন্ডলী, আমার ডান দিকে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন, মিস্টার ভেবে নিন যতিন। না না, আপনারা ভাববেন না। উনি হলে মিস্টার ভেবেনিন যতিন। *(যতিন গণমাধ্যমকর্মীর ডানে দাঁড়ায়।)*

গণমাধ্যম : হ্যাঁ, ওনারা দু'জন স্পট বিশেষজ্ঞ। অবশ্য স্পটে কী ঘটেছে তা ওনারা জানেন না। নিশ্চয়ই কথা বলতে বলতে জেনে যাবেন। বিশেষজ্ঞ হবার এটাই সুবিধে আপনারা জানেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও জানি না স্পটে কী ঘটেছে। তবে যাই ঘটুক, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো ম্যাও। (পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করে কানে লাগানোর অভিনয় করে।) এই কী হত্যাচে? ফোন দিত্যাছাও ক্যা? কচিন্যা আমি লাইভে আচি। কী! ধেড়ে চ্যানেল দেখত্যাছাও না? তালে নিশ্চয় অন্য চ্যানেল কারও দিকে হা কর‍্যা তাকায়্যা আছ। খাড়াও, আমি অনুষ্ঠান শ্যাষ কর‍্যা আইসত্যাছি- তারপর দেহামুনি-হ্যাঁ দর্শকমন্ডলী, এ বিষয়ে আমি প্রথমেই মিস্টার ডুয়েল পাম্পের মতামত জানতে চাইব। মিস্টার পাম্প! এ বিষয়ে

আপনার মতামত কী?

পাম্প : হ্যাঁ, এই বিষয়ে তো, মানে আপনার যার সাথে রিলেশন , তার এই মুহূর্তে ফোন করাটা উচিৎ হয়নি।

গণমাধ্যম : এ বিষয়ে আপনার মতামত চাওয়া হয়নি মিস্টার পাম্প।

যতিন : এ বিষয়ে ওনার কিঞ্চিত দূর্বলতা আছে তো। তাই কারও পারসোনাল বিষয় পেলেই তার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

পাম্প : আপনি চুপ করুন। আমি যেটা-

গণমাধ্যম : হ্যাঁ, যেটা - একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর আবার ফিরে এলাম। মিস্টার ভেবেনিন যতিন! মিস্টার পাম্প বলেছিলেন যেটা। এই যেটা বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

যতিন : যেখানেই ঘট-

গণমাধ্যম : হ্যাঁ ঘটো- দর্শকমন্ডলী আমাকে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নিতেই হচ্ছে। তবে কথা দিচ্ছি বিরতির পর আমরা এই ঘটো থেকেই শুরু করব। বিরতির পর আবার ফিরে এলাম। দর্শকমন্ডলী, আপনার টক থেকে স্পট উপভোগ করছেন। অবশ্য ম্যাও বিষয়ক হৃদয়বিদারক ঘটনার পর উপভোগ শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হলো কি না - ঠিক হলো কি না- সেটা আমি পরে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জেনে নেব। হ্যাঁ মিস্টার ভেবেনিন যতিন ! আপনি বলেছিলেন এই ঘটো-(হঠাৎ কাতুকুতু লাগার মতো হাসতে থাকে। সেলফোন বের করে কানে লাগানোর অভিনয় করে।) এই, সুড়সুড়ি দিত্যাছাও ক্যা? সুড়সুড়ি দিত্যাছাও না মানে? আমি মিছা কথা কত্যাছি? আমার ইস্কিনটাইট প্যান্টের পকেটে রাখা ফোনে ভাইবেটর দেওয়া আছে। সুড়সুড়ি লাগে না বুঝি? ইয়ার্কি হত্যাছে আমার সাথে? সমাজের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ আছে তোমার? কতবার কচি, টক থাক্যা পট শো দেহ- অনেক জ্ঞান হোবো- বেকারত্ব ঘুচ্যা যাইব। কিন্তু তুমি - কী কাট্যা দিল এভাবে আমাকে অপমান- ঠিক আছে- আমিও - ইয়ে হিঃ হিঃ মিস্টার ভেবেনিন যতিন, আপনি বলেছিলেন এই ঘটো-

যতিন : হ্যাঁ, ঘটনা তো নিজের কানেই- মানে নিজের চোখেই দেখলাম। মানে আপনার মতো বয়স তো একসময় আমাদেরও ছিল- মানে ওই সুড়সুড়ি! আচ্ছা আপনার ওই বালক বন্ধুর বয়স নিশ্চয় আপনার চেয়ে কম? মানে এটা তো আজকাল ফ্যাশন হয়ে গেছে-

পাম্প : থামুন! একটু আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে কারও পারসোনাল বিষয়ে নাক গলানো যাবে না। এখন তো দেখছি আপনি নিজেই বালক বন্ধু সেজে বসে আছেন।

গণমাধ্যম : থামুন আপনারা! এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়নি। হ্যাঁ, মিস্টার পাম্প! ভেবেনিন যতিন বলছিলেন এই ঘটো- এই ঘটো বিষয়ে আপনার যদি কিছু বলার থাকে- খুব সংক্ষেপে বলুন!

পাম্প : আমার একটাই-

গণমাধ্যম : হ্যাঁ, ওনার একটাই- দর্শকমন্ডলী আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ। জানিয়ে রাখি, এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হবে, রাত একটা সাড়ে এগারো মিনিটে, দুইটা বাষট্টি মিনিটে, তিনটা পঁচিশে, চারটা তেইশে, পাঁচটা আঠাশে, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা, পনেরটা.....

(গণমাধ্যমকর্মী চলে যায়। পাম্প ও যতিন তর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে কিছুই বোঝা যায় না। এক পর্যায়ে হাতাহাতির উপক্রম হলে পাশ থেকে ঋষিকেশ এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়।)

ঋষিকেশ : থামেন! থামেন আপনারা! আপনারা কি করতিছেন?

পাম্প : নাচতিছি আর গান গাতিছি। দেখতে পাচ্ছ না, আলোচনা করছি-বিশেষজ্ঞ-পর্যায়ে আলোচনা!

ঋষিকেশ : তা আলোচনা বটে। কিন্তু বাবুরা, আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনারা মারামারি করছেন।

যতিন : মারামারি করব কেন? আমরা কি মূর্খ? আমরা বিশেষজ্ঞ।

ঋষিকেশ : আপনারা বিশেষজ্ঞ আর আমি হলেম অজ্ঞ। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের আলোচনা কি কেউ শুনছে?

পাম্প : মূর্খ! দেখতে পাচ্ছ না, টিভিতে লাইভ অনুষ্ঠান চলছে! সবাই শুনছে। সামনে ক্যামেরা রয়েছে।

ঋষিকেশ : কই ক্যামরা রয়েছে? সামনে তাকিয়ে দেখেন, ক্যামেরা তো সেই দিদিমণি কখন নিয়ে চলে গেছে। *(দু'জনে তাকিয়ে দেখে ক্যামেরা নেই।)*

পাম্প : এভাবে অপমান! আমি কত প্রস্তুতি নিয়ে এলাম ! এই আপনি, আপনার জন্যেই এমন হলো! কথা বলতে দিচ্ছে না- তবু আপনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না!

যতিন : আপনি করলেই পারতেন। আমাকে বলছেন কেন? আসলে সবাই নিজের দায়িত্ব ভুলে যায়। অথচ অন্যের কাছ থেকে প্রতিবাদ আশা করে।

পাম্প : আরে রাখেন আপনার এইসব তত্ত্বকথা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমি অনুষ্ঠান দেখার জন্যে কত বন্ধু-বান্ধবকে এস এম এস করেছি জানেন? তারা দেখে কী ভাববে! কথাই তো বলতে পারলাম না। কী লজ্জার ব্যাপার!

যতিন : লজ্জার কিছু নেই। ওরকম এসএমএস সবাই করে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ দেখে না ।না দেখেই পাল্টা একটা এসএমএস করে অভিনন্দন জানায়।

খোঁজ নিয়ে দেখবেন। কিন্তু আমার কষ্টটা অন্য জায়গায়।

পাম্প : সেটা কী রকম?

যতিন : আরে ভাই, আমি অনেক টাকা খরচ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে টকশো বিষয়ে একটা ডিগ্রি নিলাম, অথচ আমাকে কোনো কথাই বলতে দিল না।

পাম্প : প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি তাও আবার টকশো বিষয়ে! এই জনেও তো টকটি নট। মানে কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না। প্রতিবাদ যে করতে পারে না, তার কথা কেউ শোনে?

যতিন : তাহলে সে দলে তো আপনিও পড়লেন। আপনি প্রতিবাদ করেছেন? আমার তো তাও একটা ডিগ্রি আছে। আপনার তো তাও নেই।

পাম্প : আরে যান যান, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারীদের সাথে আমি কোনো কথা বলি না। টকশো বিষয়ে ডিগ্রি! কী হাস্যকর ব্যাপার!

যতিন : যাবেন মানে! কেবল টকশো বিষয়ে নয়, আমার আরো একটা ডিগ্রি আছে। হস্ত-পদ ছোঁড়াছুড়ি ডিগ্রি- আর এই ডিগ্রিটা নিয়েছি পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে।

পাম্প : পাবলিক ইউনিভার্সিটির ওই ডিগ্রিটা আমারও আছে। কী বলতে চাইছেন আপনি-

যতিন : কী বলতে চাচ্ছি মানে? দেখুন, মুখ সামলে কথা বলবেন! কী ভেবেছেন আপনি- (দু'জনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। ঋষিকেশ মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। থামানোর চেষ্টা করে। এ সময় যতিন একটু দূরে পড়ে থাকা একটা চেলাকাঠ আনতে যায়। পাম্প ঋষিকেশকে যতিনের সামনে ফেলে পালিয়ে যায় দ্রুত। যতিন ঋষিকেশের ওপরেই চড়াও হয়।)

যতিন : আমাকে এভাবে অপমান ! আমি দেখে নেব! (ঋষিকেশকে মারতে থাকে) কী যেন নাম বললেন আপনার? এ্যাঁ- পাম্প (ঋষিকেশকে একটা লাথি মেরে চলে যায়)। *(আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ঋষিকেশ। কাঁদতে থাকে।)*

ঋষিকেশ : আজ্ঞে পাম্প না বাবু, আমি ঋষিকেশ-

(৩)

(গুনগুন করে ভক্তিমূলক গান গাইছে ধাড়িবাবা। তার হাতে রহস্যজনক কিছু একটা। সেটা নিয়ে সে ব্যস্ত। এক পর্যায়ে রহস্যজনক বস্তুটা নিচে রাখে সে। এ সময় হঠাৎ ম্যাও শব্দে তার মনযোগে ছেদ পড়ে।)

ধাড়িবাবা : (রহস্যজনক বস্তুর উদ্দেশ্যে) আচ্ছা, দিচ্ছি দিচ্ছি- (আবার ম্যাও ডাক শোনা যায়) এই কেরে তুই? আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস! না, দিল তো মনযোগটা নষ্ট করে! না, না, মনযোগ নষ্ট হলে চলবে না- (আবার গুনগুন করে

গাইতে শুরু করে। এ সময় আবার ম্যাও ডাক শোনা যায়)। এই, আবার! খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু ! এ নিশ্চয় ওই গেছোটার কাজ। কোনো লেখাপড়া নেই। সারাদিন গাছে গাছে আর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবে আর ভয় দেখাবে। তা দেখাক। তাই বলে মনযোগ নষ্ট হলে চলবে না। যেভাবেই হোক মনযোগটা ধরে রাখতে হবে। (আবার গুনগুন করে এবং আবার ম্যাও শোনা যায়।) এই! আমার কথা কানে যাচ্ছে না? বার বার ভয় দেখাচ্ছিস আর মনযোগ নষ্ট করে দিচ্ছিস? কিন্তু গেছোটাকে শুনেছি বেঁধে রেখেছে। তাহলে ভয়টা দেখাচ্ছে কে? আসলে মনে হচ্ছে, ভয়টা মনের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে। তা বাধুক, তাই বলে অমনযোগী হলে চলবে না- সব কাজে মনযোগটা খুবই জরুরী। (আবার গুনগুন করে গান গায় এবং সেই সাথে নেপথ্যে ম্যাও শোনা যায়।) মারব এক থাপ্পর, গেছো কোথাকার-

(ঋষিকেশের প্রবেশ।)

ঋষিকেশ : আজ্ঞে আমি গেছো নই, গেছোর বাবা, ধাড়িবাবা।

ধাড়িবাবা : আমিও বাবা, তুইও বাবা? দু'জনে বাবা হলে চলবে কী করে?

ঋষিকেশ : আজ্ঞে আমি বাবা নই, আমি হলাম গেছোর বাবা।

ধাড়িবাবা : আবার বাবা! কী বললি? গেছোর বাবা? ওরে বাবা, তুই আবার আমাকে ভয় দেখাবি না তো?

ঋষিকেশ : বাবা, আমার ছেলেটাকে ওরা বেঁধে রেখেছে।

ধাড়িবাবা : বেঁধে রেখেছে? বেশ করেছে। তুই কোনো চিন্তা করিস না। আমার কাছে যখন এসেছিস একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে তোর পরিচয়টা জানা জরুরি। তা তুই যেন কে?

ঋষিকেশ : আজ্ঞে আমি গেছোর বাবা ঋষিকেশ।

ধাড়িবাবা : বেশ বেশ! কিন্তু আমি তো সে পরিচয় জানতে চাইনি। আমি জানতে চেয়েছি তোর পরিচয়।

ঋষিকেশ : না, এতো একটা ঘোড়ের মধ্যে পড়ে গেলাম মনে হচ্ছে! কী জানতে চাচ্ছেন আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না?

ধাড়িবাবা : বুঝতে পারছিস না তো? কোনো চিন্তা করিস না- আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কানটা আমার মুখের সামনে আন! কথাটা আবার খুব আস্তে- মানে জোরে বলা যাবে না।

(ঋষিকেশ ধাড়িবাবার কাছে এসে কান পেতে দাঁড়ায়।)

ধাড়িবাব : (চিৎকার করে) ট্যাকে কিছু আছে?

ঋষিকেশ : আমার তো কিছুই নাই, ট্যাক থাকবে কোথা থেকে বাবা?

ধাড়িবাবা : ও , ট্যাক নেই না? ঠিক আছে ঠিক আছে, তারও ব্যবস্থা আছে। আমার

কাছে যখন এসেছিস, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি আবার কাউকে না করতে পারি না বুঝলি।

ঋষিকেশ : একটা উপায় করেন বাবা! ছেলেটাকে ছাড়িয়ে দিন!

ধাড়িবাবা : হবে হবে- তার আগে দেখতে হবে কোন প্যাকেজটা তোর জন্য বরাদ্দ রয়েছে।

ঋষিকেশ : প্যাকেজ আবার কী বাবা?

ধাড়িবাবা : বুঝলি না তো? আমি তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার ওই এম আই এস বুঝলি-

ঋশিকেশ : এম এ শেষ!

ধাড়িবাবা : এম এ শেষ নয়। গাধা কোথাকার! এম আই এস- মানে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম।

ঋষিকেশ : ওরে বাবা!

ধাড়িবাবা : হ্যাঁ, আরও আছে ডি এস এস-

ঋষিকেশ : বি এস এস!

ধাড়িবাবা : গাধা কোথাকার! শুধু এম এ, বি এ টেনে আনছিস! আমি এম এ বি এ বলেছি? আমি বলেছি ডি এস এস। মানে হলো ডিসিসন সাপোর্ট সিস্টেম। আগে ম্যানেজার রাখতুম। এখন ওদের লাগে না। দাঁড়া, ব্যাপারটা তোকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সব ওই নানারকম তথ্য এম আই এস - এর মধ্যেই থাকে। তো এই এম আই এসের একটি প্রোগ্রামের নাম হলো - যেমন ট্যাক তেমন প্যাক।

ঋষিকেশ : প্যাক প্যাক!

ধাড়িবাবা : ধ্যাৎ, গাধা কোথাকার! হাঁস নাকি যে প্যাক প্যাক করবে? এটা হলো ট্যাক-প্যাক। মানে যার যেমন ট্যাকের অবস্থা, তার জন্যে তেমন ব্যবস্থা। প্যাক মানে হলো প্যাকেজ। এখন দেখতে হবে, তোর জন্যে কত নম্বর প্যাকেজটা বরাদ্দ আছে। তোর ট্যাক নেই বললি তো?

ঋষিকেশ : নেই বাবা।

ধাড়িবাবা : তা তোর সমস্যাটা যেন কী?

ঋষিকেশ : আমার ছেলে গেছো-

ধাড়িবাবা : হ্যাঁ গেছো- গেছো এবং ট্যাকহীন প্যাক- এই যে তিন হাজার ১২শ ৫৮ নম্বর।

ঋষিকেশ : তিন- তিন হাজার ১২শ ৫৮!

ধাড়িবাবা : হ্যাঁ, পরিষ্কার লেখা আছে, গেছোর মুক্তির জন্যে তোকে আষাঢ় মাসের মুষলধারার বৃষ্টিতে এক নাগাড়ে ১০৭ দিন ভিজতে হবে। একেবারে জলের

মতো সহজ ব্যবস্থা- খালি জলে ভেজা। পারবি তো?

ঋষিকেশ : হ্যাঁ বাবা, ছেলের জন্যে আমি সব করতি পারবো। (হঠাৎ একটু ভেবে) কিন্তু বাবা-

ধাড়িবাবা : কিন্তু কী?

ঋষিকেশ : আষাঢ় মাসে তো ৩১ দিন , আমি ১০৭ দিন ভিজবো কী করে?

ধাড়িবাবা : ও, ৩১ দিন নাকি, ঠিক অছে এ বছর না হলে পরের বছর ভিজবি, তাতেও না হলে তার পরের বছর-

ঋষিকেশ : বাবা!

ধাড়িবাবা : আবার বাবা!

ঋষিকেশ : আষাঢ় মাসের সব দিন কি মুসলধারে বৃষ্টি হয়?

ধাড়িবাবা : ও হয় না, ঠিক আছে যে দিন যে দিন হয়, সে দিন সে দিন ভিজবি।

ঋষিকেশ : এভাবে তো পঁচিশ তিরিশ বছরও লেগে যেতে পারে বাবা!

ধাড়িবাবা : লাগুক, তোর অসুবিধা কি? তোর কাজ কেবল ভিজে যাওয়া। তবে-

ঋষিকেশ : তবে?

ধাড়িবাবা : তবে একটা কথা মনে রাখবি, বৃষ্টিতে ভিজে যদি কখনো সর্দি-জ্বর হয়, তাহলে আবার গোড়া থেকে ভিজতে শুরু করতে হবে। পারবি তো?

ঋষিকেশ : বুঝেছি বাবা, এ জনমে আর ছেলেকে মুক্ত করতে পারব না (চলে যায়)

ধাড়িবাবা : এই তো বুঝেছিস, পারবি পারবি, তোকে দিয়েই হবে-

(হঠাৎ নেপথ্যে আবার 'ম্যাও' ডাক শোনা যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে একটি নেংটি ইঁদুর।)

ধাড়িবাবা : এই আবার! তুই কেরে?

নেংটি : আমি নেংটি বাবা।

ধাড়িবাবা : ও, নেংটিবাবা! আমি হলাম ধাড়িবাবা। তা নেংটিবাবা হয়ে ধাড়িবাবার কাছে এলি কেন?

নেংটি : না না, আপনিই বাবা। আমি একজন সাধারণ নেংটি।

ধাড়িবাবা : তা তোকে আবার কে নেংটো করলো? নিশ্চয়ই ওই গেছোটা?

নেংটি : না বাবা, গেছো নয়।

ধাড়িবাবা : ও, গেছো নয়? মানে একটু আগে ওই গেছোর বাবা এসেছিল তো। আমার কাছে থেকে একটা যুতসই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে গেল। তাই ভাবলাম, গেছোটা ছাড়া পেয়েই বোধহয় আবার শুরু করেছে।

নেংটি : গেছো তো এখনো ছাড়া পায়নি ধাড়িবাবা। আমি একনই শুনে এলাম।

ধাড়িবাবা : ছাড়া পায়নি? মনটা তুই খুব খারাপ করে দিলিরে!

নেংটি : কিন্তু বাবা, আমার যে সর্বনাশ করে দিল।

ধাড়িবাবা : তা দিক- তা দিক, আমার কাছে যখন এসেছিল তখন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা তোর সর্বনাশটা কে করলো?

নেংটি : ম্যাও-

ধাড়িবাবা : আবার ম্যাও! তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস?

নেংটি : না বাবা, ম্যাও সকলের সব সর্বনাশ করে দিচ্ছে। আমার ছেলেটাকে সকালে ধরে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে বোধহয় মেরে ফেলেছে বাবা!

ধাড়িবাবা : তা মারুক, তা মারুক, আমার কাছে যখন এসেছিল, তখন একটা উপায় হয়ে যাবে। তা তোর সমস্যাটা যেন কী?

নেংটি : ম্যাও।

ধাড়িবাবা : আবার ম্যাও বলে ভয় দেখাচ্ছিস?

নেংটি : ম্যাও ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে। একটা উপায় করেন বাবা।

ধাড়িবাবা : দাঁড়া দাঁড়া, দেখি ট্যাক প্যাকে কী আছে। তুই তো নেংটি, ট্যাক রাখার তো জায়গা নেই তোর? তবু দেখি তোর জন্যে কত নম্বর প্যাকেজ রয়েছে। আমি আবার কাউকে না করতে পারি না বুঝলি। (গুনগুন করে একটা ভক্তিমূলক গানের প্রথম কলি গায়। বুঝতে না পেরে নেংটিও সাথে সাথে গাইতে থাকে।) ধেৎ! দিলি তো মনযোগটা নষ্ট করে। তা তোর সমস্যাটা যেন কী?

নেংটি : আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বাবা।

ধাড়িবাবা : আর বলতে হবে না। আমর কাছে যখন এসেছিস তখখন সব সমস্যার সমাধান করে দেব।

নেংটি : কখন দেবেন বাবা?

ধাড়িবাবা : এই যে এখনই দিচ্ছি- অমাজোৎস্না কবজ।

নেটি : অমাজোৎস্না কবজ কী বাবা?

ধাড়িবাবা : গাধা, ধেড়ে, নেংটি- অমাজোৎস্না কবজ চিনিস না! অমাবস্যার জোৎস্নারাতে যে কবজ ধারণ করতে হয়, সেটাই হলো অমাজোৎস্না কবজ।

নেংটি : কীভাবে ধারণ করবো বাবা?

ধাড়িবাবা : বলছি, শোন মনযোগ দিয়ে (মন্ত্রপাঠের মতো করে) ঘোর- *(নেংটি ঘোরে।)*

ধাড়ি বাবা : ধেৎ! তোকে কে ঘুরতে বলেছে? ঘোর অমাবস্যার ফুটফুটে জোৎস্না রাতে-

নেংটি : অমাবস্যার জোৎস্না রাতে!

ধাড়িবাবা : হ্যাঁ, ঘোর অমাবস্যার ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে এই কবজ দূরপাল্লার চলন্ত চাকার পায়ে বেঁধে দিতে হবে।

নেংটি : দূরপাল্লার চলন্ত ট্রেনের চাকা! চলন্ত চাকায় কবজ বাঁধব কেমন করে বাবা?

ধাড়িবাবা : ও, বাঁধা যাবে না বলছিস? দেখি তাহলে ভেবে-

(গুন গুন করে গায়। নেংটিও সঙ্গে সঙ্গে গায়।)

ধাড়িবাবা : ধেৎ! বার বার মনযোগ নষ্ট করে দিচ্ছিস! তা তোর সমস্যাটা যেন কী?

নেংটি : ম্যাও।

ধাড়িবাবা : হ্যাঁ, ম্যাও। ম্যাও দেবতা রুষ্ট হয়েছেন!

নেংটি : রুষ্ট!

ধাড়িবাবা : রুষ্ট মানে ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত! যেহেতু ম্যাও দেবতা রুষ্ট হয়েছেন, সেহেতু তাকে তুষ্ট করতে হবে।

নেংটি : কীভাবে তুষ্ট করবো বাবা?

ধাড়িবাবা : ম্যাওদেবতার নামে বিশ্বব্যাপী ৭২ টেরাবাইট ম্যাওসংকেত্তন করতে হবে।

নেংটি : বিশ্বব্যাপী ৭২ টেরাবাইট সংকেত্তন করব?

ধাড়িবাবা : ধেড়ে, ইঁদুর, তোকে কিছু করতে হবে না। আরে গাধা, তোদের ওই কী বলে ওকে- হ্যাঁ ওই সামাজিক গোলযোগ মাধ্যম আছে না।

নেংটি : সামাজিক গোলযোগ মাধ্যম! কিন্তু বাবা আমি তো শুনেছি সামাজিক মাধ্যম।

ধাড়িবাবা : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম! সমাজের কোথাও যাওয়া নেই, কারো সাথে দেখা নেই, কথা নেই, সমাজের ভালো - মন্দের খোঁজ রাখা নেই, সমাজের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ নেই কেবল ঘরে বসে টেপাটেপি, এটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, নাকি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মাধ্যম?

নেংটি : কিন্তু বাবা, সবাই তো ঘরে বসেই টেপাটেপি করছে?

ধাড়িবাবা : ও, সকলে ঘরে বসেই টেপাটেপি করছে বলছিস? তো কর, তুইও তাই কর! কিন্তু মনে রাখবি, ম্যাও দেবতার নামে বিশ্বব্যাপী ৭২ টেরাবাইট ম্যাওসংকেত্তন করতেই হবে।

নেংটি : সংকেত্তন কী বাবা?

ধাড়িবাবা : গরু, মোষ, ছাগল, পেরেক, তারকাটা! সংকেত্তন কী জানিস না?

ধাড়িবাবা : ও গালাগালি নয়, এগুলো গালাগালি নয় বলছিস? তাহলে কী বলে গালাগালি দেই তোকে বলত? আচ্ছা তোর সমস্যাটা যেন কী?

নেংটি : ম্যাও, ম্যাও সংকেত্তন-

ধাড়িবাবা : হ্যাঁ ম্যাও সংকেত্তন হলো - ম্যাও সংকেত্তন।

নেংটি : ম্যাওসংকেত্তন হলো ম্যাও সংকেত্তন?

ধাড়িবাবা : ইয়ে মানে কেত্তন, সংকেত্তন- ধর আমার সাথে- হুলো-

নেংটি : মূলো-

ধাড়িবাবা : ধ্যাৎ! মূলো খেয়ে খেয়ে, মুখ দিয়ে শুধু মূলোই বের হচ্ছে। ধর ঠিক মতো- হুলো- ও হুলো- ও হুলো রে- মেচির আহ্বানে হুলো কী সাড়া না দিয়ে পারে? হুলো তখন বলছে, মেচি মেচি রে, ও মেচি-

(বাদ্যযন্ত্রসহ সকল অভিনেতা - অভিনেত্রী নাচতে নাচতে ধাড়িবাবাকে ঘিরে দাঁড়ায়।)

সমবেত : হুলো বিলাই হুলো বিলাই

বিলাই বিলাই হুলো হুলো।
মেচি বিলাই মেচি বিলাই
বিলাই বিলাই মেচি মেচি।

(গাইতে গাইতে সবাই ঘোরের মধ্যে চলে যায়। এক পর্যায়ে নিঃশব্দে কেবল তালে তালে শরীর দোলাতে থাকে। এমন সময় চারপাশ থেকে বিকট ম্যাও ডাক শোনা যায়। ভয়ে সবাই ধাড়িবাবার সাহায্য চায়।)

ধাড়িবাবা : শান্ত হও ভক্তকূল, শান্ত হও! ভক্তের ডাকে ম্যাও দেবতা কি সাড়া না দিয়ে পারে? ভক্তকূল দেখ, তোমাদের ভক্তির জোরে স্বয়ং ম্যাও দেবতা হাজির হয়েছেন। তোমরা তাকে তুষ্ট কর! আমি প্রস্থান করি। আমার আবার অন্যস্থানে ২৫ টেরাবাইট সংকেত্তন সমাপ্ত করতে হবে।

(ভয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ধাড়িবাবা। ক্রমাগত ম্যাও ডাক বাড়তে থাকলে সবাই ভয়ে ছুটে পালায়।)

(৪)

(মোড়ল চেয়ার আগলে আছে। আতঙ্কগ্রস্ত অন্য সকলে মোড়লের কাছে প্রতিকার চাইতে আসে।)

মোড়ল : আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম দপ্তরি, সকলেই যদি ঝিমিয়ে পড়ে তাহলে এক সময় আমরাও আক্রান্ত হব। এখন সেই সময় উপস্থিত। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম, কোনো দিক খোলা নেই দপ্তরি। চারদিকে কেবল ক্ষমতা লোভী ভীষণমূর্তি ম্যাও!

দপ্তরি : দফাদার কোথায়? বিপদের সময় বেটা ঠিক সটকে পড়েছে! ওই বেটাই তো বলেছিল, ওকে অবিশ্বাস করা ঠিক হচ্ছে না। এখন কী হলো? বিশ্বাস রাখলো? আমাদের বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে গেল। আমার তো সন্দেহ হয়, ম্যাওদের সাথে ওই বেটার একটা যোগসাজস থাকা বিচিত্র নয়, কী লাভ হলো এতসব লাঠি-সোটা কিনে? *(দফাদারের প্রবেশ।)*

দফাদার : লাটাইয়ের কথা আপনারা ভুলে গেছেন মনে হচ্ছে। আমি কি বলিনি যে, আমার একার পক্ষে এটা সামলানো সম্ভব নয়? এটা একটা বিশ্ব-

মোড়ল : মানে তোমার সেই গোলমাল ফেলখেলনা ? ও সব গোলমেলে কথা বাদ দিয়ে এখন কী করা যায় তাই বলো!

দফাদার : আপনি বিধান জারি করলেন সকলের জন্যে, তাদের বাদ দিয়ে এখনি কেবল আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কী করা যায়?

মোড়ল : সকলের জন্যে বিধান তো তুমিই জারি করতে বলেছিলে দফাদার। তুমি বলেছিলে, সম্মিলিতভাবে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে- সুশীল সমাজ, নারী সমাজ, যুব সমাজ, ধর্মীয়গুরু- বলনি তুমি?

দপ্তরি : নিজের দায় এড়ানোর জন্যেই এই কুবুদ্ধি দিয়েছিল দফাদার।

দফাদার : কী বললেন, আমি দায়িত্ব এড়িয়ে গেছি? কুবুদ্ধি দিয়েছি আমি? এটা কিন্তু যথেচ্ছ বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

দপ্তরি : মানলাম যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কিন্তু তোমার সেই বিখ্যাত পুরনো রেকর্ড- সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, দেখছেন না- সব কেমন শুনসান, কোনো প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই-

মোড়ল : ঠিক ঠিক। তাহলে দফাদার এখন সবকিছু তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই কেন?

দফাদার : এখনো তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণেই আছে। এই যে ম্যাও চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে আছে- তাতে কোনো প্রতিবাদ দেখতে পাচ্ছেন?

দপ্তরি : কথার মারপ্যাঁচে পার পাওয়া যাবে না দফাদার। ভুলে যেও না, সকলের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব তোমার।

দফাদার : আমার একার দায়িত্ব যে নয়, এটা তো আপনারা মেনে নিয়েছেন।

ঋষিকেশ : বাবুরা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করে তো এই বিপদের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। সাধারণের নিরাপত্তার দায়িত্ব তো আপনাদের ওপরেই। সে দায়িত্বটা যদি আপনারা পালন করতে না পারেন- তাহলে দায়িত্বটা আগলে আছেন কেন বাবুরা?

দপ্তরি : দেখ, স্বশিক্ষার মাহাত্ম দেখ! বেটা এখন দায়িত্ব থেকে আমাদের সরে যেতে বলছে! নিশ্চয় বেটা ওই ম্যাও - এর চর। আমি হলপ করে বলতে পারি, ওই স্বশিক্ষা বিষয়ক বিধানটা অত্যন্ত সঠিক ও সময়োপযোগী ছিল।

মোড়ল : হ্যাঁ, বিধানটা জারির পরামর্শ যেহেতু তোমার ছিল, সেহেতু সেটা তো উত্তম হতেই হবে। শোনো দপ্তরি, ব্যোমকেশ- না মানে আমাদের ঋষিকেশ ঠিকই বলেছে! দায়িত্ব পালন করতে না পারলে দায়িত্বে থেকে লাভ কী? ঠিক আছে ঋষিকেশ, তুমি এই বিপদ থেকে রক্ষার পথ বাতলে দাও- আমরা দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি।

ঋষিকেশ : এখানে তো সুশীলবাবু, গণমাধ্যমবাবু, ধর্মীয়বাবু, যুববাবু- সকলেই আছেন। বাবুরা এই বিপদে চুপ থাকবেন না, দয়া করে কথা বলে নে ! এ বড় ভয়ানক বিপদ বাবু!

মোড়ল : বলেন সুশীল বাবুরা! আপনারা তো বুদ্ধিজীবীও বটে। সাধারণেরা তো আপনাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে।

পাম্প : মোড়লবাবু! আমার মনে হয় একটা শক্ত করে বিবৃতি দেওয়া যেতে পারে।

মোড়ল : হ্যাঁ, শক্তপোক্ত একটা বিবৃতি। কী ঋষিকেশ বাবু, চলবে?

দপ্তরি : আমার তো মনে হয়, বিবৃতির কথা শুনেই ম্যাও পালিয়ে যাবে, বিবৃতি লেখার আর দরকার পড়বে না।

পাম্প : ঠিক আছে বিবৃতি পছন্দ না হলে ইঁদুর বন্ধন করতে পারি।

মোড়ল : এটা পছন্দ হয়, ঋষিকেশ বাবু?

দফাদার : বেশ নির্ঝঞ্ঝাট এবং নিরামিষ কর্মসূচি। খুবই ভালো ব্যবস্থা। তবে আমি ভাবছি ম্যাওদের এটা পছন্দ হবে কিনা! ওরা তো আবার একটু আমিষ পছন্দ করে।

যতিন : আমার মনে হয় সব থেকে মোক্ষম অস্ত্র হলো টকশো। একেবারে বাক্যবাণ।

পাম্প : হ্যাঁ মোড়লবাবু! ওনার আবার এ বিষয়ে একটা ডিগ্রিও আছে- অনেক অর্থ ব্যয় করে ডিগ্রিটা উনি অর্জন করেছেন।

যতিন : খোঁচা মারবেন না! নেহাত একটা বিপদের মধ্যে আছি। না হলে আমার অন্য ডিগ্রিটার ধার কতটা, তা আর একবার প্রমাণ করে দিতাম।

ঋষিকেশ : বাবু! ওই ডিগ্রিটার ধার তো উনি বুঝবেন না- ওটা খানিকটা বুঝেছি আমি। কী শুরু করেছ তোমরা? ওসব ডিগ্রি দিয়ে কী হবে? ম্যাওতাড়ুয়া ডিগ্রি থাকলে সেটা বলো!

দপ্তরি : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। কাকতাড়ুয়া হবে না কেন?

মোড়ল : থামো তো তুমি! গণমাধ্যম দিদিমণি বলুন তো, কী করা যায়?

গণমাধ্যম : কোনোই সমস্যা হবে না। মোড়লাজ্ঞা বলে কথা। বিবৃতি আর ইঁদুরবন্ধনের খবর ব্রেকিং-

মোড়ল : ব্রেকিং! মানে ভেঙ্গে গেল! ইঁদুরবন্ধন ভেঙ্গে গেল!

গণমাধ্যম : আমি তা বলিনি, আমি বলতে চেয়েছি বিবৃতি আর ইঁদুরবন্ধনের খবর ব্রেকিং নিউজ শিরোনামে স্ক্রলে দিয়ে দেব। আর টকশো হলে তো কথাই নেই-

যতিন : কথাই নেই মানে?

পাম্প : মানে টকটি নট, আমার থামিয়ে দেবার ব্যবস্থা। আরে কথাই যদি নেই, তাহলে টকশো না বলে স্টপ টকশো বলুন, মানানসই হবে।

গণমাধ্যম : না, না, আমি সে কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি টকশো হলে তো কথা নেই- মানে সঞ্চালক হিসেবে তো আমার অভিজ্ঞতা রয়েছেই, আমিই সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করব- একটি বিজ্ঞাপন বিরতি।

মোড়ল : এই বিপদের মধ্যেও বিজ্ঞাপন বিরতি!

গণমাধ্যম : আমি বিজ্ঞাপন বিরতির কথা বলতে চাইনি। আমি বলছি যে, ওই বিজ্ঞাপন বিরতির দিকটা এবার একটা খেয়াল রাখবেন।

পাম্প : শুনুন! আপনি যখনই বললেন সঞ্চালকের দায়িত্ব আপনিই পালন করবেন, আপনার সঞ্চালনার অভিজ্ঞতা কেমন তা আমার জানা আছে।

ঋষিকেশ : বাবু, আপনার আবার অভিজ্ঞতা কী? সে অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে আমার পিঠে।

মোড়ল : আহা বিপদের দিনে এভাবে মান-অভিমান করলে তো চলবে না। ঠিক আছে গণদিদি-মানে গণমাধ্যম দিদি, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা হবে। কী ঋষিকেশ

বাবু দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা উঠেছিল। তাহলে ম্যাও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এবার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঋষিকেশ : বুঝেছি বাবু, কেবল এ জনমে না, পর জনমেও ম্যাওয়ের হাত থেকে মুক্তি নেই!

ধাড়িবাবা : এই তো বুঝেছিস। হবে হবে তোকে দিয়েই হবে।

মোড়ল : হবে, হবে, আরে কী হবে সেটা বলো?

ধাড়িবাবা : না মানে আমার কাছে যখন ব্যাপারটা এসেছে, তখন কোনো চিন্তা করতে হবে না। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঋষিকেশ : মানে আপনার সেই ডি এস এস-

ধাড়িবাবা : ধ্যাৎ! এই বিপদের সময় আমার মনযোগ নষ্ট করে দিচ্ছিস! হ্যাঁ, আমাদের সমস্যাটা যেন কী?

দফাদার : ম্যাও সমস্যা।

ধাড়িবাবা : না না, আর বলতে হবে না। এই তো পরিষ্কার লেখা রয়েছে, আগের বারের ডোজটা একটু কম হয়েছিল। এর সাথে আরও ৩২ টেরাবাইট যোগ করলেই-

মোড়ল : পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়া যাবে। ৭২ টেরাবাইটে সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে, আর সেই সুযোগে ম্যাও সবাইকে ঘোল খাইয়ে চলেছে। এখন যদি আরও ৩২ টেরাবাইট যোগ করা যায়, তাহলে বাকি কাজটা শেষ করতে আর কোনো সমস্যা থাকে না। একেবারে ঘোলের মতো স্বচ্ছ ব্যবস্থা, খালি ঘোল খাওয়া- তাই তো?

দপ্তরি : এখন তো মনে হচ্ছে, ম্যাওয়ের যোগসাজসটা এই ধাড়িবাবার সাথেই!

ধাড়িবাবা : এভাবে বার বার আমার মনযোগ নষ্ট করে দিলে-

মোড়ল : এভাবে বার বার মনযোগ নষ্ট করে দিলে বলতে হবে, আচ্ছা আমাদের সমস্যাটা যেন কী- এই তো? কিচ্ছু হবে না তোমাকে দিয়ে। শুধু শুধু সকলে মিলে সময় নষ্ট করে যাচ্ছি, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ধ্যাৎ

ধাড়িবাবা : সকলে মিলে আমার মনযোগ-

মোড়ল : আবার-

ঋষিকেশ : আমি মুখখো-সুখখো মানুষ তবু যদি দয়া করে আপনারা আমার একটা কথা শোনেন-

মোড়ল : তোমার কথা শুনেই তো এতটা সময় নষ্ট করলাম। তবু বল শুনি। আমাকে তো সকলের কথাই শুনতে হয়। তবে বাবা, এমনিতেই মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে আছি, তাই দয়া করে তোমার ওই মৃত্যু-শিল্পকে এর মধ্যে টেনে এনো না।

ঋষিকেশ : আমার কথাটা শিল্প কি না জানি না, এই দুঃসময়ে যদি একটু কাজে লাগে

তাই সাহস করে বলা। তবে এতে হয়তো সমস্যার গোড়া কাটা সম্ভব হবে না।

দফাদার : ঠিক আছে তুমি না হয় আগাই কেটো। অত ভনিতা না করে বলে ফেলো তো কথাটা!

ঋষিকেশ : ঘন্টা।

দফাদার : ঘন্টা! আমার কথাকে তুমি ঘন্টা বলে ঠাট্টা করছ? তোমার সাহস তো কম নয়!

ঋষিকেশ : না বাবু, আমি বলছিলাম যে, ওই ম্যাওয়ের গলায় যদি একটি ঘন্টা বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে আমরা সাবধান হতে পারি। মানে ম্যাও নড়াচড়া করলেই ঘন্টাটা বেঁজে উঠবে, আমরাও সাবধান হয়ে আপনার ওই লাঠি-সোটা নিয়ে প্রস্তুত হতে পারব। বলেন বাবু কেমন হবে ?

যতিন : ঘন্টা হবে।

ঋষিকেশ : হ্যাঁ, এ হলো সেই ঘন্টা দফাদারবাবু। আপনি একটু আগে ঠাট্টা মনে করে আমার ওপর রাগ করেছিলেন।

মোড়ল : সুশীলবাবু! এভাবে ঋষিকেশকে ঠাট্টা করা ঠিক হচ্ছে না। আমার তো মনে হয়, ও যথার্থ একটা বুদ্ধি বাতলেছে- বুদ্ধিজীবি হয়ে আপনারা যা পারেননি।

পাম্প : না না, ঘন্টার গল্পটা আমাদেরও জানা, কিন্তু -

মোড়ল : কিন্তু সময় মতো সেটা মনে পড়েনি এই তো?

যতিন : না মানে হয়েছে কি, ওই টক-

মোড়ল : নো টক! আর কোনো টক নয়। কথা আপনারা অনেক বলেছেন। এবার আর কথা নয়, কাজে প্রমাণ দিতে হবে। ঋষিকেশের পরামর্শ আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ম্যাওয়ের গলায় ঘন্টা বেঁধে দিতে হবে। দফাদার! যাও, কাজে লেগে পড়ো!

দফাদার : কাজে লেগে পড়ব মানে! আমার কাজ হলো লাঠি-সোটা চালানো। ঘন্টা বাঁধার কাজের সাথে তার মিল কোথায়? একটা বিশেষ শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের চলতে হয় প্রশিক্ষণ ছাড়া ওই ঘন্টা - শৃঙ্খলার বিষয়তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার মনে হয় এই সহজ কাজ যে কেউ পারবে। কথায় কথায় যে কোনো কাজে আপনারা দফাদারকে ব্যবহার করলে আপনার সম্মানেরও তো হানি হয়।

মোড়ল : তাহলে দপ্তরি! আমার মনে হয় এই সহজ কাজটার দায়িত্ব তুমিই নাও!

দপ্তরি : কাজটা সহজ না কঠিন, সেটা বড় কথা নয়। কথা হলো ওই দফাদার বলেছে, যে কেউ কাজটা পারবে। তার মানে দফাদারের কথায় তুমি আমাকে ওই যে কেউ এর দলে ফেলছ! ঠিক আছে থাকল তোমার দপ্তর, আমি চললাম-

দফাদার : কেটে পড়ছে যে!

মোড়ল : না না, এই বিপদে তুমি আমাকে ফেলে যেও না দপ্তরি! বিপদেই তো প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় । ভেবে দেখ -

যতিন : তোমার বাবা আর আমার বাবা এক সাথে ভুসিমালের ব্যবসা করত।

মোড়ল : কে বলল কথাটা ? ও, সুশীল বাবু। তাহলে দায়িত্বটা আপনারাই নিন। ঘন্টা বাঁধার কাজটা কায়িক শ্রমেরও নয়। এর সাথে বুদ্ধির একটা সংযোগ আছে।

পাম্প : তার মানে যে কারও দলে আপনি আমাদেরও ফেলছেন। শাসকদেরে এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তো আজ এই অবস্থা। দেশে মুক্ত বুদ্ধিচর্চার বদলে কেবল হস্তপদ ছোড়াছুড়ির দাপট।

যতিন : এটা কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে! আপনি আবার আমার প্রতি ইঙ্গিত করছেন! এবার কিন্তু আমি আর সহ্য করব না!

মোড়ল : সুশীলবাবু! আপনার এই সাহসী এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাবটা আমার বেশ পছন্দ হচ্ছে। আমার মনে হয় কাজটা আপনাকে দিয়েই হবে।

যতিন : তার মানে? সাহস থাকলেই সব কাজ সবাইকে করতে হবে নাকি? আমার আর কাজ নেই? এই তো এখনো ৬টা টিভি চ্যানেলে আমাকে হাজির হতে হবে। যানজটে তো রাস্তার অবস্থা নাকাল। কীভাবে যে পৌঁছুবো, সেই চিন্তাতেই তো আমি অস্থির! এর মধ্যে অন্য কাজের কথা ভাবার সময় আমার কোথায়?

মোড়ল : তাহলে কী করা যায়, সেটা অন্তত: বলুন!

যতিন : সেটা আমি চ্যানেলে গিয়েই বলব। তাছাড়া সব বিষয়ে কেবল আমাদের দিকে নজর কেন? পৃথিবীর অর্ধেকই নারী। তাদের কোনো দায়িত্ব নেই? পৃথিবীর অর্ধেকই তো নারী। তাদের কোনো দায়িত্ব নেই? আর নারীবাদীরা তো নারী স্বাধীনতার জন্য সর্বত্র সোচ্চার। তারা একটু করে দেখাক না কাজটা। এ কাজটা হাসিল করার জন্য আমার তো মনে হয় নারীরাই উত্তম। মানে ওই সুড়সুড়ি-

গণমাধ্যম : এবার কিন্তু আপনি আমার প্রতি ইঙ্গিত করছেন! শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে সকল নারীকে আপনি অপমান করছেন! আসলে আপনারা নারীদের পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না!

পাম্প : শুধু আপনারা পণ্য হবেন কেন? আপনাদের ওই চ্যানেল কথা বলতে না দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বসিয়ে রেখে আমাদের পণ্য বানাচ্ছেন না? ঋষিকেশদের মতো মানুষেরা আজ পণ্য নয়?

গণমাধ্যম : আপনি কিন্তু যেচে ঝগড়া করছেন! আমি বলছি পুরুষ আর নারীর তুলনার কথা। আমরা যখন সূর্যোদয়ের আগে উঠি তখন তো আপনারা ঘুমিয়ে থাকেন। জানেন, সেই ভোর থেকে রাত ১১টা ১২টা অবদি একজন মাকে

কতজন প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি আর কতগুলো কোচিং সেন্টারে বাচ্চাদের নিয়ে দৌড়াতে হয়? তারপর ধরুন, বাচ্চাটাকে নিয়ে আপনি খাচ্ছেন, ওদিকে ফসলের মাঠ, সেখানে পাখি ডাকছে- বাচ্চাটা পাখির পিছু পিছু ছুটছে- কী ভয়াবহ! সামনে পরীক্ষা- মনযোগ নষ্ট হবে না? এগুলো ভেবেছেন কখনো? ওদিকে খেলার মাঠ, সেখানে ছেলেরা খেলছে, বাচ্চাটা সেদিকে ছুটে যাচ্ছে! ভাবুন তো খেলতে যাচ্ছে ! তাহলে পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পাবে কী করে? এর দায়িত্ব তো মায়েদেরই পালন করতে হয়। এত সব ঠ্যাকনামারা দায়িত্বের মধ্যে ঘন্টা বাঁধার সময় তাদের কোথায়?

মোড়ল : ঠিক আছে, গণদিদি- না মানে গণমাধ্যম দিদি, আপনি অত উত্তেজিত হবেন না! এখন উত্তেজনার সময় নয়। উপায় খোঁজার সময়।

দফাদার : আমার মনে হয়, আপনি হলেন মোড়ল। সকলের দেখাশোনার দায়িত্বটা আপনারই। কাজেই ঘন্টা বাঁধার দায়িত্বটা শেষ পর্যন্ত আপনাকেই পালন করতে হবে।

মোড়ল : কী বলতে চাও তুমি? আমি দায়িত্বটা পালন করতে চাই, আর তুমি আমার চেয়ারটা দখল করে নাও। ভেবেছ এটা আমি বুঝি না! এমন ঘটনার অসংখ্য নজির রয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ দপ্তরি, এখন মনে হচ্ছে, ম্যাওয়ের সাথে যোগসাজসটা দফাদারের সাথেই হয়েছে। আমি শুরুতেই বলেছি, এটা একটা ষ আর ড়- কী যেন বলে-

দপ্তরি : ষড়যন্ত্র!

মোড়ল : হ্যাঁ ষড়যন্ত্র, মানে একটু ইঁদুর মারার ফাঁদ পাতা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে!

ঋষিকেশ : বাবু, আমি বৃদ্ধ মানুষ। শরীরে শক্তি পাইনে, মনোবলও কমে গেছে। না হলে ঘন্টা বাঁধার কাজটা একবার করার চেষ্টা আমিই করতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, যদি ব্যর্থ হই তাহলে সকলের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার মনে হয় কি বাবু, কাজটা আসলে যুবক - তরুণদের।

মোড়ল : হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা মনের মতো কথা বলেছে ঋষিকেশ। কাজটা আসলে যুবকদের । এই যে যুবক, কী যেন নাম তোমার?

যুবক : (অনেকটা রোবটের মতো আচরণ করে।) বিষয়টা নিয়ে আমি আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছি মোড়লবাবু। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে বসেও আছি। পাওয়ামাত্র ডাউনলোড করে ফেলব। আপনি ভাববেন না।

মোড়ল : ভাবব না! কী যেন বললে? ইন্টারনেট! ডাউনলোড!

যুবক : কেন ইন্টারনেটে আস্থা নেই আপনার? কত বড় বড় কাজ আজকাল হচ্ছে ওই যে অক্যু-

মোড়ল : অক্যু!

যুবক : অক্যুপাই ওয়ালস্ট্রিট মুভমেন্টের কথা শোনেন নি আপনারা?

মোড়ল : কী বললে? আকুপাংচার?

যতিন : ঠিক বলেছেন, পাংচার। ওই যে ইউরোপ-আমেরিকার যুবকেরা ল্যাপটপ, স্মার্টফোন নিয়ে ওয়ালস্ট্রিটে জড়ো হলো হাজারে হাজারে। কেউ কাউকে চেনে না, কথা বলতে পারে না, কোনো সংগঠন নেই- শুরু হলো যার যার যন্ত্রের বোতাম টেপাটেপি। এতো টেপাটেপিতে কি আর আন্দোলনের দম থাকে? শেষে পাংচার-ওয়ালস্ট্রিট দখলের বাসনা পাংচার। ওই মুভমেন্টের পাংচার-দশার কথা তো সবাই জানে।

ঋষিকেশ : মোড়লবাবু! যদি অভয় দেন তো বলি। ঘন্টা বাঁধার কাজটা আমার মনে গেছোই পারবে।

দফাদার : মানে গেছোকে ছাড়িয়ে নেয়ার পায়তারা!

মোড়ল : না না, ঠিকই বলেছে ঋষিকেশ। এতক্ষণ আমরা কথাটা ভাবিনি। কাজটা তো আসলে গেছোদের মতো যুবকদেরই। যাও দফাদার! এখনই গেছোকে নিয়ে এসো! *(দফাদার চলে যায়।)*

মোড়ল : আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করলাম। আসলে ঋষিকেশ, তোমার পরামর্শটাই খাঁটি- *(হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত দফাদারের প্রবেশ।)*

দফাদার : পাওয়া যাচ্ছে না- গেছোকে তো পাওয়া যাচ্ছে না।

মোড়ল : সেকি! কী সর্বনাশ!

সকলে : তাহলে এখন উপায়?

দফাদার : গেছো যেখানে ছিল, সেখানে এই চিরকুটটা পাওয়া গেছে।

মোড়ল : এ্যাঁ চিরকুট! পড়ো, পড়ো তাড়াতাড়ি-

নেপথ্যকণ্ঠ : মোড়লবাবু, আসল ম্যাও লুকিয়ে আছে আপনাদের অন্তরের লোভের মদ্দে। আর আপনাদের ভেতরের ম্যাও , টাইনে এনেছে বাইরে ম্যাওদের- গেছোদের করেছে বন্দি নিয়মের খাঁচায়। যে খাঁচায় গেছোরা আজ দিশাহীন! কিন্তু একদিন - বিধি নিয়মের পিঞ্জর ভেঙে গেছোরা আবার ফিরে আসবে- ফিরে আসবে আপনাদের লোভের গলার ঘন্টা ঝোলানোর জইন্নে।
(সকলে মনযোগ দিয়ে গেছোর কথা শুনছিল। কথা শেষে নেপথ্যকণ্ঠে শোনা যায় গান।)

কোন দ্যাশত গেলি রে গেছো
আয় ত্বরায় ফির‍্যা!
মায়ে কান্দে দ্যাশ কান্দে
কান্দে মন তোর লাইগ্যা!
কোন দ্যাশত গেলি রে গেছো
আয় ত্বরায় ফির‍্যা!

অভিযোজন

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র : তিনজন অধ্যাপক, পরে দুজন পোষাক পরিবর্তন করে প্রবীর ও রজত, রৌহিন, সীমা, সুহানী, প্রশান্ত ।

পর্দা খোলার আগে কিছু মানুষের উত্তেজিত ঝগড়াঝাটির শব্দ শোনা যায়। পর্দা খুললে সাইক্লোরামায় দেখা যায় কিছু ছায়ামূর্তি বিবাদমান। হঠাৎ একজন অপর একজনের মুখে ঘুঁষি মারে। সব স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা করুন বাঁশির সুর শোনা যায়। পর্দা খুললে স্টেজের সামনের দিকে দুদিকের প্রথম উইংস বরাবর আলো জ্বলে। দেখা যায় তিনজন বয়স্ক মানুষ (অধ্যাপক) তর্কবিতর্কে জড়িয়ে।

১ম : এটাকে কোন ছোটখাটো ঘটনা বলা ঠিক হবে কি?

২য় : বিল্ডিং কমিটির মিটিঙে কেউ হয়তো ছেলেটিকে উত্ত্যক্ত করেছে, সেটা তো খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। দুম করে একটা ছেলের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া ....

৩য় : কী বলছেন কি আপনি? একজন স্টুডেন্ট যে কারণেই হোক, একজন প্রিন্সিপালের গায়ে হাত তুলবে? অতবড় অডাসিটি! কলেজের ডিসিপ্লিন কোথায় যাচ্ছে বুঝেছেন?

১ম : আস্কারা, আস্কারা। পল্ সায়েন্সের প্রফেসর বসুর একান্ত গুণগ্রাহী ছাত্র। দেখ, প্রফেসর বসুই কোনও কলকাঠি নেড়েছেন কিনা।

২য় : এসব বাজে কথা। শুধু বাজে নয়, চিমটি কাটা কথা।

৩য় : কেন, বাজে কথা কেন? প্রফেসর বসু তো বিল্ডিং কমিটির কনভেনর। মিটিঙে তিনিই হয়তো কোনও কারণে কোশ্চেনড্ হয়েছেন। তাছাড়া রৌহিনের তো মিটিঙে যাবার কথা নয়।

১ম : গুণধর ছাত্রটি তার আইডলের কোনও অপমান সহ্য করতে পারেনি। ব্যস দিয়েছে— জানে তো, মাথায় কোনও না কোন আশীর্বাদের হাত আছে।

৩য় : ভাবতে অবাক লাগছে আমাদের এক্স প্রিন্সিপালের নাতি। কত বড় বাড়ির ছেলে, তার এই আচরণ!

২য় : আসলে মিটিঙে কী হয়েছিল সে তো প্রফেসর বসুই বলতে পারবেন। আমরা কেন শুধু শুধু—

৩য় : শুধু শুধু নয় প্রফেসর সেন। কানাঘুষো তো শোনাই যাচ্ছিল বিল্ডিং কমিটিও প্রফেসর বসুর ব্যাপারে নাকি ক্ষুব্ধ। তারমানে গণ্ডগোল কিছু একটা আছেই।

১ম : তাছাড়া মিটিঙে তো ইউনিয়ন রিপ্রেজেন্‌টেটিভ ছিল। ওই ছেলে তো ভিতরে ছিলনা। ওর তাহলে এত উত্তেজনার কারণ কি? নিশ্চয় কেউ ওকে উত্তেজিত করেছিল।

৩য় : সেটাই তো ভাবাচ্ছে। এদিকে প্রফেসর বসুও তো দেখছি কলেজে নেই।

১ম : আরে, উনি ওনার কাজ সেরে কেটে পড়েছেন। ডিসগাস্টিং, কলেজের পরিবেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। এর পর তো মানসম্মান নিয়ে থাকাই মুস্কিল।

২য় : আবারও বলছি, আপনারা মূল সমস্যাটা না জেনেই যা তা বকে চলেছেন। এটাও কম ডিস্‌গাস্টিং নয়।

৩য় : তাই নাকি? বাঃ বাঃ—

১ম : মূল সমস্যা না জানার তো বিষয় নয়, গত তিন বছর ধরেই তো বিল্ডিং কমিটি নাকি জানতেই পারছে না কনভেনর কীভাবে কি করছেন। অথচ ফাণ্ডে নাকি বছর বছরই টাকা আসছে। তাহলে যাচ্ছে কোথায়?

৩য় : কাজ কোথায় কী হচ্ছে সেতো আমরাও দেখতে পাচ্ছি না।

২য় : তাতেই প্রমাণ হয়না সামথিং রঙ ইন ইট।

১ম : এটাকে কী বলবেন— আত্ম-সান্ত্বনা নাকি দেখেও না দেখা।

(হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে তিনজন ছাত্র, অভি, তমাল ও শতরূপ)

৩য় : কী খবর শতরূপ, স্যার এখন কেমন আছেন?

শতরূপ : আমরা স্যারকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেছিলাম। ওখানেই স্যার-এর একটা স্ট্রোক হয়। ফলে এখন স্যার আই সি ইউ-তে। আপনারা কি যাবেন?

১ম : প্রিন্সিপালের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?

অভি : হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে গিয়ে ওনার দুই ছেলেকেই হস্‌পিটালে পৌঁছে দিয়েছি। আধ ঘন্টার মধ্যেই সিনিয়র ডাক্তার আসবেন।

২য় : কার্ডিয়াক?

তমাল : হ্যাঁ স্যার, ডাক্তার তো সেরকমই বলছেন।

(পরিবেশ থমথমে হয়ে যায়। তিন অধ্যাপক বেড়িয়ে যান, তিনজন ছাত্র

বাঁদিকের প্রথম উইংসের ধার ঘেঁষে বসে)

অভি : রৌহিনটা যেদিন থেকে শ্যামলদের সঙ্গে ওঠাবসা করছে সেদিন থেকেই বুঝেছি ও গোল্লায় গেছে। তা নাহলে এত বড় একটা কান্ড ঘটাতে পারে! আমি তো ভাবতেই পারি না।

শতরূপ : আমাদের বলতে পারতিস, আমরা ওকে বোঝাতাম।

অভি : *(উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ গলা নামিয়ে)* শোন, একই পলিটিক্যাল পার্টির দুটো গ্রুপ। বলতো, তুই আমি কেন এই সব ফালতু ঝামেলায় জড়াবো। তাছাড়া ওরা—

তমাল : আসলে একটা ভালো ফ্যামেলির ছেলে তো— তার উপর ওর দাদু ছিলেন আমাদের কলেজেরই প্রিন্সিপাল।

অভি : তো—

শতরূপ : তো ফো কিছু নয়, আমরা সিনিয়র হিসাবে তো কিছুটা বোঝাতে পারতাম, তাছাড়া রৌহিন তো স্টুডেন্ট হিসাবেও খুব ভালো।

(হঠাৎ অভি ইশারায় কিছু দেখায়)

তমাল : ওই তো, ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে প্রফেসর বসু আর রৌহিন যাচ্ছে। আহা পুরো জগাই মাধাই।

শতরূর : কে যেন বলল ওরা পালিয়ে গেছে।

অভি : কী গুরু, এবার মানবে তো কে কার মাথা খাচ্ছে। বুঝলে, অভি দাশগুপ্ত কোনও ভুলভাল খবর দেয় না।

শতরূপ : কিন্তু প্রফেসর বসুর কী ইন্টারেস্ট বলতো?

তমাল : *(প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শতরূপের উপর)* ইন্টারেস্ট নেই মানে, কী বলতে চাইছিস! প্রফেসর বসু বিল্ডিং কমিটির কনভেনর। শ্যামলদের গ্রুপটা ওকে পুরো মদত দেয়। প্রিন্সিপালের পার্সোনালিটির সামনে ট্যা ফো করতে পারে না তাই বাইরে এসে ছাত্রদের খ্যাপায়।দিনের পর দিন শ্যামল রৌহিনদের খ্যাপানোর মূলে তো উনিই।

অভি : বিল্ডিং কমিটি কার টেন্ডার অ্যাকসেপ্ট করবে যেটা ওনারা ঠিক করেন আগে থেকেই। ভাবতে পারিস, লাইব্রেরির ছয়টা জানালায় অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল বসিয়ে গ্লাস উইন্ডো করতে নাকি সাড়ে চার লাখ টাকা খরচা হয়েছে। প্রিন্সিপাল স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ডি.ডি.ও হিসাবে তিনি ওই বিল পাশ করবেন না।

তমাল : দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখন স্টুডেন্টদের দিচ্ছে লেলিয়ে।

শতরূপা : (হতাশ গলায়) প্রফেসররা যদি ঠিক ঠাক না হয় তাহলে —

তমাল : তাহলে আর কী— রৌহিনকে দাবার বোড়ে করেছে রতন বসু, দেখ্ এর শেষ কোথায়?

(হঠাৎ একটা গাড়ি থামার আওয়াজ। তিনজন বাইরের দিকে তাকায়)।

তিনজন একসঙ্গে : পুলিশ! *(ফ্রিজ হয়, আলো কাটে)*

২

স্টেজ রাইটে প্রশান্ত বাবুর ঘর। খাটের দুপ্রান্তে বসে আছে ওনার পুত্র প্রবীর ও পুত্রবধূ সীমা। খাটের পিছনে প্রশান্তবাবুর মৃতা স্ত্রীর ছবি। প্রশান্তবাবু খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। প্রবীর বাব বার কাউকে মোবাইলে ধরার চেষ্টা করছে। পাচ্ছে না।

প্রবীর : ফোনের সুইচ তো অফ্। কোথায় যেতে পারে!

সীমা : আচ্ছা বাবা, আপনাকে কিছু বলে যায়নি?

(নীরবে ঘাড় নাড়েন প্রশান্তবাবু। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসেন)

প্রশান্ত : *(ধরা গলায়)* আমি কদিন ধরেই তোমাকে বলছি ওর চাল চলন আমার ভালো লাগছে না। তুমি তো মা, তুমি বোঝার বা জানার চেষ্টা কর গণ্ডগোলটা কোথায়।

সীমা : কিন্তু বাবা, আমি তো বার বার বলেছি বাবান এ বাড়িতে আপনাকে ছাড়া কারোর কথায় গুরুত্ব দেয় না। আমি বলে কী করব—

প্রবীর : বাবা, সীমা তো ঠিকই বলেছে। এই তো সেদিন—

(কলিং বেল বাজে, সীমা প্রায় দৌঁড়ে গিয়ে দরজাটা খুলেই ছিটকে পিছিয়ে আসে)

সীমা : পুলিশ!

প্রবীর : পুলিশ! কিন্তু কেন?

(পুলিশ ঢোকে, মাথার টুপিটা খুলে প্রশান্তবাবুকে প্রণাম করে)

পুলিশ : স্যার, আমি রজত।

প্রশান্ত : বোসো রজত, মাই বিলাভেড গ্রান্ডসনের কোনও খবর এনেছ?

পুলিশ : স্যার—

প্রশান্ত : বল, কী বলবে *(রজত চুপ করে থাকে)* স্পিক আউট রজত।

পুলিশ : স্যার, রৌহিন একটা অন্যায় করে ফেলেছে। কলেজের ইউনিয়ন তো একটা পলিটিক্যাল পার্টির কন্ট্রোলে, তাদেরও আবার ফ্র্যাকশন রয়েছে। রৌহিন একটা ফ্র্যাকশনে বিলং করে। দুটো ফ্র্যাকশনের মারামারিতে ও জড়িয়ে পড়ে।

প্রবীর : মারামারি! কিন্তু কেন? কার সঙ্গে মারামারি করেছে?

(রজত এবার প্রবীরের দিকে তাকায়, আবার প্রশান্তকে বলে)

পুলিশ : বিল্ডিং কমিটির মিটিঙে হিসাবের গরমিল নিয়ে খুব কথা কাটাকাটি গণ্ডগোল হয়। প্রিন্সিপাল চাননি স্টুডেন্টরা ম্যাটারটায় ইন্টারফেয়ার করুক। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে যায়, অবশ্যই দু'একজন টিচারের ইনস্টিগেশনে, যে স্টুডেন্টরাও অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। সেসময় রৌহিন সজোরে একটা পাঞ্চ করে—

সীমা : কী! কাকে মেরেছে?

পুলিশ : প্রিন্সিপালের মুখ ফেটে যায়—হসপিটালাইজড করতে হয়—বাই দিস্ টাইম ওনার একটা কার্ডিয়াক— *(হাতের ইশারায় প্রশান্তবাবু রজতকে থামিয়ে দেন। সবাই চুপচাপ। থমথমে পরিবেশ। হালকা ড্রাম বিটের শব্দ)।*

প্রশান্ত : *(মাথা নিচু করে)* দাদুভাই এখন কোথায়?

পুলিশ : স্যার পুলিশ কাস্টডিতে।

প্রশান্ত : কেস্ হবে নিশ্চয়? *(রজত আমতা আমতা করে)* তুমি আমার ছাত্র, আমার সন্তানতুল্য। বাট নাউ ইু আর অন ডিউটি। কাজেই যা বলার অকপটে বলতে পার।

পুলিশ : স্যার চেষ্টা করব যাতে—

প্রশান্ত : (দৃঢ় কণ্ঠে) না রজত, অন্য কোনও চেষ্টা নয়—এই মুহূর্তে সে এই পরিবারের অড্ম্যান— ইউ শুড ডু ইয়োর ডিউটি অ্যাকরডিংলি। আই থিংক ইউ কুড ফলো মি। *(চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে অস্থিরভাবে নাড়তে থাকেন। স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকেন)।* সে কি এই পরিবারের সন্তান? না, না, কিছুতেই না, হতেই পারে না। উদ্বৃত্ত, উদ্বৃত্ত— সব উদ্বৃত্ত।

প্রবীর সীমা : বাবা! *(মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায় রজত। প্রবীর তার পিছু পিছু যায়। সীমা চোয়াল শক্ত করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শ্বশুরের দিকে)*

প্রশান্ত : *(ধীরে ধীরে মুখ তুলে)* কিছু বলবে?

সীমা : আপনি পারলেন বাবা? *(মুখে চোখে ঘৃণা)*

প্রশান্ত : একটা ধাক্কা না খেলে তুমি ওকে ফেরাতে পারবে না সীমা। মা নয় অভিভাবক হয়ে ওঠো। *(দুজনে ফ্রিজ হয়। আলো কমে)।*

৩

আলো জ্বললে দেখা যায় প্রশান্তবাবুর ঘরে নীল আলো। উনি মৃতা স্ত্রীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে । একটা গান শোনা যায়। বিক্রম সিং-এর কণ্ঠে মিউজিক ছাড়া— নয়ন তোমারে দেখিতে না পায়, রয়েছ নয়নে নয়নে— প্রথম চার লাইন।

(অন্য জোনে স্টেজডেপথে— বাড়ির দোতলা— একটা উঁচু রস্ট্রাম।সেখানে দাঁড়িয়ে প্রবীর ও সীমা। প্রবীর কিছু বলছে, সীমা মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছে, আবার রেগে ঝগড়া করছে। সবটাই হবে মাইমে। গানের চার লাইন শেষ হলে দুটো জোনেই স্পট আলো জ্বলে। সীমার গলা শোনা যায়— ঘরে দাঁড়িয়ে প্রশান্তবাবু সবটাই শুনতে পান)

সীমা : আমার ছেলেকে যারা উদ্বৃত্ত বলে তারা কী? তারা উদ্বৃত্ত নয়? আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খাচ্ছে, আবার আমাকে জ্ঞান দেয়— মা নয়, অভিভাবক হও। আমি জানিনা আমার ছেলেকে কীভাবে মানুষ করতে হবে? একজন উদ্বৃত্তর জ্ঞান আমার শোনার কোনও প্রবৃত্তি হয় না। বলে দিও তোমার বাবাকে। আমার ছেলে উদ্বৃত্ত! কত বড়ো সাহস!

(সবটা শুনে প্রশান্তবাবু চেয়ারে বসে পড়েন)।

(একটি অল্প বয়সী মেয়ে সেসময় প্রশান্তবাবুর ঘরে ঢুকে তার পিছনে দাঁড়ায় ও সবটা শোনে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। প্রশান্তবাবু কিছুই বুঝতে পারে না। আলো কমে)।

৪

(প্রশান্তবাবু ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। ঘরে ঢোকে রজত, প্রশান্তবাবুর পোষাক পরিবর্তন)।

রজত : স্যার—

প্রশান্ত : এসো রজত, বসো, *(রজত বসে)* প্রফেসর মুখার্জী কেমন আছেন? কোন খবর পেয়েছ?

রজত : এখন অনেকটা স্টেবল, হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়া পাবেন। তারপর একটা ডিক্লারেশনে সই করে দিলেই রৌহিন ছাড়া পেয়ে যাবে। আপনি তো স্যার হসপিটালে গিয়েছিলেন শুনলাম।

প্রশান্ত : *(নীরবে মাথা নাড়েন)* আই সি ইউতে তো ঢুকতে দিল না। ক্ষমা চাইবার

সুযোগ পেলাম না।

রজত : ছি ছি স্যার, আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন, যাদের লজ্জিত হবার তারা তো—

প্রশান্ত : বাদ দাও, আমি মনে করি রজত, দাদুভাইয়ের এই শিক্ষাটার প্রয়োজন ছিল। আমার তো দিন শেষ। সংসারের চিত্রটাও দ্রুত পাল্টাচ্ছে।

রজত : চিন্তা করবেন না স্যার, সব ঠিক হয়ে যাবে। সাময়িক একটা ডিসটারবেন্স ছাড়া কিছুই নয়। বয়সটা কম, ফলে ব্যালেন্সিংটা বোঝেনি।

প্রশান্ত : না না রজত, কিছু ঠিক হবে না। আমি জানি বয়স হলে সংসারের উপর নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা করে দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রাশ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিছু অপ্রীতিকর কথা, অদ্ভুত আচার আচরণে অপরাধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা —সবই বুঝি।আসলে দাদুভাইয়ের মধ্যেও তো ওই ইন্সটিংটা কাজ করে।

রজত : স্যার, আপনি এত মন খারাপ করবেন না। আমি রৌহিনকে তাড়াতাড়ি ফেরাবার ব্যবস্থা করছি। দেখবেন, রৌহিন বাড়ি ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার মতো এমন বটবৃক্ষের ছায়ায় থাকলে ও কিছুতেই খারাপ হবে না।

প্রশান্ত : জানো রজত, বড্ড অতীতের কথা মনে পড়ে আজকাল।

রজত : অতীত মানে, ছেলেবেলা না কলেজে চাকরী জীবন?

প্রশান্ত : ওসব কিছুই না। কয়েকটা ব্যক্তিগত কথা তোমাকে আজ বলি।

রজত : হ্যাঁ স্যার, বলুন। একটু হালকা হবেন।

প্রশান্ত : বড্ড মনে পড়ে জানো, কীভাবে এই সংসারটাকে টেনেছি, কীভাবে কাক হয়ে কোকিলের ছানা বড় করেছি।

রজত : মানে?

প্রশান্ত : *(কিছু সময় চুপ করে থাকে)* প্রবীর তো আমার ছেলে নয়। রমলার প্রথম পক্ষের সন্তান। অসংযত জীবন যাপন করতে করতে মারা যান কিশোর মিত্র, রমলার স্বামী। শিশুপুত্র সমেত অনাথা রমলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলাম। আমার নিজের কাছে আমি খুব পরিস্কার, কোনও অন্যায় করিনি। রমলা বেঁচে থাকলে পরিবারের আজকের পরিস্থিতি নিশ্চয় অন্যরকম হতো। আমি তো কাউকে আমার নিজের ছাড়া ভাবিনি, আজও না। কিন্তু রজত—

রজত : ঠিকই তো স্যার, সবাই আপনার নিজের। আপনি পাখির মায়ের মতো

ডানা মেলে বুক দিয়ে সংসারটাকে আগলেছেন। আমার জেঠু বেঁচে থাকতে আমি কিছু কথা শুনেছি। তিনি তো আপনার খুব বন্ধু ছিলেন। দেখুন স্যার, রৌহিনও খুব ভালো ছেলে। আমি তো নিজে ওর সঙ্গে বহুক্ষণ কথা বলেছি। আমি ওকে অনেক কিছু বুঝিয়েছি। ওর মধ্যে অলরেডি রিপেনটেন্স কাজ করছে।

প্রশান্ত : কী বলছো তুমি রজত, একজন ভালো ছেলে কখনো একজন শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে?না না, এ অন্যায় কোনভাবেই বরদাস্ত করা যায়না।সুস্থ শিক্ষিত সমাজ সংসারে এরা উদ্বৃত্তই। কোনও ভাবেই ক্ষমা করা যায় না। ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার—

রজত : স্যার, রৌহিন কিন্তু আপনাকে খুব ভালোবাসে। এর স্বপ্ন, ও আমাকে বলেছে, দাদুর মতো সব কিছু গুছিয়ে করতে চায়। আপনার এতদিনের শিক্ষার একটা মূল্য তো আছে, সে আপনি যাই বলুন স্যার।

প্রশান্ত : খুব মূল্য আছে। হাসালে রজত। বুঝলে খুব ফাঁকা লাগে বাড়িটা। পাশের ঘরটাইতো দাদুভাইয়ের ঘর। একদিন ঢুকলাম ওর ঘরে, জিনিসপত্রগুলো ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করল। তাই গেলাম। কী অবস্থা করে রেখেছে ঘরটার। কে বলবে একটা রুচিশীল পরিবারের ছেলের ঘর। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

রজত : বাড়িতে সব সময় রয়েছেন। বিকালের দিকে তো বাজারের বা রেল স্টেশনের দিক থেকে কিছুটা হেঁটে আসতে পারেন। ভালো লাগবে। মনের চাপ ভাবটা কিছুটা অন্তত রিল্যাক্সড্ হবে।

প্রশান্ত : সব সময় সবকিছু ভালো লাগে না রজত। এইতো সেদিন বাজারের দিকে গেলাম চোখের একটা ওষুধ কিনতে। কলেজের অ্যাকাউন্টেন্ট চঞ্চলবাবুর সঙ্গে দেখা। দু'একটা কথার পরই ওই প্রসঙ্গ— আপনার ঘরের ছেলে স্যার, ভাবাই যায়না। ভালো লাগলো না। বাড়ি চলে এলাম। ফলে এখন বাড়ি থেকে বেরুলেই মনে হয় কেউ আমাকে দেখছে।

রজত : তবু স্যার, রৌহিনের শিক্ষার এখনও অনেকটা বাকি। আপনি হাল ছেড়ে দিলে তো—

প্রশান্ত : *(নীরবে মাথা নাড়েন)* দেখি, কোথাকারে জল কোথায় গড়ায়। যাক্‌গে অনেক রাত হলো তুমি এবার ওঠো।

রজত : হ্যাঁ স্যার, আপনি এবার উপরে গিয়ে খেয়ে নিন।

প্রশান্ত : না, সে প্রয়োজন হবে না। আমি এখন অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি। ফলে

এখন আর উপরে খাবার ডাক পড়ে না। র‍্যাকের উপর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যায়।

রজত : স্যার!

প্রশান্ত : এই ভালো, বুঝলে। অন্যায়ের সঙ্গে, নোংরামির সঙ্গে কোনভাবেই কমপ্রোমাইজ করা যায় না। যারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে চায়, তাদের কথা ভাবা যায়। কিন্তু স্নেহান্ধ মানুষের অশোভন আচরণ কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহার বিরুদ্ধে লড়াই করেই যেতে হয়। *(কিছুটা নীরবতা)* একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। অবশ্য তার জন্য লম্বা প্রস্তুতি প্রয়োজন, *(রজতের চোখে চোখ রেখে)* সম্পর্কের সূতোটা এবার বোধহয় কাটা পড়বে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাঁচিটা কার হাতে থাকবে।

(ফ্রিজ হয়, আলো কমে)।

৫

স্টেজ ডেপথে উঁচু রস্ট্রামের নীচেই একটা ঘরের সাজেশন। রৌহিনের ঘর। ঘরে রৌহিন আর প্রশান্তবাবুর ঘরে দেখা গেছিল যে মেয়েটিকে সেই সুহানী। চুপ করে বসে আছে রৌহিন।

সুহানী : কী হলো বললেনা, কাল রাতে ঘুমিয়েছ কিনা।

রৌহিন : প্লিজ কিছু ভালো লাগছে না।

সুহানী : তবু, সারারাত কী করলে? প্লিজ বলো না।

রৌহিন : (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে) রাতের নির্জনতায় অন্ধকারে আমি আমার ভিতরের আমিটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম সুহানী।

সুহানী : কী দেখলে? একটা সুন্দর ফুল গাছের নিচে যেভাবে কিছু আগাছা গজায় সেভাবেই তোমার দিনযাপনের ছবি আঁকা হচ্ছিল—তাই তো?

রৌহিন : সুহানী আমার বড়ো নির্ভরতার জায়গাটা টলে গেছে। আমি উদ্বৃত্ত। সুহানী আমি উদ্বৃত্ত।

সুহানী : সে তো তোমার বাড়ির লোকের কথায় দাদুভাইও উদ্বৃত্ত।

রৌহিন : কী বলছ যা তা

সুহানী : আমি নিজের কানে শুনেছি রৌহিন। যাক্‌গে, কাল বিকালে বাড়ি এসেছো, একবারও দাদুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছ? (রৌহিন চুপ করে থাকে) বল, হ্যাঁ কি না। *(রৌহিন নীরবে মাথা নাড়ে)* বাঃ রৌহিন, খুব সুন্দর। প্রশান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে তো তোমার রক্তের সম্পর্ক নেই। তবু তাঁরই বংশ

পরিচয়ে তুমি সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছ, নিজের যা ইচ্ছা তাই করছ। সেই দেবতুল্য মানুষটাকে এড়িয়ে চলছ, বাঃ বাঃ।

রৌহিন : তোমাকে এসব কথা কে বলেছে?

সুহানী : পুলিশ অফিসার রজত সান্যাল আমার দাদা এবং আমাদের জ্যেঠু দাদুভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ফলে এসব কথা আমাদের না জানার কোনও কারণ তো নেই। কিন্তু কেউ বিষয়টা নিয়ে কখনও প্রকাশ্যে কোনও আলোচনা করিনি।

রৌহিন : তো, থামলে কেন?

সুহানী : অকৃতজ্ঞ হয়োনা প্লিজ। সেই মানুষটাই তো তোমার শিক্ষাগুরু, সেই মানুষটাই তো তোমার প্রকৃত বন্ধু। তাহলে কেন সঠিক পথ থেকে তোমার এই বিচ্যুতি, এই মরীচিকা কেন তোমাকে আকর্ষণ করল? বলো, অন্তত আমাকে বলো।

রৌহিন : আমার কেন জানি না বার বার মনে হচ্ছে আমি পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার সমস্ত অদ্ভুত অস্থিরতা।

সুহানী : কক্ষনো না, কিছুতেই না। ফিরতে তোমাকে হবেই। রৌহিন মানুষের মনটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। একা হয়ে গেলেই কষ্ট হয়— তুমি পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে পৌঁছালে আমাদের সম্পর্কটা কী হবে রৌহিন?

রৌহিন : পৃথিবীর অনেক নির্মম সত্য ফুটে ওঠে চোখের সামনে, ছবির মতো-

সুহানী : আজ রাত শেষে যখন ভোরের আলো ফুটবে, মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিও। ভোরের বাতাস শরীরটাকে স্নিগ্ধ করবে, মনের অস্থিরতা অনেকটা কমে যাবে। দেখো আমার কথা মেলে কিনা।

রৌহিন : হয়তো ঠিক, আজও ভোরে পাশের ওই আমগাছটায় একটা বুলবুলি পাখি ডাকছিল। মনে হচ্ছিল পাখিটাও আমার মতো একলা।

সুহানী : না, একলা নয়। একটা বুলবুলি ডাকলে আরেকটা ঠিক সাড়া দেয়। তুমি কি দুটো বুলবুলির কণ্ঠস্বর আলাদা করতে পারবে? পূব আকাশে যখন লালের ছোঁয়া লাগবে তখনই মনে হবে —

রৌহিন : মনে হবে, একটা কনফেশন দরকার, কনফেশন।

সুহানী : যদি তাই মনে হয়। তবে তাই কর। দেখবে মনের অনেক গ্লানি মুছে যাবে। সত্যি তোমার একটা কনফেশন দরকার।

রৌহিন : চেষ্টা করব। বুকের বোঝাটা কিছুতেই নামছে না সুহানী।

সুহানী : চেষ্টা করতেই হবে রৌহিন। দাদুভাই তোমার শিক্ষাগুরু, তিনি এই পরিবারে একটা নিজস্ব সুর তৈরি করেছিলেন। সেই সুরকে তো তোমাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কি তাই তো? পারবে না? বলো পারবে না?

(হঠাৎ আপার ডেকে অর্থাৎ দোতলায় সীমার চিৎকার শোনা যায়, প্রশান্তবাবুর ঘরের জোনও আলোকিত হয়)

সীমা : আমাকে এসব বোঝাতে এসো না।

প্রবীর : আঃ এত চিৎকার করার কী দরকার

সীমা : আমার বাড়ি আমি কীভাবে কথা বলব সেটাও কি শিখতে হবে? আমি কি বাচ্চা মেয়ে?

প্রবীর : প্লিজ, বাবা হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটু চুপ কর।

সীমা : আমি আবারও বলছি বাবন এখন থেকে দোতলায় থাকবে। সে এ বাড়িতে উদ্বৃত্ত নয়। উদ্বৃত্ত অরেক জন।

প্রবীর : মাত্রা ছাড়িও না সীমা।

সীমা : কোনও মাত্রা ছাড়াইনি। আমার ছেলে খারাপ তো খারাপ। তাতে অন্য কারোর অন্নসংস্থানে তো অসুবিধা হচ্ছে না। চারবেলা তো ভালোই জুটছে।

প্রবীর : বয়স্ক মানুষ, তোমার পিতৃতুল্য। এই ধরণের কথা বলা যায় নাকি? কী শুরু করেছ কী। তাছাড়া তিনি আমাদের পয়সায় খান না। সেটা মনে রেখো। বাবান এসব কথা শুনলে কী হবে ভাবতে পারছ? সে তার মাকে কোনওদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে? সেটা ভেবেছো?

সীমা : কী আবার ভাববো, তারও জানা উচিত কে তাকে এবাড়ির অড্‌ম্যান ভাবে, উদ্বৃত্ত ভাবে, কে তার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

প্রবীর : সেই এক কথা ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছ। এবার ব্যাপারটা তেতো হয়ে যাচ্ছে। কেন তিনি পুলিশ লেলিয়ে দেবেন।

সীমা : হোক তেতো, তবুও আমি বলে যাব। আমার, আমার ছেলের মান সম্মান নেই? যার মাস্টারী করার ইচ্ছা তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে মাস্টারী করুন। এ বাড়িতে ওসব চলবে না।

প্রবীর : *(উত্তেজিত)* সীমা, বাড়ি তোমার নয়। এসব কথা বল কোন অধিকারে?

সীমা : বেশ করেছি। আবার বলব। যার পোষাবেনা সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাক্। খুঁজে দেখুন কোথায় ভদ্র সভ্য জায়গা আছে। আমরা তো অভদ্র।

(রৌহিন, সুহানী, প্রশান্তবাবু সবাই যে যার জোনে। সবাই কথাগুলো শুনতে পায়। হঠাৎ একটা শব্দ। রৌহিন ছুটে যায় দাদুর ঘরে। পিছন পিছন সৌহানীও। প্রশান্তবাবু মাটিতে পড়ে আছেন। রৌহিন পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সুহানী মাথায় হাত বুলোতে থাকে। রৌহিন একটা ওষুধ নিয়ে দাদুর জিভের তলায় দেয়)

প্রশান্ত : *(জড়ানো গলায়)* হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল।

রৌহিন : কোনও কথা নয়। ইউ শুড টেক রেস্ট নাউ।

(রৌহিন সুহানীকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ছোট আলোটা জ্বেলে দেয়। প্রশান্তবাবু হাতটা তুলে রৌহিনকে ছুঁতে চান, রৌহিন সেটা দেখতে পায় না)

সুহানী : *(রৌহিনের ঘরে এসে)* চেষ্টা কর জেগে থাকতে। দাদুর দিকে খেয়াল রেখো। এটা তোমারই দয়িত্ব রৌহিন।

রৌহিন : আমি তোমাকে এগিয়ে দেব? রাত তো অনেক হলো।

সুহানী : না, তার দরকার হবে না। তুমি বাড়িতে থাকো। এদিকটা ঠিক ঠাক করে দেখে রাখ। *(বেড়িয়ে যায়) (রৌহিন কিছুক্ষণ পায়চারি করে একটা চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই গানটি (বিক্রম সিংয়ের)*

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ

থেকে কেহ নাহি জানে তেমনে .. পর্যন্ত গান বাজে

(ভোরের আলো ফোটে, পাখির ডাক শোনা যায়। হঠাৎ লোহার গেট খোলার আওয়াজে রৌহিনের ঘুম ভাঙে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে দাদুর ঘরে এসে দেখে দাদু নেই। ছুটে বাইরে যায়। দেখে একটা ছোট ট্র্যাভেলার ব্যাগ হাতে দাদু রাস্তায়। পিছন থেকে রৌহিন—)

রৌহিন : কোথায় যাচ্ছ, বাণপ্রস্থে?

(প্রশান্তবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ধারে ধীরে ঘুরলেন, চোখ মাটির দিকে, রৌহিন দুপা এগিয়ে গেল। কেটে কেটে উচ্চারণ করল)

বিদ্যার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে কি কোনও গুরু আশ্রম ত্যাগ করে?

(চোখ তুলে তাকালেন তিনি । দুহাত বাড়িয়ে দিল রৌহিন। মুখে দুষ্টুমির হাসি)

কাম অন, ওয়ান উদ্বৃত্ত ইজ ওয়েলকাম টু অ্যানাদারস রুম।

(হাত থেকে ব্যাগটা খসে পড়ে গেল প্রশান্তবাবুর। দুজনেই ফ্রিজ। পর্দা পড়ে)

অচেনা নিবেদিতা

সঞ্জয় কর

প্রথম দৃশ্য

(মঞ্চের পিছনে মাঝখানে একটি আলোর বৃত্তে ১৮/১৯ বছর বয়সী একটি মেয়ে। মেয়েটির সাজ পোষাক ভগিনী নিবেদিতার মতো। কলেজের প্রথম বর্ষে পড়ুয়া মেয়ে 'যেমন ইচ্ছা সাজো' প্রতিযোগিতায় নিবেদিতা সেজে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। মেয়েটির হাতে ট্রফি)

নেপথ্যে ঘোষণা ঃ গিভ এ্যা বিগ হ্যান্ডস টু নিবেদিতা। কলেজের 'ফ্রেসারস ওয়েলকাম-২০১৯' অনুষ্ঠানে সবাইকে পিছনে ফেলে 'গো এজ ইউ লাইক' ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের ফ্রেসারস নিবেদিতা ঘোষ । ইজ ইট নট ভেরি ইন্টারেস্টিং? নিবেদিতা এজ নিবেদিতা ! হোয়াট অ্যা সাপ্রাইজিং সিলেকশান। (হাততালি) হাই - সিস্টার।

নিবেদিতা : হা-ই-

নেপথ্য ঘোষণা : সিস্টার ইয়র 150th অ্যানিভার্সারি ইজ বিয়িং সেলিব্রেটেড দিস ইয়ার অল ওভার দি কান্ট্রি। উই ওয়ান্ট অ্যা ম্যাসেজ ফর দি ইয়ং জেনারেশন অব দিস কান্ট্রি বিলংগিং টু থাওসেন্ড সেভেন্টিন (নিবেদিতা চুপ) সিস্টার উই ওয়ান্ট ইয়র ম্যাসেজ-

নিবেদিতা ঘোষণা : আই-আই-

নেপথ্য : সিস্টার

নিবেদিতা : আই ডু নট নো

নেপথ্য : হোয়াই সিস্টার?

নিবেদিতা : আই ডোন্ট নো এনিথিং- অ্যাবাউট সিস্টার নিবেদিতা

(হাসির হুল্লোড়। শিস্। নিবেদিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আলো নেভে)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নিবেদিতার বাড়ির নাম দিতা। আমরা ওকে এ নামেই জানবো। দিতার পড়ার ঘর। পড়ার টেবিল চেয়ার, বই খাতা। একটি ছোট শোয়ার ব্যবস্থা। এতে বড় একটা টেডিবিয়ার। এ বয়সের মেয়েদের ঘরে যা - যা থাকতে পারে- তা। দিতা ঘরে ঢুকেই ট্রফিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বালিশে মুখ চেপে কাঁদে। ভেতর থেকে মা আসেন)।

মা : ও মা ! কি হল? (দিতা নিশ্চুপ) ফোন করলি। নিবেদিতার জন্য প্রাইজ পেয়েছি, তারপর কি হল?

দিতা : আমার সঙ্গে কথা বলবে না, যাও।

মা : কি হয়েছে বলবি তো? কেউ কিছু বলেছে?

দিতা : আজ যদি দাদু বেঁচে থাকতো না, আমি - আমি দাদুকে-দাদুকে-

মা : দাদু আবার কি করলো?

দিতা : আমার নাম নিবেদিতা রাখতে কে বলেছিল?

মা : তোর দাদু?

দিতা : দাদু বেঁচে থাকলে, আজ আমি

মা : কি হয়েছে বলবি তো-

দিতা : আমার নাম কেন নিবেদিতা রাখা হল? বল, কেন রাখা হল?

মা : আশ্চর্য! শ্বশুরমশাই রামকৃষ্ণ দীক্ষিত ছিলেন। ছেলে হলে হয়তো নাম রাখতেন বিবেকানন্দ। তুই এলি - তাই নিবেদিতা রেখেছেন। এতে এত রাগারাগির কি হল?

দিতা : দাদুর ইচ্ছা হলেই হবে! তোমাদের কোন মতামত ছিল না?

মা : আমাদের মতামত মানে? এর চেয়ে ভালো নাম হতে পারে? ভগিনী নিবেদিতার নামে নাম।

দিতা : এটাই তো সমস্যা। হোয়াই আই উইল বি আইডেন্টিফাইড এজ এনাদার গ্রেট লেডি? হোয়াই?

মা : ওমা তাতে কি হল? এত বড় একজন মহীয়সী মহিলার সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফায়েড করাটা তো - একটা গৌরবের বিষয়।

দিতা : মানে? যাকে জানি না, বুঝি না- এমন একজন মহিলার নামের বোঝা নিয়ে চলতে হবে সারা জীবন? মহীয়সী বলেই তার নাম অন্যের উপর চাপিয়ে দেবে?

মা : কি বলছিস যা তা? কি হয়েছে বল?

দিতা : প্রাইজ আমার হাতে তুলে দিয়ে- হল ভর্তি স্টুডেন্টস টিচারদের সামনে আমায় বলল- হাই সিস্টার। এই দু-হাজার আঠারো সালের ছেলেমেয়েদের জন্য আপনার বার্তা কি হবে? ও শিট—

মা : কে বলল একথা—?

দিতা : ঐ অ্যাঙ্করটা এক নম্বরের পাজি, বদমাশ।

মা : ওর কথা ছাড়। এরপর কি হল বল?

দিতা : আমি কি বলবো? আমি জানি কিছু নিবেদিতা সম্পর্কে?

মা : তুই জানিস না? এত বড় হয়েছিস- কলেজে পড়ছিস- নিবেদিতা সম্পর্কে কিছু জানিস না?

দিতা : জানি । জানি তো- মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল- জন্ম আয়ারল্যান্ডে - ১৮৮৫তে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্বামীজির আধ্যাত্মিক চিন্তায় মুগ্ধ হয়ে ভারতে চলে এলেন, স্বামীজি তাকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিলেন- নাম দিলেন নিবেদিতা- সবাই তাকে বলতো সিস্টার নিবেদিতা-ব্যস্।

মা : অনেক কিছুই তো জানিস। কলকাতায় বোসপাড়া লেনে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি কিন্তু একটা স্কুল খুলেছিলেন। তারপর- তারপর।

দিতা : তারপর? কি? বল;

মা : তারপর—এত বছর বয়স হহল, ওঁর একটা জীবনী পড়তে পারলি না? সারাদিন মোবাইল আর ল্যাপটপ-

দিতা : নিবেদিতা সম্পর্কে যেটুকু বললাম- তা ঐ মোবাইলের দৌলতেই , বুঝলে?

মা : এরপর?

দিতা : আমি কিছু বলতে পারিনি। ইস্ কি লজ্জা - কি লজ্জা! হল ভর্তি সবাই হাসতে লাগল- অ্যাঙ্কর শুদ্ধু! আমি আর কলেজে যাব না-

মা : যা জানিস বলে দিলি না কেন?

দিতা : ওহো!চেয়েছে এই সময়ের ছেলেমেয়েদের জন্যে নিবেদিতার একটা ম্যাসেজ। তাঁর দর্শন, তাঁর আদর্শ, জীবন - কর্ম না জানলে - না বুঝলে - এটা বলা সম্ভব? ইস্ কি লজ্জা- ছেলেরা সিটি মারছিল- আমার মনে হচ্ছিল- এই মুহুর্তে আমার মৃত্যু হোক। - এইসব কিছুর জন্য তোমরা দায়ী।

মা : বিষয়টাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন?

দিতা : না - না - তুমি আমার সেই মুহূর্তের অবস্থাটা বুঝতে পারছো না। আমি নিবেদিতা ঘোষ- কিন্তু তখন আমার পোষাকে আসছে সিস্টার নিবেদিতা- আমি আমি মন থেকে চাইছিলাম সিস্টার হয়ে উঠতে - কিন্তু মুহূর্তেই আমি একটা সঙের পুতুল হয়ে গেলাম।

মা : ছাড়তো দেখি। পোষাক চেঞ্জ করে খেতে আয়।

দিতা শুধু : না-না-না। এভাবে ছাড়া যাবে না। আই হ্যাভ টু নো হার কমপ্লিটলি। শুধু তার ভারী নামটা নিয়ে বেড়াব না। তাকে যতটুকু পারি জানবো। ইফ আই কান্ট, আই উইল চেঞ্জ মাই নেম।

মা : ওহো! মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

দিতা : নো। তাঁকে আমি ছাড়বো না। ঐ মহিলার জন্য আজ আমি যেভাবে হ্যারাস হলাম- আমি তাঁকে এবার হ্যারাস করবো। ইয়েস (বেরিয়ে যায়)

মা : (হাসি) পাগলী মেয়ে আমার! যখন যা মাথায় ঢুকবে সেটাকে নিয়েই

পড়বে। দিতা শোন, তোর বাবা জিজ্ঞেস করেছিল তোর ভ্যাকেশন ব্রেক কবে থেকে পড়বে? জানালে পর- ওর কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের টিকিট কাটবে—

দিতা : (ভিতর থেকে) আমি যাব না। ভ্যাকেশনে আমার এখানে অনেক কাজ।

মা : বললাম না। এখন আর কোন কিছুতেই রাজি হবে না। পড়বে সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে। মেয়ে বটে একখানা!

তৃতীয় দৃশ্য

(মঞ্চে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে ও আমাদের পরিচিত মুদ্রায় সিস্টার নিবেদিতা। দিতা ওদের দিকে এগোয়। নেপথ্যে মিউজিক)

দিতা : (জোরে) সিস্টার। (সিস্টার নির্লিপ্ত) আমি-আমি-এসেছি তোমার কাছে। আমি তোমার নাম বয়ে বেড়াচ্ছি- আমার পরিচয় তোমার নামে। অথচ আমি তোমাকে জানি না- তুমি সত্যিকারের কে? কি চেয়েছিলে তুমি? কেন এসেছিলে? চুপ করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। জাগো, জাগো সিস্টার- আমাকে বল সব। (মূর্তিদের নাড়া দেয়। ওদের যেন সম্বিত ফিরে এল)।

সিস্টার ১: তুমি কে গো মেয়ে? আমার জন্মের দেড়শত বৎসর পর আমাকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিলে?

সিস্টার ২: আমার কাছে তুমি কি চাও? যা বলার আমার জীবদ্দশাতেই তো আমি বলেছি।

দিতা : সেই বলাটাকেই আবার নতুন করে বলতে হবে সিস্টার, আমাদের জন্যে।

সিস্টার ৩: (হাসি) জানিস মেয়ে, তোর এই বয়সে আয়ারল্যান্ডে আমি একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়াতাম।

সিস্টার ২: ভারতের মতো আয়ারল্যান্ডও ছিল ব্রিটিশের পদানত। আমার বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে আমার বাবা ঠাকুরদারা ছিলেন গভীরভাবে যুক্ত।

সিস্টার ১: মার্গারেটের কথা যাক। শোন, আমার নিবেদিতা হয়ে ওঠার কথা। ১৮৯৫ সাল, আমার বয়স তখন ২৪ বছর। কিন্তু, আমি একটা অস্থির সময় কাটাচ্ছি। ধর্মের উপর , মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে আমি আমার এক উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। কিন্তু, ১৫ নভেম্বর ওয়েস্টউইন্ড এন্ড এর বাড়ির ড্রইংরুম থেকে শুরু হল আমার নতুন যাত্রা।

(পিছনে পর্দায় ছায়াতে বিকোনন্দ অথবা প্রজেকশানে । কণ্ঠ শোনা যায়

নেপথ্যে)

স্বামীজী : সকল ধর্মই সমভাবে সত্য। সকল ধর্মের সারকথাই হচ্ছে ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, প্রেমই হচ্ছে সকল ধর্মভাবের মূল কথা। পৃথিবীর সকল কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ।

সিস্টার ১ : এই সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর কথা কি- আমার কাছে একদম নতুন?

সিস্টার ২ : না - না- এর আগে অনুরূপ কথা আমি যেন কোথাও শুনেছি।

সিস্টার ৩ : কিন্তু, আমার কি হল? কেন আমি বার বার তার কথা শোনার জন্য এমন চঞ্চল হয়ে উঠছি?

একত্রে ৩জন : এ কেমন আকর্ষণ গুরুদেব?

সিস্টার ২ : আই স্ট্রেঞ্জ। আই-অ্যাড্রেস হিম অ্যাজ গুরুদেব!

সিস্টার ৩ : চিঠি এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি।

দিতা : কোথা থেকে লিখলেন, স্বামীজী এই চিঠি।

সিস্টার ৩ : লন্ডনের সেন্ট জর্জেস থেকে, ৭ জুন ১৮৯৫ তারিখে লেখা। কল্যাণীয়া মার্গারেট, আহা কি আনন্দ! (স্বামীজীর কণ্ঠ-)

স্বামীজী : জগৎকে আলো দেবে কে? যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী তাদের চিরদিন 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় আত্মোৎসর্গ করতে হয়। জগতের ধর্মগুলি আজ প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্র। এখন, অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন। মার্গারেট, তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে। ওঠো, জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে। এই সময় কি তোমার নিদ্রা সাজে? (নাকাড়ার শব্দ। যেন এক প্রচন্ড আলোড়ন)

সিস্টার ২ : শুনছো, শুনছো-মার্গারেট - স্বামীজীর আহ্বান? এখন কি আমার আর সুখস্বপ্ন, আমার স্বার্থপরতা, আমার আত্মমগ্নতায় ডুবে থাকলে চলবে?

সিস্টার ১ : না-না- বীর্যের মন্ত্রে, শৌর্যের প্রেরণায় আমাকে আমার গন্ডিকে অতিক্রম করতে হবে।

সিস্টার ৩ : আমি সংকল্প করছি। আমি আত্মোৎসর্গ করবো। (জাহাজের সাইরেন। পর্দায় জাহাজের ভিডিও প্রজেকশান)

স্বামীজী কণ্ঠ: ভারতের জন্য, বিশেষত নারী সমাজের জন্য একজন প্রকৃত সিংহীনীর প্রয়োজন। তোমার শিক্ষা,ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা সর্বোতোভাবে তোমাকে সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে। (মঞ্চের মাঝে সিঁড়ির উপর চারিদিকে দেখছেন সিস্টার নিবেদিতা)।

সিস্টার ৩ : আমার কাছে আজকের দিনটি বড় পবিত্র, বড় মহান। ১৯৯৮ সালে

২৮ জানুয়ারী জাহাজ থেকে নেমে ভারতের মাটি স্পর্শ করে আমি মাথায় ঠেকালাম। (সিঁড়ি থেকে নেমে মঞ্চে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম)

চতুর্থ দৃশ্য

দিতা : (দৌড়ে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যায়)। সিস্টার - এদেশে এসেই তুমি এমনভাবে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লে যে মনে হচ্ছে না তুমি কোন বিদেশিনী। আমি যে কোন খেই পাচ্ছি না তোমার । কখন মনে হয়, তুমি সত্যি এদেশের ভগিনী, আবার কখনও দেখি তুমি যেন মা। কখনও বা বন্ধু, সখা, আবার কখনও তুমি বিপ্লবী অগ্নিকন্যা! এদেশে আসার দু'মাস পরেই স্বামীজী তোমাকে নবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। নাম দিলেন নিবেদিতা! আরও দু'মাস পর কলকাতা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল প্লেগের আতঙ্কে। তোমার নামের যথার্থতা সেই তুমি প্রথম প্রমাণ করলে।
(হৈ হৈ করে লাঠি সোটা নিয়ে কিছু মানুষ ঢোকে। কারো পড়নে লুঙ্গি, কারো ধুতি। এর আগে ঝোলা কাঁধে মঞ্চের একেবারে সামনে ঢোকেন সিস্টার, সঙ্গে একটি যুবক ও রবীন্দ্রনাথ)

ছেলেটি : এদিকের পাড়া পুরোপুরি শুনশান-সবাই ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে ভগিনী।

সিস্টার১ : প্লেগ যতটা ছড়িয়েছে, তার থেকে গুজব ছড়িয়েছে অনেক বেশি-গুজব এত মারাত্মক হতে পারে কল্পনাও করতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ : দেখুন মিস মার্গারেট, মানুষের অজ্ঞতা কী ভয়ঙ্কর- সারা শহরের চারভাগের তিনভাগ লোক প্লেগের ভয়ে পালিয়েছে -প্লেগের টীকা নিয়ে দেখুন কী হাঙ্গামা চারদিকে-

সিস্টার১ : আমাদের সামনে দুটো কাজ মি: টেগোর। এক, মানুষকে প্লেগ সম্পর্কে সচেতন করা, দুই- আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

রবীন্দ্রনাথ : আপনার শুনলে ভাল লাগবে, আমাদের পরিবারের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লিফলেট বিলির পাশাপাশি আমরা চাঁদা তুলে ।

সিস্টার১ : মঠ থেকেও হ্যান্ডবিল করা হচ্ছে। মি: টেগোর আমি বাড়ী বাড়ী যেতে চাই- একজন আক্রান্তও যাতে বিনা শুশ্রুষায় মারা না যায়—

রবীন্দ্রনাথ: মিস মার্গারেট, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত আপনি সারা শহর চষে বেড়াচ্ছেন প্লেগ আক্রান্তদের সেবায়। আপনি অনুমতি দিলে একাজে আমি আপনার পাশে থাকতে চাই।
(হৈ হৈ হট্টগোল । ছেলেটি দৌড়ে ঢোকে)

ছেলেটি : কিছু উত্তেজিত জনতা এদিকে আসছে। আমাদের পালিয়ে যেতে হবে

ভগিনী। চলুন-

সিস্টার১ : কী বলছ তুমি? পালাবো কেন?

রবীন্দ্রনাথ : দাঁড়ান, আমি দেখছি। (উত্তেজিত জনতা ঢোকে)

জনতা : এই যে টীকা ওয়ালার দল। মার ওদেরকে মার-

রবীন্দ্রনাথ : শান্ত হও, শান্ত হও ভায়েরা, তোমরা কাকে মারতে বেড়িয়েছো?

জনতা ১ : আমাদের যারা প্লেগের টীকা দেবে- তাদেরই মারবো—

জনতা ২ : এই টীকার জন্যেই প্লেগ এত ছড়িয়েছে- এ আমাদের মেরে ফেলার জন্যই বিদেশীদের চক্রান্ত।

সবাই : মার, মার— হাত পা সব ভেঙে দে।

সিস্টার ১ : ভায়েরা শোন, আমার চেহারা, সাজ পোশাক বিদেশী হলেও, আমি তোমাদের ঘরের মেয়ে। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে আমি তোমাদের সেবা করতে পথে বেরিয়েছি—

জনতা ১ : সব গভর্মেন্টের চর। সাধুসন্তরা, বড়লোকরা সব। আমাদের মেরে তোমাদের কি লাভ গো বাবুরা?

জনতা ৩ : মুসলমান আর নীচু জাতের হিন্দুদের মেরে ফেলার জন্যে প্লেগের টীকার প্রচার করতে নেমেছে।

রবীন্দ্রনাথ : শুন ভায়েরা, শান্ত হয়ে শোন, আমি সাধুসন্ত নই। আমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ। আমি বলছি, টীকা নেওয়া না নেওয়া এটা সম্পূর্ণ তোমাদের ইচ্ছা। কেউ জোর করে টীকা দেবে না। দিতে পারে না।

জনতা : আমাদের তো জোর করেই টীকা দিচ্ছে সাহেবরা।

সিস্টার১ : ইচ্ছার বিরদ্ধে টীকা দেওয়া অন্যায়। একটা কথা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন ভায়েরা, টীকা দিলে প্লেগ রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৃত্যুর প্রশ্নই আসে না।

জনতা : তবে মানুষ মরছে কেন? বল, জবাব দাও।

রবীন্দ্রনাথ: যারা টীকা দেয়নি, তারাই আক্রান্ত হচ্ছে। এই যে দ্যাখ, আমরা প্রত্যেকেই টীকা নিয়েছি। এই যে আমাদের হ্যান্ডবিল, পড়ে দেখ- ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তোমরা মারামারি করছো-

জনতা ৩ : এ কী বলছে রে ভায়া- ঠাকুরবাড়ীর ছেলে মিথ্যে বলবে? না - না এ বিশ্বাস হয় না।

সিস্টার ১ : আমি তোমাদের মা। মা কি সন্তানদের মারতে পারে?

জনতা ১ : তুমি কে গো মা এমনভাবে বলছো-বিশ্বাস না করে পারি না যে। ঠিক আছে-তোমরা যখন বলছ ভাইরা শোন টীকা নিয়েই দেখি-মরি না বাঁচি—

জনতা : ঠিক আছে- তাই সই। চল মা, ব্যবস্থা কর।

সিস্টার১ : ভাই, তুমি এদের ক্যাম্পে নিয়ে যাও। (জনতা বেরিয়ে যায়)

রবীন্দ্রনাথ : মিস মার্গারেট, আপনি জয়ী হলেন।

সিস্টার১ : সত্যের জয় হল মি: টেগোর। আপনি আমাকে নিবেদিতা বলে ডাকলেই খুশি হব।

রবীন্দ্রনাথ : নিবেদিতা?

সিস্টার১ : হ্যাঁ, স্বামীজী আমার এ নতুন নাম দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ : এ নাম আপনার জন্যে যথার্থ।

পঞ্চম দৃশ্য

(সিস্টার নিবেদিতা মঞ্চে এলেন)

সিস্টার২ : এর আগেই আমার জীবনে ঘটেছে আরেকটি বিশেষ ঘটনা। জগদীশ চন্দ্র বসু'র বৈজ্ঞানিক আবিস্কার আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরি দেখতে গিয়ে পেয়ে গেলাম আমার সারা জীবনের এক বন্ধুকে।

(জগদীশচন্দ্র বসু সিস্টারকে স্বাগত জানাচ্ছেন)

বোস : আপনার আগ্রহ দেখে আমি হতবাক। আমার পুরোটা ল্যাবরেটরি আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

সিস্টার২ : ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু মিসেস সারা বুলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

বোস : ব্যাঁস তিনি আমার স্ত্রী অবলার সঙ্গে জমিয়ে বসেছেন। গত ১০মার্চ, স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশন আহুত সভায় ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের বিস্তার বিষয়ে আপনার বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ ।

সিস্টার ২ : ধন্যবাদ মিঃ বোস। আমি কিন্তু আপনার ল্যাবরেটরি দেখে একেবারে অবাক।

বোস : কেন বলুন তো?

সিস্টার২ : যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর বেতার তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণা ইউরোপের তাবৎ বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন তুলেছে- তার ল্যাবরেটরি এত সাধারণ, আমি ভাবতে পারি না-

বোস : একটি পরাধীন দেশের অবজ্ঞা আর অবহেলা যে বিজ্ঞানীর সম্বল- তার ল্যাবরেটরি এর চেয়ে ভাল হয় কি করে বলুন?

সিস্টার২ : না- না- না- এটা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয় মিস্টার বোস। ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য- সর্বক্ষেত্রেই ভারত যে পৃথিবীর যে কোন দেশের

সমতুল্য - বৃটিশ সরকার এই সম্ভাবনাটাকে দাবিয়ে রাখছে- ভারত যাতে মাথা তুলতে না পারে।

বোস : বলতে কোন লজ্জা নেই মিস মার্গারেট, এমনভাবে কোনদিন আমি ভাবি নি। আপনি যে এসব বিষয়ে ভাবতে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। আপনি শুনে খুশী হবেন, আমি এখন একটি নতুন গবেষণা নিয়ে মগ্ন।

সিস্টার ২: আমি জানতে পারি - কী সেটা?

বোস : অবশ্যই। আমি দেখতে পাচ্ছি জড় বস্তুও উত্তেজনায় সাড়া দেয়—

সিস্টার২ হোয়াট?

বোস : ইয়েস। মেটালস গ্রো টায়ারড এন্ড রিক্যুয়ার্ড রেস্ট ফর দি অ্যাডজাস্টমেন্ট অব দেয়ার মলিক্যুলস-

সিস্টার২ : হোয়াট আর ইউ টেলিং মি. বোস? উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, ক্লান্তি বোধ করা- সে তো প্রাণের অনিবার্য লক্ষণ। আপনি বলছেন জড়বস্তুও—

বোস : ইয়েস, নাও আই এ্যাম ওয়ার্কিং অন ইট।

সিস্টার২ : তাহলে মিঃ বোস। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র যে বলে সর্বভূতে একই চৈতন্য বিরাজমান আপনি সেটাই প্রমাণ করতে চলেছেন।

বোস : ঠিক তাই।

সিস্টার ২: তাহলে তো ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ আর বিজ্ঞান একবিন্দুতে মিলিত হয়ে নাড়িয়ে দেবে সমগ্র পৃথিবীকে—

বোস : এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার কিছুদিন সময় লাগবে মার্গারেট।

সিস্টার ২: মিঃ বোস আপনার আগামী গবেষণার যাবতীয় কর্মকান্ড ইউরোপে, আমেরিকায় তুলে ধরতে হবে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো তার জন্যে। একই সঙ্গে আপনার ল্যাবরেটরিটাকে আপনার গবেষণার উপযুক্ত ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। আমি দেশে এবং ইউরোপে এর জন্য প্রচার চালাবো।

বোস : মিস নোবেল আপনার উদ্দীপনাময় আশ্বাস পেয়ে আমি নতুন ভাবে বল পাচ্ছি। এতদিন আমি কাজে কোন প্রেরণা পেতাম না। আপনি যে আমাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করলেন।

সিস্টার ২: মিঃ বোস আমাকে নিবেদিতা বলেই ডাকুন।

বোস : একটি কথা না বলে পারছি না, আপনাকে মিস নোবেলের পরিবর্তে সিস্টার নিবেদিতা বলতে আমার খুব আত্মপীড়ন হবে।

সিস্টার ২: কেন মিঃ বোস?

বোস : আমার মনে হয়, এই বদলের ফলে নোবেলের মানবিক সম্পদে টান

পড়ল। নিবেদিতা হয়ে উঠার জন্য আপনাকে যে সংকীর্ণমনা হতে হল- তা আমাকে খুব আঘাত করে।

সিস্টার২ : আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ বোস - এটা আমার গুরুর দেওয়া নাম। আমার কাছে এ নাম চরম গৌরবের?

বোস : আপনাকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু আমার মনের কথাটাই জানালাম। ও কে — সিস্টার নিবেদিতা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(দিতা তক্তপোষে ঘুমিয়ে আছে। বুকের উপর একটি বই — মা আসেন।)

মা : কান্ড দেখো মেয়ের! সারা রাত বিছানায় যায় নি। এখানেই শুয়ে পড়েছে! (বইটা হাতে নিয়ে) নিবেদিতা ও জগদীশ চন্দ্র বসু - দেবাঞ্জন সেন। নিবেদিতাকে নিয়ে লেখা যেখানে যে বই পাচ্ছে - পাগলের মতো পড়ছে। দিতা মা- মা- ওঠ- বিছানায় গিয়ে শো- কখন ঘুমিয়েছে কে জানে? ওঠ—

দিতা : (ঘুমের ঘোরে আই হ্যাভ জাস্ট বিন টেলিং ইয়াম হাউ আই স্পেন্ট লাস্ট সানডে অ্যাটদি বোসেস। ইট ওয়াজ জাস্ট হেভেন-। আই এনটার্ড ইন টু দি ফুল পজেশন অব-

মা : দিতা কি হয়েছে, কি বলছিস? ইয়াম কে?

দিতা : ইয়াম (যেন সম্বিত ফিরে আসে) আমি এখানে কি করছি।

মা : ইয়াম? এক আমেরিকান মহিলা। মিসেস সারা বুল। নিবেদিতা তাকে মায়ের মত দেখতেন। আদর করে ডাকতেন ইয়াম। তিনিও স্বামীজীর ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন।

মা : আচ্ছা।

দিতা : তিনি নরওয়ের বিশ্ব বিখ্যাত ভায়োলিন বাদক ওলে বর্ণম্যান বুল এর স্ত্রী। বুলের মৃত্যুর পর প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হন এই সারা বুল। জগদীশ চন্দ্রও তাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

মা : আরে বাবা! কিন্তু তুই ওসব কি বললি? ঐ যে এনটার্ড ইনটু দি ফুল পজেশন অব—

দিতা : এটি বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির অংশ। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিবেদিতা একেবারে বিমোহিত। সারা বুলকে লিখছেন, আই জাস্ট এনটার্ড ইন টু দি ফুল পজেশন অব দি হার্ট অব মাই ডিয়ার মিঃ বোস।

মা : তার মানে নিবেদিতা প্রথম দর্শনেই জগদীশ চন্দ্রের প্রেমে পড়ে

গিয়েছিলেন? অবলা বোস এসব জানতেন?

দিতা : ওহো মা- এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে কি করে হবে? এদের দুজনের প্লেটনিক বন্ডিং-এর ব্যাপার রহস্যময় । কিন্তু আমাকে ভেতর ভেতর কষ্ট দিচ্ছে অন্য একটি ঘটনা-

মা : কি ঘটনা?

দিতা : কেন স্বামীজীর মৃত্যুর মাত্র দুসপ্তাহ পর অমৃত বাজার পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন যে, নিবেদিতার কাজকর্মের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর নিজের, এর সঙ্গে মঠের কোন সংস্রব নেই। কার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হল? যার সম্বন্ধে স্বামীজীর মৃত্যুর দুদিন পর অমৃতবাজার পত্রিকাই বলেছিল— পরমহংসদেবের ছায়া পড়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপর আর স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তার ছায়া তারই মানস কন্যা নিবেদিতার উপর। সেই নিবেদিতার সংস্রব ত্যাগ করল বেলুড়মঠ!

মা : এমনও তো হতে পারে, এটা শুধু ইংরেজের কুনজর থেকে মঠকে রক্ষা করার কৌশল।

দিতা : তাহলে প্রশ্নটা কি দাঁড়াল? নিবেদিতাই হচ্ছেন ব্রিটিশের কুনজরের কারণ। কিন্তু কেন? (একটা বই হাতে নিয়ে) এই বইটা দেখা মা - নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ - এই প্রশ্নের উত্তরটা মনে হচ্ছে এতেই পাব।

মা : এ কি? তুই আবার বই নিয়ে বসবি? না মুখ ধোঁয়া, না চা খাওয়া - তুই কী শুরু করলি?

দিতা : জানার আগ্রহ যে এত বিধ্বংসী হতে পারে মা - আমার ধারণাই ছিল না। আমাকে চা দিয়ে যাও। (বই খুলে বসে) অরবিন্দ সকাশে নিবেদিতা—

সপ্তম দৃশ্য

(অরবিন্দ ঘোষ এর ঘর । নিবেদিতা প্রবেশ করলেন)

অরবিন্দ: বরোদায় আপনাকে স্বাগত মহাশয়া। নমস্কার। গতকাল বরোদার মহারাজ গাইকোয়াড়ের প্রাসাদে আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আপনি আমার সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে চাইলেন। তাই এই নির্জন কক্ষটিতে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। আসন গ্রহণ করুন। আপনি তো সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ—

নিবেদিতা ৩ : দেখুন মিঃ ঘোষ । গত জুলাই মাসে স্বামীজীর মৃত্যুর কিছু দিন পরই এক দিব্য প্রেরণা আমি অনুভব করলাম। আমার মনে হল বসে থেকে

শোক করলে হবে না। তাই, এই সেপ্টেম্বরে ঝড়ের মতো ছুটছি-

অরবিন্দ : বিভিন্ন স্থানের সভায় আপনার যে বক্তৃতা প্রকাশ হচ্ছে পত্রিকায়, তাতে তো কোথাও দেখছি না আপনাকে বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করতে কিংবা সংসার মায়া ও মিথ্যা - এসব প্রচার করছেন- আপনি তো সবার মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলছেন।

নিবেদিতা৩ : নিঃসন্দেহে স্বামীজী। স্বামীজী ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত স্বচক্ষে দেখেছেন, পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন— তিনি দেখেছেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, আচার রীতিনীতি ভিন্ন তবু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আছে। এই ঐক্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতের জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়েছে। মিঃ ঘোষ আমার এখন একমাত্র কাজ এই জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তোলা।

অরবিন্দ : আপনার কর্মধারার প্রশংসা না করে পারছি না।

নিবেদিতা : আপনার কথা বলুন। বরোদায় অধ্যাপনার কাজ কেমন চলছে?

অরবিন্দ : বৃটিশের বুটের তলায় কোন কাজেরই যথার্থ সম্মান নেই।

নিবেদিতা৩ : আপনার এই বাসস্থানটি নিরাপদ তো?

অরবিন্দ : সম্পূর্ণ নিরাপদ। হঠাৎ করে আপনি এ প্রশ্ন কেন করলেন?

নিবেদিতা৩ : আপনি আমার অতীত সম্পর্কে কি জানেন?

অরবিন্দ : আমি জানি, ইংল্যান্ডে আপনি আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করতেন।

নিবেদিতা : হ্যাঁ, আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী সিনফিন দলের একজন ছিলাম আমি। আর রাশিয়ান বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপাটকিনের কাছ থেকে পেয়েছি বিপ্লবের শিক্ষা।

অরবিন্দ : সেজন্যেই আপনার কর্ম এমন আগুন ঝরা।

নিবেদিতা৩ : গুজরাটের সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত চক্রটির কাজ কেমন চলছে?

অরবিন্দ : এ আপনি কি করে জানলেন? এতো চূড়ান্ত গোপনীয়।

নিবেদিতা৩ : আমি এও জানি, চক্রের প্রেসিডেন্ট ঠাকুর সাহেব বৈপ্লবিক কাজের শলা করতে জাপানে গেছেন। এই মূহূর্তে আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে চক্রের কাজ সামলাচ্ছেন।

অরবিন্দ : আপনি তো অনেক কিছুই জানেন? সিস্টার, আপনি শুধু সংগঠক নন, গোয়েন্দাগিরিতেও সমান পারদর্শী! (দুজনে হাসি)

নিবেদিতা৩ : জানেন তো বিপ্লবী কাজে গোয়েন্দাগিরিটা শিখতে হয়। কাল বরোদার রাজা গাইকোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর যখন আপনার সঙ্গে পরিচিত হলাম- তখন থেকেই আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব। মিঃ

ঘোষ কোলকাতা আপনাকে চায়- আপনার উপযুক্ত স্থান বঙ্গদেশ।

অরবিন্দ : না, আমি অন্তরালেই থাকবো। পশ্চাতে থেকে আমার কাজ মানুষ তৈরি করা। তবে বাংলাতেও ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছি।

নিবেদিতা৩ : কিন্তু, মিঃ ঘোষ, এর জন্যে তো বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। ভলান্টিয়ার রিক্রুট করতে হবে। তাদের মোটিভেট করতে হবে- অস্ত্র চালনার ট্রেনিং দিতে হবে। আপনি ছাড়া এত বড় কাজটা কে করবে?

অরবিন্দ : আমি এখান থেকে সব চালনা করবো। এর মধ্যেই যতীন্দ্রনাথ কলকাতার সার্কুলার রোডে গুপ্ত সমিতির প্রথম কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছে।

নিবেদিতা ৩: (অরবিন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে) আমি এ কাজে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আপনি কি সে সুযোগ দেবেন?

অরবিন্দ : সিস্টার! আপনাকে গুপ্ত সমিতির কাজে পেলে আমাদের কাজ অনেক দ্রুত এগিয়ে যাবে। আপনি হবেন আমাদের পরামর্শদাতা। আমাদের একটাই লক্ষ্য, ভারতবর্ষকে ইংরেজ অধীনতা থেকে মুক্ত করা।

নিবেদিতা ৩ : আপনি আমার উপরে নির্ভর করতে পারেন, আমাকে আপনার বন্ধু বলে জানবেন। (ব্যাগ থেকে একটি বই বের করে) নিন- এই বইটি আপনার জন্যে। স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'।

অরবিন্দ : ধন্যবাদ সিস্টার। বন্দেমাতরতম্।

সিস্টার ৩ : বন্দে মাতরম্। **(আলো নেভে)**

অষ্টম দৃশ্য

সিস্টার ৩ : বরোদা থেকে কলকাতা ফিরেই আবার আমাকে ছুটতে হল মাদ্রাজে। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হল। এরপর মালাপুর, সালেম , ত্রিচিনপল্লী, চিদাম্বরম - একের পর এক জায়গায় বক্তৃতা সভায় আমার একটাই কাজ- জাতিকে জাগ্রত করা। কলকাতায় ফিরতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

(একজন সন্ন্যাসী, একজনের হাতে কয়েকটি কবিতা)

ব্রহ্মানন্দ : প্রতিটি পত্রিকায়— এই যে "হিন্দু"- "স্ট্যাটস্‌ম্যান" প্রত্যেকটিতে জমকালোভাবে এসব ছাপানো হয়েছে। দিস ইজ টু মাচ।

(অন্য একজন সন্ন্যাসী নিবেদিতাকে নিয়ে আসেন)

সন্ন্যাসী : মহারাজ ব্রহ্মানন্দজী। ভগিনী এসেছেন।

নিবেদিতা ৩: প্রণাম মহারাজ। আপনি কুশলে আছেন তো?

ব্রহ্মানন্দ : কুশলে থাকার মতো আর পরিস্থিতি আর নেই।

নিবেদিতা ৩ : কি হয়েছে মহারাজ?

ব্রহ্মানন্দ : এসব কি হচ্ছে বল তো নিবেদিতা? তোমার কান্ড কারখানায় আমরা একেবারে হতবাক্। তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলতো? স্বামীজীর আধ্যাত্মভাব প্রচার করা, না অন্য কিছু?

নিবেদিতা ৩ : আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে ভারতবাসীর মধ্যে অখন্ড জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই সবচেয়ে আগে প্রয়োজন।

ব্রহ্মানন্দ : এ কি তোমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

নিবেদিতা ৩: এতো আমার গুরু নির্দিষ্ট কাজ।

সন্ন্যাসী : তুমি বলছ, হে নব্য ভারত, শুধু অতীতের রামায়ণের গল্পে ডুবিয়া থাকিও না। মাতৃভূমির সেবা দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া নূতন রামায়ণ সৃষ্টি কর- এসব বক্তৃতার মানে কি?

নিবেদিতা ৩: মানে কি- সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে মহারাজ ব্রহ্মানন্দ?

ব্রহ্মানন্দ : তুমি কেন বুঝতে পারছো না, তোমার এ সমস্ত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাগুলি উপলক্ষ্য করে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট এবার নিশ্চিত মঠকে টার্গেট করবে।

নিবেদিতা ৩: মঠ থেকে তো আগে একবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আমার সমস্ত কাজের দায়িত্ব আমার। মঠের কোন দায়িত্ব নেই।

সন্ন্যাসী : ঐ ঘোষণাই যথেষ্ট নয় ভগিনী।

ব্রহ্মানন্দ : হ্যাঁ, তোমার এই ইন্ধনমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার পূর্বের ঘোষণা মোটেই যথেষ্ট নয়। নিবেদিতা, তুমি কেন বুঝতে পারছো না। - আমাদের কাজ মানব জীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশ, সেই সঙ্গে জনসেবা। কিন্তু, তুমি সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছো তুমি ভাল করেই জান, তোমার সমস্ত রাজনৈতিক কাজে আমরা কোনভাবেই সায় দিতে পারি না। আমরা এভাবে মঠের ধ্বংস ডেকে আনতে পারি না। কারণ আমরা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়াতে চাই না।

সন্ন্যাসী : তোমার মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? (নিবেদিতা চুপ)

ব্রহ্মানন্দ : তুমি চুপ করে থেকো না নিবেদিতা। শোন তোমার এসব কাজকর্মে আমরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। তাই তোমাকে বলছি, হয় তুমি রাজনীতি ছাড়, না হয় আমাদের।

সন্ন্যাসী : স্বামীজীর শিষ্যা হিসেবে তোমাকে মঠের শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত।

ব্রহ্মানন্দ : কাল বিলম্ব না করে, তুমি তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। শেষবারের মতো বলছি। হয় তুমি রাজনীতি পরিত্যাগ কর নয়তো আমাদের।

(সবাই চুপ। একটু পরে)

নিবেদিতা : মহারাজ, আমি রাজনীতি ছাড়তে পারবো না। ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলার চেয়ে অন্য কোন কাজই আমার কাছে মূল্যবান নয়। আমি একাজে একান্ত হয়ে গেছি। আমি প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু একাজ থেকে পিছু হটতে পারবো না।

সন্ন্যাসী : আপনি কি বলছেন ভগিনী- সেটা ভেবে দেখেছেন তো?

নিবেদিতা : হ্যাঁ, আমি ভেবেই বলছি।

ব্রহ্মানন্দ : তবে তুমি এক কাজ কর। একটি খোলা চিঠি লিখে কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও যে তুমি স্বেচ্ছায় মঠ ত্যাগ করে যাচ্ছ।

নিবেদিতা : আপনার আদেশ শিরোধার্য্য মহারাজ।

(ধীরে ধীরে আলো অফ)

নবম দৃশ্য

(বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে যাওয়ার রাস্তা। একজনের মাথায় একটি বিরাট কার্টনের বাক্স। সামনেও পিছনে সতর্কভাবে প্রহরা দিয়ে এগিয়ে চলছে দুজন)

বাহক :ও বাবু আর যে চলতে পারছি নে। একটু থেমে বিরাম নিতে হবে। একটা হাত লাগান দিকিনি।

বারীন্দ্র : আরে এই তো- আর একটুখানি পথ-

বাহক : তখন থেকে শুধু বইলতেছেন-এট্টুখানি- এট্টুখানি -। বাক্সটার ওজনে যে আমার কাপড় চোপড় ভরে যাবার যোগাড়। ধরেন- এট্টু নামাই।

বারীন্দ্র : ধর - ইন্দ্র ধর।

ইন্দ্র : বারীনদা- তাড়াতাড়ি এদিকটা পেরিয়ে গেলে হতো না?

বারীন্দ্র : দেখছিস না? ব্যাটা কাপড়চোপড় ভরিয়ে দেওয়ার হুশিয়ারি দিচ্ছে। ধর।

বাহক : ঐ আগে আমি ইট্টু বাইরে যাই। (ওরা বাহকের মাথা থেকে বাক্সটি নামায়)

ইন্দ্র : বারীনদা এর কান্ড কারখানা কিন্তু সন্দেহজনক। পুলিশের চর না তো? (বাহক ঢোকে)

বাহক : বাপরে বাপ এটার ভেতরে কি আছে গো কর্তা? এত ভারী।

ইন্দ্র : কি আছে সেটা, তোমার জেনে কি হবে? যা তোমার কাজ সেটা কর।

তোল।

বাহক : না - না জানতি হবে। শুনেছি আইজ কাইল এই মেদিনীপুরে নাকি বিপ্লবীরা ঘাঁটি গেইড়েছে।

বারীন্দ্র : বিপ্লবী? এই মেদিনীপুরে? কি বলছো কি?

বাহক : সাদা মুখে দিয়ে তারপর আপনেরে বলতেছি। খাড়ান।

ইন্দ্র : দেরি করলে বিপদ হবে। চল—

বাহক : কি যেন বললেন— বিপদ। বিপদ হবি ক্যাইনে। কর্তা, আমার কেনতু আপনাদের কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বারীন্দ্র : সন্দেহ! বলছ কি? আমাদের মধ্যে সন্দেহের কি দেখলে? এই যে দেখ না- দেখ - হাত-পা-জামা-জুতো-সন্দেহের কোন ব্যাপার আছে?

বাহক : না বাপু। আপনাদের তো এ অঞ্চলে কোনদিন দেখিনি। যা ভেইবে ছিলাম-

ইন্দ্র : কি ভেবেছিলে?

বাহক : ঐ যে হরগোবিন্দ ঘোষ না কি যেন নাম। তিনি নাকি এই অঞ্চলে ছেইলে ছোকড়াদের বন্দুক চালনার টেরিনিং দেইতে ঘাঁটি খুলেছেন। ও কত্তা-এর ভেইতরে বোমা টোমা নেই তো? ফিরিঙ্গি পুলিশের হাতে পইল্লি যে নিঘ্‌ঘাত হাজত বাস হবি গো।

বারীন্দ্র : বলছি এতে আমাদের ব্যবসার জিনিস। মেলা বকবক না করে চল দেখি-তোল মাথায়।

বাহক : ও কর্তা- আমার যে আবার বাইরে যেইতে হবে। তলপেটে আবার চাপ-

ইন্দ্র : এতো মহা ঝামেলায় ফেল্লে- ব্যাটা যাবি কিনা বল? নাকি বের করবো অস্ত্রটা?

বাহক : ও মা গো - বিপ্লবী-ই-ই (ছুটে পালায়)

বারীন্দ্র : এ্যাই-এ্যাই মুটে- শোন- পালালো তো? অস্ত্রের কথা বলতে গেলি কেন?

ইন্দ্র : আমি তো ভেবেছিলাম ভয় দেখিয়ে যদি কাজ হয়। ব্যাটা পালাল!

বারীন্দ্র : এবার চল, চল, নিজেদের মাথায় তোল।

ইন্দ্র : এ্যাঁ। এত ভারী বাক্স মাথায়? আচ্ছা বারীনদা, এত বই কিসের জন্যে?

বারীন্দ্র : শোন, এখানে শ'দেড়েক নানারকমের বই আছে। সিস্টার নিবেদিতা তার লাইব্রেরির সব বই আমাদের গুপ্ত সমিতিতে দান করেছেন।

ইন্দ্র : এত বই দিয়ে কি হবে? আমাদের তো বোমা পিস্তল দরকার।

বারীন্দ্র এগুলি বোমা পিস্তল থেকেও বেশি বুঝলি? সিস্টার আমাদের ঘাঁটিগুলিতে পলিটিক্যেল মিশনারি গড়তে চাইছেন । এখানে ক্লাস হবে- অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য সব। স্বয়ং সিস্টার আসবেন ক্লাস

নিতে।

ইন্দ্র : পড়াশুনা? বন্দুক চালানো শেখানো হবেনা? যতীন্দ্রনাথ দা আসবেন? অস্ত্র চালনা শেখাতে?

বারীন্দ্র : চুপ। যতীন্দ্রনাথের নাম আমার সামনে একদম নিবি না। আমাকে দাবিয়ে নেতা হতে চায় । আমাকে ? আমি হলাম অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই। নে তোল মাথায় তোল। যতীন্দ্রনাথের চ্যালা। (মাথায় নিয়ে বেরিয়ে যায়) (ভিতরে প্রবেশ)

দিতা : কি আশ্চর্য! বাংলার গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের আন্দোলনের নেতা বারীন্দ্র ঘোষ যে অপর নেতা যতীন্দ্রনাথের নামই শুনতে পারে না। এই ব্যক্তিগত ঝগড়া বিবাদের জেরেই যে ভেস্তে গেল নিবেদিতার প্রথম বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়াস। আর সিস্টারের ভাগ্যে জুটল এক রাশ তিরস্কার-

সিস্টার২ : কিন্তু তাই বলে মাঝপথে থামলে তো চলবে না-

দিতা : কিন্তু এর জন্যে কত কষ্ট জমেছে তোমার বুকে।

সিস্টার২ : না- না- না। আমার কোন কষ্ট নেই। কোন ব্যথা নেই।

দিতা : হ্যাঁ, কেন তোমার কষ্ট হবে। তুমি তো পাথর প্রতিমা। তোমার জীবনের পিছনের দিকে তোমায় নিয়ে যাব সিস্টার। ১৯০০ সাল। প্যারিসে বিবিধ বিদ্যার আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ভারতের দুই কৃতি সন্তান আমন্ত্রিত সেখানে- স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস।

সিস্টার২ : হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে আমিও তখন প্যারিসে।

দিতা : কিন্তু সেই আনন্দঘন সময়ে হঠাৎ জগদীশ চন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার শরীরে দ্রুত অস্ত্রোপচার করতে হবে।

সিস্টার ২: আমি আর সারা বুল লন্ডনে তার অপারেশন করালাম। তারপর তার দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রথমে লন্ডনে পরে উইম্বলডনে আমার মায়ের বাড়িতে নিয়ে এলাম।

(তিনটে চেয়ার ও সেন্টার টেবিল। অবলা বসু টেবিলে রাখা ডেট স্ট্যান্ডে ডেট চেঞ্জ করছেন। জগদীশ চন্দ্র ঢোকেন।)

জগদীশ : গুড মর্নিং অবলা।

অবলা : গুড মর্নিং। ভোরে কখন তুমি সাইক্লিং, করতে বেরিয়ে গেলে টেরও পাইনি।

জগদীশ : তুমি ঘুমোচ্চ বলে আমি ডিস্টার্ব করিনি। মিসেস মেরি নোবেলের দেশবাড়ির এই গ্রামখানি বড় মনোরম। ভোরে কুয়াশা চরাচর কেমন ম্রিয়মান , কিন্তু সোনালী রোদের ছোঁয়া লাগতেই একেবারে চনমনে।

অবলা : নিবেদিতার সাইকেল রাইডিং কতদূর শেখা হল?

জগদীশ : আজ নিবেদিতা রাইডিংয়ে যা কান্ড করেছে-

অবলা : কি হয়েছে- কোন অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেনি তো? (নিবেদিতা চা নিয়ে ঢোকেন) সাইকেল রাইডিংয়ে আজ কি হয়েছে?

সিস্টার ২:(হাসতে হাসতে কুটি কুটি) সে আর বল না বো। হোয়াট অ্যান এমবেরাসিং মোমেন্ট- বাট আই এনজয়েড ইট-

অবলা : টেল মি- হোয়াট হ্যাপেন্ড মাই ডিয়ার-

সিস্টার২: আমি তো বাইসাইকেল চেপে-ইন ভেরি হ্যাপি মুড- একটা ছোট্ট টিলা থেকে নামছি-রাস্তার একপাশে এক ঝালাইওয়ালা কাজ করছিল। আমার সাইকেলটা তাকেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বস্তু ভাবল- আমি তাকে ব্রেক চেপে যতই সংযত করার চেষ্টা করছি, সে ততই আড়াতাড়িভাবে রাস্তাকে অতিক্রম করে ছুটছে ঝালাইওয়ালার দিকে। আমি চিৎকার করছি মিঃ ঝালাইওয়ালা সাবধান! সাবধান! কিন্তু , ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি সাইকেলসহ তার উপর- বাট, সেভড্ লাকিলি! (সবাই হাসিতে ফেটে পড়েন)

জগদীশ : আমার দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্যে, সুস্থ হয়ে গবেষণার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, মানসিকভাবে আমাকে চাঙ্গা রাখার জন্য তোমার, মিসেস সারাবুল আর অবলার চেষ্টার কথা কোনদিন ভুলব না।

সিস্টার২: আমরা চাই আপনার চারপাশে একটি অক্ষুব্ধ শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে যা আমার কাজের জন্য একান্ত আবশ্যক।

জগদীশ : আমার অপারেশনের পরবর্তী দিনগুলোতে তুমি আর অবলা পালা করে যেভাবে রাত জেগে আমার শুশ্রুষা করেছো- আমি- আমি-

অবলা : নিবেদিতা যে তোমাকে 'বায়েন' বলে সম্বোধন করে যার অর্থ হল 'ছোট খোকা' । ছোট খোকার জন্যেই তো সে রাতের পর রাত জেগেছে- মায়ের মত।

সিস্টার২ : বায়েন, এসব কোন কাজের কথা নয়। কাজের কথা হল, হাতে সময় কম- আপনাকে এখন রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে-

জগদীশ : ইয়েস, দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তাই বলে বিকেলের তাস খেলা বন্ধ রাখা যাবে না। (সবাই হাসি)

অবলা : তোমার কৃপায় তো নিবেদিতাও লুইস্টতাস খেলা শিখে ফেলেছে।

জগদীশ : তবে, লন্ডনে সেই কমেডি সিনেমা দেখা কিন্তু এখনো মিস করছি

সিস্টার২ : আহা, কি মজার ছিল সেই সিনেমা আর থিয়েটার দেখা।

জগদীশ : ও হ্যাঁ বাই দ্য ওয়ে, নিবেদিতা আমি কিন্তু রবিকে জানিয়েছি-তোমার অনুবাদে তাঁর কাবুলিওয়ালা, ছুটি দুটি গল্প এখানে সাহিত্য মহলে কেমন সমাদৃত হয়েছে-

সিস্টার২ :এবার শুরু করবো- দেনা পাওনা। কিন্তু, তার আগে বায়েন আপনার 'রেসপন্স ইন দ্য লিভিং এন্ড নন লিভিং' এর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

অবলা : এত এত পরিশ্রম তুমি কেন করছ নিবেদিতা?

সিস্টার২ : কেন করছি ! মিঃ বোসের বিজ্ঞান গবেষণাকে আমি দেশপূজা বলে মনে করি বো। ভারবাসীর আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত উপলক্ষ্য আর কি হতে পারে?

অবলা : ঠিক। আমার খুব ভালো লাগলো তোমার বায়েন যখন ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার অফার প্রত্যাখ্যান করলেন-

জগদীশ : আসলে আমার হৃদয়মূলে ভারতবর্ষ, যদি সেখানে থেকে কিছু করতে পারি, তবেই আমার জীবন ধন্য হবে।

অবলা : এই দেশপ্রেম থেকেই জান, বেতার তরঙ্গ গবেষণা লব্ধ আবিষ্কারকে তিনি প্যাটেন্ট হিসাবে বিক্রি করলেন না।

জগদীশ :প্যাটেন্ট কেনার জন্যে আমার কাছে এক ইংরেজ কোটিপতি ভিক্ষুকের মতো এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি বললাম, বিজ্ঞান বিক্রয়ের জিনিস নয়, এটা মানুষের কল্যাণের জন্য।

সিস্টার : বায়েন, এই মহত্বের জন্যই আমি তোমাকে অন্ধভাবে ভালোবাসি। তোমার গবেষণার পেপারগুলো কাগজে লিপিবদ্ধ করতে চাই তাই আমার কলম এত অক্লান্ত। তোমার কলম অনুগত ভৃত্যের মতো তোমার কাজ করে যাবে। মনে করবে এ লেখা তোমার, সেই সঙ্গে, দেশে ফিরে তুমি যাতে নির্বিঘ্নে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পার, তার জন্য মিঃ টেগোরকে চিঠি লিখেছি। মিঃ টেগোর দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ইতোমধ্যে ত্রিপুরার রাজা তোমার গবেষণার জন্য বাৎসরিক অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন—

জগদীশ :দেশবাসীর এই ঋণ অমি কি করে ফিরিয়ে দেবো? এখন, সামনের কাজ হচ্ছে আমার ভাবনাগুলোকে কাগজে লিপিবদ্ধ করা। সেখানে নিবেদিতা, তোমার কলম আমার সারথি।

একাদশ দৃশ্য

মা : দিতা— দিতা (পূর্বের দৃশ্যের আলো নেভে) ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

দিতা : না। কারণ আমি সিস্টারের উপর তৈরি একটা পুরনো সিনেমা দেখছি। ভগিনী নিবেদিতা।

মা : আচ্ছা, এটা কেমন কথা ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে জে সি বসুর তিনখানা বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলোর পিছনে সিস্টার নিবেদিতার অক্লান্ত শ্রম- কিন্তু তিনটে বইয়ের কোথাও নিবেদিতার ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানালেন না জগদীশচন্দ্র বোস। কেন এমন হবে বল? এ কেমন নির্মম উদাসীনতা?

দিতা : এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে চাইছো মা? আমি সিস্টার নিবেদিতা নই, আমি নিবেদিতা ঘোষ।

মা : সে যাই হোক, আমি বুঝতে পারি না, আচার্যের এত কৃপণতা কেন? নারী বলে? বিদেশিনী বলে? না জগদীশ বোস ব্রাহ্ম বলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পৌত্তলিক নিবেদিতাকে প্রাপ্য সৌজন্য জানাতে কুণ্ঠা?

দিতা : আমিও এসব প্রশ্ন নিয়ে তোমার মত অসহায়।

মা : আমার কেন জানি মনে হয়, সিস্টার নিবেদিতার অবদানের মূল্যায়ন তাঁর জীবদ্দশায় কেউ করেন নি। জগদীশচন্দ্র বোস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - কেউ না। (বোট চলছে পদ্মার বুকে। বোটে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্র।)

সিস্টার ১: শিলাইদহে না এলে গ্রাম বাংলাকে জানাই হত না। হাউ ডিভাইন, হাউ মেজেস্টিক।

রবীন্দ্রনাথ: আজ ভোরবেলা- বুঝেছো জগদীশ- সিস্টার আমার কাছাড়ির আমলা দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন গ্রাম দেখতে। এখানকার গ্রাম জীবন জানার তার কি আগ্রহ কিশোরীর মতো ছুটেছেন- কখনও চাষীর বাড়ির উঠোনে, কখনও আলপথ ধরে, কখনও বিশাল বট গাছের তলায়।

রবীন্দ্রনাথ: গ্রাম বাঙলার প্রতি একজন বিদেশিনীর এমন আকর্ষণ দেখে আমি মুগ্ধ।

সিস্টার১ : আই অবজেস্ট। নিজেকে কিন্তু ভারতীয় ভাবতেই আমার ভালো লাগে।

জগদীশ : আমার বিশ্বাস এখানকার খেজুরের রস, আখের টাটকা গুড় আর গরুর সদ্য দোয়া দুধ- এসবের আস্বাদ একবার যে পায় সে কোনদিন এদেশ ত্যাগ করবে না। (সবাই হাসি)

রবীন্দ্রনাথ: তুমি জান, জগদীশ, প্রথমবার যখন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার আলাপ

হয় - তখন তিনি মিস নোবেল - অল্পদিন হয়েছে তিনি ভারতে এসেছেন। আমার ধারণা ছিল, সাধারণতঃ ইংরেজ মহিলারা যেমন হয়ে থাকেন, তিনিও সেই শ্রেণির। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আমার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হল:

জগদীশ : কি ভাবে?

রবীন্দ্রনাথ: আমি তাকে বলেছিলাম আমার কনিষ্ঠা কন্যা মীরাকে ইংরেজি শেখাতে।

সিস্টার১ : আমি বলেছিলাম ঠাকুর বংশের মেয়েকে একটি বিলাতী খুকী বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?

রবীন্দ্রনাথ: জান তখন আমার ধারণা ছিল ইংরেজী শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। সঙ্গে আদব কায়দা-।

জগদীশ : সিস্টার তখন কি বলেছিলেন?

সিস্টার১ : পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আপনি এতটা আবিষ্ট- আমি ভাবতে পারছি না। আপনি আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে ফোটবার আগেই-নষ্ট করে ফেলতে চান? আমার মতে, শিশুর পরিচিত পরিবেশ ও মাতৃভাষার পরিমন্ডলেই তার প্রথম প্রকাশ হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ: ইউ আর রাইট। আপনি আমাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার পথ খুলে দিলেন।

সিস্টার১ : এসব কথা থাক, আপনার নতুন গল্পের ভাবনাটি শুনতে চাই।

জগদীশ : ইয়েস। এ জায়গাটি- গল্প শোনার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত- বল রবি।

রবীন্দ্রনাথ: ভাবছি একটি উপন্যাস লিখব-এবার - নামটাও ভেবে নিয়েছি 'গোরা'।

জগদীশ : বল! বল- শুনি

রবীন্দ্রনাথ: একটি আইরিশ যুবক।

সিস্টার১ : আইরিশ?

রবীন্দ্রনাথ: হ্যাঁ, আইরিশ। ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষকে ভালবেসে সে ভারতবর্ষেই থেকে যেতে চায়। এখানকার রীতিনীতি আত্মীকরণ করে সে ভারতের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করে।

জগদীশ : ইন্টারেস্টিং। তারপর।

রবীন্দ্রনাথ: ছেলেটি নম্র স্বভাব, অথচ সংকল্পে কঠিন। সব কাজে নেতৃত্ব দেওয়া তারপক্ষে সহজ, আচারে অত্যন্ত গোঁড়া সে, অথচ যুক্তির উপাসক, স্বাধীনতার পূজারী। শেষে সে জানতে পারল, সে এক আইরিশ সৈনিকের ছেলে। কিন্তু তাঁর বিদেশী শিকড়ের জন্য তার প্রিয়জন তথা শিষ্যা তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

সিস্টার ১: না- না- আপনার এই ভাবনা সঙ্গত নয় মি. টেগোর।

রবীন্দ্রনাথ : কেন সঙ্গত নয়? বুঝিয়ে বলুন—

সিস্টার ১ : একজন বিদেশী, যিনি নিঃস্বার্থভাবে ভারতবর্ষকে আপন করে নিয়েছেন— ভারতবাসী কেন তাকে আপন করে নেবে না।—

রবীন্দ্রনাথ : ভারতের হাজার বছরের লালিত সংস্কার তাকে আপন করে নিচ্ছে না।

সিস্টার ১ : শুধুমাত্র বিদেশী শিকড়ের কারণে আইরিশ যুবকটির পরাজয় মেনে নেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ : হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেই এই সনাতন ধর্মে অন্তর্ভূক্ত না হতে পারার যে সীমাবদ্ধতা- আমি তাকে ধরতে চাই—

সিস্টার ১ : একজন লেখক হিসাবে আপনাকে তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রয়োজন।

জগদীশ : আমি বিজ্ঞানের মানুষ। যে কোন ঘটনার পেছনের তত্ত্বটি অন্বেষণ আমাদের কাজ। আমি জিজ্ঞেস করবো— গল্পের আইরিশ যুবকটির প্রেরণা কে? (রবীন্দ্রনাথ চুপ)

সিস্টার ১ : কে মি. টেগোর?

রবীন্দ্রনাথ : সময়, পারিপার্শ্ব— এসবই এর প্রেরণা। বিশেষ কোন ব্যক্তি নন।

জগদীশ : আমার তো মনে হয়— নিবেদিতাই তোমার এ গল্পের প্রেরণা।

নিবেদিতা : যদি আমি প্রেরণা হয়ে থাকি, তবে আমি বলব এ কাহিনী আমার কর্মের অবমূল্যায়ন। আমার জীবনব্রতকে অপমান করা, সর্বোপরি আমাকে অস্বীকার করা—

রবীন্দ্রনাথ : আপনি আপনার ভাবনাকে আমার উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না সিস্টার নিবেদিতা।

নিবেদিতা : আমি মোটেই এমন স্বেচ্ছাচারী নই। আপনার উচিত হবে লেখার সময় গল্পের শেষটা পরিবর্তন করা। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি চললাম। (প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(মঞ্চের সম্মুখে এক পত্রিকার হকার)

হকার : পত্রিকা পত্রিকা। সরকার বাহাদুর, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। খবর-খবর-জবর খবর। গতকাল গভর্ণমেন্ট বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাব করিয়াছেন –তাজা খবর- তাজা খবর বাংলা ভাগ হইয়া গিয়াছে। (বেরিয়ে যায়)

যুবক : (পত্রিকা পড়তে পড়তে) শাসনকার্যের সুপরিচালনার জন্য মহামান্য সরকার বাহাদুর ২০শে জুলাই, ১৯০৫ - বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত বড়লাট লর্ড কার্জনের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। (চিৎকার করে) এ অন্যায়,

মহাঅন্যায়- এর প্রতিবাদ চাই- প্রতিবাদ। (আরো অনেকের প্রবেশ)

সকলে : প্রতিবাদ চাই- প্রতিবাদ। বাংলাকে ভাগ করতে দেব না।
(একটি আলোক বৃত্তে নরেন্দ্রনাথ সেন) (হাততালি)

নরেন্দ্রনাথ: আমি নরেন্দ্রনাথ সেন প্রস্তাব করিতেছি, যতদিন পর্যন্ত না বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বঙ্গভঙ্গ রদ করিবে ততদিন আমরা সমস্ত বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' করিব। (তুমুল হর্ষধ্বনি)। পাষন্ড প্রচন্ড বলে অঙ্গ খন্ড খন্ড করে। হে মা চন্ডী, তুমি দন্ড দিতে অগ্রসর হও।
(অনেকের মধ্যে নিবেদিতা। বারীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে অরবিন্দ প্রবেশ করলেন)

সিস্টার ৩ খন্ডদৃশ্য : ভারতবর্ষে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা আমি তৈরি করেছি। এজন্য গুপ্ত সমিতির কাজকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের মৃত্যু ভয় জয় করতে হবে। কাপুরুষ বলে আমাদের যে অখ্যাতি আছে তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

খন্ডদৃশ্য ২ : নিবেদিতা হাতে পিস্তল নিয়ে অন্যদের ট্রেনিং দিচ্ছেন।

খন্ডদৃশ্য ৩ : নিবেদিতা বোমা তৈরির প্রক্রিয়া দেখাচ্ছেন।

সিস্টার ৩ : কিছুদিনের মধ্যেই হেমচন্দ্র দাস প্যারিস থেকে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরছেন। ইতিমধ্যে আমি উল্লাসকর দত্তের এই পদ্ধতিটি তোমাদের দেখালাম। তোমাদের মধ্যে জে.সি. বোস ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে। মিঃ বোস ও মিঃ রায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে । (কাশতে থাকেন)

চতুর্দশ দৃশ্য

(সন্ধ্যা। একটি ইজি চেয়ারে সিস্টার। ক্রিস্টিন গ্লাসে করে ফলের রস নিয়ে এসেছেন। কালো কাপড়ে গাছ আঁকা - কয়েকজন নিয়ে দাঁড়াবে)

ক্রিস্টিন : নাও, ফ্রুট জুস খাও।

সিস্টার ৩ : খেতে ইচ্ছে করছে না। জিহ্বায় কোন স্বাদ নেই।

ক্রিস্টিন : একথা বললে হবে না। ডা. নীলরতন সরকার অরেঞ্জ জুস পথ্য দিয়েছেন। নাও, নাও মাইডিয়ার।

সিস্টার ৩ : ক্রিস্টিন, তুমি ঠিক আমার মায়ের মত। ছোটবেলায় মা এমনি করে জোড় করে সব খাওয়াতেন। দাও।

ক্রিস্টিন : এই তো -বিশ্রাম নেই। গত দুমাস ধরে প্রথমে পূর্ববঙ্গে পরে ওড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, বন্যার্ত মানুষের সেবার জন্য, রাত দিন খেটেছো, স্নান, খাওয়া

কিছুরই ঠিক ছিল না। তার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন, লেখালেখি। কারোর কথা তুমি শোন? তোমার যা মনে হবে তুমি তাই করবে। এখন এক মাস ধরে এই ম্যালেরিয়ায় কি অবস্থা হয়েছে তোমার, বলতো?

সিস্টার ৩ : আর বকিস না মা আমার। এবার একটু একা থাকতে দে।
ক্রিস্টিন ঠিক আছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘরে ভীষণ গুমোট। এখানেই আরও কিছুক্ষণ থাকো। (চলে যায়)

(গাছ গুলি যেন নড়ে ওঠে। ক্রমশ এক আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। যেন গাছগুলো কাঁদছে। আলো আঁধারিতে গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এক একজন মানুষ।)

সিস্টার ৩ : কে - কে তোমরা?

গাছ ১ : আমাকে চিনতে পারছো না? আমি পূর্ববঙ্গের পাবনার বুনো পাড়ার সেই বৌ। মালতি।

সিস্টার ৩ : মালতি!

গাছ ২ : আমি মুরারী পুকুরের সেই যুবক।- অর্জুন।

সিস্টার ৩ : আমাকে চিনতে পারছে না, দ্যাখো ভালো করে।

সিস্টার ৩ : সুমি, মাই স্টুডেন্ট! মা আমার। কি হয়েছে তোমাদের? মালতি, তোমার শিশু সন্তানটি?

গাছ ১ : নেই- নেই- সিস্টার! ছেলেটার মুখে দুটো ভাত দিতে পারিনি গো। এক ফোঁটা দুধ দিতে পারিনি। দুর্ভিক্ষ খেয়ে নিয়েছে আমার ছেলেটাকে। বাঁচাতে পারলাম না-

গাছ ২ : সিস্টার। এক হাতে গীতা আর এক হাতে তলোয়ার নিয়ে তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম- দেশের জন্য প্রাণ দেবো। কিন্তু অতি উৎসাহে আর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ধরা পড়ে গেলাম পুলিশের জালে।

সিস্টার ৩ : অর্জুন।

গাছ ২ : সিস্টার! জেলের ভেতরে পুলিশের অত্যাচার সইতে পারছি না। লোহার শিঁক গরম করে সারা শরীরে ছেঁকা দিচ্ছে -ও-ও-

সিস্টার ৩ : আর বলিস না। বাছা আমার। আমি সইতে পারি না।

গাছ ৩ : সিস্টার তোমার সাধের বালিকা স্কুল অর্থাভাবে বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তুমিই তা বলেছ, শিক্ষা ছাড়া নারীর মুক্তি নেই। তুমি শিক্ষা দিয়েছ, যথার্থ নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য। উত্তম নাগরিক না হলে সত্যিকারের দেশপ্রেমী হওয়া যায় না। কিন্তু, সিস্টার স্কুলবন্ধ হয়ে গেলে এই শিক্ষা

আমাদের কে দেবে?

সব গাছ : সিস্টার , তুমি আমাদের সহায়। তুমি আমাদের পথ দেখাও। সিস্টার

সিস্টার ৩: আমি কি করবো? কি করা উচিত আমার? মাদার, হোয়াট ইজ দাই উইল? হাউ মেনি টাইমস অ্যাগেইন, মাদার, শ্যুড আই হ্যাড টু ফাইট। মাদার । আমাকে বজ্রের শক্তি দাও। বজ্রের শক্তি দাও মা। (ক্রিস্টিন ছুটে আসে)

ক্রিস্টিন : কি হল? চিৎকার করছো কেন?

সিস্টার : না- না- আমাকে শুয়ে বসে কাটালে হবে না ক্রিস্টিন। আমার অনেক - অনেক কাজ।

ক্রিস্টিন : আগে তো সুস্থ হও। শীতের দেশের মানুষ, এখানকার গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারছো না। দুদিন পর পর অসুস্থ হয়ে পড়েছো। এত কাজ কাজ করলে হবে?

সিস্টার ৩: কাজ করেলই আমি সুস্থ থাকবো। দেখি, আমি ভেতরে যাব। আর দেরি নয়। অনেক কাজ, আগে স্বামীজীর জীবনী গ্রন্থটা শেষ করতে হবে। সময় নেই।

ক্রিস্টিন : বইয়ের নামটা বড় সুন্দর 'দ্য মাস্টার, অ্যাজ আই স হিম।'

(ক্রিস্টিন ধরে ভেতরে নিয়ে যায়)

পঞ্চদশ দৃশ্য

বারীন্দ্র : সিস্টার আপনি সুস্থ তো?

(নিবেদিতা ও অবিনাশের প্রবেশ)

সিস্টার ৩: বারীন্দ্র। আমি আমার শক্তি ফিরে পেয়েছি । ভূপেন্দ্রনাথের জামিনের অর্থ যোগাড় করতে পেরেছি। এই নাও, দশ হাজার টাকা। কোর্টে জমা দিয়ে ভূপেন্দ্রের জামিনের ব্যবস্থা কর।

বারীন্দ্র : সারা শহরে খবর ছড়িয়েছে- এবার আপনার গ্রেপ্তার হওয়ার পালা। আপনি নিশ্চয় দেখেছেন, ইংলিশম্যান পত্রিকায় আপনাকে 'দেশদ্রোহী' হিসেবে তিরস্কার করা হয়েছে। এই যে দেখুন- (পত্রিকা দেয়)

সিস্টার ৩: হুঁ। আমি নিজেকে নিয়ে একটুও ভাবছি না বারীন্দ্র।

বারীন্দ্র : আমাদের পরামর্শ- আপনি কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় চলে যান।

সিস্টার ৩: কি বলছ, বারীন্দ্র? যুগান্তর বন্ধ হয়ে গেছে। গুপ্ত সমিতির ভলান্টিয়ারদের ধরপাকড় চলছে, এসময় আমি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাব? কাপুরুষের মত- কখনও না।

অবিনাশ : আপনি ধরা পড়লে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

বারীন্দ্র : সিস্টার। দলের থেকে আপনাকে এ অনুরোধ জানানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেজদারও একই অভিমত।

সিস্টার ৩ : ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখছি। তুমি এখন তাড়াতাড়ি যাও, ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর কোর্টে গিয়ে দ্রুত জামিনের টাকা জমা দাও।

বারীন্দ্র : যথা আজ্ঞা। বন্দেমাতরম্।

সিস্টার ৩ : বন্দেমাতরম্। (বেরিয়ে যায় । দিতা ঢোকে) (দিতার প্রবেশ)

দিতা : সিস্টার। এরপরই দু'বছরের জন্য আপনাকে প্রায় জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংল্যান্ডে।

সিস্টার ৩ : হ্যাঁ, ১৯০৯ সালে কলকাতায় ফেরার পরের বছর আবার আমেরিকা—

দিতা : অসুস্থ সারা বুলকে দেখার জন্যে।

সিস্টার ৩ : সেখানে আপনাকে মুখোমুখি হতে হল এক ভয়ঙ্কর ঘটনার—
(অ্যাডভোকেট হ্যানরি ও নিবেদিতা)

অ্যাডভোকেট : গত দু'মাস ধরে মিসেস সারা বুলকে যেভাবে আপনি শুশ্রূষা করেছেন-তা নিয়ে কোন মেয়েও তারা মার জন্য করে না।

সিস্টার ৩: তবু তো তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না কি হ্যানরি। এটুকু সান্ত্বনা যে, শেষ দিনগুলোতে আমি তার পাশে ছিলাম।

অ্যাড আপনার : বেশ কিছুদিন আগেই তিনি এই উইলটা করেছেন। উইলের বিষয়ে জানা দরকার মিস নোবেল।

সিস্টার ৩ : বুলুন মিঃ হ্যানরিওলিয়া এই যে এখানেই দুজন? কি? আমার মায়ের সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছো? এসব তুমি কি বলছো ওলিয়া? মিস সারা বুল আমার মায়ের মত। আমি তাঁকে সেবা করবার জন্য এসেছিলাম।

ওলিয়া : চুপ কর মিথ্যেবাদী। আমার মায়ের সম্পত্তি হাত করার জন্য ঐ লোভী ভিক্ষুক ইন্ডিয়ানরা তোকে পাঠিয়েছে?

অ্যাড : আপনার বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে মিসেস ওলিয়া। আপনি অন্যায় কথা বলছেন।

ওলিয়া : ইউ শাট আপ। এই ডাইনি, ইন্ডিয়া থেকে বিষ ফল এনে, দিনে দিনে আমার মাকে খাইয়ে একটু একটু করে খুন করেছে।

সিস্টার ৩ : ওলিয়া।

ওলিয়া : আমার বাবা ওলে বুল লক্ষ লক্ষ টাকার এস্টেট রেখে গেছেন তোদের দান করার জন্য? তার কন্যাকে এভাবে বঞ্চিত করার জন্য?

অ্যাড : আপনি বাড়ি যান মিসেস ওলিয়া। আপনার কিছু বলার থাকলে, আপনি উইল চ্যালেঞ্জ করুন, কোর্টে যান।

ওলিয়া : ইয়েস, আমি কোর্টেই যাচ্ছি। এই সাধু বেশি মতলববাজ, লোভী, খুনির মুখোশ আমি খুলে দেবো। বুঝেছিস, ডাইন, মায়াবিনী- তোর সঙ্গে কোর্টে দেখা হবে।

(বেরিয়ে যায়। নিবেদিতা বিমূঢ়। মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পরেন।)

অ্যাড : মিস নোবেল, আপনি অযথা ভেঙে পড়বেন না। কোর্টে আমরাই জয়ী হব। আপনি অনুমতি দিলে, আমি বিদায় নেবো।

সিস্টার ৩ ওলিয়ার : আসুন। (অ্যাডভোকেট চলে যান। নিবেদিতার কানে ভেসে আসে সেই কথাগুলো - তুমি প্রতারক, মিথ্যেবাদী ইত্যাদি। নিবেদিতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে আরেক নিবেদিতা।)

সিস্টার ২ : এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না নিবেদিতা। শুধু মনে রাখ, সত্যের জয় হবেই।

সিস্টার ১ : আমি যে এই অপবাদ সহ্য করতে পারছি না।

সিস্টার ২ : একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল তো সত্যি করে মিসেস সারা বুলের বিষয় সম্পদের উপর তোমারও কি কোন আসক্তি নেই?

সিস্টার ৩ : কি- কি? বিষয় সম্পদের আমার আসক্তি?

সিস্টার ২ : হ্যাঁ আসক্তি! বল নেই? বল—

সিস্টার ৩ : আছে আছে। আমি চাইছিলাম। জগদীশবসুর গবেষণার কাজ যেন অর্থের অভাবে বন্ধ না হয়। চাইছিলাম, তাঁর সাফল্যের পথ সুগম করতে। চেয়েছিলাম, আমার বালিকা স্কুল যাতে অর্থের অভাবে বন্ধ না হয়- এই বিষয় বিষের আসক্তি আমাকে এখন দহন করছে-আমাকে দহন করছে।

সিস্টার ২ : ওঠো, ফিরে চল ভারতে। সেখানে যে তোমার অনেক অনেক কাজ পড়ে আছে। চল । (বেরিয়ে যায়)

ষোড়শ দৃশ্য

দিতা : এখনও বই নিয়ে আছো? ইউ আর ভেরি স্লো লার্নার।

মা : আজও ফিরতে এত দেরি করলি? তোর বাবা ফোন করেছিল। খুব বিরক্ত হয়েছে। তোর নাকি লাইনই পাচ্ছিল না। বন্যা কবলিত গ্রামে তোরা গিয়ে কি করলি?

দিতা : শহর থেকে সংগ্রহ করা শুকনো খাবার, জামাকাপড় বিলি করেছি। এই কাজের সময় আমার বার বার তার কথা মনে হচ্ছিল মা।

মা : কার কথা?

দিতা : সিস্টার নিবেদিতার কথা।

মা : তুই যে হঠাৎ করে এসব কাজে লেগে গেলি- তোর বাবা জানলে কিন্তু খুব রাগ করবে।

দিতা : আমি তখন বলবো, আমার নাম নিবেদিতা রেখেছিলে কেন? (পত্রিকা দেখে) হোয়াট নন্‌সেন্স! কান্ড দেখেছো?

মা : কি?

দিতা : এই দ্যাখো, অ্যাকসেশনের এত বছর পরেও একদল মানুষ রাজ্যটাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কি না করছে, দেশের ভেতরে দেশ রাজ্যের ভিতরে রাজ্য তৈরি করার জন্য জাতি, ভাষা, বর্ণ নিয়ে, সারা দেশ জুড়ে কি ভয়ঙ্কর রাজনীতি। আমার কি মনে হয় জান?

মা : কি?

দিতা : মনে হয়, সোস্যাল মিডিয়াতে চিৎকার করে বলি, সিস্টার নিবেদিতার সেই কথাগুলো, 'রাজনীতি, জাতি, ভাষার ভিত্তিতে খন্ডিত কোনো ভূ-ভারতের ইতিহাস কখনও অখন্ড ভারতের ইতিহাস হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখন্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ, এক সম্প্রীতির উপরই জাতীয় ঐক্য গঠিত।'

মা : একশো বছর অগে তিনি যা বুঝেছিলেন, এখনকার জ্ঞানপাপীরা তা বোঝে না।

দিতা : মা, বাবা বলেছিল না, সামার ভ্যাকেশানে গ্যাংটক যেতে। বাবাকে বল আমরা দার্জিলিং যাব।

মা : কেন?

দিতা : সেখানে যে নিবেতির শেষ দিনগুলো কেটেছিল। ১৯১১ -তে এই দার্জিলিঙে তোমার শেষ দিনগুলি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে সিস্টার। রায় ভিলায়, অবলা বসুর ভগ্নিপতীর বাড়িতে তুমি লড়াই করছো মৃত্যুর সঙ্গে, পাশে অবলা, জগদীশ চন্দ্র-

(মৃত্যু সজ্জায় নিবেদিতা, পাশে অবলা। জগদীশচন্দ্র ঢুকছেন)

সিস্টার ৩ : (স্মিত হেসে) এসো- এসো বায়েন- বসো আমার পাশে।

জগদীশ : আজ কেমন বোধ করছো নিবেদিতা?

সিস্টার ৩ : আমার দিন বোধ হয় শেষ হয়ে এল।

অবলা : এমন কথা একদম মুখে আনবে না ডিয়ার

সিস্টার ৩ : বায়েন, কাল এই উইলটা করেছি। তুমি এর এক্সিকিউটার। (উইল দেন জগদীশচন্দ্রকে)

দিতা : (অন্য আলোতে): বেঙ্গল ব্যাংকে জমা করা প্রায় ৩০০ পাউন্ড। যা আমার বই বিক্রি ও গ্রন্থস্বত্ত্ব থেকে আয় এবং শ্রীমতী বুলের থেকে প্রাপ্তব্য অর্থ। বেলুড় মঠের ট্রাস্টের কাছে এবং আমার ১৬ বোস পাড়া লেনের বিদ্যালয়ে ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে, জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য চিরস্থায়ী ফান্ড হিসেবে দেওয়া হল। এই ফান্ডের আয় মিস ক্রিস্টিন গ্রিনস্টাইডেলের পরামর্শ মত খরচ করা হবে।

সিস্টার ৩ : অবলা, আমি কিছুদিন আগে যে বৌদ্ধ প্রার্থনাটি অনুবাদ করেছিলাম- সেটি একবার শোনাও না-

অবলা : In the East, and in the West
In the North & in the South
Let all things that me,
Without enemies, without obstacles,
Having no sorrow and attaining cheerfullness,
Move in his own path.

নিবেদিতা : বায়েন কটা বাজে?

জগদীশ : সকাল প্রায় সাতটা। তোমার এখন কেমন লাগছে নিবেদিতা?

নিবেদিতা : বড় দুর্বল। The boat is sinking, but I shall see the sunrise.

অসতো মা সদ্‌গময় (ক্রমশ সারা অডিটোরিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে এই শ্লোক।) দূরে দাঁড়িয়ে দিতা।

মৃত্যুঞ্জয়ী পল্টু

সৌম্যেন্দু ঘোষ

কুশীলব : প্রমথ, কানু, অতনু, রতন, ভবেশ, লতি, বিবি, পল্টু

(হস্তরেখাবিদ জ্যোতিষীর ঘর। মধ্যিখানে অনেক দেবদেবীর ছবি। একটু উঁচু বেদীর ওপর। নীচে, তারই এক পাশে প্রমথ সামান্য উঁচু পিঁড়ে বা কোনও আসনে বসেন। যখন তিনি চলে যান, সামনে একটি সুন্দর কাপড় টেনে দেবদেবীকে ঢেকে দিয়ে যান। অন্য সময় নাটক এখানেই চলে।)

প্রমথ : কানু, কানু। হ্যাঁ, এই যে কানু দেখ তো ও ঘরে আর কতজন বসে আছে?

কানু : *(বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে)* আজ্ঞে আর একজন।

প্রমথ : সক্কাল থেকে রবিবারটায় বড়ো চাপ থাকে রে! জ্যোতিষীর কাছে আসাটা, মানুষের মধ্যে যেন বেড়েই চলেছে। কোন্ ভোরে উঠেছি বল তো?

কানু : আজ্ঞে, আপনার কথা আর বলব কী? আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো উঠেছি, আধ ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে ঠিক সময়ের আগেই এসে পৌঁছেছি। আপনার সঙ্গে তো কম দিন হলো না।

প্রমথ : হ্যাঁ, তা বছর দশেক তো হলোই।

কানু : ছুটির দিনে কত দূর দূর থেকে লোক আসে বলুন তো?

প্রমথ : এ লাইনে আবার কিছু মহিলা জ্যোতিষী এসে হাজির হয়েছেন। আমি তো তাঁদের মতো মনসা সাধিকা, বিবাহ বিশেষজ্ঞা নই।

কানু : ওদের কথা ছাড়ুন তো?

প্রমথ : তাও তো আমি, দূরদর্শনে কোনও চ্যানেলে নিজের প্রচার করি না।

কানু : যা বলেছেন, সি.টি.ভি.এন চ্যানেলে আপনার তো কোনও লাইভ অনুষ্ঠানও হয় না। অথচ, কাছাকাছি সাত গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো জ্যোতিষবিদ্যায় এমন এক্সপার্ট আর কেউ আছে নাকি?

প্রমথ : সেটা তো আমার নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। সেটা মানুষ বলবে। আমি খবরের কাগজে প্রচার দিই না। বাকসিদ্ধ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন এসব বলে নিজেকে জাহির করি না।

কানু : আপনি হলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রী, দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে সৌভাগ্যের দিশারী।

ওদের মতো আপনি বলেনও না যে হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুশাস্ত্র স-অ-ব জানি। ছমাসে জ্যোতিষবিদ্যা শিখিয়েও দিতে পারি।

প্রমথ : ছ'মাসে? হ্যাঁরে ষাট বছরেও তো সামান্য মাত্র কিছু শিখে উঠতে পারলাম না। আমি হচ্ছি জ্যোতিষশাস্ত্রের নিউটন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানসমুদ্রের পাড়ে শুধু দু চারটা নুড়ি কুড়িয়ে গেলাম।

কানু : আপনাকে, কলকাতার দু-দুটো জুয়েলারির দোকান হপ্তায় একদিন করে বসতে বলল, আপনি না করে দিলেন।

প্রমথ : না, না, ওসব ফাঁকিবাজিতে আমি নেই। ওইসব দোকানের মালিকের কথায়, ওদের দোকানের নীলা, চুনী, পান্না প্রেসক্রাইব করে দিতে হবে? তাইতো ওটা এই প্রমথ জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিষ শাস্ত্রীর দ্বারা হবে না।

কানু : এই কম্পিটিশনের যুগে একটা টিভিতে চ্যানেল নিতে পারতেন।

প্রমথ : সেখানে কি বলতাম? বৈদিক মতে যজ্ঞাহুতি দিয়ে, মন্ত্রপূত: ফলগ্রহণ করে, রোগ-শোক, অভিশাপ থেকে মুক্ত হোন?

কানু : তা না, বলতে পারতেন পূজা যজ্ঞ করে গ্রহের দোষ খণ্ডন করুন।

প্রমথ : কানু?

কানু : একটা চ্যানেল যদি নিতেন, পাশে বসার একটা চান্স তো পেতাম।

প্রমথ : হা, হা, হা। এখন ওসব কথা থাক। আজকের মতো তো শেষ, আর একজন আছে বললি?

কানু : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রমথ : শোন, শেষ ভক্তকে ডাক। আর ভালো লাগছে না।(কানু, ডাকতে যায়) এই শোন্, শুনলাম লতি এসেছে?

কানু : জামাইবাবুও এসেছে।

প্রমথ : ভবেশও এসেছে? বাঃ, ভালোই হয়েছে। ওদের সঙ্গে আমরও কয়েকটা দরকারী কথা আছে। (হঠাৎ রেগে) পল্টু কি করছে রে?

কানু : পল্টু দাদা, লতুদিদির সঙ্গে (হাত দেখায়) পাশের ঘরে বসে কথা বলছে। লতুদিদি, কত করে কি যেন বোঝাচ্ছে পল্টুদাদাকে। জামাইবাবুও সমানে একই কথা বলে চলেছে। পল্টুদাদা, সমানে গোঁ ধরে মাথা নেড়েই চলেছে।

প্রমথ : ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন ভক্তকে ডাক।

কানু : (ঘরের বাইরে গেল) আপনি, এঘরে আসুন আজ্ঞে।

অতনু : (প্রবেশ করে, এদিক ওদিক দেখে নিয়ে প্রমথকে প্রণাম করে)

প্রমথ : বসো বাবা বসো। (দাঁড়িয়ে আছে) আগে বসো। (অতনু বসে) এবারে বলো বাবা, তোমার সমস্যাটা কী?

অতনু : আজ্ঞে, সমস্যার তো অন্ত নেই। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি বলুন তো?

প্রমথ : যে কোন একটা দিয়ে শুরু করো। শুরুটা যদি একবার করে ফেলতে পারো, দেখবে শেষটাও তুমি ঠিক করে ফেলেছ।

অতনু : আমি অনেক বছর সেই সাঁইথিয়া থেকে আসছি।

প্রমথ : ও, তা জল-টল কিছু খাবে?

অতনু : আজ্ঞে না ।

প্রমথ : তা কি বলতে চাইছ, সংক্ষেপে বল।

অতনু : সংক্ষেপ? সংক্ষেপে তো হবে না।

প্রমথ : আচ্ছা, বেশ বলো, বলো। তোমার যেমন মনে হয় সময় নিয়ে বল।

অতনু : জন্ম থেকে ইস্কুল, কলেজ লাইফ মন্দ কাটছিল না, মাঝামাঝি, একেবারে খুব একটা খারাপ নয়।

প্রমথ : বেশ।

অতনু : আমার মা মারা গেলেন, এই একবছরও হয়নি। .... আমি বাবার একমাত্র পুত্র। বাবার জমিজামা, দোকানপাট, ব্যাঙ্কের জমানো টাকা, সবই আমার। কিন্তু .... একটা মুস্কিল হয়েছে।

প্রমথ : মুস্কিল! তুমি কি বাবার একমাত্র পুত্র?

অতনু : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রমথ : কোন ভগিনী-টগিনীও নেই?

অতনু : না, আমি বাবার একমাত্র সন্তান।

প্রমথ : তাহলে আর মুস্কিল কীসের? সমস্যাটা কী? বাবাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁর সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম সম্পত্তি তো তুমিই পাবে। অসুবিধাটা কীসের?.... তুমি বরং আমার কাছে না এসে কোনও উকিলের কাছেই গেলে পারতে। উকিলও তোমাকে এই একই কথা বলত।

অতনু : (মাথা চুলকে) আপনার কাছে আসার আগে, আমি উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু .....

প্রমথ : কিন্তু কীসের?

অতনু : আজ্ঞে, তিনি বললেন, তোমার বাবা, মানে আমার বাবা, যা করতে চলেছেন,

তাতে নাকি কোনও বাধা নেই।

প্রমথ : বাধা নেই? মানে! উনি কী তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করতে চাইছেন নাকি?

অতনু : না, না। তিনি আমাকে ত্যাগ করছেন এমনটা বলেন নি, তবে আমাদের গৃহে তিনি একজন মানুষের মহাযোগ ঘটাতে চাইছেন।

প্রমথ : মহাযোগ? মানে বাড়িতে একজন মানুষ যুক্ত হবেন! তা বাড়িটা যখন তাঁর, তিনি তো তাঁর বাড়িতে যে কাউকেই থাকতে বলতে পারেন।

অতনু : যে কাউকে বললে তো কোনও সমস্যাই ছিল না।

প্রমথ : তাহলে সমস্যাটা ঠিক কী?

অতনু : তিনি আবার বিবাহ করতে চলেছেন।

প্রমথ : তা মন্দ কী? তোমার মা-তো গত হয়েছেন বললে? তুমি তো একটি নতুন মা পাচ্ছ!

অতনু : তা পাচ্ছি। কিন্তু এই মা-টির বয়স আমার চাইতে মাত্র দুবছরের বড়ো।

প্রমথ : তাতে কী? এখন তো হয় তোমাকে না হয় তোমার বাবাকে হাত পুড়িয়ে খেতে হচ্ছে! উনি এলে তোমাদের ঘরের সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘরেরও তো হাল ধরবেন।

অতনু : আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্যটা কী জানেন?

প্রমথ : না। এখনও পর্যন্ত সেটা তো বলনি!

অতনু : আমার পিতার বিবাহটি কী কোনওভাবে বন্ধ করতে পারেন?

প্রমথ : কীভাবে বল তো?

অতনু : জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে তো তন্ত্র মন্ত্র বা বশীরকণ পড়ে! তাই না? আপনি এখন যে কোনও ভাবে আমার বাবার বিবাহটি বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিন। যজ্ঞ করতে আমি রাজি, যে কোনও, যে কোনও অর্থব্যয় আমি করতে পারব। আমি আপনাকে সেই অর্থমূল্য দেব।

প্রমথ : দেখ বাবা, সকাল থেকে অনেক রকম ভক্ত দেখলাম। কেউ আদালতে জিততে চায়। একজনের কনের মা এসেছিলেন, তাঁর ভাবী জামাই-এর কোষ্ঠী বিচার করে দেবার জন্যে, সঠিক স্থানে জমি ক্রয় হচ্ছে কিনা, মানে তাঁদের পরিবারের পক্ষে ভালো হবে কি না, হাত দেখা, কপাল দেখে বলা এসবই আমি করি, আর তাতেই আমার নামযশ। .... কারোর বাবার বিয়ে বন্ধ করার কাজ আমি করি না। আর করবও না। অনেক টাকা দিলেও না। এবারে বাবা, তুমি আসতে পারো।

অতনু : আজ্ঞে আমি বলছিলাম .... ।

প্রমথ : তোমার নিজের কোন প্রেমের সমস্যা বা বিবাহযোগ সম্পর্কে কিছু জানার আছে কী?

অতনু : অজ্ঞে না।

প্রমথ : তাহলে এখন তুমি এসো।

অতনু : আপনার ফিজটা?

প্রমথ : কানু, (কানু এগিয়ে এলা) ওকে বলে দাও। *(কানু, হাত দিয়ে 'দুই' মানে দুশো টাকা বোঝায়, অতনু ব্যাগ খুলে দুশো টাকা দিয়ে মাথা নীচু করে চলে যায়)* কানু এবারে লতুকে এ ঘরে ডেকে দে। আর কেউ নেই তো?

বিবি : *(হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ)* মানে, আমি আছি তো!
(একটি বছর কুড়ির মেয়ে প্রবেশ করে, নাম বিবি। প্রবেশ করেই দেবতাস্থানে এবং শাস্ত্রীমশাইকে দূর থেকে প্রণাম করে)

প্রমথ : বসো, বসো মা। *(বিবি অতি ভদ্রভাবে বসল)* তোমার সঙ্গে আর কেউ আসেন নি?

বিবি : আজ্ঞে না। *(সে এদিক, ওদিক দেখে)*

প্রমথ : তুমি একলা এসেছ?

বিবি : আজ্ঞে হ্যা, বাবা।

প্রমথ : বাবা! হ্যাঁ, তা ভক্তরা আমার গুণপণায় আমাকে তো বাবা বলেই ডাকে। তা এখন বলো তো মা, তুমি কি জন্যে এখানে এসেছ?

বিবি : বাবা, আমি এবারে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে বি.এ দিয়েছি। কেমন রেজাল্ট হবে, একটু হাত দেখে বলে দিন না বাবা।

প্রমথ : হুঁ, হাতটি দেখাও। *(বিবি হাতটি বাড়িয়ে দেয়)* নারীদের বাম হস্ত দেখাতে হয় মা। *(বিবি তাড়াতাড়ি বামহস্তটি বাড়িয়ে দেয়)* এই হস্তটি দেখা হয়ে গেলে, ডান হস্তটিও আমি দেখব। দেখব, দেখব ওটি তোমার ভাবী স্বামী সম্পর্কে সমস্ত কথা বলে দেবে। *(হাত দেখতে দেখতে)* তোমার নাম কী মা?

বিবি : আজ্ঞে, বিবি।

প্রমথ : বি-বি মানে দু -বি?

বিবি : আজ্ঞে হ্যাঁ। শেক্সপিয়ার আমাকে নিয়ে চমৎকার একটি বাক্য লিখে গেছেন, যা আজও মানুষ সমানভাবে স্মরণ করে চলেছেন। আজও বার বার বলে থাকেন।

প্রমথ : শেক্‌সপিয়ার! তোমাকে নিয়ে? বাক্যটি কি বলো দেখি মা?

বিবি : বাক্যটি হলো, টু বি অর নট টু বি দ্যাটস্ দ্য কোয়েশ্চেন। টু বি মানে বি বি। আমাকে নিয়েই তো লেখা বলুন?

প্রমথ : বাঃ তুমি তো খুব রসিক নারী! *(এবারে শাস্ত্রী মশায় ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস দিয়ে বিবির হাতটা দেখতে থাকেন, পরে আস্তে করে হাতটা ছেড়ে দেন)*

বিবি : কেমন দেখলেন?

প্রমথ : তুমি তো পড়াশোনায় খুব ভালো রেজাল্ট করবে।

বিবি : তাই? তাই যেন হয় বাবা!

প্রমথ : তাই-ই হবে। (একটু পরে) তোমার বাবা কী করেন?

বিবি : আমার বাবা ব্যবসা করেন।

প্রমথ : আর তোমার মা?

বিবি : ঘরের কাজ দেখেন।

প্রমথ : গৃহবধূ! বাঃ, বাঃ, বাঃ। তোমার ব্যবহারটি বড় মধুর।.... এবারে বি.এ পাশের পরে তুমি কী করবে?

বিবি : ভালো দেখে একটা ছেলের গলায় ঝুলে পড়তে চাই বাবা।

প্রমথ : অ্যাঁ? (কেশে ওঠেন) অ! অ!

বিবি : (ইতি উতি দেখে) আমি একটি কথা অত্যন্ত গোপনে আপনাকে বলতে চাই। এখানে বলতে পারি কি?

প্রমথ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে ছাড়া আর কোথায় বলবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই বলো।

বিবি : আমি একজনকে ভালোবাসি। *(শাস্ত্রী মশায় থতমত খেয়ে কাশতে থাকেন)*

প্রমথ : বাঃ, তোমার এই স্বতস্ফুর্ত প্রগলভতা আমার খুবই ভালো লাগল। তুমি যে কোনও প্রশ্ন করো আমি সাধ্যমত তার উত্তর দেব।

বিবি : *(ডান হাতটি বাড়িয়ে)* এবারে আমার ডান হাতটি দেখে বলে দিন আমার ভাবী স্বামী কেমন হবেন?

প্রমথ : *(ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস দিয়ে দেখেন)* হুঁ, ভালো বেশ ভালো।

বিবি : এই হাত দেখে কি তাঁর আয় সম্পর্কে কোনও কথা বলা যায়?

প্রমথ : অবশ্যই যায়। *(ঝুঁকে পড়ে দেখেন)* ভালো, ভালো। মোটামুটি ভালোই আয়। মন্দ নয়। হুঁ, তোমার স্বামীর কথা বলিয়া আয়।

বিবি : কথা বলিয়া আয়। মানেটা কী হলো বাবা?

প্রমথ : এই ধরো হকার। সরাক্ষণ কথা বলা, তবেই তো তার আয় না?

বিবি : হকার?

প্রমথ : আবার পেশাদার অভিনেতাও হতে পারে। অভিনেতারা তো কথা বলেই আয় করে না? সিরিয়াল, সিনেমা, নাটক! শুনছি নাটক করেও নাকি আজকাল আয় করা যায়।

বিবি : হ্যাঁ, তা বটে।

প্রমথ : আবার শিক্ষক, অধ্যাপকও হতে পারে। ক্লাসের মধ্যে কথা না বললে তাদের মাস মাইনে বন্ধ। হা, হা, হা।

বিবি : হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছেন।

প্রমথ : আবার রাজনৈতিক নেতাও হতে পারে। সারাক্ষণ ভ্যাড় ভ্যাড় করে কথা বলেই চলেছে, বলেই চলেছে। কথা বললেই আয়।

বিবি : আচ্ছা বাবা, এই হাত দেখে কি তাঁর আয়ু সম্পর্কে কোনও কথা বলা যায়?

প্রমথ : অবশ্যই যায়। *(আবার ভালো করে হাত দেখে)* তার আয়ু তোমার চেয়ে বেশি।

বিবি : আপনি তো আমার আয়ু কত তা এখনও বলেন নি। কি করে জানব তিনি কত বছর বাঁচবেন?

প্রমথ : *(ঝপ করে দুটো হাত একসঙ্গে দেখতে থাকেন)* তোমার.... কম করে সত্তর .... তার আয়ু তোমার চেয়ে বেশি। ধরো গিয়ে ছিয়াত্তর, সাতাত্তর।

বিবি : আমায় আশীর্বাদ করুন। আমি যেন তাঁর আগে যেতে পারি।

প্রমথ : *(একটি হাত দেখতে দেখতে)* না, না, না। তোমার হস্তের রেখা তো তা বলছে না মা। তোমার মাথার সিঁদুর অক্ষয় থাকবে। তোমার হাতে নোয়া, তোমার বৈধব্য যোগ নেই।

বিবি : বাবা, আপনি নাকি আপনার সুচিন্তিত মতামত সর্বদা লিখে দেন?

প্রমথ : হ্যাঁ, অবশ্যই। অপেক্ষা কর। আমি যা বললাম, সংক্ষেপে সবটা লিখে দিচ্ছি। *(কাগজ টেনে খস খস করে লিখে দেন, পরে লেখাটা বিবির হাতে দেন)* তোমাকে আমার খুব ভালো লাগল মা। এত কম বয়সে অ্যাস্ট্রোলজির ওপর তোমার এত বিশ্বাস। এত পড়াশুনা করা মেয়ে, অ্যাস্ট্রোলজির ওপর এত বিশ্বাস দেখে খুব ভালো লাগল, খুব ভালো লাগল।

বিবি : *(বিগলিত হয়ে)* তাহলে আপনার ফিজটা?

প্রমথ : দুশো টাকা। *(বিবি অতি বিনয়ের সঙ্গে টাকাটা বার করে তাঁর পায়ের কাছে রাখে)*

বিবি : তাহলে চলি?

প্রমথ : আবার এসো মা। পারলে বাবা, মাকে নিয়ে একবার এসো। আমার খুব ভালো লাগবে।

বিবি : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, দুজনই আসতে রাজি হয়ে যাবেন। এখন তাহলে আসি?

প্রমথ : হ্যাঁ, এসো। *(বিবি চলে যাবার পর)* কানু, কানু এবারে লতিকে ডেকে দে শোন যাবার আগে পর্দাটা টেনে দে।*(ঠাকুরের সামনে পর্দাটা টেনে দেয়)*

কানু : *(উঁকি দিয়ে ঢুকে)* এ ঘরেই ডেকে দেব?

প্রমথ : হ্যাঁ, হ্যাঁ এ ঘরেই ডেকে দে। ভবেশকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বল।

কানু : *(নেপথ্যে)* দিদি, দিদি তোমাকে আর জামাইবাবুকে উনি ওঘরে ডাকছেন।

লতি : *(নেপথ্যে)* কানু, বাবা র সব কাজ শেষ?

কানু : *(নেপথ্যে)* হ্যাঁ।

লতি : *(নেপথ্যে)* ওগো শুনছ, বাবা ডাকছেন, তাড়াতাড়ি চলো। চালো, চলো।

ভবেশ : *(নেপথ্যে)* হ্যাঁ, চলো। *(লতি আর ভবেশ এ ঘরে ঢুকল)*

প্রমথ : লতি বস। *(লতি বসে)* বস, কথা আছে। কখন এলি?

লতি : এই তো একটু আগে, বাবা। ভালো আছ তো বাবা?

প্রমথ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাবা ভবেশ বসো। *(ভবেশ বসে)* তুমি তো বাবাজী আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করনি, তাই না?

লতি : ওর কথা ছেড়ে দাও তো বাবা।ওর কোনও কিছুতেই বিশ্বাস নেই।

প্রমথ : কোনও কিছুতে বিশ্বাস না থাকাটা তো কোনও ভালো কথা নয়, লতি?

লতি : আমি আর কি বলব বলো? ঠাকুরদেবতায় ভক্তি নেই, হাত দেখা, ভাগ্য কিছুই বিশ্বাস করে না, তুমি দেখে দেখে কীভাবে এমন নাস্তিকের সঙ্গে যে আমার বিয়ে দিলে কে জানে?

প্রমথ : বিশ্বাস করো আর নাই করো ভবেশ, তোমার হাত দেখে তো আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম, আর দেখেছিলাম বলেই তো বলতে পেরেছিলাম, চাকরি বাকরি তোমার জন্য নয়।

লতি : সত্যি বাবা। তোমার জামাইতো মোটে বিশ্বাই করতে চায় নি।

প্রমথ : যা দেখেছি, তাই তো বলেছি।

ভবেশ : আমি অবশ্য এসব কিছুই বিশ্বাস করি নি।

প্রমথ : তাহলে তুমি আমাকে হাতটা দেখতে দিয়েছিলে কেন?

ভবেশ : আপনি আমার শ্বশুরমশাই, হাত দেখছেন, আমি তো আর সেই হাত ঝপ করে টেনে নিতে পারি না!

প্রমথ : তোমার ওই যে কারখানার চাকরিটা ছিল, ওটা যে চলে যাবে, সেটা তো আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম, তাই না? *(লতি ডুকরে কেঁদে ওঠে)* আঃ, এখন আবার কাঁদছিস কেন? সেদিনও তো মাঝখান থেকে আধখানা কথা শুনেই নট্ট কোম্পানির যাত্রাপালা শুরু করে দিয়েছিলিস্।এখন চুপ কর। *(লতি শান্ত হলে)* আমার বলার পর, *(ভবেশকে)* তোমার চাকরিটা গিয়েছিল কি না?

ভবেশ : হ্যাঁ, গিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে যে যাবে সেটা তো বলতে পারেন নি?

প্রমথ : কিভাবে যাবে মানে? কিভাবে চাকরিটা যাবে, সেটা কি আর হাতের রেখায় লেখা থাকে? কিন্তু চাকরিটা গেলেই যে তোমার ভালো হবে, সেটা তো আমি সেদিনই বলে দিয়েছিলাম। ওই চাকরিটা ছিল তোমার পায়ের বেড়ি। বলেছিলাম কি না, এর পরেই তোমার হাতে রয়েছে লক্ষ্মীর যোগ। চাকরি তোমার জন্য নয়। এরপর বলেছিলাম কি না, তুমি ব্যবসা করবে।

লতি : চুপ করে রয়েছ যে, বল, বল, বাবা যা বলেছিলেন তাই তো হলো।

ভবেশ : হ্যাঁ ।

প্রমথ : আরে জোরে বলো হ্যাঁ। ব্যবসা।আর ওই ব্যবসার হাত ধরেই তুমি ফুলে ফেঁপে উঠবে, একথাও সেদিনই বলে দিয়েছিলাম।

ভবেশ : আমি কিন্তু সেরকমভাবে ফুলে ফেঁপে উঠিনি। জলে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন ফুলে ফেঁপে ওঠে, সেইরকম বলছি, আর কি?

লতি : (কাঁদ কাঁদ) আমার বাবার সঙ্গে তুমি একদম রসিকতা করবে না।

প্রমথ : তোমার চাকরি যাবার পর এখনও পর্যন্ত তোমাকে ব্যবসা করতে হচ্ছে কি না?

ভবেশ : হ্যাঁ, করতে হচ্ছে। আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন ব্যবসা করেনি।

প্রমথ : কিন্তু তোমায়, শেষ পর্যন্ত করতে হচ্ছে।

লতি : হ্যাঁ বাবা, তুমি ওর হাত দেখে কি সুন্দর বলে দিয়েছিলে, ওর ব্যবসা হবে। .... তোমার বলার পরের মাসেই তো ওর কারখানায় তালা ঝুলে গেল।

প্রমথ : আমি তো জানতাম, এটা হবেই। লতি, ভবেশ আজও মনে করে এসবের পেছনে আমার কোন ভূমিকাই নেই। সেদিন ব্যাপারটা মিলে যেতেই ভবেশ

তোকে ফিশ ফিশ করে কি বলেছিল, সেটাও আমি জানি। বুঝলি?

লতি : বাবা, তুমি তাও জানো? কি করে বাবা? হাত দেখে না কোষ্ঠী বিচার করে, বাবা?

প্রমথ : *(কড়া চোখে তাকিয়ে)* কোনটাই নয়। তোকে ফিশ ফিশ করে তোর কানে কানে বললেও আমি ঠিকই শুনতে পেয়েছিলাম। *(লতি ও ভবেশ চোখ চাওয়া চাওয়ি করে)* ভবেশ তুমি বলেছিলে, ঝড়ে কাক মরে, আর তাতে ফকিরের মানে আমার নাকি কেরামতি বাড়ে! বলনি? বলনি?

লতি : ও বাবা, বাবাগো ওকে তুমি ক্ষমা করে দাও, বাবা। আমি তো জানি, তুমি বলার পরের দিনই *(বাতাসে প্রণাম করে)* লক্ষ্মী কিভাবে পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়িতে এসে উঠলেন।

ভবেশ : মা লক্ষ্মী আবার কোথায় এলেন?

প্রমথ : আঃ মা লক্ষ্মী কি নিজের বেশে আসবেন না কি? এসেছিলেন তোমার বন্ধু নিরঞ্জন হয়ে।

লতি : হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিক বলেছ । দু'দিনও গেছে কিনা গেছে, নিরঞ্জন দা নিজে এসে বললেন, ওঁর নাম করে ডেকে ডেকে বললেন, আমার এই লোহা-লক্করের ব্যবসাটা বেড়েই চলেছে, একা একা আর সামলাতে পারছি না। অন্য কোথাও তোকে কাজ খুঁজতে হবে না।

ভবেশ : আমি তো ভাবতেও পারি নি। বন্ধুর কাছে কেউ কাজ করে। নিরঞ্জন ফিফটি ফিফটি অংশীদার করে নিল বলেই না, আমি রাজি হয়েছিলাম।

লতি : তারপরই তো *(লতি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিল)* এর ছ'মাসের মধ্যেই নিরঞ্জনদা হঠাৎ করে লরি এক্সিডেন্টে চলে গেলেন।

ভবেশ : এখন আর কি করি? পুরোটাই আমাকে দেখতে হয়। মালতী বৌদি তো আগেই মারা গেছেন আর ওদের কোন ছেলেপুলেও নেই।

প্রমথ : এখন চাকরি যাওয়া, ব্যবসা করা, আর তাতেই তোমার রমরমা। কথাটা বিশ্বাস হয়েছে তো? এখন পুরো লোহা-লক্করের ব্যবসাটাই তোমার, তাই তো?

লতি : আমি তো তোমার কথা কবে থেকে বিশ্বাস করে আসছি, বাবা। তোমার এই নাস্তিক জামাই-এর কথা ছাড়ো তো!

প্রমথ : বেশ ছাড়লাম। কিন্তু তুই তো জামাইকে একটু বোঝাতে পারিস, লতি।

লতি : বাবা, আমাদের জন্যে তো অনেক কিছু করলে, এবারে ভাইটার জন্যে, পল্টুর জন্যে তো কিছু করো।

প্রমথ : কি করবো বলো, ওর হাত দেখা থেকে শুরু করে কোষ্ঠীবিচার পর্যন্ত আমি সব দেখেছি।

লতি : *(উৎসাহের সঙ্গে)* কি কি দেখলে বাবা?

প্রমথ : তোমাদের কাছে কোনওদিন বলিনি .... ।

লতি : বলো না, এখন বলো না বাবা।

প্রমথ : *(একটু থেমে)* তুমি কি জানো, পৃথিবীতে ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর মা-র চলে যাবার বার্তা ওর কপালেই লেখা ছিল?

লতি : মা-র মৃত্যুর কথা, ওর কপালে কেন লেখা থাকবে বাবা!

প্রমথ : যা জানো না তা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা কোরো না। মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী এদের মধ্যে যে সম্পর্ক ঈশ্বর বেঁধে দিয়েছেন, তুমি তার কি বুঝবে?

লতি : না, আমি বলছি, এতদিন তো এসব কথা একবারের জন্যে কোনওদিন আমাদের বলনি বাবা!

প্রমথ : বলিনি কারণ, তখন তোমার বয়স কত ছিল? অ্যাঁ? যে এসব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করব?

লতি : সে তো ঠিকই বাবা, সে কথা তো ঠিকই।

প্রমথ : হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেই, পল্টু মার্চেন্ট নেভিতে ট্রেনিং নেবেই, গোঁ ধরে বসল। তখন আমি বাধা দিয়েছিলুম। বাধা দিয়েছিলুম কেন সে কথাটা খোলসা করে জানো কী?

লতি : না, বাবা, তুমি তো আমাদের সে সব কথা খুলে বলনি কোনওদিন?

প্রমথ : তার একটা ফাঁড়া ছিল। জলে, সেই সময় তার খুব বড় একটা ফাঁড়া ছিল, আর তোমার ভাই-এর ইচ্ছে, তিনি জাহাজে জাহাজে সারা পৃথিবী ঘুরবেন। ..... মার্চেন্ট নেভিতে জয়েন করবেন।

লতি : আমি তো তখন কোলকাতায় তাকে আমার কাছে রেখে, ভালো কোনও কলেজেভর্তি হবার জন্যে বলেছিলুম, বাবা।

প্রমথ : তা তো তিনি করবেন না। নেভিতেই যেতে হবে! জলেতেই ভাসতে হবে।

লতি : যাই হোক সেটা তো কোন রকমে আটকানো গিয়েছিল, বাবা।

প্রমথ : হ্যাঁ, গিয়েছিল। ও, এখানকারই লোকাল কলেজে ভর্তি হয়ে গ্র্যাজুয়েটও হলো। গ্র্যাজুয়েশনের পর তিনি আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করলেন। প্লেন চালানো শিখবেন। কমার্শিয়াল পাইলট হবেন। পাতকূয়োর মধ্যেকার

জীবনযাপন তাঁর আর ভালো লাগছে না। ..... পৃথিবীতে তাঁর অনেককিছু দেখা এখনও বাকি!

লতি : আমাদের অবস্থা তো তখন একেবারে খারাপ ছিল না। আমি তো ওর জামাইবাবুকে বলে সব ব্যবস্থা করতে পারতুম বাবা। *(ফিসফিস করে)* কি গো বল না, তুমি তো রাজি ছিলে?

ভবেশ : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রমথ : ওইসব শখের খরচ জোগানোর ব্যবস্থা তোমরা করতে পারো, আমার ওসব ধাতে নেই।... গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, এবারে কেনও ইউনিভারসিটিতে, এখান থেকে যাতায়াত করে এম.এ টা করে নাও।

লতি : আচ্ছা বাবা, পাইলট হলেও কি পল্টুর ফাঁড়া ছিল বাবা?

প্রমথ : হ্যাঁ ছিল। জলই হোক বা হাওয়াই হোক। মারা যেত ছেলেটা, আচ্ছা বুঝছিস না কেন বলতো? মৃত্যুযোগ আছে বাচ্চুর। তোরা কী চাস? তোরা কি চাস ও অপঘাতে মারা যাক।

লতি : *(ঝপ করে কেঁদে ফেলে)* ও বাবা, এ তুমি কি বলছ?

ভবেশ : তার জন্যে ওকে ওর ভালোবাসার কিছু জানতে, বুঝতে, পড়তে দেবেন না?

প্রমথ : ওর চোদ্দপুরুষ এসব কাজের দিকে কেউ কোনদিন পা বাড়ায় নি।

ভবেশ : এটা জানি না, তবে এটা জানি, শচীন তেন্ডুলকরের বাবার বংশে কেউ কোনওদিন ক্রিকেট খেলেনি। তাই আপনি বলতে চান, শচীনের ক্রিকেট খেলায় পা বাড়ানো উচিত হয়নি।

প্রমথ : ভবেশ? সমতলের নীচে আর সমতলের উপরে দু'জায়গাতেই ওর অপঘাত। অপঘাতে মৃত্যুযোগ।

ভবেশ : তাহলে আর বাকি রইল কোন জায়গাটা?

প্রমথ : তাই কাছাকাছির মধ্যে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে পড়ালাম। বাবা হয়ে কি করে ওকে আমি এমন জায়গায় ঠেলে দেব, যেখানে অপঘাতের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে? ও তো মারা যাবে।

ভবেশ : কোন মানুষটা মারা যাবে না বাবা? তাই বলে ও যখন বেঁচে আছে, তখন কেন ভালো করে বাঁচবে না ?

প্রমথ : তাই বলে এখন, এই ঊনত্রিশ বছর বয়সে? তোমরা জানো, আমি ওর জন্মছক বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি। জন্মনক্ষত্র, জন্মক্ষণ, সব, সব

কতবার করে মিলিয়েছি। এ ভুল হওয়ার নয়।

লতি : বাবা, আপনি এর থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় তো বার করতে পারেন।

প্রমথ : আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিও না। আমি যা করার করব, সময়-সুযোগ হলেই করব। *(এই কথাগুলি বলতে বলতে উঠতে যাবেন, এমন সময় পল্টুর বন্ধু রতন এই ঘরে ঢুকে প্রথমে প্রণাম করে)* ভালো, ভালো রতন, বাবা তুমি কখন এলে?

রতন : এই একটু আগেই এসেছি। আপনার শরীর ভালো তো?

প্রমথ : হ্যাঁ, বাবা, শরীর আমার যখন তখন বড় একটা খারাপ হয় না। বসো, বসো। পল্টু কোথায়?

রতন : ওই তো ও ঘরে।

প্রমথ : এ ঘরেই ডেকে কথাবার্তা বলো। আমি বরং স্নানটা সেরে নিই। *(প্রস্থান)*

পল্টু : *(প্রবেশ)* কি রে রতন, গুম হয়ে বসে আছিস কেন? কেমন আছিস?

রতন : ভালোই। তুই কেমন আছিস?

পল্টু : ভালোই। তোর জাহাজ খিদিরপুরে কবে ভিড়বে রে?

রতন : পরশু সকালে।

পল্টু : আর আজই সকাল সকাল চলে এলি, বাবার কাছে? বাবাকে ঘুষ দিতে না? যেন তোর জাহাজের চাকরিটা উনিই করে দিয়েছেন।

রতন : তুই আমার ছোট্টবেলার বন্ধু বলে কড়া ভাষায় কিছু বললাম না। এই তোর বাবার ওপর তোর এত রাগ কেন? কিসের রাগ?

পল্টু : তুই বিশ্বাস করিস, তোর জাহাজের চাকরিটা বাবা করে দিয়েছেন?

রতন : না, তা নয়। তবু উনিই তো আমার কেষ্ঠীবিচার করে চাকরিটা সম্পর্কে ফোরকাস্ট করে দিয়েছিলেন।

পল্টু : *(আবেগ চেপে)* আর আমাকে? জাহাজের কাজে আমাকে যেতেই দিলেন না। মার্চেন্ট নেভির অত ভালো চাকরিটা আমাকে অ্যাপ্লাই-ই করতে দিলেন না।

রতন : এটা তুই মেনে নে পল্টু। নইলে সারাজীবন এটা ভাববি আর মনে মনে কষ্ট পাবি।

পল্টু : হ্যাঁ রে রতন? যারা জাহাজে কাজ করে, তাদের আকাশের তারা নক্ষত্র চিনে রাখা খু-উ-ব দরকার, তাই না রে রতন?

রতন : হ্যাঁ, অবশ্যই।

পল্টু : ছোটবেলায় যখন জাহাজে চাকরি করব ভাবতাম, তখন একটা একটা করে, তারা নক্ষত্র চিনে রেখেছি।

রতন : বাঃ, এটা তো একটা ভালো শিক্ষা।

পল্টু : কোত্থেকে শিখেছিলাম বলতো? ইংরেজির স্যারের কাছ থেকে।

রতন : বরুন স্যার?

পল্টু : হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন, স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রতিমাসের শেষদিনে দেখবে, পরবর্তী একমাস, আকাশে তারা, নক্ষত্রদের অবস্থান কেমন থাকবে, ছবি দিয়ে একটা লেখা থাকে, দারুণ লেখা।

রতন : তুই কথাটা মনে রেখেছিস? অথচ দ্যাখ, ওই একই ক্লাসে থেকেও আমার কথাটা মনে নেই।

পল্টু : অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার তোকেই এখন তারা, নক্ষত্র এইসব নিয়েই কাজ করে যেতে হচ্ছে।

রতন : সত্যিই, জীবনটা বড় আশ্চর্যের! তাই না রে!

পল্টু : আচ্ছা রতন, তুই তো নানা দেশে ঘুরে বেড়াস, হ্যাঁরে, পৃথিবীর সব আকাশে, একই তারা থাকে না রে?

রতন : হ্যাঁ-আ। এটা আবার একটা প্রশ্ন হলো?

পল্টু : লন্ডন, নিউইয়র্কেও যে তারা, আমাদের ছাদের ওপর থেকে যে সব তারা দেখি, সব একই তারা?

রতন : হ্যাঁ। আকাশটা পৃথিবীর চাইতেও অনেক বড় তো! তাই সব জায়গা থেকেই তারাদের দেখা যায়।

পল্টু : আকাশের গায়ে, ওই যে নীল মতো তারাটা, ওটা হলো ধ্রুব তারা।

রতন : ওটা দেখেই তো আমরা বুঝতে পারি, কোনটা উত্তর দিক।

পল্টু : *(গান গেয়ে ওঠে)* আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা। .... আচ্ছা খুব যখন বৃষ্টি হয় বা মেঘ এসে সব কিছু ঢেকে দেয়, তখন কী করে বুঝিস কোন্‌টা উত্তর দিক?

রতন : আমাদের সঙ্গে তো কম্পাস থাকে।

পল্টু : আমার সঙ্গে তো কোন কম্পাস নেই, তাই তো আমি কিছু বুঝতে পারি না। আর তাই তো আমি দিশাহারা।

রতন : দিশাহারা হোস্ না পল্টু। তুই ভালোই তো ইস্কুলের মাষ্টার হয়েছিস। আর

বাড়িতে গোয়াল ভরিয়ে ছেলে পড়াচ্ছিস!

পল্টু : কিন্তু এরকম জীবনটা তো আমি চাইনি।

রতন : সকলের কি একই ধরণের জীবন চাইলেই পাওয়া যায়?

পল্টু : যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, বলছিস?

রতন : যাহা পাই তাহা চাই না।

পল্টু : কেন, তুই এই নেভির জীবন চাস না?

রতন : মা, বাবা, ভাই, বোন ফেলে, মাঝে মাঝে ভালো লাগে না রে এমন জীবন।

পল্টু : তোদের তো শুনেছি প্রচুর মাইনে। তাও ভালো লাগে না?

রতন : এরপর যখন বিয়ে করব, ভয়েজে, বউকেও তো ছেড়ে থাকতে হবে।

পল্টু : নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস

রতন : ও পারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

পল্টু : নদীর ওপার কহে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।

রতন : এপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

পল্টু : টাকাটা তার মানে কিছু নয় বলছিস?

রতন : টাকায় সুখ আসে, শান্তি পাবি কি করে?

পল্টু : মরব মরব, মরব মরব, ভেবে বাঁচতেই ভুলে গেলাম, তার চেয়ে বেঁচে মরলে আর কী-ই বা ক্ষতি হতো? রতন, একটু বোস, আসছি রে। *(পল্টু চলে যায় ঠিক সেই সময় লতি ও ভবেশ এ ঘরে ঢোকে)*

লতি : এই রতন, পল্টু কোথায় গেল?

রতন : এই তো উঠে গেল দিদি, বলুন, আপনি কেমন আছেন? *(দিদি হাসলেন)*

ভবেশ : ভয়েজ সেরে ফিরলে কবে?

রতন : পরশু।

ভবেশ : আবার কবে বেড়িয়ে পড়তে হবে?

রতন : মাসখানেকের মত এখন ছুটি। দেখি কবে খবর আসে।

ভবেশ : তোমার চাকরিটা কিন্তু বেশ, বিদেশ দেখে বেড়াচ্ছ।

রতন : (একটু হেসে) ভালো আছেন তো জামাইবাবু?

ভবেশ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো আছি।

(হঠাৎ একটা প্রচন্ড জোরে ধপাস করে কিছু পড়ার আওয়াজ। মনে হলো কোনও মানুষ যেন ছাদ থেকে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে পল্টুর আর্ত চিৎকার।)

পল্টু : ওঃ মা গো-ও-ও। *(নেপথ্যে)*

রতন : দিদি, দিদি, কে যেন আপনাদের ছাদ থেকে বোধ হয় পড়ে গেল।

লতি : মানে? *(ছুটে এলেন)* কে, কে পড়ে গেল? আমাদের ছাদে আবার কে উঠবে? *(বিস্মিত হয়ে)* পল্টু কই? পল্টু কোথায় গেল?

রতন : এই তো আমার সঙ্গে কথা কইছিল! একটু আসছি বলে ভেতরে গেল। চিৎকারটা করল কে?

লতি : তোমরা দু'জনে এখানে বসে গল্প করছিলে তো? *(চমকে)* পল্টু ছাদে যায়নি তো?

রতন : সেটা তো ঠিক আমি বলতে পারবো না দিদি। চিৎকারটা কিন্তু অনেকটা পল্টুরই মতো।

লতি : *(ভবেশকে)* একটু দেখো না মুখ বাড়িয়ে। তুমি বসে আছ কী বলে?

রতন : *(ভবেশ বাইরে যায়, রতন বাইরে গিয়েই দৌঁড়ে ফিরে আসে)* দিদি, আপনি যা ভেবেছেন তাই-ই পল্টু, বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

লতি : ডাক্তার। ডাক্তার।

রতন : *(নেপথ্যে)* জল, জল।

লতি : বাবা, বাবা কোথায় গেল? কোথায় গেল এই সময়ে? বাবা, ও বাবা!

রতন : *(মঞ্চে)* অ্যাম্বুল্যান্স। একটা অ্যাম্বুল্যান্স। এক্ষুনি একটা অ্যাম্বুল্যান্সের দরকার।

ভবেশ : *(মঞ্চে)* আমি অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করছি। তোমরা একটু বাইরে গিয়ে পল্টুকে দেখ।

(লতি ও রতন দৌঁড়ে যাবে, ভবেশ মোবাইল বার করছে সবেমাত্র, মঞ্চে পল্টুর প্রবেশ। রক্তে মাখামাখি, আসলে আলতা)

পল্টু : কি রকম, কি রকম এপ্রিল ফুল হলি তোরা!

লতি : পল্টু! সারাজীবন কি তুই একটুও সিরিয়াস হবি না?

ভবেশ : ছিঃ পল্টু, এরকম প্র্যাকটিক্যাল জোক কখ্‌কনো করবে না।

রতন : ছি, ছি, ছি পল্টু, ইয়ারকি মারার একটা লিমিট থাকা উচিত।

পল্টু : হে, হে,হে। আজ তো পয়লা এপ্রিল। আমি তো তোমাদের এপ্রিল ফুল করলাম।

রতন : ধ্যাৎ, রাসকেল কোথাকার

পল্টু : আমাকে রাসকেল বললে হবে? আমার তো মরার কথা আঠাশ বছর বয়সে,

সাতাশ বছর বয়সে মরলে শাস্ত্রী মশায়ের বদনাম হয়ে যাবে না?

ভবেশ : বসো, বসো, একটু স্থির হয়ে এখানে বসো তো!

পল্টু : এপ্রিল ফুল-এর এই ব্যাপারটা কি করে করলে বলো তো!

পল্টু : প্রথমে দোতলায় উঠে, ছাদের ওপর থেকে একটা পুরনো প্যাকিংবাক্স দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে এলাম।

রতন : তারপর?

পল্টু : পেছন দিকের জলাধারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চাতালে আলতা ছড়িয়ে, তার ওপর শুয়ে পড়লাম।

রতন : শুয়ে পড়লাম মানে? আমি যে ধপাস করে আওয়াজটা নিজে কানে শুনলাম। ঠিক মনে হলো, কেউ যেন ছাদ থেকে পড়ে গেল।

পল্টু : ওটার জন্য একটু ক্যাপাকাইটি করতে হয়েছে।

রতন : ক্যাপাকাইটি! বলতে একটু লজ্জাও করছে না।

ভবেশ : তা, তোমার ক্যাপাকাইটিটা কী?

পল্টু : শুনবে? তবে শোন। ওই ঝোলানো দড়িবাঁধা প্যাকিং বাক্সটায় নীচে থেকে আমিই একটা টান দিলাম, ব্যাস ধপাস করে আওয়াজ, *(রতনের দিকে চেয়ে)* তুই ভাবলি, ছাদ থেকে কেউ পড়ে যাবার ধপাস আওয়াজ। হাঃ, হা, হাঃ।

রতন : তুই আবার হাসছিস?

পল্টু : ব্যাপারটা তো পুরো হাসির তাই না?

ভবেশ : তোমার বাবা, দেখনা, এবার বোধ হয় একটা মোক্ষম চাল চালবেন।

পল্টু : বাবা, তো কখনও ছোট্ট, নগণ্য, তুচ্ছ চাল চালেন না, সব সময়ই মোক্ষম চাল চালেন। তা এটা কি চাল? রেশনের চাল না উৎপল দত্তের সমাজতান্ত্রিক চাল?

লতি : হ্যাঁ রে পল্টু, তোর সঙ্গে কি কখনও সিরিয়াসলি কোনও কথা বলা যাবে না?

পল্টু : হ্যাঁ, হ্যাঁ কেন বলা যাবে না, বলো, কিন্তু আমি এবারে বাবাকে যেটা দেব, সেটা শকুনির রাজনৈতিক পাশার চাল।

লতি : ছিঃ, ছিঃ বাবার এগেনস্টে এরকম করে কেউ কথা বলে?

পল্টু : বুজরুকির এগেনস্টে মারব বুজরুকির চাল।

লতি :প্রমথ জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিষশাস্ত্রী, তাঁকে তুই বুজরুক বলছিস?

পল্টু : হ্যাঁ, হ্যাঁ বুজরুক! কী প্রমাণ আছে, এসব মৃত্যুযোগাযোগ সত্যি!

লতি : মানে, এসব কী বলছিস তুই? বাবার সব ভবিষ্যৎবাণীই তো অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ... এখনও ফলছে।

পল্টু : তাতে করে বাবার পসার বেড়েছে। সকাল থেকে লাইন পড়ে গেছে। এসব নিজের নাম কামানোর ফিকির! তাতে আমার কী?

লতি : পল্টু!

পল্টু : জীবনটা বড় মজার! এই আছে এই নেই।

কাল ছিল ফুলে ভরে / আজ দেখি ডাল খালি

বল দেখি বড়দি রে / হয় সে কেমন করে?

লতি : দেখবি, এবারে তোর খালি ডাল ফুলে ফুলে ভরে যাবে।

পল্টু : আমারও মন বলছে সেটাই হবে।

কাল ছিল ডাল খালি / আজ ফুলে যায় ভরে

বল দেখি তুই মালি / হবে সে কেমন করে?

লতি : হ্যাঁ কি করে হবে? তোর মন যখন বলছে, তখন একটা কিছু হবেই হবে। বল না? বল না রে!

পল্টু : শর্ত আছে। আমার কথার মধ্যিখানে কোনও কথা বলবে না। আর হাসবে না। *(চুপ করে রইল)*

লতি : কী হলো, চুপ করে রইলি যে?

পল্টু : তাহলে শোনো,বাবা বলেছেন এমন একজন মেয়ে ঠিক করতে হবে যার বৈধব্যযোগ নেই। মেয়ে বিধবা হচ্ছে না। মানেই তো আমি বেঁচে থাকছি তাই না?

লতি : বাবা বলেছেন, বাবা বলেছেন এমন কথা?

পল্টু : বেহুলার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে, কার ক্ষমতা লখীন্দরকে *(নিজেকে দেখায়)* নিয়ে যায়?

লতি : তুই এসব কী বলছিস?

পল্টু : বাবা, স্বর্গের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আর্জি জানাক, ওখানে বাবার হট লাইন আছে। আমি কিন্তু একটি মেয়েকে ঠিক করে ফেলেছি। যার বৈধব্যযোগ নেই। মানে সে বিধবা হচ্ছে না, আর তার মানেই আমি বেঁচে থাকছি। আপাতত: আমার মৃত্যু নেই।

ভবেশ : তেমন মেয়ে আজই তুমি হঠাৎ কী করে পেয়ে গেলে?

পল্টু : সে মেয়ে টাটকা টাটকা আজই সকালে প্রমথ জ্যোতিষার্ণব জ্যোতিষশাস্ত্রীকে হাত দেখিয়েছে। আর তিনি বলেছেন, এ মেয়ের বৈধব্যযোগ নেই।

ভবেশ : প্রমথ জ্যোতিষার্ণব জ্যোতিষশাস্ত্রী মশাই অমন অনেক কথাই বলে থাকেন।

পল্টু : এবারে শুধু মুখের কথাই নয় তিনি লিখে দিয়েছেন।

ভবেশ : তুমি যে এত জোরে এসব কথা বলছ, ওর প্রুফ কোথায়?

পল্টু : প্রুফ? প্রুফ আমার পকেটে। *(বার করে)* এখন আমার হাতে।

লতি : হ্যাঁ রে পল্টু, আমাদের সহেলি কী দোষ করল? সেই ছোট্টবেলা থেকে দুজনের কেমন ভাব, কেমন মিলমিশ গো। *(বলে ভবেশের দিকে তাকায়)*

পল্টু : পাত্রী সেই একই। আজই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে, ছদ্মনাম ব্যবহার করে সকালে হাত দেখিয়ে গেছেন। প্রমথ জ্যোতিষার্ণব জ্যোতিষশাস্ত্রী নিজ হস্তে লিখে দিয়েছেন, সে মেয়ের বৈধব্যযোগ নেই।

ভবেশ : তিনি কতদিন মতে থাকছেন?

পল্টু : সেক্ষেত্রে শাস্ত্রী মশাই-এর লিখিত নির্দেশটি পাঠ করাই একান্ত সমীচিন হবে।

লতি : ওঃ! কৌতূহল আর ধরে রাখতে পারছি না।

ভবেশ : আরে পড়ো, পড়ো।

পল্টু : *(লেখাটা পড়ে)* মা, তোমার অতি শীঘ্র বিবাহযোগ। বিবাহের দিন অতি সন্নিকটে। পাত্র তোমার পূর্ব পরিচিত। এই বিবাহের ফলে তোমার বৈধব্যযোগ নাই। তোমার আয়ু অন্তত: সত্তর বছর, ফলে স্বামীর আয়ুবৃদ্ধি।

লতি : ও পল্টু, বাবা নিজে লিখে দিয়েছেন? বলিস কিরে পল্টু?

ভবেশ : শ্বশুর মশাই-এর লিখিত প্রেশক্রিপশান অব্যর্থ। অ্যাঁ, এবারে কী হবে?

লতি : ওরে পল্টুর মুখে একটা মিষ্টি দে। এ তো দারুণ সুখবর!

পল্টু : কেন? বিয়ে-পুজোর আগে বলির পাঁঠাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা!

লতি : আহা! তুই বলির পাঁঠা হবি কেন?

পল্টু : তবে কী? ফাঁসির আসামী? ফাঁসি মুকুব! বাবা জানতই না, স্বর্গের প্রেসিডেন্টের কাছে সহেলির আর্জি মঞ্জুর। বাবার হটলাইন এই প্রথম ফেল!

ভবেশ : বাবা, এই প্রথম ফেল করিয়াও পাশ।

লতি : বাবার কাছে সকালে সহেলির হাত দেখাতে আসাটা কার বুদ্ধি রে?

পল্টু : তুমিই বলো কার?

লতি : তো। নিশ্চই তোর।

পল্টু : তব্বে! বলো।

সহেলি : *(হঠাৎ অন্য পোষাকে)* একমাত্র তোমার বোলো না। আমি যে রূপ পাল্টে, নাম পাল্টে, পোষাক পাল্টে 'বিবি' হয়েছিলাম, তাতে আমারও একটু অবদান আছে।

প্রমথ : (প্রবেশ) কে, কে আবার আমার বাড়িতে এসে, এই সময়ে কোন অবদানের কথা বলে?

বিবি : আমি বাবা। আমি আপনার পাড়ারই নাগরিক, সহেলি।

প্রমথ : তুমি? ঠিক তোমার মতো একটা মেয়ে, আজই সকালে আমাকে হাত দেখাতে এসেছিল ।

বিবি : আমার মতো নয় বাবা। রূপ পাল্টে, পোষাক পাল্টে, নাম পাল্টে, আমিই এসেছিলাম। বিবি।

প্রমথ : বিবি। হ্যাঁ, তাইতো, কিন্তু .... ?

বিবি : কোনও কিন্তু নেই বাবা। ..... আমি বাবা-মাকে বলে এসেছি। তাঁরা সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়বেন!

প্রমথ : সন্ধ্যেবেলাতেই এসে পড়বেন মানে? কেন, কেন সন্ধ্যেবেলাতেই কেন?

বিবি : সন্ধ্যেবেলায়, মানে গোধূলি বেলায়। গোধূলি বেলায় তো সব সময়েই বিবাহ সম্পন্ন করা যায়, তাই না বাবা?

প্রমথ : হ্যাঁ, তোমরা আজকালকার মেয়ে কত জানো।

বিবি : তাহলে মানছেন তো বাবা! আমার বৈধব্যযোগ নেই মানে পল্টুর আপাতত মৃত্যুযোগ নেই।

প্রমথ : যুক্তির জালে আমি ফেঁসে গেছি মা। আহা, শাস্ত্রের এই যুক্তি দিয়ে আমিই তো পল্টুর মৃত্যুযোগ খণ্ডন করতে পারতাম।

বিবি : তাতে কী হয়েছে বাবা! আপনি না করে নাহয় আমরাই করলাম। তাহলে শীঘ্র ব্যবস্থা করুন বাবা! দিদি ... জামাইবাবু আপনারও হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না।

লতি : হ্যাঁ, হ্যাঁ শাঁখ, শাঁখ কোথায়? ওরে শাঁখ বাজা। *(দিদি শাঁখ এনে বাজায়)*

প্রমথ : তাহলে আমি বিধান দিচ্ছি।

পল্টু : আমার ওপর দিয়ে যা করেছ করেছ, আর নয়, আমার জন্যে তোমাকে আর কোনও বিধান দিতে হবে না।

প্রমথ : মুখ সামলে কথা বলো বাচ্চু। তুমি যে বেঁচে থাকবে তাও আমার হাতযশ। সেটা ভুলে যেওনা।

পল্টু : না, তুমি বাঁচাওনি। তোমারই শাস্ত্র ঘেঁটে তোমাকেই বধ করেছে সহেলি।

প্রমথ : পল্টু!

পল্টু : আর জোরে চেঁচিও না।

প্রমথ : লতি দেখ, দেখ তোর ভাই এখনও কিরকম কুবাক্য বলে যাচ্ছে।

লতি : এখন অত কথা ধরতে নেই বাবা। আজই সন্ধ্যায় ওদের দুজনের চারহাত এক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রমথ : মনে রাখবে, আমার শাস্ত্রের জোরেই এমন নিদান যে তুমি বেঁচে থাকবে। এইটাই প্রমাণ যে তুমি বেঁচে থাকবে।

পল্টু : দেখবে, দেখবে, আমি এক্ষুনি মরে গিয়ে প্রমাণ করব যে তুমি ভুল?

লতি : না রে ভাই, তুই বেঁচে থেকে প্রমাণ কর, তোর মৃত্যুযোগ ভুল।

পল্টু : হ্যাঁ, আমি বেঁচে থেকে প্রমাণ করব যে আমার মৃত্যু ছিল না, মৃত্যু নেই।

বিবি : বাবা, এবারে আমি একটা কথা বলি?

প্রমথ : হ্যাঁ, বলো।

বিবি : তুমি, কি বলে, তোমার ছেলের হবু বউ-এর কাছ থেকে দুশো টাকা ফিজ নিলে?

(সকলেই নিজের নিজের মতো হেসে উঠল। প্রমথ জ্যোতিষার্ণব জ্যোতিষশাস্ত্রীর মুখ চুন। ছেলে আর ছেলের বউকে পাশাপাশি দাঁড় করালেন। লতি শাঁখ বাজিয়ে দিল তিনবার। ধীরে ধীরে পর্দা পড়তে থাকে)।

ফিনিক্সের পাখা

রুমা মোদক (বাংলাদেশ)

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসি মোদের বাড়ী এসো, খাট নেই পালঙ নেই পিঁড়ি পেতে বসো.... আমার জীবনে একটা শৈশব ছিলো, ঝুঁটি বাঁধা শৈশব , ফ্রক পরা শৈশব, অমূল্য মায়া মাখানো আগলে রাখা মায়ের আঁচলের মতো শৈশব। সেই শৈশবের অবুঝ দিনমান অনন্ত অশেষ আনন্দ মেখে মেখে পুতুলদের বিয়ে হতো, তোমাদের এইসব ত্রস্ত জীবনের দুর্ভাবনাগুলো তখনো পুরিনি মুঠোয়। পুরতে শিখিনি।

আমার রানি পুতুলের সাথে ঐ কুমার পাড়ার রাজকুমার পুতুলের বিয়ে হতো অবসরের স্বস্তিমোড়া অম্লান বিকেলে, যে বিকেলে মায়েরা অবসন্ন ঘুমায় সূর্যোদয় পরবর্তী ক্লান্তি হাতের তালুতে মুছে নিয়ে। আমি তখন আমার সাত রাজার সম্পদের ভান্ডার খুলে বের করে নিতাম চৈত্র সংক্রান্তির বান্নি থেকে কেনা পোড়া মাটিতে লালরঙের নকশা করা হাড়ি পাতিল। বিশাল বিয়ের ভোজ যে আজ! মুঠো মুঠো বালি ঝেড়ে বেছে চুলায় চাপাই, আহা কী সুবাস! ফি ফোড়ন দেয়া পোলাও! আর, আর কচুরীপানা ঝেড়ে বেছে খাসির মাংস.... আহা! আমার অনতিদীর্ঘ জীবনের স্মৃতির খাতা ছিঁড়ে ফুঁড়ে ছুটে আসা সুবাস...। ঐ যে ফাতেমাবুর বিয়ের দিন আম্মা রেঁধেছিলো শিলপাটায় দারুচিনি আর এলাচ গুড়ো করতে করতে...। খেয়ে বরের বাড়ির লোকদের সেকী তারিফ আমার আম্মার রান্না ! আম্মা! আম্মা!

হঠাৎ আম্মার আঁচল বাতাসে ওড়ে, নাটাইয়ের সুতোর মতো, অদৃশ্য কিন্তু কাঁচগুরোর মাঞ্জামাখা, বড়ো শক্ত কঠিন... আর সেই আঁচলের গিটে বাঁধা ঘুড়ি আমি, মায়ের চোখের মণি, প্রশ্রয়ের স্নেহের মতো নাটাইয়ে বাঁধা। জানালার শিক গলে উড়ে আসে মায়ের গন্ধ, আমাকে আকুল করে, উতলা করে যেনো ঝড়ের আগমনবার্তার ত্রস্ত পাখির ছানা। পড়ে থাকে লাল হাড়ি পাতিল, কল্পনা আর আনন্দ মেশানো মাংস পোলাও আমি দৌড়ে যাই আম্মার উমে। আম্মা..... আম্মা .... আম্মার আঁচলে পেঁয়াজ, রসুন আর হলুদ মরিচের চিরায়ত সংসারী গন্ধ। আম্মা নিজের বুকে আরো জড়িয়ে ধরেন আমাকে, হাতে তার পৃথিবীর তাবৎ অমংগল অস্বীকার করা আমাকে আগলে রাখার স্পর্ধা। শাড়ির আঁচলে মুছে দিয়ে শ্রান্তির ঘাম, মা আমাকে দুহাতে উপরে তোলে ঘুরতো বান্নিতে দেখা সেই নাগরদোলার মতো.... আজ আমাদের পুতুলরানীর বিবাহ হইবে, বিবাহ হইবে..... মা গাইতো, আর তার নির্ভয় দৃঢ় হাতের বন্ধনে ঘুরতে ঘুরতে আমি দেখে নিতাম পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশাণ নৈঋত দশ দিক! কোথাও কোন কোণে নেই ঝড়ের কোন পূর্বাভাস। কোন কোণ আঁধার হয় নি কালো মেঘে।

আম্মার হাত আগলে রাখলে মোটেই কোন ঝড়ের আভাস দেখা দেয় না হানা সম্মুখগামী দৃষ্টিতে, আম্মার আঁচল শুষে নিলে শ্রান্তির ঘাম বদলায় না, মোটেই বদলায় না পুতুলের

জরি, আঙরাখার ঝলমল, বদলায় না পোড়া মাটির হাড়ি পাতিলের লাল নকশা। কিচ্ছু বদলায় না মায়ের বাহু বন্ধনে, বরং বদলে দেয় রঙের অর্থ, অর্থের নেতিবাচকতা অস্বীকার করে।

এই যেমন সেদিন স্কুলের এসেম্বলিতে নতুন আসা বড় আপা খড়খড়ে গলায় বললেন যেমন এক বন্ধ সিন্দুকের ভেতর থেকে ডাক পাঠাচ্ছে কোন দৈত্য-কাল থেকে ইউনিফর্ম ছাড়া কেউ স্কুলে আসলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভয়ার্ত এই হুশিয়ারি গম গম প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো স্কুলের মাঠ পেরিয়ে একেবারে প্রবেশ গেট পর্যন্ত।

আমি আর স্কুলে আসতে পারবো না! মফস্বলের প্রাইমারি স্কুল, কিসের ইউনিফর্ম আর এত্তো নিয়ম কানুনের বালাই! দিব্যি আসতাম আর যেতাম, ইচ্ছে হলে পড়া নইলে প্রজাপতির পেছন পেছন ছোটা । আহা আনন্দ! প্রজাপতির বহুবর্ণিল পাখায় লেপ্টে থাকা ছোপ ছোপ আনন্দ। একটুখানি লাল মাথার নীচে, পেট বরাবার নীল আর হলদেটে ছোপ ছোপ ঢেউ পাখার এখানে সেখানে ....। এইতো এইতো আমি ধরে ফেলেছি। আনন্দকে আটকে দিয়েছি দু আঙুলে, আবার উড়িয়ে দিয়েছি.... ফু:.... ঐ তো যাচ্ছে প্রজাপতি উড়ে, ঐ তো যাচ্ছে....। আনন্দকে ধরা যায়, ধরা যায় বহু বর্ণিল আনন্দকে দু আঙুলে। সে আনন্দের জন্ম আর বাস যে আসলে নিজেরই ভেতরে। খেলনা লাল হাড়ি কুড়ি, নীল প্রজাপতি সব যে নিজেকেই খুঁড়ে নিতে হয় নিজের ভেতর থেকে .....।

হ্যা নীল প্রজাপতি, আমার স্কুলের ইউনিফর্মের রং নীল। তোমরা বলো বেদনার রঙ নীল, আমার সেই শৈশবের নিষ্পাপ বেলা ছুঁয়ে আনন্দ এসেছিলো নীল রঙের ইউনিফর্ম পরে। আব্বার দুপয়সার সরকারী চাকরি। গুণা টাকায় মাস চলা। সেই শৈশবেই আমি জানি আমি বৈশাখে সামান্য তরমুজ কিংবা শীতের কমলালেবুর বায়না ধরলেই আম্মা আগামী মাসে আগামী মাসে বলে কপালে চুমু খান ঠিক, কিন্তু আগামী মাস আর আসে না! আমি ঠিক টের পাই আম্মার অক্ষমতা, আব্বার অর্থনৈতিক দীনতা আর বেদনার টানাপোড়েন। আর এখন মাসের মাঝখানে একটা আস্ত নীল ইউনিফর্ম কোথায় পাবে মা? তবে কী স্কুল যাওয়া বন্ধ আমার?

আকণ্ঠ জড়তা আর অপ্রাপ্তির প্রস্তুতি নিয়ে তবু আমি ভয়ে ভয়ে আম্মাকে বলি, আম্মা নতুন বড় আফা বলছে আগামী রবিবার থেকে ইউনিফর্ম ছাড়া স্কুলে ঢুকতে দেবে না। মা তখন ভাতের হাড়ি উল্টে মাড় ফেলছিলেন। হাড়িটা জায়গামতো বসিয়ে দিয়ে দুহাতে আমার দুগালে ধরে সকল আশিস ঢেলে চুমু খেলেন কপালে, না মোটেই আমার মেয়ের পড়া বন্ধ হবে না। আমার মেয়ে ঐ স্কুলের বড় আপা হবে। হতেই হবে।

তারপর কী হয়, দেখি তিনি ত্রস্তে খুঁজে আনেন মাটির ব্যাংক, আছড়ে ভাঙেন মেঝেতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া পয়সাগুলো গুনতে বসেন পা মেলে। পাঁচ...দশ... পনেরা...।

ঘরে খুঁটি আটকানো বাঁশের পাল্লা নানা কসরতে কেটে তার ভেতরে জমানো নোটগুলো

এগুলো আঁচলে বাঁধেন। তারপর মাস মাস খাবার হাড়ি থেকে মুঠো করে তুলে দেয়া জমানো চাল নিয়ে দৌড়ান করিমন চাচীর বাড়ি।

আর এর দুদিন পর এক শনিবারের সকালে যখন আকাশের রঙ একটু ধূসর, জমাট মেঘেরা অভিমানে থমকে আছে, রান্নাঘরে আম্মার মুসুর জাল বাগাড় দেয়ার গন্ধে পেটে চনমন করছে খিদে আর আমি বারান্দায় চাটাই পাতিয়ে ঝুলে ঝুলে পড়ছি, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে ... আমার বইয়ের পাতায় অভিমানী মেঘেদের ছায়া চুপটি মেরে বসে আছে। ঠিক তখন রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঝলমল আনন্দ নিয়ে বাসায় এলেন আব্বা, এক হাতে বাজারের ব্যাগ আর অন্য হাতে নীল ইউনিফর্ম। আহা নীল, আনন্দের নীল, নতুন জামার গন্ধের নীল, আহা কতোদিন নতুন জামা পরি না। কত্তো দিন ....।

তোমরা বলো বেদনার রঙ নীল, হয়তো। হয়তো। নইলে যে নীল গায়ে জড়িয়ে নীল প্রজাপতি আমি উড়েছি আনন্দে, চেতনার রঙে চুনি-পান্না আনন্দ পেয়েছি খুঁজে, সেই নীল গায়ে একদিন স্কুল থেকে ফিরে দখি আম্মা শুয়ে আছেন খাটিয়ায়, সাদা কাফনে মোড়া। গত তিনদিন জ্বর ছিলো তার, মামুলি জ্বর।

বরই পাতা গরম জলে শোয়াইয়া মশারি তলে ..। আমার আম্মা চলে গেলেন। এই নিষ্ঠুর নিদারুণ পৃথিবীর বিপরীত কোন সত্য না শিখিয়ে চলে গেলেন! আম্মার গায়ে জড়ানো সাদা কফিন শুষে নিয়ে চলে গেলো সকল রঙ, আমার জীবনের সকল রঙ...।

(২)

আম্মা চলে গেলে আমি প্রথমবার টের পেলাম জীবন কেমন ছেয়ে যায় অচেনা অনিশ্চয় অন্ধকারে, কেমন নিজের ভেতরে আর জন্ম নেয় না কোন আনন্দ। আব্বা যেনো হয়ে যায় লক্ষ যোজন আলোকবর্ষ দূরের কোন দয়ামায়াহীন অনাত্মীয়। আম্মা নাই, শূন্য নিরাপত্তাহীন ঘরে কতো চেনা মুখ আসে আশ্রয় আর সান্ত্বনার মুখোশ পরে। নিরাপত্তার নামে, সহমর্মিতার ভন্ডামিতে তারা আমার পাশে বসে। মাথায় হাত রাখে । যেন বা কতো নিষ্পাপ এই আশিসের ধারা।

আসে মনির মামা, আম্মার খালাতো ভাই। আম্মা থাকতে কালেভদ্রে আসতো এ বাড়িতে আমার জন্য পটেটো চিপস আর আম্মার প্রিয় জিলিপি নিয়ে। এবার আসে চিপস নিয়ে, আহারে মা মরা মাইয়াডা.... তার হাত মাথা ডিঙ্গিয়ে বিষাক্ত সাপের মতো নামে আমার নব অংকুরিত যৌবন চিহ্নে। আমি টের পাই এর স্পর্শের কামুকতা। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে দেয় এ স্পর্শ কেমন নোংরা! আমি ছিটকে সরে দাঁড়াই।

আসে করম আলী চাচা, আম্মার হাতে এক কাপ গুড়জ্বালের চা আর তেলেমাখা মুড়ি না খেলে নাকি ভাত হজম হতো না, তার। আমাকে জড়িয়ে ধরে চলে তার কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণয

কেমনে তোর মা চলে গেলো রে! আমি টের পাই, ঐ যে নারী হয়ে উঠার ষষ্ঠেন্দ্রিয়, তাতে টের পাই আমি করম আলী চাচার জড়িয়ে ধরায় নেকড়ের শিকার ধরার লালা। তার অশ্রুর আড়ালে চকচক করে লোভী কামনা। অসহ্য অসহ্য এই জড়িয়ে ধরা! এক ধাক্কায় সরিয়ে দেই তাকে।

হায় নারী জন্ম! আম্মার আগলে রাখা হাত সরে গেলে বুঝি এমনি উষর হয়ে উঠে জীবন! আপনা মাংস বৈরি হয় হরিণীর!

অতপর আমার নিরাপত্তার খাতির আর আব্বার সংসার রক্ষার অজুহাতে বছর না ঘুরতেই সৎ মা আসে ঘরে। হা হা হা, টলমল করে আমার নিজেরই টিকে থাকা।

আম্মার কবরের পাশে দিনরাত কাঁদি আমি, আম্মা... আমা...।

আম্মা কী শোনতে পান আমার আকুতি, মৃত্যুর মতো গহীন শূন্যতায় বুঝি সব আকুতি মিলিয়ে যায় নিঃশব্দ হয়ে...। ঘরে ময়লা জমতে জমতে ম্লান হয়ে যায় আমার নীল ইউনিফর্ম। স্কুলে যাওয়া হয় না আমার। আম্মা তুমি না চাইতে তোমার মেয়ে ঐ স্কুলের বড় আফা হবে, আম্মা, আম্মাগো ...।

আম্মা শোনেন কিনা জানি না, একদিন পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখে যেনো এক দেবদূত। প্রজাপতি... প্রজাপতি, প্রজাপতি কে ডাকে আমাকে এই নামে? কে ডাকে এই পুষ্পহীন উষর মরুতে, কে ডাকে যখন জীবনের রঙ হারিয়ে বিষাদে বেদনায় বিপর্যস্ত আমি, তখন কে ডাকে আমাকে জীবনের রঙে? কে ডাকে প্রজাপতি পুষ্পকাননে?

ঘুরে তাকিয়ে দেখি রিয়াদ ভাই। ঐ মিয়া বাড়ির মাইজা ছেলে। আমাদের স্কুলেই পড়ে, কয়েক ক্লাস উপরে। স্কুলে যাসনা কেন তুই, রিয়াদ ভাইয়ের কণ্ঠে কেমন নির্ভরতার আহ্বান, হঠাৎ তুলির পরশ ছড়িয়ে যায় ভেতরের ক্যানভাসে, রঙের ছোঁয়ায় যেনো মুহুর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায় ভেতরটা। আমি স্কুলে যেতে চাই রিয়াদ ভাই, আমি পড়তে চাই, আমি স্কুলের বড় আফা হতে চাই ।

রিয়াদ ভাইয়ের ব্যবস্থাপনায় তার ছোট বোন বুশরারে সপ্তাহে ছয়দিন পড়াতে যাই আমি। রিয়াদ ভাইয়ের আম্মা আমাকে প্রতিমাসে পাঁচশত টাকা দেন । সেই টাকায় আমার খাতা কলম কেনা হয়, আমি নীল রঙের আনন্দ মুঠোয় নিয়ে আবার মায়ের কবরের পাশ ঘেঁষে সুপারি গাছের ছায়ায় ছায়ায় স্কুলে যেতে যেতে, সৎ মায়ের খোঁটা শুনতে দিব্যি এস.এস.সির ঘর পার হয়ে যাই।

এর মাঝে কী হয়, এক উজ্জ্বল বিকেলে। হ্যাঁ খুব উজ্জ্বল ছিলো সে বিকেলটা। অস্তগামী যে রোদটার স্কুল মাঠের বাউন্ডারি লাগোয়া শিরীষ গাছের পাতায় ঝিমুতে থাকার কথা, সেই রোদটা সেদিন কেমন রহস্যময় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। আমি স্কুল ফিরতি পথে আনমনা হাঁটছিলাম, কী ভাবছিলাম? কী জানি কী ভাবছিলাম হয়তো ভুল হওয়া উপপাদ্য কিংবা নৌকাভ্রমণ রচনাটির কথা। আমার জীবনে তখন স্কুলের বড় আপা হওয়া ছাড়া

আর কোন লক্ষ্য ছিলো না, স্বপ্ন ছিলো না, ভাবনা ছিলো না....। সেই উজ্জ্বল বিকেলে সাইকেলে আমার পথ আটকায় রিয়াদ ভাই, প্রজাপতি .....। সাত আসমান অতিক্রম করে সে ডাক পাড় ভাঙে আমার হৃদয় গাঙের। এমন আকুল ডাক আমি শুনি নাই আগে, কিন্তু আমি জানি এ ডাক আমার শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যুবতী বেলায় ঝাঁপ দেয়ার ডাক, এ ডাক আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সুখী করার ডাক।

তুই আমার হবি প্রজাপতি?

আমার নামতো রিনি, তুমি আমাকে প্রজাপতি ডাকো কেন রিয়াদ ভাই?

তোর ভেতরের রঙ আমি দেখতে পাই। লাল, নীল, হলুদ ছোপ ছোপ রঙ...

মুহুর্তে আমার আম্মাকে মনে পড়ে। যতোদিন আম্মা ছিলেন, আমার রঙগুলো ছিলো অমলিন।

তুই স্কুলে প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটতি, আমি দেখতাম তোকে। দেখতাম তুই একটা আস্ত প্রজাপতি। তোর ভেতর থেকে স্ফুরে বের হচ্ছে লাল, নীল হলুদ সহস্র রং, রাঙিয়ে দিচ্ছে চারদিক।

কী বলো, শুধু তুমি দেখতে পেতে!

হ্যা শুধু আমি দেখতে পেতাম, সে রঙ দেখার জন্য অন্য চোখ চাই যে।

আমি টের পেতে থাকি আবার রঙ জন্ম নিচ্ছে আমার হৃদয়ের গহীনে। অনুরাগের আবীর রঙ, সূর্যাস্তের আভার মতো, অপেক্ষার তীব্র লাল রঙ, সূর্যোদয়ের ভোরের মতো, অভিমানের হলদেটে রঙ শীতের শেষের পাতাগুলোর মতো। আমি নারী, আমি সামান্য নারী পারি কী এড়াতে তারে! এইবার টের পাই পুরুষের ডাকও কখনো হয় কাঙ্খার মতো মায়াময়।

"এই যে তোমার প্রেম হৃদয়হরণ
এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ
হৃদয়হরণ...."

(৩)

এস.এস.সি পাশের পর রিয়াদ ভাই আমাকে বলে, চল জেলা সদরে তোরে নিয়ে কলেজে ভর্তি করে দেই। আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই। আব্বা আমার থেকেও নাই, সৎ মা আমি গেলেই বাঁচে। পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে কোন কলেজ নেই, এস.এস.সি পাশের পর আমি কী করবো আর জেলা সদরে না গিয়ে। আমি রিয়াদ ভাইয়ের হাতটা ধরি। আর এক অন্ধকার ভোরে, তখনো কাকগুলো ডেকে পাঠায়নি ভোরের বার্তা, করিমন চাচীর খোঁয়ার থেকে ডেকে উঠে নি মোরগের দল আমি এক হাতে ধরি রিয়াদ ভাইয়ের হাত আর অন্য হাতে বাসের হ্যান্ডেল .....।

আপাত ঠিকানা হয় রিয়াজ ভাইয়ের মেস। রুমমেটরা সব রিয়াজের বউয়ের জন্য সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়, চাঁদা তুলে তা থেকে চা সিঙারা আনে। তারপর মুচকি হেসে জরুরী কাজের অজুহাতে একে একে বের হয়ে যায়। আমি বলি তুমি না বলছো আমার জন্য লেডিস মেস ঠিক করেছো।

হ্যা করেছি তো

এখানে এনে ওঠালে যে?

ভয় পাচ্ছো?

মোটেই না, সবাই ভাবি ভাবি ডাকছে, বেশ লাগছে।

তাই! তবে থেকেই যাও।

বয়স ১৮ হতে আরো দুইমাস বাকি, পুলিশ কেসে পরবা কিন্তু

হা হা হা হাসতে হাসতে আমরা হাত রাকি একজন আরেকজনের হাতে, নির্ভরতার হাত। রিয়াজ ভাইয়ের হাত একটা হাত ছেড়ে সাঁতরে বেড়ায় আমার চুলের গহীন অরণ্যে। অমরা ঠোঁট রাখি একে অপরের ঠোঁটে, সমর্পণের। স্পর্শের গভীরে আমরা ডুবে যাই, যেতে থাকি .... হাত থেকে ঠোঁট, কাঁধ, চিবুক, ঘাড় ঠিক কোথায় গোপন হয়ে আছে নারীত্ব আমার জানা ছিলো না মোটেই, জানার হয়নি সুযোগ কেমন নারী হয়ে উঠতে জানি আমি স্পর্শে কেমন শরীরের লোম কূপে লাগে প্রলয় নাচন, তীব্র আত্মসমর্পণ আর উন্মত্ত সাড়া.... আহা নারী জন্ম! ধন্য নারী জনম! পূর্ণ নারী জনম!!

কী ভাবছেন, যা শুনেছেন এতোকাল, পুনরাবৃত্ত সেই গল্প! আসলে কোন প্রতারক পুরুষ রিয়াদ। প্রেমের ছলাকলায় ভুলিয়ে এক গ্রাম্য অবোধ যুবতীকে অতপর নিলামে তোলে ব্যবসার বাসনায়, বিক্রি করে দেয় অন্ধকার জগতে আর প্রতিরাতে হাত বদল হয় ভাগ্য আমার!

হা হা হা। না। ভুল ভেবেছেন। একদম ভুল ভেবেছেন। এর কিছুই ঘটে নি আমার জীবনে। বরং রিয়াদের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে প্রথম দিনেই শহর আমায় আপন করে নেয় নির্ভয় মমতায়, শিহরণে, সোহাগে। সেই বিকেলে রিক্সা চড়ে শহরের উটকো ব্যস্ত মানুষের ভীড় ঠেলে ঠেলে মেয়েদের মেসে যেতে যেতে আমি টের পাই আম্মার মৃত্যুতে হারিয়ে ফেলা রঙ আমার, আনন্দের রঙ আমার কেমন বিন্দু বিন্দু জমাট ঘনীভূত হয় বুকের ভেতরে, জন্ম নেয় পুনর্বার। যেমন ঘনীভুত হয় কার্তিকের নবীন শিশির ঘাসের বুকে কিংবা পিঁপড়ের দল সারি বেঁধে সঞ্চয় করে খাদ্য।

আমি দিব্যি মানিয়ে নেই শহরের জীবন। এর মাঝে আব্বার ফোন আসে,

হ্যালো

হ্যালো আব্বা

গ্রামের মানুষ বলাবলি করছে তুমি রিয়াদের সাথে পালাইয়া গেছো

পালাইয়া আসছি ঠিকই রিয়াদ ভাইয়ের সাথে আসছি এও ঠিক। কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে আসি নাই আব্বা। পড়ালেখা শেষ করতে আসছি।

গ্রামের মানুষ এসব শুনবে না বুঝবে ? আমার মুখে কলঙ্ক মেখে ঘর ছেড়েছো তুমি আর ফিরবা না এ ঘরে।

আমি ফোন রেখে হাসি। ভেতরে দমকে উঠে বিষাদের গভীর কান্না। আম্মা ছাড়া সেই ঘর কী আর ঘর ছিলো আমার নিরূপায় আশ্রয় ছাড়া? আমি জানি আব্বা আমি আর না ফিরি ঘরে তাতে তোমারও শান্তি আমারও।

সকাল সকাল কলেজ আর কলেজ শেষে টিউশনি। অপেক্ষা আমার উন্মন আকুল হয়ে থাকে এক টুকরো সন্ধ্যার জন্যে। রিয়াদের পথপ্রদর্শক, ভরসার হাতে রেখে আমার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের হাত আমি ভবিষ্যৎ দেখি, দেখি বিশাল আকাশ নত হয়ে কেমন সন্ধ্যা গ্রাস করে পৃথিবী আর আমি রিনি, নিযামপুর গ্রামের এক অখ্যাত, সুতো ছেঁড়া উড়ুক্কু ঘুড়ি কেমন খুঁজে নিজেকে জড়ানোর নাটাই আবার। আমার ঘর হবে আবার, আমি ঘরের স্বপ্ন দেখি.... এই তো আর বছর খানেক, রিয়াদের পড়াটা শেষ হলেই শেষ হবে আমারও মেস জীবন। ন পাখিরা দলবেঁধে কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে নীড় অভিমুখী।

আর আমার নীড়ে প্রবেশের স্বপ্ন কেমন অজানা আশঙ্কায় কাঁপে থরো থরো। আমি পুন পুন নিশ্চিত হতে চাই, মাথা রাখি রিয়াদের কাঁধে।
তুমি সব সময় আমাকে এমনভাবে ভালোবাসবে?

সব নারী বুঝি প্রেমিকের কাছে গ্যারান্টি চায়?

হ্যা চায়। বলো প্লিজ

হ্যা বাসবো। ঠিক প্রথমদিনের মতোই চিরদিন তোমাকে ভালোবাসবো আমি।

কী হয় আমার, আরো নিশ্চয়তা খুঁজে নিতে চাই, জীবনটাই অনিশ্চয় জেনে আচ্ছা আমার এই মুখ যদি কখনো ঝলসে যায় আগুনে, কুৎসিত দেখতে হই আমি।
তবু আমি তোমাকেই ভালোবাসবো।

যদি আমি অতর্কিত দুর্ঘটনায় একটা পা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ি।

তবু আমি তোমাকেই ভালোবাসবো।

কেন?

কারণ আমি ভালোবেসেছি ভেতরের তোমাকে। ঐ যে ভেতরটায় রঙ জন্ম নেয়। যে রঙ চারপাশে ছড়িয়ে তুমি হয়ে যাও একটা প্রজাপতি। সেই স্কুলজীবন থেকে ....।

(৪)

সেদিন আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ। টিউশনির জমানো টাকার সাথে মিলিয়ে আমি শেষবার রিয়াদকে ফোন দেই। শেষ হতে চলেছে আমার গন্তব্যমুখী দৌড়.....

ডিপার্টমেন্টের দিকে এসো।

হ্যা আসছি। তুমি কাগজপত্র সব ঠিকঠাক নিও।

সব গুছিয়ে নিয়েছি, ভেবো না

টাকা পয়সা?

হ্যা তোমারটুকু আমারটুকু মিলে হয়ে গেছে

তাহলে রিনি বিবি, প্রজাপতি আমার একধাপ পার হতে যাচ্ছে। বড় আপা হবার দিকে। হুম। আর আর রিয়াদের জীবনসঙ্গী হবার দিকে...

ফোনের দুপ্রান্তে সুখ আর আনন্দের জোয়ারে হাসতে হাসতে ভাসি দুজন....।

ফর্মটা এনে কাগজপত্র মেলে সব পূরণ করতে বসি, তখন হঠাৎ আমি টের পাই ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার দৃষ্টির সামনে সবকিছু। ফর্মের কাগজ, তার গায়ে গোটা গোটা লেখা, আমার কলম, আমার হাত.... এমনকি সামনে বসে থাকা রিয়াদ। আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। কিচ্ছু না। হার্মাদের মতো হঠাৎ আক্রমণ করা অন্ধকারে আমি ভয়ে সিঁটিয়ে যাই, আতঙ্কে চিৎকার করি, রিয়াদ....।

রিয়াদ জড়িয়ে ধরে আমাকে, এইতো আমি ... রিয়াদ রিয়াদ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না রিয়াদ।

পাবে রিনি পাবে। এই তো আমি আছি তোমার হাত ধরে। নিজের চোখে দেখতে না পেলে আমার চোখে দেখবে।

কয়েক মিনিট এক বিভীষিকার অন্ধকারে আমাকে ডুবিয়ে আবার আলো আসে দৃষ্টির সম্মুখে । কিন্তু তারপর থেকে সেই আতঙ্ক পিছু নিয়েছে আমার। কেনো সত্যি অন্ধকার নেমে আসলো। এমন হঠাৎ আমার দৃষ্টি জুড়ে।

রিয়াদ আশ্বস্ত করে আমাকে, দূর হয়তো একটু মাথা ঘুরেছিলো। কিংবা, কিংবা মনের ভুল।

মনের ভুল নয় রিয়াদ সত্যি সেদিন আলো হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি।

আচ্ছা হারালেই বা, আমি তো আছি তোমার সাদা লাঠি .....।

রিয়াদের আশ্বাসে আমি বিশ্বাস রাখি, নিজের বিশ্বাস খুঁজে নেই নিজের ভেতর থেকেই, যেমন করে রঙ খুঁজি, আলো খুঁজি, পরীক্ষার হলে যাই।

খাতা, প্রশ্ন হাতে নিয়ে আমি লিখতে যাবো। তখন আবার হঠাৎ করে এক সর্বগ্রাসী অন্ধকার নেমে আসে পরীক্ষার হলময়। আমি কিচ্ছু দেখতে পাই না কিচ্ছু না... তীব্র দিনের আলোয় দেখি অমাবস্যার আঁধার.... ম্যাম .... চিৎকার করে আমি ম্যাডামকে ডাকি .... আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কিচ্ছু লিখতে পারছি না।

এবার বিষয়টি ভাবায় রিয়াদকে। সন্ধ্যায় চক্ষু ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট করি দুজন। ডাক্তার

এ মেশিন ও মেশিন এ পরীক্ষা ও পরীক্ষার পর গম্ভীর মুখে রায় দেন, এ রোগের নাম রেটিনাস পিগমেন্টশেন। চোখের পেছনে থাকে রেটিনা যেখানে থাকে আলোক সংবেদী কোষ। জীনগত সমস্যার কারণে এই কোষগুলো আর তৈরি হতে পারে না, ধীরে ধীরে কমে আসে রোগীর দৃষ্টিসীমা, রাতে কম দেখে, পার্শ্বদৃষ্টি কমে আসে, একসময় অন্ধ হয়ে যেতে পারেন।

অন্ধ হয়ে যেতে পারেন, অন্ধ হয়ে যেতে পারেন, ... আমি ভেঙে পড়ি পুনর্বার। যেমন ভেঙে পড়েছিলাম মায়ের কবরের কাছে, যেমন মায়ের সাদা কাফন শুষে নিয়েছিলো আমার জীবনের সকল রং। আমি টের পাই এমনই এক রঙ শুষে নেয়া আঁধারের মতো রঙহীন জীবন আমার দিকে আসছে ধেয়ে। আমি আকূল কাঁদতে কাঁদতে রিয়াদকে ফোন দেই, রিয়াদ, রিয়াদ আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। গলায় পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা গলায় সঞ্চিত করে দরিদ্র পিতার সঞ্চয়ের মতো। আমি আছি রিনি আমি আছি তোমার পাশে আমি আছি প্রজাপতি তোমার জন্য।

ধীরে ধীরে একদিন আলো কমে যেতে যেতে সত্যি অন্ধ হয়ে যাই আমি। আমার ডিগ্রি আছে, আমার রিয়াদ আছে তবু ভীষণ একা হয়ে যাই, নিঃসঙ্গ, অসহায়, দিক্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই আমি। নিজেকে সামলাতে পারি না। রিয়াদের ফোন আসে। আমি হাতড়ে বেড়াই গোলাপি জামা ... চিনি না এই তো সেদিনও ঠিক প্রেমের গোলাপি রঙ খুঁজে নিতে পারতাম। খুঁজে নিতে পারতাম সূর্যোদয়,সূর্যাস্তের রঙ... রিয়াদের চোখ চেয়ে পড়ে নিতে পারতাম অনুরাগ আর অনুভবের তীব্রতা। কিচ্ছু দেখতে পারি না এখন আর কিচ্ছু না .....।

রিয়াদ, রিয়াদ আমি কী বড় আপা হতে পারব না? রিয়াদ চুপ করে থাকে। প্রথমবার আমি রিয়াদের নীরবতায় ভাষা দেখতে পারি না, পড়তে পারি না। বুঝতে পারি না ওর ভেতরে কী উথালপাথাল পরিবর্তন নাকি আমার হঠাৎ রঙ মুছে যাওয়া জীবনের বেদনা সংক্রমিত করে ওকে পড়তে পারি না। পড়তে পারি না। কী জানি হয়তো ভুল হয়তো ঠিক আমি টের পাই অচেনা লাগে রিয়াদকে। চোখের দৃষ্টিহীনতায় আমি প্রথমবার দেখতে পাই রিয়াদের বিরক্তি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই.....।

দৃষ্টিহীন সে রাতে আমার দৃষ্টি খুলে দেয়। আমি রুমমেট পরিকে ডাকি। পরি আমার দৃষ্টিহীন চোখের অশ্রু মুছে জানায় আমার ডায়াল করা নাম্বারটা ভুল নয়। রিয়াদেরই নাম্বার। নিজের কাছে নিজের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণের শেষ আশাটিও মুছে যায় অবশেষে। আহা আহা আমার সাদা ছড়ি!

মায়ের কবর থেকে তুলে আনা রিয়াদ, বড় আপা হবার স্বপ্ন উসকে দেয়া রিয়াদ আমার সাদা ছড়ি হতে যাওয়া রিয়াদ! কী হয়, সে রাতে আমার ভেতরে জন্ম নেয় এক অন্য আমি। আমি হই সাদা ছড়ি। পরিকে বলি, একটি বার একটি বার আমাকে নিয়ে যাবে ব্রেইল স্কুলে?

দুটি বছর লাগে আমাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে। রিয়াদের নাম্বারে এ দুবছর আমি ডায়াল করি নি সে রাতের পর! অবাক হই না একটুও রিয়াদও আর খবর নেয় না আমার। যেনো এ খুব স্বাভাবিক। যেভাবে জীবনের রঙ মুছে যায়, বর্ণিল প্রজাপতি মরে ধূসর হয়ে মিশে যায় মাটিতে, অন্ধকার ঢেকে দেয় জীবনের মোহময় আলো ঠিক তেমনই সুসময়ের কথা দুঃসময়ে অর্থহীন হয়ে যায়.... দৃষ্টি কিংবা সামর্থ্যময় জীবনের প্রতিশ্রুতি গুলো দৃষ্টিহীন অসহায় জীবনে মিথ্যে হয়ে যাওয়াতে কিচ্ছু নেই অবাক হবার। অবাক হবার কিচ্ছু নেই।

এই দুবছরে আবারো পদে পদে নারীত্বের অপমান! মাথার উপর ছাতাহীন নারী, সে দৃষ্টি নিয়ে হোক কিংবা দৃষ্টিহীন। চারপাশের বিপরীত জগতে হা করে থাকে গিলে খাবার জন্য। হাত বাড়িয়ে থাকে সুযোগে এই নারীত্বকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেবে বলে।

চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি ডাকে বড়কর্তা। নাম কী আপনার। ততোদিনে দৃষ্টিহীন আমি জেনে গেছি দরজা বন্ধ করে দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্য। বড়কর্তা আমার কাছে আসেন। আমি ততোদিনে চিনে গেছি ঘাড়ের উপর ফেলা গরম নিঃশ্বাসের মানে। বড়কর্তা হাত রাখে কাঁধে আমি না দেখেও দেখতে পাই তার দৃষ্টি কামুক লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার নারী চিহ্নের অলিগলিতে। বার বার জীবনের ধাক্কা আমাকে দৃঢ় হতে শিখিয়েছে। আমি চিৎকার করি, স্যার দরজাটা খুলে দিন। দরজাটা খুলে দিন স্যার নইলে আমি চিৎকার করবো!

আমি চিৎকার করবো, চিৎকার করবো ! আমার কণ্ঠ ভেদ করে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে আসে যে চিৎকার তার নাম প্রতিবাদ। প্রতিবাদে আরো তীব্র দৃঢ় হই আমি তুমুল আত্ম বিশ্বাসে নিজেকে প্রস্তুত করি। প্রস্তুত করি বড় আপা হবো বলে।

দরজাটা খুলে যায়, আমি ছিটকে বেরিয়ে আসি.... বেরিয়ে আসি প্রতারণা থেকে প্রতিনিয়ত বিপরীত অভিজ্ঞতা থেকে। আমি দাঁড়াই আমার মুখোমুখি। আমার টিকালো নাকে লেগে অছে যে শ্রান্তির ঘাম, একসময় দেখেছি মুক্তোর মতো চমকাতো, আজ হাত দিয়ে স্পর্শ করি, সেই ঘাম বদলায়নি, শুধু আমি দেখিনা তার ক্লান্ত রং। এই না দেখার বেদনায় আমি কী বেরিয়ে আসতে চাই স্বপ্ন দেখা থেকে, প্রত্যাশা থেকে, সংগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাই লড়াই থেকে? না। না। আবার উঠে দাঁড়াই নিজেকে তৈরি করতে থাকি একটা দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য। যে যুদ্ধে পরাজয় নামে কোন পক্ষ থাকে না।

ব্রেইলে পরীক্ষা ভালোই হয়েছিলো। না খুব আশা ছিলো না। সব পরীক্ষাই কমবেশি এমন ভালো হয়। ভাইভায় যারা ছিলেন, আমি তাদের ভ্রুর ভাঁজ দেখি না, দেখি না তাদের ঠোঁটের কোণে কী লেগে আছে অবজ্ঞা নাকি সত্যি শুভাশিস। তারা বলেন, দারুণ তো আপনি অসম্ভব কে সম্ভব করেছেন। আপনি প্রতিযোগীদের মধ্যে সব চেয়ে ভালো করেছেন। আপনি ইতিহাস হয়ে যাবেন। কথাগুলো ঘুর্ণির মতো আমাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে... ঘুরতে থাকে।

তারপর, তারপর..... একদিন আমাকে আমাকে অবাক করে দিয়ে, আমার আত্মবিশ্বাস আর স্বপ্ন সত্যি করে দিয়ে আমার বড় আপা হবার নিয়োগপত্র আসে। সরকারি কলেজে নিয়োগ পেয়েছি আমি। পরি আমাকে পড়ে শোনায় আর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুর্ণির মতো আমার দুহাত ধরে। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে....। আমার আম্মাকে মনে পড়ে। আম্মা আম্মা আমি বড় আপা হয়েছি..... আমি বড় আপা হয়েছি আম্মা। পরদিন পত্রিকাওয়ালারা ভীড় করে বাড়িতে।

আপনি অন্ধ হয়েও কী করে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এতো ভালো ফলাফল করলেন আপনি?

আপনার এই এগিয়ে চলার পেছনে অনুপ্রেরণা কার?

আপনাকে কী কী প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

আপনি কি জানেন কতো বড়ো আদর্শ আপনি স্থাপন করলেন !

আমি কী উত্তর দিয়েছি কী দেইনি মনে করতে পারি না। তারপর, তারপর সত্যি একদিন আমার সব অপেক্ষা সব প্রস্তুতি আর প্রত্যাশা সত্যি করে দিয়ে আমার কাছে হলুদ খামে আসে বড় আপা হওয়ার বার্তা নিয়ে। বড় আপা হয়েছি আমি। বড় আপা। হলুদ খামে বার্তা এসেছে। বার্তা এসেছে আনন্দের বার্তা এসেছে শত সহস্র রঙের। বার্তা এসেছে সাফল্যের। আমি পেরেছি। পৃথিবীকে চিৎকার করে জানাই আমি পেরেছি। পরদিন সব পত্রিকায় নাকি আমার বড় বড় ছবি। পরি আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছে.... রিনি, রিনি রে তুই বলেই পারলি। আমি হলে পারতাম না। মোটেই পারতাম না।

আমি বলি, পারতি অবশ্যই পারতি। যখন জেনে নিতি তুই নিজেই নিজের শক্তি তখন অবশ্যই পারতি।

ঠিক তখন, কেমন করুন কান্নার সুরে তখন বেজে উঠে মোবাইলটা। পরি হাতে নিয়ে চেঁচায়, রিনি রিয়াদের ফোন, রিয়াদের ফোন রিনি। পাক্কা দুবছর পর রিয়াদ ফোন দিলো আমাকে। আনন্দের এই মুহুর্ত আমাকে কেমন অলক্ষ্যে এক শক্তি দেয় অপরিমেয়। আমি ফোনটা উপেক্ষা করি। আমি জানি কেবল আমিই আমার সাদা ছড়ি। আমিই কেবল! আমার আত্মশক্তি আমার আত্মবিশ্বাস আমার সাদা ছড়ি। আর কিচ্ছু নয়।

দুঃসময়ে যে ত্যাগ করে যায়, সুসময়ে তাকে ক্ষমা করায় মহত্ব আছে বটে, কিন্তু আত্মসম্মান নেই। আমি বাঁচবো আমার মতো আত্মসম্মান নিয়ে। কারণ আমি অক্ষম বলে আমার আত্মসম্মানকেই বার বার বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিলে তোমরা।

*
**

স্বয়ংপ্রভা

আদিত্য সেন

চরিত্র পরিচয়

মা- সরলা মুখার্জী
বড় ছেলে - ড. সুশান্ত মুখার্জী (প্রফেসর)
মেজ ছেলে - প্রশান্ত, একটা কোম্পানির ম্যানেজার
মেয়ে - শ্রাবণী, একটা কম্যুনিকেশন অফিসে সিনিয়র পোষ্টে কাজ করে
জামাই - ড. শোভন গাঙ্গুলি, বিখ্যাত সোসিয়োলজিষ্ট
প্রশান্তের বান্ধবী - পূজা মালহোত্রা
কাজের মেয়ে - মালতী

(সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। স্টেজে একটা টেবিল ও একটা চেয়ার। একদিকে সোফাসেট ও একটা আরামকেদারা। অন্য একটা টেবিলে রাখা টেলিফোন। ফ্লাওয়ার ভাসে রজনীগন্ধা। বইয়ের একটা র‍্যাক, তাতে রাখা আছে সঞ্চয়িতা, গীতবিতান আর দু-একটা ইংরেজি ও বাংলা বই। কয়েকখানা বই। রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজছে, সরলাদেবী সোফায় বসে গীতবিতান খুলে মন দিয়ে গান শুনছেন। সুশান্ত আরামকেদারায় আধ-শোয়া মাকে তন্ময় হয়ে গান শুনতে দেখে বলে ওঠে :

সুশান্ত : তুমি যখন এত তন্ময় হয়ে গান শুনছ, তাহলে আমি আমার পড়ার ঘরেই যাই --

সরলা : (গান বন্ধ করে দিয়ে) তুই এখনও কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরী হসনি?

সুশান্ত : না মা আজকে আমি যাব না। আমার কলিগকে বলে দিয়েছি। দুটো পিরিয়ড উনি ম্যানেজ করে নেবেন।

সরলা : তবে আয় তোর কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। তোরা কত কিছু জানিস, পড়িস, পড়াস। আজকে একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনা না। এই নে সঞ্চয়িতাটা তো হাতের কাছেই রেখে দিস তুই। (সঞ্চয়িতাটা সেলফ থেকে বার করে সুশান্তের হাতে দেন)

সুশান্ত : তবে শোন বলাকার প্রথম কবিতাটা — সবুজের অভিযান
ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ ওরে সবুজ, ওরে অবুজ,/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।/ রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে/ আজকে যে যা বলে বলুক, বলুক তোরে,/ সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে/ পুচ্ছটি

তোর উচ্চে তুলে নাচা।/ আয় দুরন্ত আয় রে আমার কাঁচা।।

সরলা : রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কথা শুনতে কী যে ভালো লাগে। আমাদের যেন উনি কথা দিয়ে আমাদের চেতনা ফিরিয়ে আনেন। গানেও তেমনি— কী কথা, কী সুর, একজন অন্যজনকে নিয়ে কোন সুদুরে যেন চলে যায়। আমরাও বাঁচার আগ্রহে উন্মোচিত হই। গানগুলি যেন আমাদেরই মনের ভাব প্রকাশ করে চলে।

সুশান্ত : আসলে মা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সবসময় নতুন লাগে কেন জান, বারবার তিনি নিজেকে পাল্টেছেন। তবে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র যখন বেরোল, পঞ্চাশ বছরের মানুষটি একেবারে তরুণ হয়ে গেলেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথ আর ফিরে তাকাননি। যেমন বিষয়, তেমনি ভাষা, তেমনি আঙ্গিক, তেমনি বৈচিত্র্য। এই যে কবিতাটি শুনলে বলাকার, সব কবিতাগুলি তিনি সবুজপত্রে লিখেছিলেন। তারপর গল্প, উপন্যাস, নাটক - কি নয়।
(সরলাদেবী শুনতে শুনতে চোখ মুছলেন)

সুশান্ত : এ কী মা, তুমি কাঁদছ কেন?

সরলা : কোথায় কাঁদছি, না তো। কত আশা ছিল তোকে নিয়ে। অত ভালো চাকরি পেলি, কত সুখ আমার। সর্বনাশ ঘটতে তো দেরি হল না। কোথা থেকে এমন দুর্যোগ ঘনিয়ে এল, বল তো। তোর বিয়ে থা দেব ভেবেছিলাম, এমন সময় শুনি তোর ক্যানসার হয়েছে, ভাবা যায়?

সুশান্ত : তাও আমি জোর গলায় বলছি মা, আমি ভাগ্যকে মানি না। আমি একটা দারুণ ফাইট দেব, দেখি মৃত্যু-বেশী হয়ে কে এত তাড়াতাড়ি দুয়ারে দাঁড়ায়। তুমি দেখে নিও মা, আমার মনের জোরের কাছে মৃত্যু সাতমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। (প্রশান্তের প্রবেশ)

প্রশান্ত : (অফিসে বেরুবার মুখে) দাদা বিশ্বাস কর, আমরাও তোর সঙ্গে সমানে লড়ব। তোকে ধরে এত তাড়াতাড়ি কেউ টানাটানি করবে তা আমরা হতেই দেব না।

সরলা : মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন আর সইতে পারছি না।

প্রশান্ত : তুমি এত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন মা? (একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে) হে বীরাঙ্গণা, সাহস অবলম্বন করো। অতটা দুর্বল হবার মতো কিছু ঘটেনি মা। দাদা তো এখন বেশ ভালো আছে। ডাক্তার বলেছে আপাতত কোন ভয় নেই। (মাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে) আমার মনে হয় তুমি সবটা দিয়ে বসে

আছ দাদাকে। লুকিয়ে লাভ নেই তুমি দাদাকে বেশি ভালোবাস। যাই হোক আজকে আমার কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে যাবে। অফিসের পরে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে। ফিরতে একটু রাত হবে। বাইরে খেয়ে আসব।

সুশান্ত : মার ভালোবাসার কথা বলছিলি না, আমার তো মনে হয় উল্টোটা। ছোট ছেলের ওপরে যত টান। এই যে দেরি হবে বললি পূজার সঙ্গে ডেট আছে নাকি? মাকে বলে যা মা যেন বসে না থাকে।

সরলা : হ্যারে তুই যে পূজাকে একদিন আনবি বলেছিলি, আনলি না তো। আমারো তো কথা বলতে ইচ্ছে করে।

প্রশান্ত : হবে হবে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে , চললাম। (শ্রাবণীর প্রবেশ)

শ্রাবণী : এই ছোড়দা দাঁড়া দাঁড়া, আমার ভীষণ লেট হয়ে গেছে। আমাকে আমার অফিসে একটু ড্রপ করে দিবি? মা আমি চলি।

সরলা : মার সঙ্গে দু'দন্ড কথা বলার সময় হয় না। এত ব্যস্ত তুই।

শ্রাবণী : তোমার সঙ্গে কথা বলার মানে জীবনের আদর্শ নিয়ে কথা বলতে শুরু করা। আমার এসব ভালো লাগে না। তুমি তোমার মতো আদর্শ আঁকড়ে থাক তবে এই আধুনিক যুগে আমি আমার মতো চলব। অবশ্য তোমার মত নিয়ে (একটু হাসি ছড়াবে) আমার সত্যি দেরি হয়ে যাচ্ছে। অফিসে দুদিন বাদে একটা সেমিনার হবে, তার আয়োজন করার দায়িত্ব পড়েছে আমার ঘাড়ে। মা চলি। ছোড়দা চল। (দুজনের প্রস্থান)

সুশান্ত : শ্রাবণী ভীষণ পসিটিভ মেয়ে। আমার খুব ভালো লাগে। ঠিক জিনিসটি ঠিক মতো তুলে ধরতে জানে। ওর কোন রিগ্রেটস নেই। মানুষের ভাবনা রাজ্যটা বেড়ে গেলে দেখছি তার কষ্টটাও বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সরলা : (কাজের মেয়ে কমলাকে ডেকে) কী রে কমলা, আর কত দেরি করবি চা দিতে? আমার যে বেরুতে হবে। তুই তো জানিস আমি এই সময়ে মোহনাতে ক্লাস নিতে যাই।

কমলা : (তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এসে) চা করতে একটু দেরি হয়ে গেল মা। (চা-টা টেবিলে রেখে) নাও খেয়ে নাও। কাজের লোকেদের ছেলেমেয়েদেরই তুমি পড়াও বুঝি মা? কত বিদ্বান তুমি, কত দিকে তোমার নজর। লোকেদের

জন্য কত দরদ তোমার। আমিও তো আমার ছেলে দুটোকে কত কষ্ট করে পড়াচ্ছি মা।

সরলা : খুব ভালো করছিস তুই। আসলে কি জানিস, আগের চেয়ে আজকাল অনেক মা বাবাই কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের পড়ায় । আমরা দুজনে এমন আছি, যারা উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদেরে একটু ইংরেজি আর অংকটা দেখিয়ে দিই। নয়তো আমাদের সমিতিতে সকালেই ক্লাস হয়। বেশিরভাগ সকালেই আসে। আমাদের এখানে কারোর থেকেই আমরা ফিস নিই না।

কমলা : তোমরা তো শুধু মেয়েদের পড়াও, না মা?

সরলা : হ্যাঁ, শুধু মেয়েদের। (চা খেয়ে কাপটা টেবিলে রাখবেন) তাছাড়া বড় বড় ছেলেমেয়েদের আমরা কাউন্সিলিং করি। ধর ছেলেমেয়েরা হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে কী কী বিষয় নিয়ে পড়তে পারে বা কোন লাইনে গেলে কি সুবিধা-অসুবিধা হতে পারে— সে সব বিষয়েও গাইড করি। আবার ধর একটা মেয়ে এমন একটা ছেলেকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে, বিয়ে করলে সর্বনাশ হবে। কিংবা মেয়েটাকে ঠিক মানাবে না। নানা দিক খোঁজ করে দেখা গেছে ছেলেটা খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশছে বা ও তার দু-একজন বন্ধুবান্ধব মাফিয়া গ্রুপে নাম লিখিয়েছে। আমরা তখন মেয়েটাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নতুন পথ দেখাবার চেষ্টা করি। চেলেরাও যাতে অসৎ পথে না যায় তাদের বাবা-মার সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। থাক, আজকে আর না। তোর সঙ্গে গল্প করতে বসে গেলে আমার যে ভয়ানক দেরি হয়ে যাবে।

(কমলার প্রস্থান । শ্রাবণীর প্রবেশ)

শ্রাবণী : (ঘরে ঢুকে বাধা দিয়ে)- মা, বেরুচ্ছ? দাঁড়াও, কথা আছে— একটু দেরি হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না তোমার।

সরলা : (বাধ্য হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে) আমাকে তোর অত কি দরকার? (একটু ঠাট্টার সুরে) ভাবখানা এই যেন বিয়ে করতে যাচ্ছিস, তর সইছে না— দাঁড়াও মা, আমি বিয়ে করে আসি, তারপরে বেড়িও। (সরলাদেবী হাসলেন)

শ্রাবণী : সেরকমই অনেকটা ব্যাপার। ঠিক করেছি মা, আমি শোভনদাকে বিয়ে করব।

সরলা : সে কী? ও যে বিবাহিত, একটি মেয়ের বাপ।

শ্রাবণী : সেটা আমি জানি। দীপার সঙ্গে এখন আর শোভনদার কোন সম্পর্ক নেই। আমিও তার প্রমাণ পেয়েছি— এতদিন ধরে একসঙ্গে ঘুরছি- বেড়াচ্ছি

তো, এটুকু যদি না বুঝি তবে তো মানুষটাকে চেনাই কঠিন হয়ে যাবে। বিশেষ করে ওরকম একজন বিশিষ্টজন যখন ।

সরলা : দীপার সঙ্গে শোভনের ডিভোর্স হয়ে গেছে কি না খোঁজ নিয়েছিস? ওসব দেখে টেকে নিও বাবা! পরে যেন এ নিয়ে অসুবিধায় না পড়িস। তোর দাদাদের মত নিয়েছিস?

শ্রাবণী : না মা আমি শুধু তোমাকেই বলতে এলাম। তুমি কী ভাবে নেবে ব্যাপারটা জানতে চাই। সবার মতামত নিয়ে আমি চলতে অভ্যস্ত নই। ওটুকু স্বাধীনতা নিয়ে চলতে না পারলে এ যুগে বেঁচেবর্ত্তে থাকাই যে মুশকিল হবে।

সরলা : সব যখন ঠিক করেই নিয়েছিস, তখন আর আমার মতামত নিয়ে কি হবে বল। আমি কি তোকে চিনি না। যা তুই ঠিক ভাবিস সেটাই তো তুই করিস। পড়াশুনায় ভালো ছিলি, ভালো ডিবেট করতিস, তোর বাবা চেয়েছিলেন তুই আই.এ.এস হবি। তা তুই সেদিকেই গেলি না। সোজা একটা এনজিও-তে যোগ দিলি। আমরা বাধা দিইনি। গ্রামে গিয়ে থাকতে ইচ্ছুক এমন লোকদের অরগানাইজ করা— সবই তো তোর নিজের মত করছিস। আমরাও তাতে উৎসাহ দিয়েছি। সত্যি তো মনের মতো কাজে নিজেকে মগ্ন রাখা - সেটাই তো জীবন। বাঁচার সার্থকতা তো সেখানেই।

শ্রাবণী : আমি যে বল ভরসা তোমার কাছ থেকে পাই মাগো এমন আর কেউ দিতে পারবে না।

সরলা : তোর বাবা স্বামীজীর সোসিওলজিতে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। চিরকাল তাঁরই আদর্শ মাথায় রেখে, প্রচুর লোকজনদের নানাভাবে সাহায্য করে, তাদের খাইয়ে পড়িয়ে, তাদের সঙ্গে বলা যায় আনন্দ করে চলে গেছেন। শুধু তাই-- একা নয় সংসারে তোদেরও মানুষ করেছেন। কিন্তু এখন যেন সব কিছুই পাল্টে যাচ্ছে। আর আগের মতো আমার কাছে কিছুই স্বাভাবিক ঠেকছে না। তাই আমার ভয়টা বাড়ছে। তোকে নিয়েও আমার সেই চিন্তা।

শ্রাবণী : (ভয় ভাঙাবার চেষ্টায়) - সেজন্যই তো তোমাকে বলতে এলাম। শোভনদাকে আমার ভালো লাগছে। দারুন আইডিয়া আছে মানুষটার— একেবারে অরিজিনাল। তাছাড়া তুমি যে অর্থে সংসার করা ভাবছ সে রকম তো ব্যাপার নয়। শোভনদা বলেছে আমরা এখন যে রকম আছি সেরকম চিরকাল বন্ধুই থাকব। আমি আমার কাজ করব, শোভনদা তার নিজের । আমার তো এরকমই পছন্দ। তুমি মিছি মিছি বেশি চিন্তা করছ।

সরলা : ঠিকই বলছিস। সুশান্ত সবসময় বলে এখন তোমার একেবারে অন্য জীবন, সংসারের মায়াজাল থেকে তুমি উর্ধে থাকার চেষ্টা করো। (স্বগতোক্তি) সংসারে থেকে তা কি কখনও সম্ভব— বিশেষ করে আমি যখন এদের সবার মা।

শ্রাবণী : মা, তোমার ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আমরা বড় হয়েছি। আমরা যা সত্য তা ধরে থাকব। কোনরকম মিথ্যাকে আমরা কখনো আশ্রয় করব না। তুমি আমাদের ওপরে বিশ্বাস রাখ। শোভনদা এক্ষুনি আসবে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে।

(শোভনের প্রবেশ)

শোভন: হ্যাঁ মা, আমি এসে গেছি। শ্রাবণীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশ ক বছরের, তা আপনি জানেন নিশ্চয়। ওকে নিয়ে আমি ঘুরি-ফিরি-বেড়াই, তাও আপনার অগোচরে থাকার কথা নয়। আপনার অপছন্দ হতে পারে এমন কোনো জিনিস ও করে না— এটা আপনাকে জানিয়ে রাখা খুব জরুরী। শ্রাবণীকে আমি বিয়ে করব অর্থাৎ ওকে নিয়ে আপাতত ঘর বাঁধব— সেই অনুমতি আপনার কাছে নিতে এলাম মা।

শ্রাবণী : শোভনের ইচ্ছে আমাদের কোন আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে না। শুধু কাল থেকে ওর বাড়িতে আমি থাকতে চলে যাব। পরে কোন সময় একটা ছোটখাট পার্টি দেওয়া হবে। যদি দেখি একসঙ্গে থাকতে পারছি তাহলে পরে কোনো এক সময় রেজিস্ট্রি করে নেওয়া যাবে।

সরলা : তোমরা যা ঠিক করেছ সেটাই হবে বাবা! আমি মাঝখান থেকে কী বলতে পারি বলো। জীবন তোমাদের যাতে সুখের ও শান্তির হয় এই শুধু প্রার্থনা ও আশীর্বাদ ।

শোভন : আপনি আমাদের সকলের মা। আজকে আমি যা বলছি তাতে যেন মিথ্যার ছোঁয়া লেশমাত্র জড়িয়ে না থাকে সেই অভিলাষ মাথায় রেখে আমি আর বেশি কিছু বলব না মা। শুধু আপনার সহানুভূতি ও সমর্থন আশা রাখি।

সরলা : আমি সব কিছু জানলেই কি তোমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে পারব। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা যে যার সিদ্ধান্ত নিই। কেউ তাতে ঠকে যায়, কেউ জেতে। যা-কিছু করি তার পুরোপুরি দায়িত্ব যেন নিজেরা নিতে পারি সেটাই আমাদের কাম্য। আমি বেরুচ্ছি । সুশান্ত এক্ষুনি এসে যাবে। তোমাদের কথাটাও ওকে বোল আর এখানে খেয়ে যাবে। শ্রাবণী তুই কমলাকে বলে দিস। আর শোন, ওকে চা দিতে বল— আমি চলি। (সরলাদেবীর প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রাবণী : (দরজা খুলে, পর্দা সরিয়ে) বাঃ শোভন, এই শোভন, ভোরবেলাটা উঠে দেখো কি সুন্দর। প্রথম সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে দেবদারু গাছের পাতায়। ভোরের আলোয় সব কিছু যেন নতুন সাজে সেজে উঠেছে। ওঠো একবার, এসব দেখার জিনিস, অনুভবের জিনিস। রাতে দাপাদাপি করো, আর সকালে আটটা পর্যন্ত নিথরভাবে পড়ে থাকার কি অর্থ, আমি তো বুঝি না। আজকে ছুটির দিন, দেখো কত লোক সেজেগুজে মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছে।

শোভন : (উইংসের ভেতর থেকে ঘুমের আড় ভেঙে) ব্যাপার কী? কি সব শুরু করেছ বলো তো? (স্টেজে এসে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলবে) ঘুমুতে দাও। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় এই নির্বিরোধী ঘুম। পৃথিবী বড় দুঃচিন্তায় থাকে আজকাল, ঘুমতে দাও। (আবার চোখ বোজে) যতসব।

শ্রাবণী : ওঠো, ওঠো, কত আর ঘুমবে? ওঠো, উঠে আমার কথামতো বাইরেটা দেখতেই হবে। আমি যা-তা বলছি না, এই পরিবেশের মূল্য আমাদের অনেকখানি, সেটাকে অনুভব করতে বলছি।

শোভন : (উঠে বসে, একটু বিরক্ত ভাব দেখিয়ে) কি বলে যাচ্ছ তখন থেকে? সকালে উঠে এত হট্টগোল শুরু করে দেবে আমি ভাবতে পারিনি। ভোরবেলা আমার ঘুমটা গভীর হয়, তাকে আমি তোষণ করে চলি।

শ্রাবণী : বেশ তো, উঠে পড়ো। মুখটা ধুয়ে এসো, অনেক কথা আছে।

শোভন : ভোরবেলাতেই সদ্য-বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—এমন প্রস্তাব শুনে এরা হাসবেন। অবশেষে উঠে পড়ে। দাঁড়াও মুখটা ধুয়ে আসি। তুমি সেই ফাঁকে চা-টা করে নিয়ে এসো। (একটু ঠাট্টার সুরে) রাতে বেশ জমেছিল কিন্তু। তৃপ্তি পেয়েছিলে বলেই তো এত ভোরে জ্বালাতন শুরু করেছ।

শ্রাবণী : (চা নিয়ে আসে)

শোভন : (চা-টা হাতে নিয়ে) এবার বলো দেখি কী তোমার থিসিস।

শ্রাবণী : আমি ভাবছিলাম, এখন বলব, না একটু ধাতস্ত হবার পর বলব। শোনো আমাকে ব্যাপারটা খুব ভাবাচ্ছে । আমরা কি দিনদিন খুব মেকানিক্যাল হয়ে পড়ছি? প্রকৃতির মধ্যে যে ফ্রেসনেস্ তা আমাদের জীবনে নেই কেন? আমাদের দিকে তাকালে আমার নিজেরই হাসি পায়। কেন যেন কলের

পতুলের মতো চলা। সকালে উঠে তৈরি হয়ে অফিসে যাওয়া। আর পরিশ্রান্ত হয়ে রাতে ফিরে, কোনরকমে রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়া। তোমার সঙ্গে বেড়ানো, এদিক-ওদিক যাওয়া— সেই দিনগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে তোমার কাজের চাপ যেন বেড়েই চলেছে। তোমাকে আমি যেন আজকাল ঠিক বুঝতে পারছি না।

শোভন : এইসব মামুলি কথা বলতে আমাকে ছুটির দিনে এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে তুলে দিতে তোমার এক ফোঁটা কষ্ট হল না?

শ্রাবণী : যা ভাবছিলাম— তা যদি তৎক্ষনাৎ বলতে না পরি আমার ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে। আচ্ছা, আমাদের স্টাইল অব লিভিং আমরা কি দ্রুত পাল্টে ফেলছি? মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটা দিন নানা কারণে বন্ধু-বান্ধব, নাইট ক্লাব বা পার্টি-ফার্টি থাকার জন্য আমাদের রাতে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। একটা বা দুটার আগে আমরা বিছানায় যাই না। রাতের এনগেজমেন্ট নিয়ে ধরো আরও এক ঘন্টা। ফলে আমাদের বডি-ল্যাঙগোয়েজ, দৃষ্টিভঙ্গি, ভালোমন্দ, বাচবিচার— সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে।

শোভন : আধুনিক কাল ভালো-খারাপ অত বিচার করে না। বৃহত্তর সমাজের মানুষ যা করছে, আমরাও তাই করছি। সাধারণ মানুষ ও নিয়ে তোমার মতো ভাবনা-চিন্তা বা দুশ্চিন্তা কারুর হয় কিনা জানি না।

শ্রাবণী : দেখো, এইসব নানা কারণে প্রত্যেকটি লোকের টেনশন বেড়েছে। আমাদের ভোগের স্পৃহা বেড়েছে। ভোগের বাহার আমাদের বেশি মুগ্ধ করে। আগে তো এতটা ছিল না। এর দোষগুণ নিয়ে ভাবা উচিত কিনা বলো— তুমি তো আবার একজন সোসিয়োলজিস্ট, তাই তোমাকে বলছি কথাটা।

শোভন : সকাল সকাল যখন ওঠালে, আর এক কাপ চা চাই। তুমি বললে না আমাদের ভোগের স্পৃহা বাড়ছে। পৃথিবীতে ভোগের স্পৃহা বাড়ছে বলেই না নিত্য নুতন এত কিছুর উৎপাদন বাড়ছে। বিশাল একটা গাছের কথা তুললে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারটা বোঝাবার ব্যাপারে আমার সুবিধে হবে। ধরে নাও গাছটা পুঁজিবাদের প্রতীক। এই গাছটা কেটে ফেললে সব গেল, কারণ গাছটা ফলের মৌলিক আধার। সেটাকে মেরে ফেললে ওয়েলথ জেনারেট হবে কোথা থেকে? তাই দেখো না, রাশিয়ার সোসিয়েল মডেলটার দিকে চেয়ে চীন মুখ ঘুরিয়ে নিল। ভোগসুখ পূরণ করার যে পুঁজিবাদ তার দরজাও খোলা আবার সামাজিক সমতা ও লোককল্যাণের জন্য উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ— সেটাও বহাল রাখা হল — যেন একই বৃন্তে দুই রঙের

ফুল। অনেকে আবার নতুনভাবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কাজ করে কীভাবে সমতা রক্ষা করা যায় তার কথা ভাবছে।

শ্রাবণী : তুমি যে সমতা আনার কথা বললে—সেটাইতো নেই। আমাদের সেদিনের সেমিনারে তো সেই কথাটার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হল। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতেই ভোগসুখের চাবিকাঠি—বাকিরা তো ভোগের উপকরণগুলি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তাদের দিন আনি দিন খাই—এই তো অবস্থা। ভোগ করা তো দূরঅস্ত।

শোভন : বাপরে! তুমি তো দেখছি বেশ মুডে আছ। বইটই নামিয়ে ফেলার প্ল্যান আছে নাকি?

শ্রাবণী : বই লেখা তোমার কাজ। উঃ কি করে যে এত লেখো। মাথায় তোমার যে কত তত্ত্ব গজ গজ করছে। তোমার স্টেনো তো দেখি হাঁপিয়ে ওঠে।

শোভন : বইটই না লিখলে লোকেরা খাতির করবে কেন? তবে তুমি বোধ হয় আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে বসে আছ। আমি কিন্তু লাক্সারী, আধুনিক ধরণধারণা খুব এনজয় করি। এবং তাতে আমার কোন রিগ্রেট নেই। ভোগের ব্যাপারে আমার ছুৎমার্গ নেই। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তুমি যাকে বলে বাম-ঘেঁষা— আগে তো তা বুঝিনি। আমার আবার সেসব নিয়ে ভাবার অবসরটাই কম।

শ্রাবণী : তোমাকে দেখে কী মনে হয় জান? জীবনে অবসর তুমি চাও না। তোমার পক্ষে ব্যস্ত থাকাটা খুব জরুরী, কারণ কোন একটা নিষিদ্ধ অধ্যায় তুমি ভুলে থাকতে চাও। ইমোশনাল কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে তুমি বেশ ভয় পাও। দীপা বোধহয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

শোভন : ওসব পুরোনো কথা থাক না। তোমাকে আগেও আমি ওসব কথা তুলতে বারণ করেছি। তুমি আমার কাছে এসে থাকছ ভুলে যেও না।

শ্রাবণী : মার ফোন এসেছিল, দুপুরে ওখানে যেতে বলেছে। একটা কথা তোমাকে বললে নিশ্চয় অবাক হবে না। আমার ধারণা, আমাদের সব ব্যাপারটা দাদা জানে।

শোভন : সে কী? কীভাবে?

শ্রাবণী : আমি বলতে পারব না। তবে দীপাকে দাদা খুব ভালো করে চেনে।

শোভন : তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে।

শ্রাবণী : দাদারা অন্যদের ব্যাপার নিয়ে অত মাথা গলায় না। তুমি নিশ্চিত থাক।

শোভন : কিছু কিছু সম্পর্কের জিনিস ও কিছু ঘটনা এমনভাবে ঘুরে যাচ্ছে যে আমি বেশ বিব্রত বোধ করছি।

শ্রাবণী : এখন ওসব ছাড়ো তো, চলো বেড়িয়ে পড়ি— খোলা মনে আনন্দ করি।

(দুজনেই তৈরি হবার জন্য উঠে পড়ে। দুজনেরই প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

সরলা: (স্বগতোক্তি) আজকাল পুজো করতে বসলেই নানা কথা মনে পড়ে। যাঁকে আরাধনা করতে বসা, তিনি তো উধাও। পুজো করতে বসলে ছেলে মেয়েদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে। কখনও ঝগড়াঝাঁটিতে মেতে ওঠে। ওরা কেউ শান্তিতে নেই। (সরলাদেবী নমস্কার করে পুজো সাঙ্গ করলেন) না, এরচেয়ে চুপচাপ বসে থাকি সে অনেক ভালো। দেখি মনটা শান্ত হয় কিনা।

সুশান্ত : (টুলটা কাছে টেনে এনে) মাগো, কী এত সারাক্ষণ ভাব, পুজোয় বুঝি মনটা বসছে না।

সরলা : মনে বলে কিছু আছে নাকি যে সম্পূর্ণ মনটা তাঁর চরণে সমর্পণ করব। তুই তো আমার দেবতা হয়ে বসেছিস। সারাক্ষণই তোর কথা ভাবি। নয়তো মেয়েটার কথা। প্রশান্ত বেশ স্বাবলম্বী, ও নিজেরটা গুছিয়ে নিতে জানে। ভেবেচিন্তে কাজ করে। এর কথা অত ভাবি না।

সুশান্ত : আমার কথা আমি বলি। মায়ের সেবায় সন্তান নিরাময় হয়ে ওঠে । কিন্তু ক্যানসার বড় অবাধ্য। রেগেমেগে শরীরের কোনে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কারুর কথা শোনে না। (সুশান্ত হাসে) এখন ভেবে নাও তুমি কী করবে। তোমার মেয়েটা তো তোমাকে ভাববার সময় দিল না। ও তো দিব্যি সংসার পেতে বসেছে।

সরলা : কতদিন সংসার করতে পারে দেখ। শোভনের তো আন্তর্জাতিক ব্যাপার। নানা ইউনিভার্সিটি থেকে নাকি ডাক আসে। কখন আবার চলে যায়। অল্প দিনের জন্য হলে মেয়েকে কি আর নিয়ে যাবে? মেয়ে যে-কে-সেই, আবার আমারই কাছে।

সুশান্ত : (দাঁড়িয়ে উঠে অশান্তভাবে পায়চারী করতে থাকে)

সরলা : (তা দেখে আরও অস্থির হয়ে) কী হল তোর? অমন করছিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি— প্রশান্ত, ও প্রশান্ত- দাদাকে দেখ, কেমন যেন করছে।

প্রশান্ত: (ছুটে এসে) কী হয়েছে দাদা? তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে? তবে

ডাক্তারবাবুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে চলো একবার ঘুরে আসি।

সুশান্ত: না রে, কিছু না। তুই যা তোর কাজে যা। আজ অফিস যাবি না?

প্রশান্ত: দেরি করে যাব। তোমার প্রয়োজন থাকলে না হয় যাব না— যা তুমি বলবে। তোমার দরকারটা আগে। সব সময় দেখতে পারি না। আজকে যখন সময় আছে—

সুশান্ত: প্রয়োজনে টেলিফোন করে আমি নিজেই ডাক্তারের কাছে চলে যাব। তোদের কারুর ভাবতে হবে না।

সরলা : সেটাই তো তুই করছিস দেখছি। একটু সাবধানে থাকা খুব দরকার।

সুশান্ত: আর কত সাবধানে থাকব মা, ওসব কথা একেবারে বলবে না।

শ্রাবণী: (শ্রাবণীর প্রবেশ) তোমাদের একটা খবর দিতে এলাম।

সুশান্ত: বল, বল কী খবর। আগে বল, ভালো আছিস তো তুই। সংসার পেতেছিস, ভাবছি একদিন তোদের দেখতে যাব।

প্রশান্ত: আমার একদিন যাওয়া উচিত ছিল। অফিসের জন্য কোন কর্তব্যই করা হয় না। শ্রাবণী কেমন আছিস তুই?

শ্রাবণী: এখনও পর্যন্ত খুব ভালো। তবে ও কয়েকদিনের মধ্যে হার্ভার্ড যাবে। কল পেয়েছে। আপাতত তিন মাসের জন্য যাচ্ছে। তাই ভাবছি আমি যাব না।

প্রশান্ত: এ তো ভালো খবর কিন্তু তোর কি হবে?

শ্রাবণী: তার মানে? শোভন ছাড়া আমার কি আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকতে নেই? কি না শোভনকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি—। বিয়ে করিনি তাতেই যখন এরকম একটা আশঙ্কা— হারিয়ে গেছি এমন একটা ভাব—তখন বিয়ে করলে না জানি কি হত! কি আজেবাজে কথা বলিস প্রশান্ত।

প্রশান্ত: এই জন্যই বলি আমি তোর ব্যাপারে থাকতে চাই না। আমার একটা জরুরী কাজ আছে। আমি চললাম। (প্রশান্তের প্রস্থান)

সুশান্ত: আমিও তোর জন্য একটু বিচলিত হয়েছি রে— বেশ ছিলি, এর মধ্যে আবার চলে যাওয়া। একেবারে তোলপাড় অবস্থা— মা কী বলো?

সরলা : কবে যাবে রে? তুই না হয় ওর সঙ্গে বিদেশে ঘুরে আয়।

শ্রাবণী: শোভনদা বলছিল অবশ্য, আমি রাজি হইনি।

সুশান্ত: কেন, তোর রাজি না হওয়ার কী কারণ? এত জেদ ভালো না।

শ্রাবণী : আমার ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো নয় কি?

সরলা : এই শ্রাবণী, সামলে কথা বলতে শেখ, বুঝলি। কিসের থেকে কি যে হয় তুই কী করে বুঝবি। আমরা জীবনে ওসব অনেক দেখেছি। সব ব্যাপার সব সময় নিজের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। আমাদের ভুল হয় সেখানেই।

সুশান্ত: আমি বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু তোর বেদম জেদ দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

সরলা : এটা কী শোভনের জীবনের কিছু ব্যাপার?

সুশান্ত: হ্যাঁ মা, শোভনের প্রথম স্ত্রীর নাম দীপা। খুব সুন্দরী, আর শান্ত স্বভাবের মেয়ে। শোভন বিদেশে গেছে আর ফেরে না। দীপা জোর করে একবার সেখানে যায়। গিয়ে দেখে অন্য এক বিদেশিনীর সঙ্গে থাকছে। সেই থেকে ওদের বিচ্ছেদ।

শ্রাবণী: এ তুমি কী বলছ দাদা? বিশ্বাস করতে পারছি না।

সুশান্ত: আমি যা শুনেছি তাই বললাম। আমি নিজের চোখে তো দেখিনি। হতে পারে আমি এক তরফা শুনে বিচার করছি—এসব ব্যাপারে সাধারণত যা হয়ে থাকে। তাই, বলছিলাম, যখন যেতে বলছে তোর একবার বোধহয় ভেবে দেখা উচিত।

শ্রাবণী: আমার বোধহয় আর ওর ঘর করা হবে না। আমি চললাম। (দ্রুত প্রস্থান)

সরলা : এ কী করলি তুই সুশান্ত? আর একটা তো ঘর ভাঙার উপক্রম করলি ।

সুশান্ত: কী করব বলো মা, আমি তো ওকে ভালোবাসি শুধু সাবধান করতে চেয়েছিলাম। ভুল বুঝলে আমি কী করতে পারি?

সরলা : আমি তোদের মা, আমি তোদের কী আর বলব। যে যা করছিস সব সহ্য করা ছাড়া আর আমার তো গতি নেই। অবশ্য আর একটা পথ খোলা আছে। মুখে একটা মুখোশ সেঁটে নেওয়া। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা। সে তো আমার দ্বারা আর হল না। ওসব আমার আসে না-রে। (সরলাদেবীর দ্রুত প্রস্থান)

সুশান্ত: (স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে) আমি এটা কী করলাম? মাকে আমি কাঁদালাম? এটা করার কী খুব দরকার ছিল। আমি তো অসুস্থ মানুষ।শত আবেগ ও উত্তেজনায় চুপ করে থাকা খুব জরুরী। আমি তো আজ আছি, কাল নেই। আমার এসব সাজে না। কিন্তু কি করব আমি, শোভনকে দেখলে যে আমার মাথার ঠিক থাকে না। আমি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সংযত থাকি। নিজেকে সামলে রাখতে পারব না বলেই এতদিন আমি শ্রাবণীর কাছে যাইনি। আমি কিছু না বললেও এটা ঘটনা যে শোভন একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করেছে। তার চেয়েও আর একটা বড় অপরাধ করেছে— একটা নিরীহ মেয়ে শ্রাবণীর কাছে সে এটা গোপন করে রেখেছে— যে কিনা ওর ভালোবাসায় পাগল। শ্রাবণী নিশ্চয়

জানত না শোভনের ভালোবাসার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে একটা অন্য মানুষ। আসল সত্যটা জানলে শ্রাবণী এরকম একটা সম্বন্ধে নিশ্চয় নিজেকে জড়াত না। দীপাকে শোভন ঠকিয়েছে এটা শ্রাবণীর কাছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বিশেষ করে ও যখন অসত্যকে এত ঘৃণা করে। দীপা তো শ্রাবণীর মতো এত শক্ত মনের মেয়ে নয়। ওর বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেছে— ও এখন ডিপ্রেশনের শিকার। শ্রাবণীর মতো স্বাধীনচেতা মেয়ে একটা মিথ্যাকে আশ্রয় করে সারা জীবন থাকবে— এটাও তো মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না। আমি কী ভুল করলাম? মা যে বলে গেল আর একটা ঘর ভাঙালাম আমি। শ্রাবণী যেভাবে চলে গেল, ও নিশ্চয় শোভনকে চ্যালেঞ্জ করবে। আমাকে ক্ষমা করে দে শ্রাবণী। আমি তো এই আছি এই নেই— ভুল করা আমার সাজে না।

পঞ্চম দৃশ্য

সরলা : সুশান্ত, তুই যে আবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লি। ডাক্তার টেনশন ও স্টেস নিতে এক্কেবারে বারণ করেছেন, আর তুই সেটাই করে যাচ্ছিস। কলেজে যেতে পাচ্ছিস না, চলতে তোর নাকি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। এখন তোকে নিয়ে আমি কী করি বল।

সুশান্ত: আমার ডাক এলেও আমি শেষ ফাইট দিয়ে যাব, তুমি চিন্তা কোরো না মাগো। তবে শ্রাবণী কি করল— মানে ও কী করতে যাচ্ছে কোনো খবর পেলে? আমি প্রশান্তকে কাল শোভনের বাড়ি যেতে বলেছিলাম– কিন্তু তালা বন্ধ পেয়েছে। কেউ নেই। ভাবলাম, চলে গেল কিনা কে জানে।

সরলা : আমাকে না বলে চলে যাবে না— এটা আমি বিশ্বাস করি। যা জেদী মেয়ে, শোভনের বিদেশে যাওয়াটাই না আবার বাতিল দয়ে যায়।

সুশান্ত: আমি তাই সকালে ওকে ফোন করেছিলাম। ফোন ধরে সারাক্ষণই ওর মুখে আমি কেমন আছি সেই জিজ্ঞাসা। নিজের কথা কিছু বলল না। আমি বললাম, আমার বাঁচা-মরা তোর উপরে নির্ভর করছে। তোর ব্যাপারে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ি, এটা তো তুই জানিস, শ্রাবণী। তুই কেমন আছিস বল। আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছিস মনে হচ্ছে। কিছু বলবে না, শুধু বলল, কাল তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব। তখন থেকে বসে আছি কখন শ্রাবণী আসবে।

সরলা : আজকে আসবে? একা আসবে না শোভনও আসবে?

সুশান্ত: তা আমি জানি না। দু-জনের সঙ্গে একটা জোরদার বোঝাপড়া চলছে, এটুকু বুঝতে পারছি।

সরলা : বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটাই তো গণ্ডগোল সৃষ্টি করল। নয়তো বেশ ছিল, সুখেই ছিল। ওদের দেখে, কথাবার্তা বলে আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

সুশান্ত: হুট্ করে ভেবে নিও না কিছু। আধুনিক যুগে কোন কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না। বেঁচে আছে, দিন গুজরান করছে, এই যথেষ্ট। কেউ সুখে নেই মা। এটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো দেখবে তোমার মেয়ের ব্যাপারটা সহজ একটা ঘটনা মনে হবে।

সরলা : কখন যে আসবে বুঝতে পারছি না তো। একবার টেলিফোন করে দেখবি নাকি?

সুশান্ত: তার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আসবে যখন বলেছে আসবে। (শ্রাবণীর প্রবেশ)

শ্রাবণী: মা, তুমি বুঝি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কখন আসব। এই তো দেখো এসে গেলাম। (একগাল হাসি) তুমি কেমন আছ মা?

সরলা : কেমন আছ জিজ্ঞেস করলে তো ভদ্রতা করে বলতেই হয়, ভালো আছি। (একটু হাসি ছড়িয়ে) কিন্তু সত্যি কি ভালো থাকতে দিচ্ছিস তোরা।

(প্রশান্ত ও পূজার প্রবেশ)

প্রশান্ত : বাঃ ! সবাই তোমরা এখানে একসঙ্গে রয়েছো — বেশ হল। মা, এই হচ্ছে পূজা, পূজা মালহোত্রা।

সরলা : এসো মা, বাঃ সুন্দর মুখশ্রী খান। তুমি আমার ছেলেকে পছন্দ করেছ, খুবই সুখের কথা। এবার কথাবার্তা বলে আমরা তাহলে ঠিকঠাক করি, কি বলিস সুশান্ত।

সুশান্ত : হ্যাঁ, মা বেশ তো, যা তুমি বলছ তাই হবে। পূজা যখন বদলী হয়েছে শুনলাম, এবার তো তাহলে শুনব প্রশান্তও বদলী হয়ে গেছে। (সকলের হাসি) তখন দেখব ওর মা-বাবা সব মুম্বাইতে চলে গেছেন— এভাবে সব পাখি উড়ে যাবে, কেমন। (আবার হাসি) পূজা, আমি তো বাংলায় বলে যাচ্ছি, বাংলা জানো তো?

পূজা : হ্যাঁ, কলকাতায় ছিলাম তো, তাই বাংলা একটু-আধটু বলতে পারি। অন্তত বুঝতে পারব।

শ্রাবণী : মা, ছোড়দার বিয়েতে খুব মজা হবে। পূজাকে আমি তো আগের থেকে চিনি, ছোড়দার সঙ্গে মানাবে খুব। দুজনেই আনন্দ করতে জানে।

সরলা : সেটাই তো আমি চাই। তুমি যখন চলে যাচ্ছ মুম্বাই তখন কি আর প্রশান্তকে বেশি দিন এখানে ধরে রাখতে পারবো? ও ঐখানে চলে যাবে। ওখানেই

ওদের হেড অফিস। দু-একবার ট্রান্সফারের কথা উঠেছিল, ও কায়দা করে ঠেলে দিয়েছে। মা, এই তো দেখছ আমাদের পরিবার। তোমার এমন ভাগ্য— সবাই আজ উপস্থিত আছে। এমন কি শ্রাবণী পর্যন্ত। তুমি শুনলাম, মা-বাবাকে খুব দেখো। শুনে খুব ভালো লাগল। দেখো মা, সবাইকে যদি দেখো, ভালোবাসতে পার, তবে দেখবে কখনই তোমার একা লাগবে না। সব সময় মনে হবে কোন এক অদৃশ্য দেবতার সান্নিধ্য পাচ্ছ। আমার কথাটা মনে রেখো।

পূজা : প্রশান্তের মুখে শুধু আপনার কথা। কতদিন ধরে ভাবছি আসব, তা আর হয়ে ওঠে না। যাইহোক আপনাকে দেখে বুঝলাম, প্রশান্ত এত মা মা করে কেন।

সরলা : (হাসতে হাসতে) সেটা যখন বুঝে গেছ তখন আর ভাবনা কি। তুমি আজকে কিন্তু না খেয়ে যেও না।

প্রশান্ত : মা, আজ পূজাকে নিয়ে একটু কেনাকাটা করতে বেরুতে হবে। দু-একদিন বাদে আর একদিন নিয়ে আসব। আমরা চলি মা।

সরলা : এসো মা, তোমার মা-বাবার সঙ্গে আমিই কথাবার্তা বলব। আবার এসো কেমন। (পূজা ও প্রশান্তের প্রস্থান)

সরলা : শ্রাবণী এবার তুই বলতো কী অবস্থা।

সুশান্ত : আমিও তোর কথা শোনার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।

শ্রাবণী : শোভন বিদেশের অফারটা নেবে ঠিকই করেছে, তার জন্য সব আয়োজন ওর সারা। ভীষণ অ্যামবিশাস। আর তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য একটা আকর্ষণও আছে। (একটু ভেবে) মা, তুমি জান, কমপ্রোমাইজ করা আমার ধাতে নেই। এর কাছে থাকব কিংবা তোমার কাছে চলে আসব—সেটাই সারাক্ষণ ভাবছি।

সুশান্ত : মানুষকে তো ওভাবে বিচার করা চলে না। মানুষেরই ভুল হয় আবার মানুষই সাহস ও বিক্রমে জেগে উঠতে পারে। অতীতের ঘটনা মানুষকে সবল করে নতুন পথের দিশা দেয়। কোন অবস্থায় মানুষ ভুল করে বসে সেটা জানা থাকে না। তার পারমপর্য হারিয়ে যায় বলে অপরাধীকে আমরা বড় নির্মমভাবে বিচার করি। কী বলো মা?

সরলা : ঠিক বলেছিস। মানুষ সম্পর্কে আমি এরকম কোনো রিজিড মনোবৃত্তি ধারণ করার পক্ষপাতী না। কারণ কী অবস্থায় সে হঠাৎ পড়ে গেছে তা তো আমরা জানি না। কলার খোসা পায়ে পড়লেও মানুষ হড়কে পড়ে। আবার মানুষ জেনে শুনে আগুনে হাত পোড়ায়। না জেনে তার বিচার করতে গেলে কোথাও নিশ্চয় ভুল হয়ে যেতে পারে। সেটা প্রত্যাখ্যানের চেয়েও ভয়ংকর অপরাধ।

শ্রাবণী : (চোখে জল) আমি বুঝে উঠতে পারছি না মা, যা আমি করতে যাচ্ছি ঠিক করছি কিনা। স্বাধীনচেতা মানুষ আমি, চাকরি-বাকরি করি বলে পরনির্ভরতার

ভাবটা আমার মধ্যে একেবারে নেই। তাছাড়া শোভনদার সঙ্গে থেকে মানুষটাকে যতটুকু বুঝেছি ও যে শুধু নামী একজন সোসিয়োলজিস্ট তাই নয়, ওকে ঘিরে একটা কনট্রোভারসি চলতে থাকুক এটা ও খুব এনজয় করে। কাউকে খুশি করার কথা ও একেবারেই ভাবে না। নিজের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যাকে মনে করে দাম্ভিক, মিথ্যা মতবাদ বা ভুল পথের সন্ধান দিচ্ছে — তার বিরুদ্ধে অবিরাম কলম চালায়। ওর শুভানুধ্যায়ীরা বলে, ওরকম কোরো না, দিনকাল খুব খারাপ, অধ্যাপক বলে পার পাবে না। কোনদিন দেখবে খুন হয়ে যাবে। খুব মারধোরের যুগ এটা —ক্ষমা বলে কিছু নেই। বড় অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ চারিদিকে।

সুশান্ত : এ তো বড় চিন্তার কথা হল, কী বলো মা?

সরলা : তা তো বটেই, এইসব একরোখা মানুষের তো এই এক বিপদ। সাবধান করা খুব দরকার।

শ্রাবণী : অন্যদিকে আমাকে দেখো। একটু প্রকৃতির ছোঁয়াচ, একটু রবীন্দ্রনাথ, একটু গানবাজনা বা এককথায় রোমান্টিক একটা মন আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। আমার দিক থেকে বিচার করে আমি যখন শোভনকে দেখি ওকে ভীষণ প্র্যাগম্যাটিক মনে হয়, ওর মনটা যাকে বলে একেবারে নিরেট। আমি এরকম দুটি ভাবনার জটে পড়ে শুধু খাবি খাচ্ছি। শোভনদার সঙ্গে থাকলে একে যে বাঁচাতে পারব তা যেমন সত্য নয়, আমার পক্ষে ওর থেকে দূরে থাকাও মুশকিল। যেহেতু আমি ওকে ভালোবাসি, তাই মনটা ওর চারপাশেই পড়ে থাকে। ওর কাছে থাকতেও আমার আপত্তি নেই কিন্তু সারক্ষণই বইপত্র লেখা নিয়ে, ছাত্রছাত্রী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ফলে যেটুকু আমরা অবসর পাব মনোমালিন্য ও ঝগড়াঝাঁটিতে সময় কাটবে। আমি যে কী করব, তোমার কাছে চলে আসব কিংবা ওর সঙ্গে থাকব আমি বুঝে উঠতে পারছি না মা।

সরলা: তোকে তো এরকম দিশেহারা অবস্থায় কখনও দেখিনি। আমার মনে হচ্ছে নিজের চেয়ে তুই এখন শোভনের কী হবে ভাবছিস। যা চিরকাল করে এসেছিস একেবারে বিপরীত। ঝগড়াঝাঁটি করে তিক্ততা বাড়াবার চেয়ে তুই বরং এখন কিছুদিন আমার কাছেই থাক।

সুশান্ত : মা ঠিকই বলেছে। এই সময়ে দূরে দূরে থাকলে তোরা পারস্পরিক মূল্যটা অনুভব করতে পারবি। সেটা দুজনের পক্ষেই ফলপ্রসু হবে। শোভন তোকে সত্যিকারের কতটা ভালোবাসে তার যাচাই হবে এই, এখন থেকে।

শ্রাবণী : (এগিয়ে এসে মার হাত ধরে) তবেই না আমার মা। (বলে জড়িয়ে ধরে স্টিল হয়ে থাকবে।)

শিল্পী

বাদল ধর

চরিত্র — হারু, অসীম, পরেশ, গৃহস্বামী, চার্লি, শিবানী, মা ও অন্যরা।

(বিয়ে বাড়ি। একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে চ্যাপলিন সেজে একজন দাঁড়িয়ে। শার্ট গুঁজে ঢোলা প্যান্টটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পড়েছে। পায়ে বুট। শার্টের ওপরে ছোট হয়ে যাওয়া এক কালো কোট। ঠোঁটের ওপর ছোট্ট এক গোঁফ। সিঁড়ি দিয়ে বিয়ে বাড়ীতে যাঁরা আসছে, বেরোচ্ছে চার্লি প্রত্যেককে অভিবাদন করছে। হাসাচ্ছে। চার্লি ওর হাতের লাঠি দিয়ে লাঠির বিশেষ খেলা দেখিয়ে, চার্লির বোকা ল্যাবার মত বিশেষ হাঁটা হেঁটে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছে। মোটা মত, ফুল প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবী পরিহিত একজন, নাম হারু, বেহালা বাজিয়ে চার্লির সঙ্গে সিঁড়ির অন্য পাশে দাঁড়িয়ে সঙ্গত করার চেষ্টা করছে। দু'জন নাম অসীম আর পরেশ , আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বেরোতে উদ্যত, চার্লি ওদের আনন্দ দিতে গিয়ে একজনের আইসক্রিম হঠাৎ ফেলে দিল। সে রেগে গিয়ে চার্লিকে এক থাপ্পর মেরে বসল। পড়ে গেল চার্লি। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল চার্লি। যেন কিচ্ছু হয়নি। হাসির উদ্রেক হল। মোটকু হারু যেন একটু ক্ষ্যাপে গেল।)

হারু : একেবারে মেরে বসলেন?

অসীম : বেশ করেছি।

হারু : এ কিরে! বলে বেশ করেছি।

অসীম : আমার হাতের আইসক্রিম ফেলে দিল, দেখলি না?

হারু : (আইসক্রিমের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একবার দেখে) কোণায় কোণায় ছিটে ফোটাই তো লেগে আছে। সবই তো শেষ করে এনেছেন দেখছি।

অসীম : ও ফেলবে কেন?

হারু : কী হ্যাংলা দেখ।

অসীম : কি বললি?

হারু : বললাম, হ্যাংলা— হ্যাংলা—

অসীম : এই! কী বললি? (হারুর কলার চেপে ধরে)

হারু : যাহ্! গরীব মানুষ । কলারটা ছাড়ুন না মাইরি।

অসীম : শালা ভিখিরি!

হারু : এ রাম! একটু মুখ সামলে কথা বলতে পারেন না?

অসীম : অন্যায় করে তরপাচ্ছিস ? শালা!

হারু : শার্টটা ফেঁসে গেলে আমিও যে ফেঁসে যাবো স্যার।
অসীম : মেরে হাড়গোর গুড়িয়ে দেব বে।
হারু : এই দেখ। ভদ্দর লোকের মুখের ভাষা দেখ।
অসীম : বেহালা টেহালা তুবড়ে একেবারে ছেড়ে দেব। জানিস?
হারু : বেহালা আবার কী দোষ করল বলুন তো?
পরেশ : আইসক্রিমটা ধরতো। শালাকে একটু মেপে নিই।
হারু : আরে মাপার কি আছে। আমি তো মোটাই। বেশ মোটা।
অসীম : মোটকুকে কেলাতেই তো মজা।
হারু : এই না মাইরি লাগবে। যা । (গৃহস্বামীর প্রবেশ)
গৃহস্বামী : কি হল আবার।
পরেশ : দেখুন না। ওর আইসক্রিমটা ফেলে দিল।
হারু : চেটেপুটে প্রায় শেষ করেই এনেছিলেন। হঠাৎ—
গৃহস্বামী : কে? তুই ফেললি?
হারু : না, না। ও হাসাতে গেল। আর আইসক্রিমটা হাসতে হাসতে হঠাৎ জাম্প করল।
গৃহস্বামী : আইসক্রিম জাম্প করল!
অসীম : মেরে একেবারে—
গৃহস্বামী : আপনি বরং আর একটা নিয়ে যান।
হারু : হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর একটা। অত লোভের থুরি প্রাণের জিনিষ!
পরেশ : এ-ই ! শালা। (ঝাঁপিয়ে পড়ে! হারু নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটতে থাকে।)
হারু : উরে বাপ্! আমার নিজের প্রাণের ওপর যে বড্ড মায়া গো— (ছুটে অসীমের পেছনে লুকোতে চায়।)
পরেশ : মেরে একেবারে — (হারুকে মারতে গিয়ে ঘুষিটা ধুম করে অসীমের মুখে মেরে বসে। অসীম ঝফ করে পড়ে যায়)।
হারু : এই সেরেছে! কেলোর কীর্তি হয়েছে গো। ও দাদা। দাদা গো—
গৃহস্বামী : এই! কেউ একটু জল নিয়ে আয় তো!
গৃহস্বামী : (চোখে মুখে জল ছেটাতে ছেটাতে) দাদা। তাকান। ও দাদা—
চার্লি : লুক। লুক।
হারু : এই তো চোখ ফেটিয়েছেন গো—
চার্লি : হয়েছে। আখিঁ পল্লবের উন্মীলন ঘটেছে—
পরেশ : অসীম! লেগেছে?
অসীম : (উঠে বসে) লাগবে না ? আয়। তোকে একটা কষায়। তারপর দেখ।
পরেশ : ব্যাপারটা বাই চান্স্ ঘটে গেল। বিশ্বাস কর। ওকে কষাতে গিয়ে —

গৃহস্বামী : ঠিক আছে। ঠিক আছে। দাঁড়াতে পারবেন তো ?
অসীম : পারবো না কেন? (হট্ করে দাঁড়িয়ে যায়। শার্ট ঝাড়তে থাকে।)
হারু : সুপারম্যান! হিরো! হিরো!
অসীম : তোকে শালা ! (হারুকে তাড়া করে)
হারু : ও মাগো! আমার কী হবে গো! (ছুটে প্রস্থান করে)
গৃহস্বামী : এই কে আছিস? দুটো আইসক্রিম নিয়ে আয় তো—
পরেশ : না। না। লাগবে না।
গৃহস্বামী : কেন লাগবে না? জিনিষটা যখন পছন্দের হয়েছে।
অসীম : না বলেছি তো !
গৃহস্বামী : রাগ করলেন?
অসীম : আর লোক পেলেন না? এসব কোত্থেকে জুটিয়েছেন?
গৃহস্বামী : আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যই তো—
পরেশ : ও! আনন্দ একেবারে আমাদের উথ্‌লে উঠেছে।
গৃহস্বামী : ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। প্লীজ !
অসীম : ছিঃ ! একি করছেন!
গৃহস্বামী : আবার আসবেন।
পরেশ : প্লীজ। ডোন্ট মাইন্ড।
পরেশ : আরে ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা। আসি।
গৃহস্বামী : আবার আসবেন।
পরেশ : আসবো। আসবো।
অসীম : আসি।
গৃহস্বামী : গুড নাইট।
পরেশ, অসীম : গুড্ নাইট। (পরেশ ও অসীমের প্রস্থান)
গৃহস্বামী : এসব কী করছিস তোরা?
চার্লি : আনন্দ দিতে গিয়েই তো—
গৃহস্বামী : তাই বলে আইসক্রিমটা ফেলে দিবি?
চার্লি : লাঠিটা হঠাৎ বিট্রে করে বসল।
গৃহস্বামী : ঠিক করে লাঠি সামলাতে পারিস না তো খেলা দেখাতে যাস কেন?
চার্লি : কী যে বলেন না! দেখবেন? (হঠাৎ লাঠির খেলা দেখাতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ লাঠি ইত্যাদির খেলা দেখাবার পর।)
গৃহস্বামী : হয়েছে । হয়েছে। ভালোই তো দেখাস। (ভীড় জমে যায়। শিবানীও এসে

দাঁড়ায়।)

চার্লি : ভালো না? বলুন (হারুর প্রবেশ)

শিবানী : বেশ মজার তো! আবার দেখাও। আবার।

(চার্লি মজার মজার খেলা দেখাতে থাকে। কখনো মাতাল। কখনো বোকা। কখনো হ্যাংলা। কখনো প্রেমিক। কখনো চোর। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। যেন ও এক বিত্তশালী লোক। আর ঐ বিত্তশালী হতে গিয়েই কৌতুকরস যেন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে হারুর বেহালা বাদন যেন ব্যাক্‌গ্রাউন্ড মিউজিকের সৃষ্টি করে। শিবানীই যেন বেশী উচ্ছ্বসিত হয়।)

শিবানী : বাহ্! বেশ তো ! কোথায় এসব শিখলে?

চার্লি : নিজে নিজে।

শিবানী : নিজে নিজে!

হারু : হ্যাঁ। চ্যাপলিনের সিনেমা দেখে। আর শিখে নেয়।

শিবানী : বেশ তো তোমার ক্ষমতা!

হারু : ওর মাও আমাকে শেখায় । কী করে অনুকরণ করতে হয়।

শিবানী : তা-ই!!

হারু : ওর মা'তো আগে থিয়েটার করতো।

শিবানী : তুমি পড়াশুনা কর?

চার্লি : না। ছেড়ে দিয়েছি। টুয়েলভে ফেল করলাম। তারপর—

শিবানী : সে তো অনেকেই ফেল করে।

চার্লি : দূর! বাবা বকাবাকি করল।

হারু : ওর বাবাও তো তারপর চলে গলে।

শিবানী : কোথায়?

হারু : ওপরে। হসপিটালে ভর্তি হল । হসপিটালের যে ঘরটায় ওর বাবা ছিল, ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারারাত ধরে ঐ ঘরটার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সে রাতেই ওর বাবা চলে গলে।

শিবানী : যাহ্! তাই আর পড়াশুনা করলে না?

চার্লি : তারপর তো অভাব—অভাব—

হারু : ওর মাও নাটক করা ছেড়ে দিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এখন শুধু ব্লাউজ সেলাই করে।

গৃহস্বামী : এই চল্ চল্। খেয়ে নিবি চল্। তোরাও আয়। খেয়ে নিবি আয়।

চার্লি : আমাদের প্যাকেট দিয়ে দিন। বাড়ি গিয়ে খাবো।

গৃহস্বামী : ও ! ঠিক আছে। কিরে! শিবানী, আ-য়।

শিবানী : আসছি। (গৃহস্বামী সহ অন্যরা প্রস্থান করে, শিবানী থেকে যায়।) তুমি অনুষ্ঠান বাড়িতেই এসব কর?

চার্লি : কেন?

শিবানী : না। কোন মঞ্চে পারফর্ম করো না?

চার্লি : কে আমায় চান্স দেবে?

শিবানী : আমি যদি চান্স করে দিই?

চার্লি : সত্যি! (ভেতর থেকে গৃহস্বামী শিবানীকে ডাকে)

গৃহস্বামী : (নেপথ্যে) কিরে শিবানী ! আ-য়!

শিবানী : আসছি। স্টোরি বানাও। হাসির বা দুঃখের।

চার্লি : স্টোরি!

শিবানী : হ্যাঁ। তারপর ঐ স্টোরিগুলি পারফর্ম করো। চ্যাপলিনের না। তোমার নিজের স্টোরি। কিন্তু চ্যাপলিনের স্টাইলে দেখাও।

চার্লি : আমার নিজের স্টোরি!

শিবানী : হ্যাঁ। সব বাস্তব ঘেঁষা স্টোরি। (ভেতর থেকে আবার গৃহস্বামীর ডাক আসে)

গৃহস্বামী : (নেপথ্যে) এই শিবানী। আরে আসবি তো!

শিবানী : যাচ্ছি তো! তোমার পারফরমেন্স আমার ভালো লেগেছে।

চার্লি : সত্যি!

শিবানী : তোমাকেও। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ .....! এ-ই গম্ভীর হয়ে গেলে কেন তুমি?

চার্লি : কই নাতো।

শিবানী : দেখছি। তোমার মুখে যেন একটা শ্যাডো পড়ে গেল।

চার্লি : যাহ্!

শিবানী : ল্যাবা নাকি তুমি?

চার্লি : না । ভাবছি।

শিবানী : ও। এখনই প্লট ভাবতে বসে গেলে!

চার্লি : না তো।

শিবানী : তবে?

হারু : আসলে ও এখন এই জগতে নেই।

শিবানী : মানে ?

হারু : ও এরকমই। মাঝে মাঝে কোন্ অতলেই যে তলিয়ে যায়।

শিবানী : তা-ই। সৃষ্টিশীল মানুষ তো। (আবার নেপথ্য থেকে গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।)

গৃহস্বামী : (নেপথ্যে) কি রে শিবানী। এলি না?

শিবানী : আসছি। ... এই! পরে দেখা করবো, কেমন । (প্রস্থান)

হারু : এই!

চার্লি : কী?

হারু : এরকম থম্ মেরে গেলি যে!

চার্লি : নারে। ওর দিকে তাকাতেই পারছিলাম না।

হারু : কেন?

চার্লি : বাব্বা! চোখ তো নয়। যেন সার্চ লাইট। আমার সব যেন একেবারে হাতড়ে নিচ্ছিল।

হারু : সত্যি কথা বল না বাবা । তুই ক্রমশ অতলে ডুবছিলিস!

চার্লি : কোথায়?

হারু : প্রেমের ডুবসাগরে।

চার্লি : ভ্যাট্! (প্যাকেট হস্তে গৃহস্বামীর প্রবেশ)

গৃহস্বামী : এই নাও। (দুজনকে দুটো পাঁচশ টাকার নোট দেয়)

হারু : আচ্ছা, নমস্কার। একটা কথা। আমাদের হয়ে অন্যদের অনুষ্ঠানেও আমাদের কথা একটু যদি বলে দেন। বুঝতেই তো পারছেন। এমন একটা পেশা ধরেছি, যেটাতে ঠিক ....

চার্লি : পেশা কে বলেছে? আমার কাছে এটা ঠিক ... আমার কাছে এটা একটা আর্ট। শিল্প।

গৃহস্বামী : হ্যাঁ। ঠিকই তো। শিল্পই তো।

চার্লি : শোন। আর একশ টাকা রাখ। দু'জনে পঞ্চাশ পঞ্চাশ নিও। এটা অবশ্য আমার মেয়ের রেকমেন্ডেশনে।

চার্লি : ধন্যবাদ। ওকেও আমাদের ধন্যবাদ দেবেন।

গৃহস্বামী : তোমরা কি চ্যাপলিনের মতই ভবঘুরে?

হারু : এ্যাঁ। হ্যাঁ, প্রায় সেরকমই।

গৃহস্বামী : আর কিছু কর না?

চার্লি : করি তো।

গৃহস্বামী : কি কর?

চার্লি : কেন? শিল্পের সাধনা।

গৃহস্বামী : এই লোক হাসানোর সাধনা?

হারু : কেন? লোককে হাসানো, আনন্দ দেওয়া, এখনকার সময়ে কম ক্রেডিট নাকি?

গৃহস্বামী : তা অবশ্য ঠিক।

চার্লি : আচ্ছা, আসি।

গৃহস্বামী : এসো।

(দৃশ্যান্তর । চার্লির বাড়ি। চার্লি ও হারু চার্লির বাড়িতে প্রবেশ করে।)

চার্লি : মা? ওমা? মাগো — (অসুস্থ বয়স্কা মা প্রবেশ করে)

মা : এসে গেছিস? হ্যাঁরে ! রাত কি অনেক হল?

চার্লি : হয়েছে তো। এই নাও মা। খাবার এনেছি।

মা : কেন? ওখানে খেয়ে আসিস নি?

চার্লি : না তো! তুমি একটু খাবে না? বাহ্!

মা : আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে।

চার্লি : কেন তুমি জানো না ? আমি খাবার নিয়ে আসবো?

মা : বড্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছি যে। অত রিচ্ খাওয়া কি আমার চলে?বল?

চার্লি : কেন তুমি খাও না?

মা : এই! ডাক্তার ওদিন বারণ করলো না?

চার্লি : দূর! তোমার জন্য কোথায় নিয়ে এলাম।

হারু : হ্যাঁগো মাসি। আমিও তো তোমার জন্য নিয়ে এলাম। ও মাসি। তাহলে কিছুটা করে রেখে দাও। কাল সকালে খেও।

মা : তুই ও নিয়ে এসেছিস?

হারু : বারে! তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে , বল?

মা : এই পাগল ছেলে। তোরা দু'জনে বসে আমার সামনে খা তো! আমি বসে বসে দেখি।

চার্লি : ওমা? তুমি একটুও খাবে না?

মা : এই ! খাওয়া শুরু কর তো? (দু'জনেই প্যাকেট খোলে)

হারু : দেখেছ! শুধু ফ্রাই রাইস্। আর দু পিস্ আলু। একটু মাংস টাংস দেয়নি।

চার্লি : কোন মিষ্টিও নেই। ফিস ফ্রাই টাই কিচ্ছু নেই।

মা : এ কিরকম লোক রে! এ কিরকম মানসিকতা!

চার্লি : এ ব্যাটা ঐ ক্যাটারারদের কাজ । আমাদের কিরকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করল দেখলে?

হারু : কেন? বাড়ির মালিক একটু দেখে দেবে না?

চার্লি : মালিকের কি দোষ বল্! সুন্দর করে প্যাক করে দিয়েছে! মালিক ভেবেছে সব ঠিক ঠিক আছে।

হারু : জান মাসি। আমাদের সবাই কেমন ফেক্‌লু ভাবে দেখ। কোথাও একটু সম্মান নেই গো।

চার্লি : আমাদের কেউ শিল্পী বলেই মনে করে না।

মা : ওসব বিয়ে বাড়ীতে টারিতে খাটতে কেন যাস?

হারু : মাসি, একটু রোজগার তো করতে হবে। শুধু কোন বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আশায় বসে থাকলে তো আমার চলবে না। তা না হলে পেট চলবে কি করে?

মা : কেন অন্য কিছু করতে পারিস না? বলেছি তো, এগুলো হল মনের খোরাকের ব্যাপার। অফ্ টাইমে করবি। প্রথমেই এগুলোকে পেশা হিসাবে দেখলে চলবে? কতবার বলেছি, আগে নিজেরা তৈরী হ'। তৈরী হ'।

চার্লি : মাগো। তৈরী হতে গেলে তো রা-ত দিন এগুলো নিয়েই পড়ে থাকতে হবে, মা।

মা : থাক না। কিন্তু পেটের জোগাড়টাতো আগে করবি। তারপর, তারপর সারা রাত জাগ না। নিজেকে নিংড়ে দে। বড়লোকের ছেলে তো নোস্ যে—

চার্লি : তাই বলে শিল্পী বলে কেউ মান্য করবে না?

মা : আগে শিল্পী হ'। সত্যিকারের শিল্পী বনে যা। তারপর চেল্লাস। কিছু শিখলি না, জানলি না, নিজেকে শিল্পী শিল্পী বলে জাহির করলে চলবে?

চার্লি : মাগো। কোথায় একটু এন্থু দেবে, একটু এন্কারেজ করবে— (চেঁচিয়ে) (হঠাৎ সবাই যেন থম্কে যায়)

মা : রাগ করলি? চার্লি? চার্লিরে ....! তোর নামটা তোর বাপ চার্লি কেন রেখেছিল জানিস? নিজে তো নাটক করতো। আর তোকে নিয়ে যে ক-ত স্বপ্ন দেখতো। একদিন, একদিন তুই চ্যাপলিনের মত হয়ে উঠবি। না হলে হিন্দুর ছেলের আবার চার্লি নাম কেউ রাখে? বল? ওরে বড় কিছু হতে গেলে তো আগে শিক্ষিত হতে হয় রে। তুই ক্লাস টুয়েলভে - দু-দুবার ফেল করলি। তোর বাবার মন ভেঙ্গে গেল। তারপর মদ খেয়ে খেয়ে তো নিজেকে—

চার্লি : মা— । কেতাবি শিক্ষা ছাড়া কি এমনি নিজেকে শিক্ষিত করা যায় না?

মা : যায়। কিন্তু তুই বই নিয়ে বসিস কোথায়? পড়াশুনা করিস কখন?

চার্লি : কেন মা তুমি আমায় পড়াও না? ঐ দেখ, মাতালটা কেমন করে মাতলামী করছে দেখ। কিরকম হাঁটছে দেখছিস? ওর স্টেপিংগুলো দেখ।

হারু : হ্যাগো মাসি। চোরকে দেখিয়ে তুমিই তো শেখাও— দ্যাখ্ দ্যাখ্ নিজেকে বাঁচাবার জন্য উদভ্রান্তের মত ওর ছোটাটা একবার দ্যাখ।

চার্লি : হ্যাঁ তো। প্রেমিকদের দেখিয়ে তুমিই বল, দেখ্ পৃথিবীর কোথাও ওদের আর দৃষ্টি নেই। নিজেদের নিয়েই ওরা কেমন ব্যস্ত একবার দেখ।

হারু : তুমিই তো আমায় দেখিয়েছ, ঐ দ্যাখ, ধনী ব্যক্তিটার পোশাক পরিচ্ছদ, ওর চেহারা, ওর ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিটা একবার দ্যাখ।

চার্লি : মানব চরিত্রকে খুঁটিয়ে বোঝার ক্ষমতাটা তুমিই তো আমার মধ্যে গড়িয়ে দিয়েছো। মাগো—

মা : খাওয়া হয়েছে? যা, মুখ ধুয়ে এবার শুয়ে পড়। হারু! চার্লির সঙ্গে আজ আমার পাশে শুবি নাকি? আমার একপাশে তুই আর এক পাশে চার্লি, থাকবি? একটু অবশ্য কষ্ট হবে। আমার চৌকিটাতো আবার সেরকম বড় নয় রে।

হারু : শোব, মাসি। শোব। আমার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দেবে তো? ও মাসি? বল না ? দেবে গো?

মা : দেব রে, দেব। আমার পাগল ছেলে।

হারু : দেখ না? একা ঘরে থাকি তো। মাঝে মাঝে এমন হাঁপিয়ে উঠি! নিজেকে এমন নিঃস্ব মনে হয়! মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে চাঁদটাকে দেখা যায়। তখন মনে হয়, ঐ তো ঐতো! একজন তো আছে। দেখ, কেমন তাকিয়ে আছে দেখ। আবার, আমার বাবা মা'র ফটোর পেছনে একটা বড় টিকটিকি লুকিয়ে থাকে জান। মাঝে মাঝেও ফটোর পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়েই থাকে। তখন মনে হয় ঐতো, ঐতো, আমায় কেমন পাহাড়া দিচ্ছে দেখ।

মা : আয়। কাছে আয়।

হারু : মাসি গো—

মা : খেয়েছিস?

হারু : হ্যাঁ।

মা : পেট ভরেছে ?

হারু : না।

মা : কেন?

হারু : দূর ! তুমি যদি খাইয়ে দিতে!

মা : পাগল ছেলে। জল খেয়েছিস?

হারু : ও! নাতো!

চার্লি : ও মা! আমিও তো জল খাইনি গো—

মা : যা। আগে জল খেয়ে আয় দুজনে। যা — (দুজনে কাড়াকাড়ি করে জল খেতে থাকে।)

হারু : মাসি। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাদের সঙ্গে থাকবো গো।

মা : থাকিস। প্রতিদিন থাকিস।

হারু : না। তাহলে ঐ যে ফটোতে বসে থেকে দুজনে আমার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে, তারা আবার রাগ করবে না ? বল?

মা : আজকে রাগ করবে না।

হারু : আজকে? তাইতো। না ।ঐ যে টিকটিকিটা ওদের ফটোর পেছনে লুকিয়ে থাকে না, ও আজকে ওদের ঠি-ক পাহারা দিয়ে দেবে। ... ঐ দেখ, টিকটিকি, টিক্‌টিক্ টিক্ করে ডাক দিয়ে উঠল। দেখেছ? (সকলের হাসি)

মা : আমার এই ছেলেটার মাথায় একটু ছিট্ আছে। নারে —?

হারু : আছে তো। পুরো এক গজ।

মা : হ্যাঁরে ? প্রতিদিন তোর ভাত জোটে?

হারু : জুটবে না? না জুটলে তো রোগা টিং টিং - এ হতাম। কিরকম মোট্‌কু বুনেছি দেখেছ?

মা : শোন্ না। না জুটলে আমাদের বাড়িতে এসে খেয়ে নিবি, কেমন?

হারু : তুমি খাইয়ে দেবে তো?

মা : (হাসি) দেব।

চার্লি : না। ইস্। আমার মাকে কেড়ে নেবার তাল। না? (আবার সকলের হাসি)

মা : শোন্। ওর মত বাউন্ডুলে হবি না তো?

হারু : ও বাউন্ডুলে তোমায় কে বলেছে?

মা : ও বাউন্ডুলে নয়?

হারু : ও একদিন কোথায় পৌঁছাবে তুমি জান?

মা : কোথায় পৌঁছাবে?

হারু : ওর একদিন কত নাম হবে তুমি দেখো। দেখে নিও ও একদিন কত নামকরা শিল্পী হয়।

মা : তখন আমি বাঁচবো তো রে?

চার্লি : এই! এই মা!

মা : শরীরটাতো ভাল যাচ্ছে নারে। মাঝে মাঝে এমন হাঁপানির টান ওঠে।

চার্লি : তবুও তো ডাক্তার দেখাবে না।

মা : ডাক্তার ! সাধে কি আর দেখাই না , বল?

চার্লি : এখন তো টাকা আছে। বল, কাল দেখাবে? বল না? ওমা?

হারু : ও মাসি ! কাল দেখাবে তো?

মা : আমি কি আর সুস্থ হ'ব রে?

চার্লি : মা—

মা : চল্ ! শুয়ে পড়বি, চল।

চার্লি : মা, শুয়ে শুয়ে গল্প বলবে তো?

মা : গল্প?

চার্লি : হ্যাঁ। ছোটবেলার মত।

হারু : হ্যাঁগো মাসি। বাবুর এখন স্টোরি দরকার। স্টোরি।

মা : স্টোরি?

হারু : একজন ফরমায়েস করেছে। শুধু ক্যারিকেচার করলে চলবে না। ওর পারফরমেন্সে স্টোরিও থাকতে হবে।

মা : গল্প?

হারু : হ্যাঁ।

মা : ওমা! তা-ই?

চার্লি : হ্যাঁগো। একটা মেয়ে। এই, নাম যেন কী বলল?

হারু : শিবানী

চার্লি : হ্যাঁ, শিবানী। ওর নাকি আমার পারফরমেন্স খুব ভাল লেগেছে। বলল, মঞ্চের অনুষ্ঠানে চান্স করিয়ে দেবে। কিন্তু স্টোরি চাই। স্টোরি।

মা : সত্যি?

চার্লি : হ্যাঁ। বলল, সব বাস্তব গল্প চাই।

মা : বাস্তব গল্প? সে তো বড় দুঃখের হবে রে।

হারু : হোক। ঐ বাসি বাস্তবগুলোকেই ও নয় একটু সেঁকে নেবে।

মা : বেশ। রাত তো অনেক হল রে। চল।

(দৃশ্যান্তর। দেখা যায় চার্লি কোন এক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। চারদিক আধো অন্ধকার পরিবেশ। পাশে বসে হারু বেহালা বাদন রত। চার্লি গতরাতের ওর মা'র বলা বাবার গল্পই ভাবছে। মা'র কণ্ঠস্বর তাই শোনা যায়। মাঝে মধ্যে বনের মধ্যেকার টুকটাক পাখির কাকলিও ভেসে আসছে। মা'র কণ্ঠস্বর—)

মা : (নেপথ্যে) তোর বাবার জীবনটা ছিল এক আলোর জাফরির মত। কোথাও ছিটেফোঁটা রোদ্দুর। বেশীর ভাগই অন্ধকার। এক মাড়োয়ারী ফার্মে কাজ করতো। আর করতো নাটক। নাটকই ছিল প্রাণ। কিন্তু এক অপ্রাপ্তির বেদনা ওঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতো। কিন্তু ইগোর প্রব্‌লেমেই ভুগতো বেশী। মহৎ সাজার চেষ্টা করত। আর সম্ভবত এটা তৈরী হয়েছিল ব্যর্থতাবোধ থেকেই। সারাজীবন ধরে তো তেমন কিছু করে উঠতে পারে নি লোকটা। আর এর জন্য আমাকে চিরকাল গরুচোরের মত মুখ করে কাটাতে হল তোর বাবার পাশে। প্রতিভাবান লোকের সাধারণ স্ত্রী। আহা। কী অনুকম্পা তোর বাবার। এরকম একজন সাধারণ মহিলাকে সারাজীবন বয়ে চলল। আসলে এই ভাবটা বজায় না রাখতে পারলে হয়তো তোর বাবার ফাঁকিটা ধরা পড়ে যেত। তোর বাবা যে সাধারণ, অতি সাধারণ, তাঁর যে সেরকম কোন যোগ্যতাই নেই- এই ব্যাপারটা সকলেই

বুঝে যেত। তাই নিরুপায় হয়েই হয়তো একটা মুখোশ, একটা মিথ্যে সাজও চাপিয়ে রাখতে চেয়েছিল চিরদিন। (শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী : কি হল ? এভাবে বসে?

চার্লি : কে? ও তুমি!

শিবানী : তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তোমার মা বললেন, ঐ বাগানে গিয়ে দেখগে হয়তো আমগাছ তলায় দু'জনে প্র্যাক্‌টিস করছে।

চার্লি : প্র্যাক্‌টিস্! দূর কিছু ভাল্লাগে না।

শিবানী : 'ভাল্লাগে না' শব্দ দুটো ভাল লাগে তোর?

চার্লি : কেন?

শিবানী : এই! তুই বললাম বলে রাগ করলি না তো?

হারু : কেন ? রাগ করবে কেন?

শিবানী : আসলে ওকে ভাল লাগতে কাল আমার মাত্র দু'মিনিট সময় লেগেছিল।

হারু : শুধুই ভাল লেগেছে?

শিবানী : এই কি ফাজিল! ... রাগ করলি?

হারু : ধ্যাৎ!

শিবানী : তোরা প্র্যাক্‌টিস্ করছিস না কেন?

হারু : ঐ যে বলল, ভাল্লাগে না।

শিবানী : কেন রে ? মুড্ অফ্?

চার্লি : মা গতরাতে বাবাকে নিয়ে এমন গল্প করল! শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম।

শিবানী : এখানেই শুয়েছিলিস?

চার্লি : হ্যাঁ। খসে পড়া সব পাতা বিছানায়। এমন সুন্দর সব অনুভূতি হচ্ছিল!

শিবানী : তা-ই?

চার্লি : নিজেকে গাছের মত লাগছিল।

শিবানী : তা-ই?

চার্লি : মনে হচ্ছিল আমার কান্ড বেয়ে ডেঁয়ো পিঁপড়েগুলো সব নেমে আসছে। বল্কলে সর সর বৃষ্টির ফোঁটা। শিকড় দিয়ে যেন খামচে ধরে আছি মাটি, শীর্ণ ডালে যেন সব পাখিরা বাসা বেঁধেছে। পাতাগুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে যেন রোদ গলে পড়ছে।

শিবানী : হ্যাঁরে। তুই কি কবিতাও লিখিস?

চার্লি : না তো।

শিবানী : কেন? লিখিস না কেন?

হারু : দ্যাখ না, আমি ক-ত বলি। ও গ্রাহ্যই করে না।

চার্লি : শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম কুলেখাড়া আর গিমেশাক হাওয়াতে দুলছে। আর ওদের দোলানিতে হঠাৎ চল্‌কে পড়ল দুধ কচুপাতার ওপর জমা জল।

শিবানী : ঐ দ্যাখ রোদ্দুরের জাফরি। বল্ বল্ এবার ভাল্লাগে না।

হারু : দ্যাখ দ্যাখ বাচ্চাটা ছাগলটাকে চড়াচ্ছে। ঐ দ্যাখ, খিল খিল করে বাচ্চাটাও হাসছে, ছাগলটাও হাসছে।

শিবানী : ভ্যাট্! ছাগলটাও হাসছে। কী যে বলে না!

হারু : বিশ্বাস কর। আমি সত্যি দেখেছি।

শিবানী : তোরা সবাই পাগল নাকি রে। ওমা! প্রজাপতিটা কী সুন্দর! এই ধরে দে নারে! দিবি? ধরে দিবি?

হারু : না উড়ছে। ওকে উড়তে দে।

শিবানী : দে-না—।

হারু : এমনি দ্যাখ। প্রাণ ভরে দেখ। মনে হচ্ছে না? আমাদের প্রাণ যেন উড়ছে!

শিবানী : যাহ্! উড়ে গেল।

চার্লি : হাতের মুঠোয় বরং ধরে থাক ওর স্মৃতি।

শিবানী : কি বললি? দারুণ বললি তো! ... এই আমরা সব কেমন হয়ে যাচ্ছি, না রে?

হারু : কেমন?

শিবানী : এমন সব কথাবার্তা বলছি ! একটু এ্যাবনর্মাল মনে হচ্ছে না নিজেদের?

চার্লি : এটা প্রকৃতির জন্য। এই পরিবেশের জন্য। দেখ্ না, আমার এই মেজাজি সাইকেলটাও ওর হাতল, ব্রেক, স্পোক, টায়ার সব নিয়ে কেমন ঠান্ডা হয়ে গেল।

শিবানী : তোর সাইকেল?

হারু : হ্যাঁ। ওর আমার টো টো করে ঘুরে বেড়াবার সঙ্গী।

চার্লি : যখন ফাইভে উঠলাম। প্রাইমারী থেকে হাইস্কুলে গেলাম, তখন। হাইস্কুল তো অনেক দূর। বাবা কিনে দিলেন।

হারু : জানিস? সাইকেলটার এখনো একবারো চেন পড়েনি।

শিবানী : ভ্যাট্।

হারু : বিশ্বাস কর।

চার্লি : খুব রাগী জানিস সাইকেলটা। খু-ব মেজাজ।

শিবানী : যাহ্।

চার্লি : হ্যাঁরে। পিচ রাস্তায়ও এমন লাফায়! এমন ক্ষেপে ওঠে!

শিবানী : ওটারও যেন একটা প্রাণ আছে, না?

হারু : আছে তো।

চার্লি : হ্যাঁ আছে। বিশ্বাস কর।

শিবানী : তোরা এমন করে বলছিস। আমারও যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।

চার্লি : খুব ভোরে ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। আমার ঠাম্মা তখন তুলসীতলায় সুর করে কীর্তন গাইতো। সাইকেল চালাতে চালাতে মনে হত ঐ কীর্তনের সুরটাই যেন আমি পৌঁছে দিচ্ছি গ্রামে গ্রামে। রাস্তায় রাস্তায়।

শিবানী : তোর ঠাম্মা কি এখনও বেঁচে?

চার্লি : না- না। সে সব কবে ফিনিশ। কিন্তু ঐ সুরটা? সুরটা কি এখনো মুছতে পেরেছি? আমার সাইকেলটাতে জড়িয়ে মুরিয়ে ঠি-ক রয়ে গেল। ঠিক।

হারু : তোর ঠাকুরমাকেই তো এখনো তুই ভুলতে পারলি না।

শিবানী : ঠিক। যেদিন ভুলে যাবি, সেদিন দেখবি ঐ সুরের অনুরণনটাও তোর মন থেকে মুছে গেছে।

চার্লি : ভুলতে পারছি কোথায়। এখনো যেন দেখি। বারান্দায় বসে বসে ঠাকুরমা যাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটছে। কাকদের খই মুড়ি ছিটিয়ে খাওয়াচ্ছে। মাথার ঘোমটাটি কিন্তু কক্ষনো পড়ছে না। আর মুখে হাসি লেগেই রয়েছে।

শিবানী : আয়, একটু বসি।

চার্লি : কেন?

শিবানী : তোর স্মৃতি কুড়িয়ে, শৈশবের খিড়কি খুলে একটু বসি।

চার্লি : সদর দরজা খুলে , রোয়াকের সিঁড়ি পার হয়ে আমাকে নিয়ে প্রথম উনি এম.বি. রোডে নেমেছিলেন। সেই প্রথম আমি দেখেছিলাম অতবড় রাস্তা। আজো মাঝে মাঝে, কাক পায়রাদের খই মুড়ি ছুঁড়ে দিতে দিতে, দুই একটা দানা নিজের মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে আমি ঠাম্মার কথা ভাবি। আর বৃষ্টি এলেই ঠাম্মার কথা মনে পড়ে। শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ওঁকে তেমন টানতো না। কিন্তু বর্ষা এলেই ঠাম্মা পাল্টে যেত। মনে পড়ছে, বাতাস আসতেই থাকছে। বাতাস থামছে না। বর্ষায় সমস্ত ঢাকা। এদিকে জানালা ধরে ঠাম্মা দাঁড়িয়ে। মা চেঁচাচ্ছে, ও মা জানলা বন্ধ করুন। মা— ! ঠাম্মা শুনছেই না।

শিবানী : থামলি কেন? বল।

চার্লি : কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রেখেছে আঁচার। আমি রাগ করেছি বলে বয়াম হাতে ছুটে এসেছে ঠাম্মা। পাখির ছানার হাঁ করা মুখের মত লাল টকটকে রঙের আঁচারের সে যে কী স্বাদ। জ্বর হয়েছে। ঠাম্মা জলপট্টি দুধ সাবু নিয়ে চুপচাপ জেগে থেকেছে আমার পাশে, ক-ত রাত! স্কুল থেকে না বলে বন্ধুর বাড়ি চলে গেছি। সন্ধে হয় হয়, উৎকণ্ঠায় বড় রাস্তায় বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে ঠাম্মা আমার অপেক্ষায়। .. এ জন্মে ঠাম্মা ঠিক এক বিড়াল ছানা হয়ে জন্মাবে, দেখিস।

হারু : কী চিন্তাভাবনা দেখ।

শিবানী : ও বিড়ালছানাকে খু-ব ভালবাসে, না?

চার্লি : বাসিই তো। আসুক না, একবার বাড়ির বিড়ালছানা হয়ে আসুক। জুতোর বাক্সের মধ্যে রেখে দেব ওকে। খু-ব যত্ন করব। তোমাকে খুব আদর করব ঠাম্মা। ঠাম্মাগো—

শিবানী : এখন মাকে জ্বালাস না—?

চার্লি : উম্?

শিবানী : আমার তো মা নেই। তাই তোর মা'র কথা জিজ্ঞেস করছি।

হারু : জ্বালায় না আবার।

চার্লি : ভোর না হতেই জেগে ওঠে কলতলা। কলতলাতে মা'র বাসন মাজার আওয়াজ শুনতে পাই। একটু পরে রোদ জানলা দিয়ে উঁকি মারে। এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার শরীরে। মা তখন কাপ প্লেট নিয়ে ঢোকে আমার ঘরে। চায়ের ঘ্রাণে আমি চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, ঘোমটা টানা মা'র হাসি মাখা সাদা ধবধবে অ্যানিমিয়া মুখ। কিছুক্ষণ পরেই রান্নাঘরে আবার হাতা খুন্তির আওয়াজ। দুপুরে অন্তরঙ্গ ভাত বেড়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সেই মুখ।

শিবানী : দেখেছিস, আকাশে আবির রঙ ছড়িয়েছে। কিরকম একটা নতুন রাগ ছড়াচ্ছে না বাতাসে? মনে হচ্ছে না, অনেক কিছু বলার আছে, অনেক?

চার্লি : বল্। তোর কথা বল।

শিবানী : আমার?

চার্লি : তোকে কেউ এর মধ্যে প্রপোজ করে নি?

শিবানী : ক-ত জন।

হারু : তাহলে?

শিবানী : সবকটা একই রকম। গায়ে পড়া পড়া। যেন, এক্ষুণি ঘনিষ্ঠ হবার কথা বলতে চায়।

হারু : যাহ্।

শিবানী : ঐ দুটো কথা বললেই আমি ছেলেদের মতিগতির কথা বুঝতে পারি।

চার্লি : তাহলে, কাউকে এর মধ্যে তোর ভাল লাগে নি?

শিবানী : একজনকে লেগেছিল।

হারু : লেগেছিল?

শিবানী : ফোনে ভারী গলায় আবৃত্তি শোনাতো।

হারু : তুই কী বলতিস?

শিবানী : কিছু বলিনি তো। কবিতাটা পুরো শুনতাম। চুপ করে থেকে একটা ছোট্ট শ্বাস

ছাড়তাম। টুক করে ফোনটা কেটে যেতো।

চার্লি : কোন কমেন্ট করতিস না?

শিবানী : না তো। ওপাশ থেকে তো সময়ই দিত না।

হারু : ওটাই তো ভুল করতিস।

শিবানী : কেন? আমার নিঃস্তব্দ হয়ে থেকে ছোট্ট শ্বাস ফেলার ব্যাপারটা ও বুঝতো না কেন?

হারু : তোর গলার স্বরই শুনতে পেল না। তোকে জানাবে কী করে!

চার্লি : হ্যাঁ। অভিমানও তো হতে পারে।

হারু : তোকে অহঙ্কারীও তো ভাবতে পারে।

চার্লি : তা, কতদিন আবৃত্তি শুনিয়েছিল তোকে?

শিবানী : তিনদিন।

হারু : তিন দিনেও সাড়া দিলি না?

চার্লি : কি কবিতা শোনাতো তোকে? গদ্য কবিতা না ছন্দ কবিতা?

শিবানী : ছন্দ কবিতা।

হারু : ইস্, ছন্দময় ছিল রে ছেলেটা।

চার্লি : কখনো, দূরে কেউ একা একা পুরানো সাইকেল নিয়ে ক্যাবলা মতো তোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে নি?

শিবানী : হ্যাঁ। তাকিয়ে ছিলি তো। তুই, তুই তাকিয়ে থাকিস নি?

চার্লি : হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা? আমার দৃষ্টির মধ্যে কোন ....

শিবানী : না। তোর মধ্যে ছিল মুগ্ধতা, বিনম্রতা। ঐজন্যই তো তোকে...

হারু : দেখেছ! ধরা পড়ে গেছে গো....

শিবানী : এই! এই পাজী ছেলে! এই! (হারুকে তাড়া করে)

হারু : ওরে বাবাগো ... আমি গেছি গো ... (দুজনেই চার্লির চারদিকে ছুটতে থাকে)

শিবানী : (হাঁপাতে হাঁপাতে) তোকেও আই ... আই... লাইক্ ....

হারু : লাইক মোস্ট বল.....

শিবানী : ইস্ ! মোস্ট্ মোটেই না। হিঃ হিঃ হিঃ ... (তিনজনেই হাসতে থাকে) আমার না মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

হারু : কেন?

শিবানী : এমনিই।

চার্লি : তুই কখনও সূর্যাস্ত দেখেছিস? কিংবা পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা তারা?

শিবানী : হ্যাঁ দেখেছি।

চার্লি : উচ্ছে ফুল দেখেছিস? তেঁতুল ফুল?

শিবানী : তুই দেখেছিস?

চার্লি : দেখছি তো। তোর তো মা নেই?

শিবানী : না বাবাই আমার সব।

চার্লি : মা'র কথা মনে পড়ে না?

শিবানী : ফটোগুলো না থাকলে মা'র মুখটাই হয়তো ভুলে যেতাম। তবুও কে যেন ভেতর থেকে ডাক দেয়। আমারও মন সাড়া দিতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, তুই তো এতক্ষণ যা বললি সব নিজের, নিজের পরিবারের কথা বললি। বাইরের, তোর বাউন্ডলেগিরির কিছু বল?

চার্লি : তাহলে এক গ্রামের কথা বলি। গ্রামটির নাম বড়শুল।

হারু : হ্যাঁ। হ্যাঁ। বল। আমার মামাবাড়ির কথা বলছে, বুঝলি? এখনো একেবারে অজ পাড়া গাঁ।

চার্লি : তখনো ভোরের কুয়াসা জড়িয়ে চারদিক। আমি আর হারু তো পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছি। আসলে, আমি পাড়া গাঁয়ে ভোরের রূপটা দেখবো। ওমা দেখি, এক কুঁড়ে ঘর থেকে এক স্ত্রীর কণ্ঠ ভেসে এল। " পারুল, ও পারুল। এবার ওঠ্। যা। ময়নাকে মাঠে বেঁধে আয়। বেচারা কখন থেকে ডাকছে। " কিছুক্ষণ পরেই দেখি একটা মেয়ে ছুটে এসে কুয়ো পাড়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিল। তার একটু পরেই দেখি মাঠ পানে ছুটছে একটা বাদামী রঙের গরু। তার পেছন পেছন ওর বখ্না। মেয়েঠি গরুটার দড়ি ধরে আছে, সামলাতে যেন হিমসিম। ঐ স্ত্রী কণ্ঠ আবার ভেসে এল , " ঠিক করে গোঁজ পুতিস, পারুল! কাল ময়না দড়ি খুলে বিশ্বাসদের ক্ষেতে মুখ দিয়েছিল। অনেক গালমন্দ করেছে—! মেয়েটিও চেঁচাল, আচ্ছা—!

হারু : জানিস, রাতে মাঝে মাঝে শুনতাম কৃষকের বৌয়ের কান্না।

চার্লি : হ্যাঁ। মদ খেয়ে, মাতাল হয়ে কৃষক তার বৌকে পেটাতো। অথচ ঐ বৌটিই হয়তো সারাদিন ধান ঝাড়াই মাড়াই করে জোতদারদের ঘরে তা দিয়ে থুয়ে এসেছে। নিজেরা যে রাতে একটু শাকান্ন খাবে, সেই মুরোদও হয়তো নেই।

হারু : মানুষর দুঃখ কষ্টের কথা আর বলিস না।

চার্লি : কতদিন দেখেছি, ঘরের মাথায় শতছিদ্র চালটুকু হয়তো আছে, কিন্তু চারপাশের সব প্রায় খসে পড়েছে। সেই ঘরে ছেলেমেয়েদের বুকে নিয়ে মা শীতে হু হু করে কাঁপছে।

শিবানী : হ্যাঁরে। সেই যে দোতারা বাজিয়ে গান গাইতো। ওদের দুঃখের কাহিনী বলতো। মা চাল আলু দিত। ওরা তো আজকাল আসে না।

চার্লি : কি জানি। সেই যে দোতরা বাজিয়ে গান গ্রামে এখনো কিন্তু অনেকে গায়। জানিস, বর্ষাতে নদীর পাড়ে বেড়াতে গেছি। বেশ ভীড়। ভীড়ের মধ্যে ছোট্ট একটি শিশু তার বোনকে নিয়েও দাঁড়িয়ে। গালে ওদের শুকিয়ে যাওয়া

অশ্রুর ধারা। হঠাৎ দেখি এক নৌকা এসে পাড়ে ভিড়লো। সবাই ধরাধরি করে নামাল মৃত এক বৃদ্ধকে। আগের রাতে ঝড় হয়েছিল। ভরা জোয়ারও। নদী নাকি নৌকাসহ এক পরিবারকে গিলে খেয়েছে। শুধু বৃদ্ধের দেহটাই নাকি খুঁজে পেয়েছে। শিশু দুটো ঐ বৃদ্ধেরই নাতি নাতনী। ... এরকম দেখেছি ক-ত মানুষের অসহায়তা। তাদের কান্না। আবার বেঁচে থাকার লড়াই।

শিবানী : হাঁরে ? এই যে এত ব্যর্থতা, জ্বালা লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা তুই সঞ্চয় করলি এতে এক চরম ট্র্যাজেডির বোধ, এক সীমাহীন বেদনাবোধ তোর মধ্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে নি?

চার্লি : কি জানি?

শিবানী : বঞ্চনার গভীর থেকে এক সীমাহীন বেদনাবোধ সমস্ত লাঞ্ছিত মানবাত্মার বোবা ভাষাকে তোর মধ্যে মুখর করে তোলে নি?

চার্লি : হ্যাঁ। ওসব বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি তো একাত্ম হয়েছিই। আর হয়তো ক্রমশঃ মানবিকবোধেও উদ্দীপিত হয়েছি। কিন্তু সেই বিত্তহীন ব্যর্থপ্রাণ ভবঘুরে হয়ে উঠতে পারলাম কোথায়! আমিও তো বস্তিতে বস্তিতে, অলিতে গলিতে, অন্ধকার খুপরিগুলিতে, ধুঁকে ধুঁকে মরা মানুষের চোখে মুখে, দারিদ্রের মধ্যে, বঞ্চনার গভীরে, অসহনীয় জীবনযাত্রার ভিতরে, বাস্তবজীবনের তলা থেকে খুঁজেছি। অথচ ঐ আজব কায়দায়, আজব ঢঙে তা ফুটিয়ে তুলতে পারলাম কোথায়?

শিবানী : পারবি। পারবি। একদিন ঠিক পারবি। আয় এখন একটু প্র্যাক্‌টিস্ করি।

হারু : এখন?

শিবানী : হ্যাঁ। এখন তুই একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাতো।

(হারু বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়—আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবে গান। ... শিবানী নাচতে থাকে। চার্লি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দৃশ্যান্তর।)

(অনুষ্ঠান মঞ্চ। মাইকে ঘোষিত হয় — 'গান্ডীব সংস্থার বাৎসরিক বিচিত্রানুষ্ঠানে এখন যুগল নৃত্য পরিবেশন করবে কত্থক শিল্পী শ্রীমতী শিবানী রায় ও প্যান্টোমাইম শিল্পী চার্লি চ্যাটার্জী। সঙ্গে বেহালা বাজাবেন শ্রী হারাধন ঘোষ।')

(প্রবেশ করে হারু। ও রাগ সংঙ্গীতে বাজাতে থাকে আপার মিডল জোনে। ক্রমে মঞ্চে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে শিবানী,। মঞ্চময়। সঙ্গে চ্যাপলিন সেজে চার্লি ওর বোকা ল্যাবা চাল চলনে ও আচরণে মঞ্চে হাসির স্রোত বইয়ে দেয়। কিন্তু দু'জনের এই প্রোগ্রামে এক স্টোরিও যেন বিরাজ করে। ওদের ঐ প্রোগ্রাম চলতেই থাকে এবং প্রোগ্রাম চলাকালীনই পর্দা পড়ে।)

ভুল মানুষ

বাবুল দাস

চরিত্র -

নীলাময়বাবু - সরকারী কর্মচারী। সুনির্মল- একজন প্রকাশক।
মতিবাবু - অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রাণতোষ- মতিবাবুর বন্ধু।
নীলয়- নীলাময়বাবুর পুত্র। মনোজিৎ - মতিবাবুর পুত্র।
হিমাংশু - নীলাময়বাবুর বন্ধু। গৌতম- ক্লাব সেক্রেটারী।
রাজু - ক্লাব সদস্য। নীলিমা - নীলাময়বাবুর স্ত্রী। নীলাক্ষী - নীলাময়বাবুর মেয়ে।
অর্পিতা- মতিবাবুর পুত্রবধূ । লক্ষ্মী - মতিবাবুর বাড়ীর কাজের মেয়ে ।
বনানী- হিমাংশুর স্ত্রী ।

প্রথম দৃশ্য

মঞ্চে পর্দা উঠতে থাকে, সেই সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠে একটা রবীন্দ্র সংগীত, সংসার যদি মন কেড়ে নেয়, জাগে না যখন প্রাণ। মঞ্চে আলো ফুটে উঠে, দেখা যায় নীলাময় তার ড্রয়িংরুমে বসে আছে, সময় সকালবেলা। ড্রয়িং রুমটা বেশ সুন্দর করে সাজানো, সোফা সেট, টি টেবিল, একটা বুক সেল্ফ, দেওয়ালে একটা রবীন্দ্রনাথের ছবি, টি টেবিলের উপর রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, একটা ফাইল, বুক সেল্ফের উপর একটা মেমেন্টো, একটা বাঁধানো শংসাপত্র। নীলাময়বাবু চোখবুজে গান শুনছেন, সামনে রাখা একটা মোবাইল ফোনে গানটা বাজছে। ড্রয়িংরুমে একদিকে বাইরে থেকে প্রবেশের দরজা, মধ্যে অন্যান্য ঘরে যাওয়ার জন্য একটা দরজা। নীলাময়বাবুর বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্ব। সরকারী গ্রুপ সি কর্মচারী। স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে সংসার। ছেলে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে, চাকরীর জন্য কোচিং নিচ্ছে, মেয়ে কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। নীলাময়বাবু তন্ময় হয়ে গান শুনছেন , এমন সময় তার স্ত্রী নীলিমাদেবী একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে। নীলাময়বাবু টের পাননি, নীলিমা দেবী কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে তারপর বিদ্রুপের সুরে বলে,

নীলিমা : আহা মানুষটা কি সুখে আছে, ঘুম থেকে উঠে চা পান করে কতক্ষণ কবিতা পাঠ করলেন, এখন চোখ বুজে গান শুনছেন, কি সুখী মানুষ আহা। (নীলাময়বাবু চোখ মেলে তাকিয়ে হাসে, মোবাইলটা হাতে নিয়ে গানটা বন্ধ করে দেয়। একটা অদ্ভূত হাসি নিয়ে নীলিমার দিকে তাকিয়ে থাকে। নীলিমা দেবী এবার খেঁচিয়ে উঠে), কটা বাজে, বাজারে কে যাবে, আমি?

নীলাময় : না না আমি যাব, (সোফা থেকে উঠে পরে)

নীলিমা : এই নাও বাজারের ব্যাগ আর টাকা, (নীলিমা দেবী টি টেবিলের উপর ব্যাগ

আর টাকা রাখে, নীলাময়বাবু চশমাটা চোখে লাগিয়ে ব্যাগ আর টাকা গুলির দিকে তাকিয়ে বলে)

নীলাময় : কি আনব?

নীলিমা : তুমি বাজারে যাবে, কি আনবে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে।

নীলাময : না, মানে বলছিলাম।

নীলিমা : কিচ্ছু বলার নেই, যা খাবে তাই আনবে।

নীলাময় : কি খাবো, মানে মাছ, সবজি, কি দিয়ে কি,

নীলিমা : এই শোন, তুমি যখন লিখতে বস, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করো, কি লিখবে?

নীলাময় : না, সেটা আমার সাবজেক্ট।

নীলিমা : বাঃ বাঃ ফাইন, মানে আজকে কি খাবে বাজার থেকে কি আনবে। এটা তোমার সাবজেক্ট নয়। এই তো কথা।

নীলাময় : অনেকটা তাই, কারণ সংসারটা তো তুমি চালাও।

নীলিমা : সেটাইত ভুল করেছি, সীমা বৌদিদের মত হতাম, কোন টেনশন নেই, দীপকদা যা এনে দেয় তাই রেধে দেয়, তাও নিজে শুধু রান্নাটা। সব তো কাজের লোকই করে, দিব্যি আনন্দে আছে। কাল এখানে পরশু ওখানে, দেখলে হিংসে হয়। আর আমি সারাদিন শুধু সংসার সংসার, তাও যদি এই সংসারে মুরদ থাকত, এই শোন তুমি যা বেতন আন না, সেই বেতনে ছেলেমেয়ের পড়াশুনা চালিয়ে সংসার চলে না।

নীলাময় : ইস্, এখন বলতো, কি আনতে হবে।

নীলিমা : বললাম তো, যা খাবে তাই আনবে, আমি রেধে খাওয়াবার মালিক রেঁধে দোব, বিনে পয়সার কাজের লোক।

নীলাময় : ছি, এভাবে বল না।

নীলিমা : বলবো না তো কি, এই বাড়িতে একটা মানুষের কোন সিমপ্যাথি নেই। যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে। এদের আর দোষ কি, যাকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছিলাম, সেই মানুষটাই তো বুঝল না।

নীলাময় : সকালবেলা কি আবোলতাবোল বলছো। তোমাকে আমি কত ভালবাসি।

নীলিমা : মুখে, মুখে, আর কাগজ কলমে, ছাব্বিশ বছরে তোমার কাছ থেকে কি পেয়েছি।

নীলাময় : (আবৃত্তির সুরে) তোমাকে দিয়েছি আমার আলোকিত যৌবন, আমার অফুরন্ত অনন্ত প্রেম।

নীলিমা : হু, ঐ একটাই পুঁজি, আপুক্ত কাঁঠালের মুঠিটাই সার। শোন, আলু নেই, আলু আনবে, মুদির দোকনের খাতাটা নিয়ে আসবে। আজ কতদিন ধরে বলছি,

আমার মুখে দেবার ক্রিমটা শেষ হয়ে গেছে, খালি মনে থাকে না, ক্রিম - আনবে। বড়টা মনে থাকে যেন।

নীলাময় : হ্যা, হ্যা, মনে থাকবে। নাইট ক্রিম বড়টা। নিলয় কি বেরিয়ে গেছে?

নীলিমা : তোমার সামনে দিয়েই তো বেড়িয়ে গেল। কেন, নিলয়কে কেন?

নীলাময : (হেসে) না এমনিতেই।

নীলিমা : বুঝেছি, বাইকটা নিয়ে বাজারের যাওয়ার ইচ্ছা, বয়স তো ষাটের ধাক্কা এখনো শখ।

নীলাময় : এই সকাল বেলায় বয়স তুলবে না তো, আর শখ বলছ, শখ জিনিষটা মনের ব্যাপার নীলিমা, মনের কোন বয়স হয় না।

নীলিমা : হে তুমি কচি খোকা, যত সব, অটো করে যাও।

নীলাময় : আরে যাচ্ছি তো, এই তুমি শুভকে দেখেছ, শুভ আর আমি সমবয়সী, অথচ শুভকে দেখলে মনে হয় কচি ছেলে, আর শখের কথা যদি বলো, শুভ তার গাড়ি নিয়ে বাজারে আসে।

নীলিমা : এমন গাড়ি একটা তোমারও থাকত, তুমি যদি একটু বুদ্ধিমান আর চালাক হতে।

নীলাময় : বিষয়টা চালাক চতুরের নয় নীলিমা, বিষয়টা ইকোনমিক, যাকে বলে অর্থনীতি। শুভ আর শুভর বৌ মিলে মাসে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ঘরে আনে, ওর মত হলে , আমিও তো অন লাইনে বাজার করতাম। সব হোম ডেলিভারি।

নীলিমা : (খেঁচিয়ে) সব সময় ফুটানির কথাবার্তা, স্বপ্নের জগতে বাস করো তো।

নীলাময় : রাইট, একদম ঠিক বলেছ, স্বপ্নেই যখন খাবো তখন চিড়া মুড়ি কেন , রসগোল্লা, রাজভোগ, ক্ষীরতোয়া। এই আজকে বাজার থেকে আসার পথে রসগোল্লা নিয়ে আসব, নীলা খুব ভালবাসে।

নীলিমা : নীলা ভালোবাসে না নিজে, স্বার্থপর, শুধু নিজেরটা ভাবে। এই বার বার বলছি বাজারে গেলে যাও, সকালবেলা আমার মেজাজ গরম করে দিও না, দিন কিন্তু ভাল যাবে না,। তোমাকে তো কিছুতেই পায় না, ছেলে বেরোবার সময় হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, মা দু'শ টাকা দাও, বাইকে তেল ঢুকাতে হবে। মেয়ে কলেজে যাবে, একশ টাকা দাও। এসব আসে কোথা থেকে। বেতন পেয়ে ক'টা টাকা হাতে দিয়ে উনি ভাব জগতে ডুব দেন, এবার তুমি মর, জীবনটাও নাটক মনে করে।

নীলাময় : নাটক, আরে আজকে রবিবার না উদয়ের নাটক আছে, রবীন্দ্রভবন হল নং টু তে। আমার মনেই ছিল না, থ্যাংকিউ।

নীলিমা : (রেগে) এই শোন, তোমার বাজারে যাবার ইচ্ছে আছে কিনা স্পষ্ট করে বলো তো? ঘরে কিন্তু কিচ্ছু নেই, আশ্চর্য মানুষ।

নীলাময় : আরে যাব তো, আজ রবিবার অফিসের তাড়া নেই। এই একটু বসো না, (নীলাময় পুনরায় সোফাতে বসে পড়ে) বসো না প্লিজ, এসো গল্প করি। নীলিমা তোমার মনে আছে, একবার কলেজের একটা অনুষ্ঠানে তুমি গান গেয়েছিলে, তোমার গান শুনে সন্দীপন নামে একটা ছেলে তোমাকে প্রপোজ করেছিল। তুমি সবার সামনে সেদিন ছুটে এসে আমার হাত ধরে বলেছিলে আমি নীলাময়কে ভালবাসি। নীলিমা আমাদের কলেজের পেছনে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে তুমি আমাকে গান শোনাতে, আমি তোমাকে আমার সদ্য লেখা কোন গল্প কবিতা শোনাতাম। আজ কতদিন তোমার গলায় গান শুনি না। কি অপূর্ব ছিল তোমার গানের গলা। এভাবে কেন নিজেকে গুটিয়ে নিলে, আজকাল তুমি আমার সাথে ভালভাবে একটা কথাও বল না। কেন নীলিমা কেন?

নীলিমা : আচ্ছা, তুমি বুঝতে পার না, আজকাল কেন আমি তোমার সঙ্গে —

(কলিং বেল বেজে ওঠে)

নীলিমা : আঃ ! এই সকালে আবার কে এল? (দরজা খোলে)

আগন্তুক : নমস্কার। নীলাময়বাবু আছেন? আমি সুনির্মল সিংহ রায়। শুভাশীসদা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। ভিতরে আসতে পারি?

নীলাময় : আসুন , আসুন! বসুন।

সুনির্মল : নমস্কার ! শুভাশীসদা আপনার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিয়েছিল। তবে এসব কথা ফোনে না বলে, সাক্ষাতে বলাই ভালো বলে চলে এলাম। তাছাড়া, আপনার মত গুণী লোকের সঙ্গ পাওয়া! সেটাই বা কম কি সে?

নীলিমা : (সলজ্জ সুরে) না, না তেমন কিছু নয়! এই শুনছো?

সুনির্মল : বৌদি'কে চায়ের কথা বলবেন তো। আমি কিন্তু একদম চা খাই না, ডাক্তারের বারণ! যাক্ যেজন্যে আমার আসা! আপনার বেশ কয়েকটা গল্প আমি রবিবারের সাহিত্যের পাতায় পড়েছি। অসাধারণ! সোশ্যাল মিডিয়াতেও আপনার লেখা পড়ি। সত্যি বলতে কি, আপনার লেখার আমি একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। আপনার অনুমতি নিয়েই , আমার প্রকাশনা সংস্থা থেকে, আপনার বেশ কয়েকটা গল্প নিয়ে একটা বই ছাপাতে চাই। আর এই বইমেলাতেই সেটা প্রকাশ করতে চাই। যদি অনুমতি দেন।

নীলাময় : দেখুন, প্রকাশকদের প্রতি আমার .....

সুনির্মল : বলতে হবে না, আর বলতে হবে না। শুভাশীসদা আমায় সব বলেছে। নাম বলতে চাই না। একজন প্রকাশক, আপনাকে ঠকিয়েছে। জানেন তো, এই

ধরনের প্রকাশকদের জন্যই লেখকরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। মানছি! পুস্তক প্রকাশনা একটা ব্যবসা! তবে সেটা যদি মুদির দোকান হয়ে যায়, তখন তো তা হয়ে উঠে লজ্জার বিষয়। পুস্তক প্রকাশনার একটা ঐতিহ্য আছে। পৃথিবীর বড় বড় লেখকদের তো প্রকাশকেরাই পাঠকের কাছে মেলে ধরেছে। আসলে বুঝলেন, সত্যটাই ভুলে গেছে। একজন প্রকাশকের দায়িত্ব হোলো লেখকদের তুলে ধরা। যার মূলধন হোলো সততা।

নীলাময় : একদম ঠিক কথা বলেছেন।

সুনির্মল : জানেন, সেদিন আমার এক লেখক বন্ধু আমাকে মুখের উপর বলে দিলো, জ্যোতিষ; প্রকাশনা, এইদুটোই নাকি বৈধ বাটপারী ব্যবসা। দুইক্ষেত্রেই কিছু সহজ সরল মানুষের মনের দূর্বলতার সুযোগ নেওয়া হয়।

(মোবাইল বের করে কানে দিয়ে)

হ্যালো , হ্যা। আমি এখন অরুন্ধুতীনগরে আছি। ঠিক আছে। আপনি আমার অফিস ঘরে বসুন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তাহলে দাদা এই কথাই রইলো। আমি অত্যন্ত সততার সঙ্গে আপনার পাঠকের সামনে তুলে ধরবো। শুভশিসদা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে। আপনার প্রতিভা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। (একটা কার্ড হাতে ধরিয়ে দিয়ে) আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকবো দাদা। আজ আসি, নমস্কার। (লোক চলে যেতেই নীলিমা প্রবেশ করে)

নীলিমা : কে গো লোকটা? কেন এসেছিলো?

নীলামায়: একজন প্রকাশক।

নীলিমা : আবার প্রকাশক। একবার এককাঁড়ি টাকা গচ্চা গেল। তোমার আর লজ্জা হবে না! কি হবে, এসব বইটই দিয়ে।

নীলাময় : নেশা গো, নেশা।

নীলিমা : এই নেশাটা যদি সংসারের একটু থাকতো ....। আমি একটু বেরোবো। তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করলে চলবে না। বাজারে গেলে যাও। না হলে ডাল - ভাত খাবে বলে দিলাম। ভালভাবে কথা বলি না, বুঝ কিছু ? বুঝতে পারছ?

নীলাময় : (সিরিয়াস) বুঝি নীলিমা, সব বুঝি। আমি জানি সারাদিন কেন তোমার মধ্যে এত অসহিষ্ণুতা। আসলে তুমি সংসারের মধ্যে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছ , বাইরের আকাশের রংটা তোমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

নীলিমা : এর জন্য তুমি দায়ী। আমি যদি সংসারে না জড়াতাম কি হতো ভাব তো। তোমার বাবা মা বোন, তোমার ছেলে মেয়ে , এমনকি তুমি নিজে। (নীলিমা এবার সোফাতে বসে পরে) সেদিন, নিলয় খেতে খেতে আমাকে বলে, মা,

তুমি কি করে বাবার সঙ্গে সংসার করছো? জানো, বাবা এখনো আমাকে একদিনও জিজ্ঞেস করেনি, আমি কোথায় কোচিং নিতে যাচ্ছি। বাবার মধ্যে তুমি এমন কি দেখেছিলে।

নীলাময় : নিলয় তোমাকে এসব কথা বলেছে, তবে আর চিন্তা নেই, ছেলে ম্যাচুউর হয়েছে। তা তুমি কি বলেছ?

নীলিমা : বলেছি, বুঝতে পারিনি, মানুষটাকে চিনতে ভুল করেছি।

নীলাময় : (মৃদু হেসে) তোমাকে বলিনি, সেদিন পিসিমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম পিসিমাকে দেখতে, কথায় কথায় পিসেমশায় আমাকে বলে, নীলাময় তোর পিসিমাকে আজো বুঝতে পারিনি। চিন্তা করো বাহান্ন বছর এক সঙ্গে ঘর করার পর পিসেমশাই বলছে, এখনো পিসিমাকে চিনতে পারে নি, হাঃ হাঃ **(কলিং বেল বেজে ওঠে)**

নীলিমা : এই শোন, আমি কিন্তু একটু বের হব।

নীলাময় : যাচ্ছি তো। নীলা , নীলা, নীলা মা।

নীলিমা : আচ্ছা, তুমি কি, রবিবার সকালে নীলা বাড়িতে থাকে, ওর নাচের ক্লাস আছে না। তা নীলাকে কেন?

নীলাময় : না, মেয়েটা পাশে থাকলে-

নীলিমা : একটু সাপোর্ট পাই, মেয়েটাকে তো তোমার মত বানিয়েছ, সারাদিন নাচ গান প্রোগ্রাম, যত সব।

নীলাময় : নীলা খুব ভাল মেয়ে।

নীলিমা : সে তো হবেই, তোমার মত হয়েছে না। নিলয় সেদিন বলেছে নীলাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাবা মাথায় তুলেছে, দেখবে একদিন কেলেংকারী করবে। ওর সব ছেলে বন্ধু।

নীলাময় : কিচ্ছু হবে না, নীলা বুদ্ধিমতী মেয়ে, আর ছেলে বন্ধু থাকলেই কেলেংকারী হবে একথা তোমাকে কে বলেছে, আসলে নীলয় হয়েছে ঠিক তোমার মত। খুঁত খুঁতে স্বভাবের।

নীলিমা : ভাল হয়েছে, তোমার মত যে হয়নি এতে আমি খুশি হয়েছি। এখন ভাবি, কি দেখেছিলাম তোমার মধ্যে।

নীলাময় : এভাবে বল না, তোমাকে কিন্তু আমি কোন দিন অসম্মান করিনি। তুমি এতো বদলে গেছ, তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়, তোমাকে আমি ভালবাসি নীলিমা।

নীলিমা : শুধু ভালবাসো দিয়ে পেট চলে না মশাই, অর্থ, অর্থই সব। মৌসুমীকে দেখলে হিংসা হয়, বিকাশদা ওকে কত সুখে রেখেছে। ইদানিং শহরের উপরে ফ্ল্যাট

কিনেছে। অথচ বিকাশটা তোমার মত কেরানীর চাকরিই করে।

নীলাময়: অর্থই সব একথা আমি মানছি না। শোন, তোমার ঐ বিকাশদা আমার মত কেরানীর চাকরী করে শহরের উপরে ফ্ল্যাট কিনেছে, হয় বাপের পয়সায় নয় গাঁজার ব্যবসা। মনটাকে হাল্কা কর, বাদ দাও এসব কথা, বিকালে চলো উদয়নের নাটকটা দেখে আসি।

নীলিমা : নাটক, তোমার সঙ্গে , আচ্ছা তোমার লজ্জা হয় না বলতে, শোন, যেদিন মানুষের সমান হয়ে যেতে পারব সেদিন যাবো।

নীলাময় : তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মানুষের সমান হয়ে মানে?

নীলিমা : তুমি আর কোনদিন বুঝতে পারবে না। তোমার বন্ধুর স্ত্রীরা কিভাবে বেড়ায় দেখ না, কি আছে আমার। এই শোন তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমকে তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে বলবে না। তোমার কোন লজ্জা নেই, সেদিন অনুপদার মেয়ের বিয়েতে সবাই কি সেজেগুজে এসেছে, কি সব গয়নাগাটি, আর আমি!

নীলাময় : আরে এসব সিটি গোল্ড, এখন কেউ সোনা পড়ে না।

নীলিমা : (রেগে) তোমাকে বলেছে, কি বোঝ তুমি। তারপর বেহায়ার মত শুভদা যখন তার গাড়ীর দরজা খুলে ডাকল , অমনি তুমি আমাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লে। ছি ছি লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

নীলাময় : কেন , তোমার মাথা কাটা যাচ্ছিল কেন?

নীলিমা : আমার বাবা কত বলেছে, চাকরীটার পাশাপাশি বাবার ব্যবসাটা দেখতে, না উনার এসব ভাল লাগে না, আসলে ব্যবসা দেখলে এসব নাটক ফাটক করতে পারবেনাতো, আজকে এরকম একটা গাড়ী আমাদেরও থাকতো। ছেলেটাও চাকরীর জন্য ঘুরতে হতো না। হু, এখন তিনি দুই টাকার কর্মচারী।

নীলাময় : আরে একটু চুপ কর না।

নীলিমা : কোথায় , কোথায় এখন তোমার সেইসব বন্ধুরা, যাদের জন্য আমার দিনে পাঁচবার চা করতে হতো। এখন কেউ আসে না। সবাই দাঁড়িয়ে গেছে, একমাত্র তুমি ছাড়া। হিমাংশুদা তো পার্টির জোরে ছেলের চাকরীও বাগিয়ে নিয়েছে। কাগজ কলম নিয়ে বসে না থেকে পার্টি করলেও লাভ হতো।

নীলাময় : (এবার রেগে বলে) এই হিমাংশুর নাম বলবে না তো, শালা একটা ধুরন্দর, গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায়। (নীলাময় ব্যাগ আর টাকা নিয়ে উঠে পড়ে) এই শোন শুকতারা সংঘ থেকে দুইটি ছেলে আসবে, একটা লেখা নিতে, টি টেবিলের উপর লেখাটা আছে দিয়ে দেবে।

নীলিমা : টাকা দেবে না?

নীলাময় : কিসের টাকা?

নীলিমা : এই যে তুমি সারা রাত জেগে বসে লেখলে, পারিশ্রমিক দেবে না?

নীলাময় : ছি, এর জন্য পারিশ্রমিক, মাথাটা একেবারে গেছে। এই আমি যাচ্ছি। (টি টেবিল থেকে মোবাইল তুলে নিয়ে নীলাময় বাজারের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যায়, নীলিমা সে দিকে তাকিয়ে থাকে মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে নিভে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চে আলো ফুটতে দেখা যায় নীলাময় বাবুর ড্রয়িংরুম, সময় সকালবেলা। নীলাময়বাবুর মেয়ে নীলা কানে মোবাইল ফোন লাগিয়ে ভিতরের ঘর থেকে প্রবেশ করে এবং কথা বলতে বলতে পায়চারী করে।

নীলা : তনুশ্রী শোন, আমার কথাটা শোন। না না বলছি তো , মৃন্ময় বজ্রসেন করলে আমি ওতে নেই। কেন রঞ্জন কে নিতে বল। আমি বলছি রঞ্জন মৃন্ময় থেকে অনেক ভাল করবে। শোন আমার কথা, রাগ করিস না, তোকে বলছি, যদি মৃন্ময় বজ্রসেন করে, তবে আমি শ্যামা করব না। বললেও না। আমিই না হয় স্যার কে বলব। ঠিক আছে রাখি। (এমন সময় নীলাময়বাবু প্রবেশ করে, নীলাময় নীলার শেষ কথা গুলি শুনে নীলা মোবাইলের সুইস অফ করে নিজে নিজে বলে) সবখানে রাজনীতি, মৃন্ময় বড়লোকের ছেলে, ভাল ডোনেশন দেয় তাই সে করবে। রাবিস। (নীলা প্রচন্ড রেগে যায় নীলাময়বাবু তা দেখে বলে।)

নীলাময় : কিরে কি হয়েছে, এত রেগে যাচ্ছিস কেন?

নীলা : দেখ না বাবা, আমাদের নাচের স্কুল থেকে পূজার পরে শারদ সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্যটা করবে, স্যার সিলেকশন করেছে, আমি শ্যামা করব, আর মৃন্ময় নামে একটা ছেলে বজ্রসেন করবে।

নীলাময় : বেশ তো, তাতে অসুবিধা কি?

নীলা : বাবা মৃন্ময় রক ড্যান্সার ও হিন্দি গানের সঙ্গে নাচে, ওর দ্বারা বজ্রসেন হবে না।

নীলাময় : তোদের স্যার যেখানে সিলেকশন করেছে সেখানে তুই,

নীলা : বাবা তুমি বুঝবে না এটা রাজনীতি।

নীলাময় : (বিস্ময়ে) কি বললি রাজনীতি, তুই রাজনীতির কি বুঝিস মা।

নীলা : বাবা, আমি কলেজে পড়ি, আমার সাবজেক্ট পলিটিকেল সায়েন্স।

নীলাময় : ওকে, এই যে তুই শ্যামা করবি, এই বিষয়ে তোর কনফিডেন্স কতটুকু,

শ্যামা কে ছিলেন জানিস?

নীলা : এটা তো জাতকের গল্প থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন।

নীলাময় : সে ঠিক আছে, কিন্তু জাতকের শ্যামা আর রবীন্দ্রনাথের শ্যামা সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা ছিলেন শিল্পী, রূপে গুণে অনন্যা, তার মা ও ছিল খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা। শিল্পী হিসাবে তার খ্যাতি ছিল এ সময়ের লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, বিরজু মহারাজ এদের সমপর্যায়ের। তাই শ্যামা করতে গেলে তোমাকে ভাবতে হবে। (এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে নীলিমা দেবীর গলা শোনা যায়)

নীলিমা : নীলা, এই নীলা, নীলা।

নীলা : আসছি মা। কিন্তু বাবা, স্যার বলেছে আমি পারব।

নীলাময় : স্যার নিশ্চয় তোমার মধ্যে ট্যালেন্ট দেখেছে। তবু আমি বলছি শ্যামা করতে গেলে তোমাকে ভাবতে হবে, মনে রাখবে শ্যামা রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ সৃষ্টি, সামান্য ছন্দপতন হলে মনে হবে, দেবী প্রতিমা অসম্মানিত হল।

নীলা : তা হলে শ্যামা করতে তুমি আমাকে না করছো।

নীলাময় : না রে তা বলছি না। বলছি তোদের তো স্টেজ হতে আরো অনেক দেরী। তুই এই ব্যাপারে একটু পড়াশুনা করে নিবি, আমার কাছে বই আছে, পড়ে নিবি। (এমন সময় তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে নীলিমা প্রবেশ করে)

নীলিমা : এই মেয়ে তোকে যে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

নীলা : যাই মা।

নীলিমা : কয়টা বাজে খেয়াল আছে। একজন তো না খেয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আরেক জনের অফিসের তাড়া, একজনের কলেজ।

নীলা : আমাকে কি করতে হবে সেটা বল।

নীলিমা : কি করতে হবে মানে, এখনো দুইটা বিছানা পড়ে আছে, আমি এক হাতে
: কতো করব, রান্না ঘরে সব্জি কেটে দিলেও তো আমার একটা হেল্প হয়।

নীলা : তুমি তো আমাকে সে কথা বলবে।

নীলিমা : ও তোমাকে বলে দিতে হবে, একেবারে বাপের ক্যারেক্টার, একজনের দিন তো শেষ, এবার তোমার মাথাটাও খাবে। (দেখা যায় নীলাময়বাবু সোফাতে বসে বই এর পাতা উল্টায়)

নীলা : আঃ চুপ কর না।

নীলিমা : চুর করব কেন, এখানে কি সিরিয়াস আলাপ আলোচনা চলছিল শুনি? কি জ্ঞান দেওয়া হচ্ছিল মেয়েকে।

নীলাময় : সে তুমি বুঝবে না।

নীলিমা : আমি বুঝতে চাই ও না, বেশী বুঝেই তো আজকে একজনের এই অবস্থা।

নীলা : মা, তুমি এসব কি বলছো?

নীলিমা : এই মেয়ে একদম চুপ, বাপের সাপোর্টার, সম্মান দিয়ে পেট ভরে না। একটা পুরুষ মানুষ এতটা উদাসীন হলে চলে না পুরুষ মানুষ হতে হবে ইস্পাতের মত।

নীলা : মা সব পুরুষ মানুষ সমান হয় না, তোমার কথায় পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষগুলি ইস্পাত হয়ে যেত, তবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হতো না।

নীলিমা : দেখো না, মেয়ের মুখ দিয়ে যেন খই ফুটছে, সব ঐ বাপের প্রশ্রয়। এই যে সাহিত্যিক মশায়, সিমেন্টের দোকান থেকে শ্লিপ পাঠিয়েছে টাকার জন্য, শুনতে পাচ্ছেন?

নীলাময় : অফিস থেকে ফেরার পথে দেখা করে আসব।

নীলিমা : এই মেয়ে তোর কম্পিউটার ক্লাসের বেতনটা নিয়ে যাবি।

নীলা : লাগবে না।

নীলিমা : লাগবে না মানে, জিদ।

নীলা : দিয়ে দিয়েছি তো।

নীলিমা : কোথা থেকে?

নীলা : আমার টিউশানির টাকা থেকে।

নীলিমা : গানের স্কুলের বেতন?

নীলা : লাগবে না, আমি একটা গানের টিউশনি নিয়েছি, সামনের মাসে এক সঙ্গে দিয়ে দেব।

নীলিমা : বাঃ বাঃ মেয়ে স্বাবলম্বী।

নীলা : মা সেদিন আমার এক বন্ধু ফোন করেছিল আমি বাথরুমে ছিলাম, তুমি ফোনটা রিসিভ করে এমনভাবে কথা বললে, জানো বন্ধুটি কি বলেছে?

নীলিমা : জানি তো, বলেছে তোর মা একটা পাগল।

নীলা : এতটা বলেনি , বলেছে, রগ চটা, বদরাগি। আচ্ছা মা তুমি একটু মিষ্টি করে
: কথা বলতে পার না।

নীলিমা : না পারি না, আর পারবোও না। কারণ সংসারের হালটা আমার কাঁধে, গায়ে বাতাসটা আমার লাগে।

নীলা : সত্যি বলতে কি, তুমি আসলে একটা কমপ্লেক্সে ভোগ, আমরা তো ভাল আছি মা, মানুষ আমাদের থেকেও কত কষ্টে থাকে। তুমি এতকিছু ভাবতে যাও কেন, বাবা তো একটা সরকারী চাকরী করে। হোক না সে ছোট চাকরী, এটাও কম কিসে। তুমি বাবার সঙ্গে যা কর না , আমার খুব কষ্ট হয়।

নীলিমা : নীলা যাবি এখান থেকে, বাপের জন্য একেবারে মেয়ের প্রাণ যায়, বাপ সোহাগী। এই রে, ডালের জলটা বোধহয় শুকিয়ে গেল। (নীলিমা ছুটে ভিতরে চলে যায়।)

নীলাময় : (সোফা থেকে উঠে মেয়ের মাথায় হাত রেখে) তোর মার কথায় কিছু মনে করিস না, আসলে তো সত্যি, তোর মা ই তো সংসারটা চালায়। আমি তো বেতনের টাকাটা দিয়েই খালাস।

নীলা : আমি মানছি বাবা, কিন্তু মার সব কিছুতেই একটা বাড়াবাড়ি, অথচ দেখ, দাদার বেলায় মা কিন্তু এমনটি না, দাদাকে মা কিচ্ছুটি বলে না। আমার সব থেকে খারাপ লাগে মা যখন লেখালেখি নিয়ে বিদ্রুপ করে।

নীলাময় : তোর মা এমন ছিল না রে? কলেজে পড়ার সময় সবচেয়ে সুন্দরী ছিল, খুব সাজগোজ করতে ভালোবাসত, আর আজ দেখ , কষ্ট তো হবেই রে মা। লক্ষ্মী মেয়ে, মার উপর রাগ করিস না, আমি তো তোকে খুব ভালবাসি, আমার মিষ্টি মেয়ে।

নীলা : (বাবাকে জড়িয়ে ধরে) তুমিও আমার মিষ্টি বাবা। (মঞ্চে আলো নিভে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

সকালবেলা নীলাময়বাবু তার ড্রয়িংরুমে বসে লেখালেখি করছেন, এমন সময় তার ছেলে নিলয় প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ নীলাময়বাবুর দিকে তাকিয়ে তারপর মুখে একটা হু শব্দ করে বাবাকে ডাকে।

নিলয় : বাবা।

নীলাময় : (চোখ তুলে তাকিয়ে) বলো।

নিলয় : একটা প্রাইভেট ফার্মে আমার সি ভি টা জমা দিয়েছিলাম ওরা আমাকে কল করেছে। যদি কাজটা করি তবে আজকে আমাকে জয়েন করতে হবে।

নীলাময় : কিসের কাজ?

নিলয় : একটা মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানী।

নীলাময় : কোথায়?

নিলয় : আগরতলাতেই, তবে মাঝে মাঝে আগরতলার বাইরে যেতে হতে পারে।

নীলাময় : সেলারী কত দেবে?

নিলয় : বেশী না, বাইকের তেল খরচ বাদ দিয়ে হাজার সাতেক থাকবে।

নীলাময় : খারাপ কি লেগে পর, তবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট এর পরীক্ষাগুলোতেও এনেন্ড করো।

নিলয় : সরকারী চাকরী, এসব মামা কাকার জোর লাগে, তুমি তো আর হিমাংশু আঙ্কেল না,

নীলাময় : (তির্যক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিলয়ের দিকে তাকিয়ে) মাকে বলেছ?

নিলয় : হ্যা, মা বলেছে জয়েন করতে।

নীলাময় : ঠিক আছে যাও, অনেষ্টি নিয়ে কাজ করবে।

(নিলয় নীলাময়কে প্রণাম করে বেড়িয়ে যায়, নীলাময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে, শেষে আবার লেখায় মনোযোগ দেয়, এমন সময় নীলা মঞ্চে প্রবেশ করে নীলাময়ের পাশটিতে বসে পরে, নীলাময় কি লিখছে সেটা লক্ষ্য করে, নীলাময় চোখ তুলে নীলাকে বলে)

নীলাময় : কি দেখছিস রে মা।

নীলা : বাবা, তোমার হাতের লেখা কি সুন্দর, একেবারে ঝক্‌ঝকে । তোমার কেরানী না হয়ে মাষ্টার না প্রফেসার হওয়া উচিত ছিল।

নীলাময় : হতাম তো।

নিশ্চয় হতাম, যদি তোমাদের মত মা বাবা পেতাম, আমাদের বাবা মেয়েরা তো একবার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েই দায়িত্ব শেষ। তবে ওদের কোন দোষ ছিল না। তখন এখনকার মত মানুষের জীবনটা এত জটিল ছিল না, ছিল না কমপিটিশন। সহজ সরল ছিল মানুষের জীবনযাত্রা , তখন মানুষের প্রতি মানুষের একটা হৃদ্যতা ছিল, যা হয়েছি তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই।

নীলা : কি লিখছ?

নীলাময় : এই তো এবার পূজার সংখ্যায় যে গল্পটা লিখেছিলাম তার একটা নাট্যরূপ দিতে চেষ্টা করছি।

নীলা : দারুণ হবে। বিষয়টা খুব ভাল। আমি গল্পটা পড়েছি।

নীলাময় : নীলা যাও, তোমার মাকে একটু সাহায্য কর গিয়ে, নয়তো এক্ষুনি এসে চেঁচামেচি করবে, যাও মা।

নীলা : মার কারো কাজ পছন্দ হয় না। আমি বলেছি সব্জিগুলি কেটে দেই, না , হবে না, তুই পারবি না, যা এখান থেকে । ব্যাস, চলে এলাম।

নীলাময়: এক্ষুনি দেখবি আবার ডাকবে। (এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠে) দেখ তো কে এলো? (নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, দেখা যায় এলাকার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকমতিবাবু প্রবেশ করে) আসুন, আসুন মতি দা, বসুন। (মতিবাবু একবার ঘরটা দেখে নীলাময়ের পাশে সোফাতে বসে পরে) যা তো মা তোর জ্যাঠুর জন্য এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়। (নীলা চলে যায়)

মতিবাবু : (বিনীতভাবে) না, নীলাময় চা খাব না, এই মাত্র আসার পথে রতনের দোকান থেকে খেয়ে এসেছি। নীলাময় একটা ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে এসেছি ভাই।

নীলাময় : কি যে বলেন মতিদা, আপনাকে আমি পরামর্শ দেব, সারা জীবন আপনি মানুষকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন।

মতিবাবু : সেদিন এখন আর নাই রে ভাই, এখন নিজেই কেমন আটকে গেছি। সব চিন্তা ভাবনা যুক্তি মাথা থেকে উড়ে গেছে। তুমি একজন সমাজের বুদ্ধিজীবী, যাকে বলে ইন্টেলেকচুয়েল, তোমার থেকে নিশ্চয় একটা সুপরামর্শ পাব।

নীলাময় : ব্যাপারটা কি মতিদা?

মতিবাবু : নীলাময় তোমরা তো দেখেছ, তোমার বৌদি মারা যাবার পর, আমি দুটি ছেলেমেয়েকে কিভাবে মানুষ করেছি, তখন আমার বয়সও কম ছিল, চাকুরী করতাম। ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করে সংসার করতে পারতাম। অনেকে আমাকে বলেছেও। কিন্তু ঐ ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমি তা করিনি, এখন মনে হয় ভুল করেছি । (মতিবাবুর গলায় ব্যথার সুর)।

নীলাময় : একথা বলছেন কেন দাদা, আপনি তো ছেলেমেয়ে দুজনকেই উচ্চশিক্ষিত করেছেন। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকে চাকরী করে, মেয়েকেও উচ্চ শিক্ষিত করে সুপাত্রে বিয়ে দিয়েছেন আপনি তো একজন সাকসেস্‌ফুল পিতা।

মতিবাবু : (বিদ্রুপের হাসি হেসে) সাকসেস্‌ফুল, হু শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু সবার কাছে সব কথা বলতে পারি না ভাই, আর বলাটাও ঠিক নয়। তুমি লেখালেখির মানুষ, তোমার অনুভূতি অন্যদের তুলনায় ভিন্ন, তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারবে।

নীলাময় : কি হয়েছে মতিদা, একটু খুলে বলবেন।

মতিবাবু : নীলাময়, আমার ছেলে, ছেলের বৌ এখন আর আমাকে চাইছে না। এদের কাছে আমি বোঝা হয়ে গেছি, ওদের কথাবার্তা ব্যবহার আমাকে- আমাকে আঘাত করে। জানো, ওরা অফিস টাইমে দুজনে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়, যাবার সময় আমাকে বলেও যায় না। আমি খেলাম না খেলাম সে কথাটাও জিজ্ঞেস করে না। কাজের মেয়েটি ভাত ক'টা বেড়ে আমার ঘরে একটা টেবিলের উপর রেখে যায়। সারাদিন একা একা বাড়ীতে থাকি।

নীলাময় : আপনার নাতি, সে?

মতিবাবু : ওকে ওরা সঙ্গে করে নিয়ে যায়, বৌমার বাপের বাড়ীতে রেখে ওরা অফিসে চলে যায়। আবার ফেরার পথে নিয়ে আসে, অবশ্য এসব ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই।

নীলাময় : তাহলে অভিযোগটা কোথায় মতিদা? (নীলাময় উঠে দাঁড়ায়)

মতিবাবু : (মতিবাবুও দাঁড়িয়ে) ওরা আমাকে চাপ সৃষ্টি করছে বাড়ীটা বিক্রি করে দেবার জন্য, এখন শহরে বিভিন্ন এলাকায় ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, ওদের ইচ্ছা, এই বাড়ীটা বিক্রি করে শহরে ফ্ল্যাটে চলে যাবে। অজুহাত, ছেলের পড়াশুনা।

নীলাময় : বেশ তো, ওরা তো আপনাকে ফেলে যাবার কথা বলছে না, যাবেন ওদের

সঙ্গে।

মতিবাবু : বলছো কি নীলাময়, ওদের সঙ্গে যাবো, তোমাকে বলি জান, ওরা আমাকে ঐ ফ্ল্যাট বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাকে বন্দী করে রাখবে, সেখানে গেলে আমি বাঁচব না নীলাময়। আমি ওদের সঙ্গে যাব না, আর ওরাও আমাকে ওদের সঙ্গে নেবে না। আমি ঠিক জানি।

নীলাময় : এর মানে কি মতি দা?

মতিবাবু: মানে বুঝতে পারছ না, তুমি এত এত নাটক লিখেছ, গল্প লিখেছ, মানুষের জীবনে সব থেকে অভিশপ্ত সময় হলো তার বার্ধক্য, তার উপর আমি বিপত্নীক। এ সময় চারুর কথা খুব মনে পড়ে। ভীষণ মিস্ করছি তাকে। (মতিবাবু হু হু করে কেঁদে উঠে)।

নীলাময় : মতিদা

মতিবাবু: (হাতের কব্জি দিয়ে চোখ মুছে) জানো নীলাময়, ওদের দেখাদেখি কাজের মেয়েটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

নীলাময় : বলছেন কি?

মতিবাবু : তাহলে তোমাকে একটা ঘটনা বলি, প্রত্যেকদিন সকালে চা খেয়ে পত্রিকাটা দেখা আমার অভ্যেস , সেদিন দাদুভাই আমার চশমার বাক্সটা হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পত্রিকাটা হাতে নিয়ে ওদের ড্রয়িংরুম থেকে চশমাটা আনতে গিয়েছিলাম।

(মঞ্চে ফ্লেসব্যাক। আলো জ্বলতে দেখা যায় মঞ্চের এক কোণে একটি সাজানো ড্রয়িং রুম। দামী সব আসবাবপত্র, একজন গৃহপরিচারিকা বালতিতে জল নিয়ে রুম পরিস্কার করছে, মতিবাবু তার গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে গেঞ্জি গায়ে একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতে যাবে এমন সময় কাজের মেয়ে লক্ষ্মী চিৎকার করে উঠে-)

লক্ষ্মী : এই, এই দাদু, ডুকবানা, ডুকবানা, কইতাছি, অক্ষনমাত্র মুচছি।

মতিবাবু : (দাঁড়িয়ে পরে) আমার চশমাটা দিয়ে দে, তা হলেই আমাকে ঢুকতে হবে না।

লক্ষ্মী : তোমার চশমা এই ঘর কেমনে আইছে?

মতিবাবু : কালকে দাদুভাই নিয়ে আসছিল?

লক্ষ্মী : কিতা কইলা তোমার দাদুভাই, মানে অর্ক, মিছা কথা কইও না দাদু, মামী অর্করে তোমার ঘর ডুকত দিছে, যিহান আমি তোমার ঘর পরিস্কার করলে সাবান দিয়া হাত ধুয়ন লাগে। আর অর্ক যাইব তোমার ঘরে, ইডা একটা কথা কইলা।

মতিবাবু : শোন, অর্ক আমার ঘরে যায়নি, আমি কালকে বারান্দাতে চশমাটা ফেলে

গিয়েছিলাম, চশমার বাক্সটা সুন্দর দেখে অর্ক হয়তো হাতে নিয়েছিল।

লস্মী : ও, হাতে লইছিল, তা এই ঘর আনছে ইডা তুমি কেমনে দেখছ?

মতিবাবু : আরে বাক্সটা নিয়ে দাদুভাই এই ড্রয়িংরুমেই ঢুকেছিল, আমি দেখেছি।

লস্মী : নাই, নাই এই ঘরে কোন বাক্স টাক্স নাই। আর থাকলে পরে আইয়, ঘর শুকাক, অহন পাইতানা, যাও, আমার কাম আছে।

মতিবাবু : ঐ যে সোফার উপর বাক্সটা দেখা যায়, তুই দিয়ে দে আমি চলে যাই।

লস্মী : কইলাম না ঘরটা শুকাক পরে দেমু। আজাইরা বিরক্ত করে, পরে দেমু অহন যাও।

মতিবাবু : দূর নিকোচি করছি তোর পরে।

(মতিবাবু ড্রয়িংরুমে ঢুকে সোফার উপর থেকে চশমার বাক্সটা নিয়ে চলে যায়। লস্মী চিৎকার করতে থাকে।)

লস্মী : ওমা, বুড়ার কি জিদ, হু- হু- অক্ষণ মাত্র মুচছি, বুড়া এর লাইগ্যাই মামী তোমারে ঐ কোনার ঘরটায় জায়গা কইর‍্যা দিছে। বুড়া অইছে তব জিদ কমছে না। ঈশ্, আবার আমার মুছন লাগব। বুড়া অইছেনা ঘুড়া অইছে। হু-হু-হু-হু।

(এমন সময় মতিবাবুর ছেলের বৌ অর্পিতা এসে দরজায় দাঁড়ায়)

অর্পিতা : কি হলো রে লস্মী, চিৎকার করছিস কেন?

লস্মী : দেখ না মামী, দাদুরে বার বার না করছি, ঘরটা অক্ষন মুছচি তুমি তুমি

: ডুইক্যনা। দাদু জিদ কইর‍্যা বড় বড় পাড়া দিয়া ঘরে ডুকছে, হু-হু- অহন আবার আমার মুচন লাগবনি। ভাল লাগেনা। এই বুড়ার যন্ত্রনায় তোমরা বাড়ীর কাম আমার ছাড়তে অইব।

অর্পিতা : তা, উনি এ ঘরে ঢুকতে এলেন কেন?

লস্মী : অর্ক বইলে তাইনের চশমার বাক্স লইয়া আইছে।

অর্পিতা : কি, উনার চশমার বাক্স অর্ক নিয়ে আসছে এই ঘরে, বললেই হল।

লস্মী : হ , মামী, ইডা নিতই তাইনে ঘর ডুকছে, আমি বার বার কইছি, ঘরটা শুকাক, আমি তোমারে দেমু, না তাইনের অক্ষন লাগব। আর এর লেইগ্যা দেখ না, বড় বড় পাড়া দিয়া জিদ কইর‍্যা সোফার থেইক্যা চশমার বাক্সটা লইয়্যা গেছে, ঐ দেখ মামী পাড়ার দাগডি রইয়্যা গেছে। বুড়া বেডার অহন যেই জিদ।

অর্পিতা : অর্ক আসুক আজকে স্কুল থেকে, অনেকদিন হল মার খায় না। কেন সে ও সব জিনিষ ধরতে গেল, দিন দিন অসভ্য হচ্ছে। লস্মী যা স্কুলের গাড়ী আসার সময় হয়ে গেছে। শোন গাড়ী থেকে তুই ওকে হাত ধরে নামাবি, ঐ

বাসের ছেলেটা কেমন দৈত্যের মত আঁকড়ে ধরে, ওর কোন দয়ামায়া নেই। পাড়লে যেন বাস থেকে বাচ্চাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অর্ক সেদিন হাতে ব্যথা পেয়েছিল। তুই গাড়ী থামলে গাড়ীতে উঠে আস্তে করে নামিয়ে আনবি কেমন।

লস্মী : আচ্ছা মামী।

(এমন সময় মতিবাবুর ছেলে মনোজিৎ শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে প্রবেশ করে)

মনোজিৎ: অর্পিতা, ড্রাইভার দিলীপ ফোন করেছে, আজ ও আসতে পারবে না, ওর মা অসুস্থ।

অর্পিতা : তাহলে কি হবে? ছেলেটা কি, এবার আমি তার বেতন কাটব। এরজন্যই বলি, বেশী প্রশ্রয় দিতে নেই।

মনোজিৎ: আমিই ড্রাইভ করবো, আগে তোমাকে তোমার ব্রাঞ্চে নামিয়ে দিয়ে পরে আমি যাব।

অর্পিতা : ঠিক অছে। কি হলো তুই দাঁড়িয়ে অছিস কেন? যা স্কুলের গাড়ী চলে আসবে। সব ঝামেলা এক সঙ্গে মানুষটা ভীষণ জ্বালাচ্ছে।

মনোজিৎ : কি হলো, রেগে আছো মনে হচ্ছে? (লস্মীর দিকে তাকিয়ে) এই লস্মী , কি করেছিস?

লস্মী : আমি না, আপনের বাবা করছে।

অর্পিতা : (ধমক দিয়ে) এই তুই গেলি। (লস্মী চলে যায়)

মনোজিৎ: আরে হলো টা কি বলবে তো?

অর্পিতা : না না এই মানুষটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না, আমার বাবাও একজন রিটেয়ার পার্সন, কই, এত যন্ত্রণা করে নাতো?

মনোজিৎ : বলবে তো কি?

অর্পিতা : লস্মী ড্রয়িংরুমটা পরিস্কার করছিল। তোমার বাবার চশমা নাকি অর্ক ড্রয়িংরুমে এনে রেখেছে, উনি তাই নোংরা পা নিয়ে সেউ মোছা ঘরটা মাড়িয়ে চশমাটা নিয়ে গেল। লস্মী নিষেধ করা সত্বেও শুনলেন না। শোন তোমাকে বলছি উনাকে নিয়ে আমি আর পারছি না, একটা ব্যবস্থা কর।

মনোজিৎ: আর কি ব্যবস্থা করবো বল? বাবা বাথরুমে গেলে তোমার ঘেন্না করে, বাবার জন্য কলতলায় আলাদা বাথরুম করে দিয়েছি, বাবার জন্য আলাদা টয়লেট করে দিয়েছি, খাবার টেবিলে আসতে বাবাকে নিষেধ করেছি, এমন কি ড্রয়িংরুমেও তুমি বাবাকে এলাও করছ না। আর কি করব?

অর্পিতা : তা নয়, বাড়ী বিক্রীর ব্যাপারটা কি হলো?

মনোজিৎ: শোন, বাড়ীটা বাবার নামে, বাবা রেজিস্ট্রী করে না দিলে আমার সাধ্য নেই

বাড়ী বিক্রী করার। তোমাকে বলছি, বাবার সঙ্গে কিছুদিন ভাল ব্যবহার কর, বাবাকে বায়াস্ট করতে না পারলে বাড়ী বিক্রী হবে না। ফ্ল্যাটবুকিং এর টাকা জমা করে দেব। এখানে থাকলে আমার ছেলেটাও অমানুষ হবে, ডিজগাস্টিং।

অর্পিতা : মানে, আমি বলছিলাম কি ....

মনোজিৎ: বাবা সব শুনতে পাচ্ছে, আস্তে কথা বল। মনে রেখো উনি একজন শিক্ষক ছিলেন। এই বাড়ী ঘর উনার, উনি ভাল পেনশন পান।

অর্পিতা : শোন, সকালবেলা আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনা, তোমার পিতৃ সম্পত্তি নিয়ে তুমি থাক, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাব।

মনোজিৎ : অর্পিতা বুঝতে চেষ্টা কর , তুমি এতবড় বাড়ীটাতে বাবাকে নিয়ে থাকতে পারছ না, ফ্ল্যাটে কি করে থাকবে?

অর্পিতা : কি, উনাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা তুমি ভাবলে কি করে? আশ্চর্য্য,

মনোজিৎ: তাহলে তো বাড়ী বিক্রীর প্রশ্নই উঠে না, বাবা এই বাড়ীতেই থাকবে।

অর্পিতা : সত্যি, তুমি বাইরে পড়াশুনা করেছো ঠিক, কিন্তু তোমার ন্যাচারটা না, কি বলব। শোন, এখন শহরে ভাল ভাল বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে, একটা বৃদ্ধাশ্রমের সঙ্গে কথা বল।

মনোজিৎ: বাবা বৃদ্ধাশ্রমে যেতে চাইবেন?

অর্পিতা : কেন চাইবেন না? ওখানে তো সবকিছুর সুবিধা আছে।

মনোজিৎ: থাক্ এসব কথা, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

অর্পিতা : আমি কিন্তু ব্যাংক লোনের জন্য আজকেই আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব।

মনোজিৎ: ঠিক আছে। এখন চলো। আজকে একটু আগে বেরোতে হবে। রাস্তায় জ্যাম হবে।

(ওরা চলে যেতে উদ্যত হয়, এমন সময় মঞ্চের আলো নিভে যায়। পুনরায় নীলাময়বাবুর ড্রয়িংরুমের দৃশ্য ফুটে উঠে। মতিবাবু দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠে। সমস্ত পরিবেশটা কেমন থমথমে। নীলাময় বিস্ময়ে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে তাকে, সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না)।

মতিবাবু : নীলাময়, এই বাড়ীটা চারুলতার নিজের হাতে তৈরী, এর মধ্যে তার স্মৃতি বিজড়িত। আমি বাড়ীটার নাম রেখেছি চারুভিলা। এই বাড়ীটার মধ্যে আমি চারুর স্পর্শ অনুভব করি, ওর হাতের লাগানো নারকেল, সুপারি গাছগুলিতে এখন ফল ধরছে-আমার ছেলে এই বাড়ীটা বিক্রী করে দিতে চাইছে। আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে, কেন, কেন, নীলাময়? এসব কি হচ্ছে, এর জন্য মা বাবা সন্তান লালন পালন করে, এর জন্যে।

(মতিবাবু আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, নীলাময় সান্ত্বনা দেয়)

নীলাময়: কাঁদবেন না দাদা, কি করবেন, এর জন্য যে আমরাই দায়ী, মা বাবা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে যেভাবে ছেলে মেয়েদের গড়তে চাইছে ওরা তাই হচ্ছে। ওরা এখন আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ছাড়া অন্য কিছু ভাববার সময় ওদের নেই। মতিদা ওদের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিন। কি করবেন।

মতিবাবু : কি বলছো নীলাময়, ওদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেব। যাদের কোন মানবতা নেই, শ্রদ্ধাভক্তি নেই, সংস্কৃতি বোধ নেই। জান মাঝে মাঝে সারারাত শ্বাসকষ্টে ছটফট করি, ওরা একটু খোঁজ পর্যন্ত নেয় না। এমন কি ঔষধটা পর্যন্ত দোকান থেকে আমাকে কিনে আনতে হয়। এর থেকেও মর্মান্তিক কি জানো, আমার নাতিটাকে আমার কাছে আসতে দেয় না। ওকে ওরা শিখিয়েছে, আমি একটা নোংরা মানুষ, আমার কাছে এলে , আমার ঘরে গেলে সে অসুস্থ হবে। এভাবে বাঁচা যায় নীলাময়? তুমি বলো? সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি রবীন্দ্রসংগীত শুনতাম, তাও বন্ধ করে দিয়েছে, ওদের নাকি ডিসস্টার্ব হয়। আমার রবীন্দ্রনাথ, নীলাময় বড় কষ্ট হয়। (মতিবাবু গায়ের পাঞ্জাবী দিয়ে চোখ মুছে)

নীলাময় : বলেন কি, এত কিছু জানতাম না। স্যরি, মতিদা, এক্সট্রিমলি স্যরি।

মতিবাবু : আমি হেরে গেছি নীলাময়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করি।

নীলাময় : মতিদা! আপনি তো হেরে যাবার লোক নন। একসময় আগরতলা শহরে ক্লাব ফুটবলে আপনি ডিফেন্সের প্লেয়ার ছিলেন , আঘাতের পাল্টা প্রতিরোধ গড়তে আমরা আপনাকে দেখেছি, আপনি বলছেন এ কথা?

মতিবাবু : মাঝে মাঝে আত্মঘাতী গোলও হয়ে যায় রে ভাই। নীলাময় আমি কিন্তু মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, তোমরা তো দেখেছ, একসময় তোমাদের বৌদি এই বাড়ীতে একটা গানের স্কুল চালাত। ঠিক করেছি, আমি ওদের বলব, বাড়ী ছেড়ে দিতে। ওরা বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে আমি কোন একটা প্রতিষ্ঠানের নামে উইল করে দেবো। কন্ডিশন থাকবে আমার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওরা আমাকে দেখাশুনা করবে। আর নীলাময় যে কারণে তোমার কাছে আসা, তোমার বৌদির নামে আমি একটা মেধাবৃত্তি চালু করতে চাই। এলাকার দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে এই ফান্ড থেকে পড়াশুনা করার জন্য অনুদান দেওয়া হবে। এর জন্য কিছু টাকা আমার একাউন্ট থেকে একটা ট্রাস্টিবোর্ড করে তোমাকে তার কনভেনর করে টাকাটা জমা করতে চাই। এব্যাপারে তুমিই আমার ভরসা, না বলো না ভাই (একটু থামে) চারুকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম, ঠিক সুখের সময় ও চলে গেল। একদিকে ভালই হয়েছে, তাঁকে এসব দেখতে হয়নি, এসব দেখলেও আরো কষ্ট পেত,

ভালোই হলো। (দীর্ঘশ্বাস)

নীলাময় : মতিদা এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আর একবার একটু ভেবে দেখবার দরকার ছিল না। অন্তত মেয়ের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

মতিবাবু : মেয়ে আমাকে বলেছে ওর এখানে চলে যেতে। আমিও জানি, মেয়ের ওখানে গেলে আমার কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে চাইনা ওর ওখানে যেতে , ও ভাল আছে , ভাল থাক। আর ছেলে তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে, বাড়ী বিক্রী করে ওদের টাকা না দিলে ওরা আমার দায়িত্ব নেবে না। ওরা বলেছে বড়জোর আমাকে একটা ভাল বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করে দেবে। হোয়াট, আমি কেন বৃদ্ধাশ্রমে যাব? আমার নিজের কষ্টার্জিত টাকায় এ বাড়ীঘর, আমি সাফ জানিয়ে দেব, তোমরা এ বাড়ী ছাড়। সরকার আমাকে যে পেনশন দেয় তা দিয়ে আমি ভাল চলব। ইটস মাই ফাইনাল ডিসিশান।

নীলাময় : কিন্তু মতি দা।

মতিবাবু : কোন কিন্তু নেই, ইদানিং দিল্লী হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছে, তুমিও নিশ্চয় জান, মা বাবার বর্তমানে মা বাবার বিষয় সম্পত্তির উপর ছেলেমেয়ের আইনত কোন অধিকার নেই। যদি বাবা মা নিজে থেকে স্বইচ্ছায় তাদের দান করে, তবেই এরা সম্পত্তির মালিক হবে। একজন অবসরপ্রাপ্ত মানুষের এই সংগ্রামে তুমি আমার পাশে থাকবে ভাই, কথা দাও।

নীলাময় : (মতিবাবুর হাত ধরে) ঠিক আছে মতি দা, আমি আমার সাধ্যমত আপনার পাশে আছি। আমিও তো একদিন আপনার —মত অবসরে যাব। ভাবনাটা আমাকেও ভাবতে হবে।

মতিবাবু: জানি জানতাম নীলাময় তুমি আমার পাশে থাকবে। আসলে দিন দিন সমাজে ভাল মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। রাজনীতির আত্মকেন্দ্রীকরণের গ্যাড়াকলে আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। সকালবেলা তোমাকে বিরক্ত করলাম, আসি ভাই। (মতিবাবু উঠে দাঁড়ায়)

নীলাময় : আসুন দাদা। (মতিবাবু বেড়িয়ে যায়, নীলাময় সেদিকে তাকিয়ে তাকে, তারপর উদাস গলায় আবৃত্তি করে।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী/
(ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে যায়)

চতুর্থ দৃশ্য

(মঞ্চে আলো ফুটতেই দেখা যায় নীলাময়বাবুর ড্রয়িংরুমের দৃশ্য, নীলাময়বাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী এগুলি পরিস্কার করছে। একসময় বিরক্ত হয়ে নীলাকে ডাকে।)

নীলিমা : নীলা, নীলা, এই নীলা। (কোন সারা না পেয়ে) এই হয়েছে এক জ্বালা, সারাদিন ফেসবুক, ওয়াটস্‌অ্যাপ নয়ত কানে একটা হেডফোন লাগিয়ে রাখবে, বিরক্ত। নীলা, এই নীলা, নীলা।

নীলা : (নেপথ্যে) হ্যা মা।

নীলিমা : এদিকে আয়। (নীলা হাতে একটা মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করে) কতক্ষণ ধরে ডাকছি, কিসে এত মত্ত থাকিস?

নীলা : কেন ডাকছিলে বলো।

নীলিমা : তোর বনানী আন্টি আসবে বলেছে, আলমারী থেকে দুটি নতুন চাদর বের করে বিছানায় পেতে দে।

নীলা : উমা কালকেই তো ধোয়া চাদর দুটি বিছালে, এগুলি তো পরিস্কারই আছে।

নীলিমা : এই মেয়ে, তোকে যা বলা হয়েছে তাই কর। সব কিছুতে একটা কথা বলা চাই। (টি টেবিলের উপর নীলাময়ের বই লেখার কাগজ এগুলির দিকে তাকিয়ে) এই মেয়ে, তোর বাবাকে বলবি টি টেবিলের উপর যাতে এসব না রাখে। এই তোর দাদা কই রে ওকে একটু ডাক।

নীলা : আমি পারব না, তুমি ডাক।

নীলিমা : কেন, তুই ডাকতে পারবি না কেন, কি হলো?

নীলা : জানি না।

নীলিমা : জানি না মানে, তোরা বড় হয়েছিস, এখনো সেই ছোটদের মতো ঝগড়া।

নীলা : মা, আমি ঝগড়া করি না, দাদাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। আমি একটা রবীন্দ্র সংগীতের নাচ তুলছিলাম দাদা এসে রিমোট টিপে গানটা বন্ধ করে দিয়েছে, কার না রাগ উঠবে বলো। একটা আন কারচারড ছেলে। (এমন সময় নীলয় প্রবেশ করে)

নীলয় : এই মেয়ে তুই কি বললি, আমি আন কালচারড।

নীলা : হে বলেছি, আনকালচারড।

নীলয় : দেব একদিন সব বন্ধ করে।

নীলা : ইস্‌, আমার গার্জেনরে, সব বন্ধ করে দেব।

নীলয় : কে(প্রচন্ড রেগে) নীলা ভাল হবে না বলছি।

নীলা : কেন ? আমি তোর খাই, না তোর পয়সায় এসব করি?

নীলিমা : (ধমক দিয়ে) এই তোরা থামবি। ভাই বোনে এভাবে সারাক্ষণ ঝগড়া করতে আমি কোথাও দেখিনি। আমরাও ভাই বোন ছিলাম, কখনো এভাবে ঝগড়া করিনি।

নীলয় : মা, দেখবে এই মেয়ে একদিন তোমাদের নাক চুল কাটবে। বলে দিলাম।

ফেসবুকে ওর কত বন্ধু জান, কি সব কমেন্ট।

নীলা : আমার কেউ ফালতু বন্ধু নেই, সবাই আমার নাচের ক্লাসের বন্ধুরা। তোর তো সেই বাপ্পাদা, পানু, মন্তোষ। জান মা বাপ্পাদা একদিন আমাকে আমার হোয়াটস্‌অ্যাপ এ কি কমেন্ট করেছে। ছিঃ ছিঃ এরা আবার আমার দাদার বন্ধু। (নীলা থেমে যায়)

নীলয় : বল কি বলেছে, বল, বলনা।

নীলা : বলবই তো, বাপ্পাদা আমাকে-

নীলিমা : (চিৎকার করে) নীলা চুপ, একদম চুপ।

নীলা : (মার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শেষে কান্না ভেজা গলায় বলে) মা তুমি সব সময় আমাকে থামিয়ে দাও, দাদাকে কিচ্ছুটি বল না। বাবা আসুক, আমি সব বলব।

নীলিমা : তোদের যন্ত্রণায় আমি একদিন বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। বাড়ীর প্রত্যেকটা মানুষ যে যার ভাবে চলছে। নীলয় এই ছেলে যা কোথায় যাবি যা, হে, শোন যেজন্য ডেকেছি, মিষ্টির দোকান থেকে আমাকে মিষ্টিটা এনে দিয়ে যা, তোর বনানী আন্টি আসবে, বিছানার নিচে টাকা আছে যা । বেরো। (নীলয় যাবার সময় আরো একবার নীলার দিকে তাকিয়ে শেষে ধপ্ ধপ্ পা ফেলে চলে যেতে উদ্ধত, এমন সময় নীলিমা আবার ডাকে।) এই নীলা, তোকে যে বললাম বেড সিট দুটি পেতে দিতে। (নীলা যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরে অভিমানী গলায় বলে।)

নীলা : দাও, আলমারীর চাবিটা দাও। (নীলিমা তার কাপড়ের আঁচল থেকে আলমারীর চাবি খুলতে খুলতে বলে)

নীলিমা : কেউ বাড়ীতে আসবে শুনলেই আমার কেমন লজ্জা করে।

নীলা : কেন, কেউ বাড়ীতে আসবে শুনলে তোমার লজ্জা করে কেন?

নীলিমা : মানুষের বাড়ীতে গিয়ে দেখিস, কেমন ফিট্ ফাট্।

নীলা : মা, এসব ছাড়, কে কি বলল, মানুষ এখন এত কিছু ভাবে না।

নীলিমা : নীলা, জ্ঞান দিবি না, মুখে যেন খই ফুটে, একটা কাজের কথা বললেই মাথা গরম হয়ে যায়। পারবি না স্রেফ্ না বলে দে এত কথা কেন।

নীলা : মা, তোমার কাজ কেউ করতে পারবে না, কারণ কারো কাজ তোমার পছন্দ হয় না।

নীলিমা : এই যা যা কোথায় যাবি যা, আমার কাজ আমি নিজেই করবো। আমি তো এ বাড়ীতে একজন কাজের লোক হিসাবে আছি সব আমাকেই করতে হবে আমাকেই দেখতে হবে। (নীলিমা দেবীর কথার মাঝখানেই নীলা ধপ ধপ পা

ফেলে ঘরের ভিতরে চলে যায়, নীলিমা দেবী সে দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন।) একজন তো সেই সকালে স্নান টান সেরে সেজেগুজে বেরিয়ে গেলেন, একটা ছুটির দিনেও বাড়ীতে পাওয়া যায় না লোকটাকে। (এরপর টি টেবিলের উপর রাখা গীতবিতান, সঞ্চয়িতা হাতে নিয়ে বলে) এগুলিই হলো নষ্টের গোড়া, এই কুষ্টিপত্রগুলি যতদিন থাকবে, মানুষটা ততদিন এ সবেই ডুবে থাকবে। একেবারে ভুল মানুষ একটা। (বলতে বলতে নীলিমা দেবী গীতবিতান সঞ্চয়িতা ও নীলাময়ের লেখার খাতা নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্ধত এমন সময় নীলাময়বাবু বাইরে থেকে প্রবেশ করে। পরনে চোস্ত দামী পাঞ্জাবী, গলায় ফুলের মালা কাঁধে সুন্দর একটা ঝোলানো ব্যাগ, এক হাতে একটা মানপত্র অন্য হাতে মিষ্টির প্যাকেট, হাসি হাসি মুখ, ঘরে ঢুকেই নীলিমা দেবীর হাতে বই—

নীলিমা : ফেলে দেব, সব ফেলে দেব। টি টেবিলের উপর কেউ বই রাখতে আমি জন্মেও দেখিনি। (এবার নীলাময়ের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে) বাঃ বাঃ মনে হয় কোন জলসা থেকে এসেছেন, ফুলের মালা, মানপত্র, মিষ্টি, এরজন্যই সকালে স্নান টান সেরে একেবারে সেজেগুজে বেরিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। (নীলাময় হাতের জিনিসগুলো টি টেবিলে রাখতে গিয়ে বলে)

নীলাময় : একটা সাহিত্য সম্মেলন ছিল। (হাতের এগুলি রাখতে নীলিমা চিৎকার করে উঠে)

নীলিমা : এই এই এখানে না, দেখছ না আমি পরিস্কার করছি।

নীলাময় : তা এই অবেলায় তুমি এসব নিয়ে পড়েছ কেন? ইস্, একটা ভাল মুড নিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম।

নীলিমা : কি বললে, ভাল মুড, কত টাকা রোজগার করে আনলে। কি করে যে মুড ভাল রাখে। স্বার্থপর এক নম্বরের স্বার্থপর।

নীলাময় : আহা চুপ কর না, প্লিজ।

নীলিমা : শোন, আমি তোমার মত বোবা হয়ে থাকতে পারব না, মেয়ে একটা বেয়াদপ, এক কথা বললে পাঁচ কথা শোনায়।

নীলাময় : আরে এগুলি কোথায় রাখব সেটা বলবে তো।

নীলিমা : একটা কথা বলে দেই, এখন থেকে তোমার এইসব বই রবীন্দ্রনাথ কাগজপত্র তুমি নীলার পড়ার ঘরে নিয়ে রাখবে, বলে দিলাম। টি টেবিলে রাখলে আমি ফেলে দেব।

নীলাময় : নীলার ঘরে কেন? এই বুক সেল্ফের উপর রাখি।

নীলিমা : একদম না, এসব আমার সহ্য হয় না, যে আসে তাকে দেখিয়ে নিজের ঢাক

নিজেই পেটানো, কি হবে এসব দিয়ে। (নীলাময় তার হাতের জিনিষগুলি নিয়ে নীলার ঘরে যেতে গিয়ে নীলিমাকে বলে, নীলিমা তুমি দিন দিন কেমন বদলে যাচ্ছ। একদিন তুমিই আমাকে লেখালেখিতে উৎসাহ দিতে, তুমি ভুলে গেলে সেই সব দিনগুলির কথা, কেন নীলিমা কেন? কেন বুঝতে পার না।

নীলিমা : তুমি যেভাবে এসবে মাথা খাটাও , এর একটু যদি সংসারটার জন্য ভাবতে, তবে আমাদের এইদিন হতো না। আনন্দ ফূর্তি করে এসেছ, এখন আমাকে বিরক্ত করো না। বনানীরা আসছে। আমাকে কাজ করতে দাও।

নীলাময় : নীলিমা বাইরের আনন্দটা বাড়ীতে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেব, কিন্তু।

নীলিমা : কিন্তু কি করি বল, শোন, আমার ভিতরে এত আনন্দ নেই, তুমি তোমার নিজের আনন্দে থাক।

নীলাময় : তাই তো আছি নীলিমা। আমি আপনার তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবনানন্দ। তাই তো নীলিমা।

নীলিমা : আশ্চর্য্য একটা মানুষ বটে। যাও তো আমাকে একটু গোছগাছ করতে দাও, কি সং এর মতো এইগুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? দ্যাখো, বনানীর সঙ্গে হিমাংশুদাও আসবে।

নীলাময় : আমি জানি তো এরা কেন আসছে?

নীলিমা : তুমি জান?

নীলাময় : জানি, বরং কেন আসছে সেটাও বুঝতি পারছি।

নীলিমা : বুঝতে পারছ?

নীলাময় : হ্যা, বুঝতে পারছি।

নীলিমা : কি বুঝতে পারছ?

নীলাময় : হিমাংশুদা গাড়ি কিনেছে, আর সেটা দেখানোর জন্যেই ওরা আসছে। দ্যাখো, তোমার বন্ধুদের মধ্যে এক মাত্র তুমি ছাড়া ।

নীলিমা : সবারই গাড়ী আছে।

নীলাময় : আমাদের গাড়ী কি খুব অ্যাসেনশিয়েল নীলিমা? এর জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ?

নীলিমা : তোমার গাড়ী কেনার ক্ষমতা নেই সেটা বল।

নীলাময় : হিমাংশু আর আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য, আমি হিমাংশুর মত হতে পারব না, আর হতে চাই ও না।

নীলিমা : বড় কথা বল না, হিমাংশুদার মত তু মি জীবনেও হতে পারবে না। পুরুষ মানুষের ধান্ধা থাকতে হয়। তোমার শুধু অফিস বাড়ী, আর ঐ কাগজপত্র।

নীলাময় : আমি ভাল আছি।

নীলিমা : কেমন ভাল সেটা আমি টের পাচ্ছি।
(এমন সময় ছেলে নীলয় মাথায় হেলম্যাট লাগিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে)

নীলয় : মা, মিষ্টিটা রান্নাঘরে রেখে এসেছি, এখন তিনশ টাকা দাও, বাইকে তেল ঢোকাতে হবে।

নীলিমা : এই তো দুইদিন আগে দুইশ টাকা নিলি?

নীলয় : দুইদিন কি বলছো মা, পাঁচদিন হয়েছে আরে এ মাসটা চালিয়ে দাও, সামনে মাস থেকে তোমাদের কাছে আর হাত পাতব না, দাও আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নীলিমা : তোর বাপ তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাপ্ কে বল।

নীলয় : বাবা, হু , কোনদিন দিয়েছে। তোমার কাছ থাকলে দাও, নয় ধার দেনা করে চালিয়ে নেব। (যেতে উদ্যত)

নীলিমা : দাঁড়া দাঁড়া, নিয়ে আসছি, আমার হয়েছে যত জ্বালা। (বলতে বলতে নীলিমা ঘরের ভেতর চলে যায় । নীলাময়ের টি টেবিলে রাখা বইপত্রগুলিও নেয়।

নীলময় : তোর চাকরীটা কেমন লাগছে?

নীলয় : (উদাস ভাবে) ভালই।

নীলাময় : আসলে পাবলিক ফার্মগুলি যেভাবে খাটায় সেই তুলনায় মাইনে দেয় না। ;

নীলয় : বাবা, একটা কথা বলি, গোঁড়াতেই তোমরা একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছ, আজ যদি আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করতাম, তবে কবেই একটা ভাল জব পেয়ে যেতাম।

নীলাময় : কিন্তু, বাংলা মিডিয়ামে পড়েও তো অনেক ছেলেমেয়ে ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছে, ভাল চাকরী পাচ্ছে।

নীলয় : (তাচ্ছিল্যভাবে) সেদিন এখন আর নেই বাবা। এখন কমপিটিশনের বাজার, এখন নিতান্ত বি পি এল পরিবারের ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ বাংলা মিডিয়ামে পড়ে না। তুমি কিন্তু আমাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারতে।
সে ক্ষমতা তোমার ছিল। (এমন সময় নীলিমা দেবী টাকা নিয়ে প্রবেশ করে)

নীলিমা : তুই কাকে কি বলছিস্, তোর বাবা কি এই জগতে বাস করে।
এই নে, তিনশ টাকা দিলাম, এই মাসে কিন্তু আর দিতে পারব না।

নীলয় : বললাম তো, আর দিতে হবে না, (এবার নীলাময়বাবুর দিকে তাকিয়ে) বাবা মা যে অনেক সময় বলে, ঠিকই বলে, মা না থাকলে আমাদের বোধহয় লেখাপড়াই হতো না। (কথা কটা বলে নীলয় মাথায় হেলম্যাট লাগিয়ে দ্রুত চলে যায়, নীলাময়বাবু অসহায়ের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকে) ।

নীলিমা : উচিত কথা বললেই মন খারাপ, তোমার মত মানুষের এমন কথা আরও

শুনতে হবে। (এমন সময় কলিং বেল বেজে ওঠে)। বনানীরা বোধহয় এসে গেছে। (একবার ঘরের সবকিছু দেখে দ্রুত দরজা খুলে দিতে যায়, নীলাময় তাকিয়ে থাকে দরজা খুলে দিতেই বনানী প্রবেশ করে নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে। পরনে দামী শাড়ী, চুল গুলি কাঁধের উপর ছাড়া, ঠোঁটে লিপস্টিক, সুন্দরী আধুনিক। পেছনে হিমাংশু বেশ ফিটফাট চোখে মুখে ধূর্ততা, নীলাময় হাতের জিনিসগুলি নীলার ঘরে রাখতে যেতে যেতে বলে)

নীলাময় : আয় আয় হিমাংশু বোস। (নীলাময় ভিতরের ঘরে চলে যায়)

হিমাংশু : ওকে বাড়ীতে পাব আশাই করিনি, ছুটির দিনে তো ওর অনেক কাজ থাকে।

নীলিমা : আজকেও ছিল,এই মাত্র উনি আসলেন,বস বনানী, বসুন। হিমাংশুদা (নীলাময় হাতের বইখাতা রেখে ফিরে আসে)

হিমাংশু : হ্যারে, নীলাময়, তোদের গলির রাস্তাটা আর একটু বড় করতে পারলি না। গাড়ীটা বড় রাস্তায় রেখে আসতে হলো, নতুন গাড়ী। রাস্তায় -

নীলাময় : কিচ্ছু হবে না, তুই নিশ্চিন্তে থাক। রাস্তাটা বড় হয়নি ঐ বণিক বাবু জায়গা ছাড়েনি।

বনানী : না, নীলাময়দা, রাস্তাটা আর একটা বড় করা দরকার ছিল। আপনি পারেন নি, আপনার ছেলে হয়তো গাড়ী কিনতে পারে।

হিমাংশু : হ্যারে নীলাময়, বনানী ঠিক কথা বলেছে, তাছাড়া কতো আপদ বিপদ আছে, বণিকবাবুকে বুঝিয়ে বল। রাস্তাটা বড় হলে সবারই সুবিধা হবে।

নীলিমা : কাকে কি বলছেন হিমাংশুদা, আপনার বন্ধুকে আপনি চেনেন না, অফিস খাতা কলম বই, এসব ছাড়া লোকটা আর কি চেনে, এই মানুষটার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

বনানী : তা তুই তো নীলাময়দাকে আগে থেকেই জানতিস, নীলাময়দার গল্প কবিতা পরে প্রশংসা করতিস্। তখন জানতিস্ না, কবিরা এমনি একটু ভুলু মানুষ হয়।

নীলিমা : কিন্তু এতটা ভুলু মানুষ, যে নিজের ভাল মন্দ বুঝে না, এমনটা আশা করিনি। হিমাংশুদা, বনানী তোমরা বসো, আমি আসছি।

হিমাংশু : না, না, কোথাও যেতে হবে না। শোন যার জন্য আসা,

নীলাময় : সে পড়ে শুনব, তোরা বোস না।

বনানী : না নীলাময়দা, বসবো না, আমাদের আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে, (হিমাংশুকে লক্ষ্য করে) এই বল না।

হিমাংশু : তুমিই বলে ফেলো।

বনানী : নীলাময়দা আগামী ৭ই মার্চ, মানে আগামীকাল আমাদের পঁচিশতম

বিবাহবার্ষিকী, আগরতলা বি কে রোডে একটা রেস্টুরেন্ট ভাড়া নিয়েছি, সেখানেই সেলিব্রেশন করব, তোমরা সপরিবারে আমন্ত্রিত। শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা থাকবে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু। তোমরা অবশ্য অবশ্যই থাকবে।

হিমাংশু : দাঁড়াও, দাঁড়াও, কি রে নীলাময়, তুই তো আমাদের এক বছর আগে বিয়ে করেছিলি, কি হলো, আমাদের জানালি না?

নীলাময় : না, আমরা আসলে (নীলিমা কথাটা ধরে নিয়ে)

নীলিমা : আসলে মনেই ছিল না।

বনানী : (হেসে) নীলিমা না গেলে কিন্তু ভীষণ রাগ করব।

নীলিমা : যাব, অবশ্যই যাব।

বনানী : তোর ছেলেমেয়েরা কোথায়?

নীলিমা : ছেলে একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে জব করে, মেয়ে তার পড়ার ঘরে, দাঁড়া ডাকছি। এই নীলা, এই নীলা একটু এদিকে আয়। (নীলা প্রবেশ করে সবাইকে প্রণাম করে।)

বনানী : (আদর করে) বাঃ কি মিষ্টি মেয়ে, মা বাবার সঙ্গে যাবে কেমন।

নীলাময় : কি রে তোরা দাঁড়িয়ে কথা বলে গেলি বোস, বস বনানী।

হিমাংশু : না রে, আজকে বসতে পারছি না। তোর এখান থেকে অশোকের বাড়ী যাব, সেখান থেকে দেবুর বাড়ী, আসি আজ , নীলিমা যেও কিন্তু। চলি রে নীলাময়। এসো বনানী।

(এরা বেরিয়ে যায়, নীলাময়, নীলিমা, নীলা তাকিয়ে তাকে, মঞ্চের আলো নিভে যায় দৃশ্য শেষ)

পঞ্চম দৃশ্য

(নীলাময়বাবুর মেয়ে নীলা সোফাতে বসে কাকে যেন ফোন করছে। দুই একবার ট্রাই করার পর লাইন পায়। চোখে মুখে বিরক্ত।)

নীলা : হ্যালো হ্যালো রঞ্জন আমি নীলাক্ষী, হ্যা শোন, আমার শরীরটা ভাল না রে, ভীষণ মাথা ধরেছে, তুই এক কাজ করবি, মীনাক্ষীর নাচের জায়গাটা তুই ভিডিও করে আমার হোয়াটস্যাপে পাঠিয়ে দিবি? ঠিক আছে, রাখি, বাই।

(নীলা মোবাইলের সুইচ অপ করে সোফাতে হেলান দিয়ে বসে থাকে। এমন সময় নীলাময় বাবু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অফিস থেকে বাড়ী ফিরে, ঘরে ঢুকে নীলাকে মন খারাপ অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করে।)

নীলাময় : কি রে মন খারাপ করে বসে আছিস, রিহার্সাল নেই?

নীলা : না শরীরটা ভাল নেই।

নীলাময় : কি হয়েছে?

নীলা : কলেজ থেকে আসার পর মাথাটা ধরেছে।

নীলাময় : জ্বর টর আসেনি তো? ঘরে প্যারাসিটামল টেবলেট আছে। খেয়ে নে।

নীলা : না। জ্বর নেই।

নীলাময়: মাকে বলেছিস?

নীলা : কি করে বলব? মা তো ভিতরের ঘরে শুয়ে আছে। কয়েকবার ডাকলাম সাড়া দিল না।

নীলাময় : মনে মুড ভাল নেই।

নীলা : মার মুড তো কাল রাত থেকেই অফ হয়ে আছে।

নীলাময় : (মৃদু হেসে) সে আমি কাল রাত থেকেই বুঝতে পারছি।

নীলা : মা কালকে বনানী আন্টিদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারী থেকে ফিরেই মুড অফ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে ভালোভাবে কথাই বলছে না।

নীলাময় : তবে আমার ও ঘরে না যাওয়াই ভাল। এখানেই একটু বসি, মা, একটু চা করতে পারবি? না থাক, তোর আবার মাথা ধরে আছে। ঠিক আছে, আমি নিজেই না হয় করে নেব।

নীলা : সত্যি, বাবা তুমি কত সহনশীল, এত বছর মাকে নিয়ে তুমি এইভাবে সহ্য করে যাচ্ছ।

নীলাময় : (হেসে) তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস? নারে? কালকে হিমাংশুদের জাঁকজমক অনুষ্ঠানে গিয়ে তোর মা কিন্তু এতটুকু আনন্দ পায় নি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম হিমাংশুদের এসব দেখে তোর মা সারাক্ষণ একটা কমপ্লেক্সে ভুগেছে। তখনই বুঝেছিলাম বাড়ীতে গিয়ে একটা কিছু হবে। তুই বস আমি চা করে আনছি, গরম চা-টা খেলে দেখবি তোর মাথাব্যথা সেরে যাবে। (নীলাময় রান্নাঘরে যেতে উদ্যত এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠে, নীলাময় থমকে দাঁড়িয়ে বলে) দেখত মা কে এল?

(নীলা উঠে দরজা খুলতে যায়, নীলাময় সেদিকে তাকিয়ে দরজা খুলে দিতেই দুইজন যুবক প্রবেশ করে, এরা স্থানীয় ক্লাবের সদস্য, নাম গৌতম ওরফে গদু ও রাজু। গদু ক্লাব (সেক্রেটারী)

গৌতম : নমস্কার দাদা, কেমন আছেন?

নীলাময় : নমস্কার, এস গদু, এস, রাজু বস বস।

(এরা নীলাকে দেখে কেমন ইতস্তত বোধ করে, নীলাময় তা বুঝতে পেরে নীলাকে বলে) নীলা মা যাও তো মা, আংকেল দের জন্য একটু চা করে নিয়ে এস।

রাজু : না না দাদা, চা খাইতম না, একটা জরুরী কথা কইতাম আইছি।

নীলাময় : আরে আমিও এই মাত্র অফিস থেকে আসছি, আমিও খাব। তুই না পারলে মাকে বলবি। (নীলা চলে যায়) বস বস। এবার বল কি জরুরী কথা । (দুজনে সোফায়বসে)

গৌতম : দাদা কালকা আপনেরে একটা লোক্যাল চ্যানেলে দেখলাম, একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা আপনেরে সম্বর্ধনা দিছে। দাদা আপনে আমরার গর্ব। ভাবছি আমরার ক্লাবের পক্ষ থেইক্যা আপনেরে একটা সম্বর্ধনা দেমু।

নীলাময়: (হেসে) সে হবে। এখন কি যে বলছিলে জরুরী কথা।

রাজু : গৌতমদা, দাদারে বুঝাইয়া কও।

গৌতম : দাদা, দুইদিন আগে মতিকাকু আমার কাছে গেছল, তাইনের পুলা , পুলার বৌ বাড়ীডা বেইচ্যালাইত চায়, মতিকাকু কোনমতেই বাড়ী বেচত দিত না। তারপর তাইনে যা কইছে এই ব্যাপারে আপনের লগে কথা কইতাম, এর লাইগ্যা আমরা আইছি।

নীলাময় : মতিদা আমাকে বলেছে, আমি অবশ্য মতিদাকে বলেছি এ ব্যাপারে আর একটু ভাবার জন্য।

গৌতম : ইডা ত আর ভাবনের কি আছে দাদা? তাইনের বাড়ী তাইনে না বেইচ্যা জনকল্যাণে আমরার ক্লাবের নামে দান কইর‍্যা দিব।

রাজু : মতিজ্যেঠু মহান ব্যক্তি, তাইনেরে প্রণাম। (রাজু উদ্দেশ্যে হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে)

গৌতম : দাদা আপনের কাছে আইছি, মতিকাকুর এই ব্যাপারটা লইয়া শুধু আপনের লগে কথা কইতাম।

নীলাময় : কিন্তু গৌতম।

গৌতম : জানি জানি, মতিকাকু কইছে তাইনেরে একটু দেখাশোনা করতাম, আর তাইনে মরণের পরেই বাড়ীডা ক্লাবের সম্পত্তি অইব, দাদা, আপনের বাড়ীত দাঁড়াইয়া কথা দিতাছি, মতিকাকু মরলে আমরা এমন কিছু করুম যে, মতিকাকুর নাম সমাজে অক্ষয় অইয়া থাকব।

রাজু : মতিলাল গ্রন্থাগার, মতিলাল শিশু পার্ক, মতিলাল ----

গৌতম : এই চুপ কর। নীলাময়দা আপনে এই ব্যাপারটার লাইগ্যা মতিকাকুরে উৎসাহিত করবেন।

রাজু : একটা মহৎ কামে হেল্প করবেন আর কি।

গৌতম : এই তরে কইছি না চুপ থাকতি।

নীলাময় : গৌতম আমি যা বলার মতিদাকে বলে দিয়েছি।

গৌতম : শুধু বইল্যা দিলে ত অইত না দাদা। মতিকাকু যাতে বাড়ীটা আমরার ক্লাবের

নামে লেইখ্যা দেয়, এই লেইগ্যা তাগদা দিয়ন লাগব।

নীলাময় : গৌতম তোমাদের একটা কথা বলি, মতিদার ছেলে আছে ওদের একটা মতামতের প্রয়োজন আছে।

গৌতম : ও কেমন ছেলে দাদা, স্বামী স্ত্রী দুইজনে চাকরী করে, গাড়ী লইয়া ফুসফাস আয়ে যায়, কোন একটা সামাজিক কামে পাওয়া যায় না। কোন অনুষ্ঠানে চান্দা আনতাম গেলে মগরামি করে। হেরে জিগাইতে অইত না, জাগার মালিক মতি কাকু, তাইনের জাগা তাইনে যারে খুশি তারে দিব। এতে পুলা মাইয়া কেডা?

রাজু : রাইট, অক্করে ঠিক কথা। বখাটে ছেলে, বাপ রে দেখাশুনা করে না। মগের মুল্লুক। এরা সমাজের শত্রু।

গৌতম : চুপ কর।

নীলাময় : গৌতম তোমরা আমার কথা শোন। তোমরা আমার কাছে এসেছ ঠিক আছে, কিন্তু ভাই, আমি এইসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না। তবে মতিদার কথা শুনে মনে হয়েছে, মতিদা গভীর অভিমান থেকে এসব বলেছে। এ অবস্থায় আমি কি করে উনাকে তাগদা দিই বলো।

গৌতম : দাদা, বুঝতাছেন না কেরে, মতিকাকুর এই অভিমানডারে আমরার কামে লাগাইতে অইব। আপনেত এক সময় ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আছলেন। আপনে চান না ক্লাবডার উন্নতি হোক।

রাজু : দাদা, মতিকাকু টপকে গেলে, এই বাড়ীটা বিক্রী করে ক্লাব ঘরটা করুম, বাউন্ডারী ওয়াল দেমু, একটা নাট মন্দির করুম, আপনের একটা নাটক দিয়া নাট মন্দিরের উদ্বোধন করুম দাদা।

(এমন সময় নীলিমাদেবী একটা ট্রেতে করে তিন কাপ চা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, নীলাময় তা দেখতে পেয়ে)

নীলাময় : ঠিক আছে, আমি মতিদার সঙ্গে কথা বলব। তবে ভাই কতদূর কি হবে বলতে পারছি না। হয়ত তিনি মত বদলাতেও পারেন। নাও, চা খাও।

গৌতম : দাদা একটা কথা কই, বাগড়া দেবেন না কিন্তু। মতিকাকু যাতে বাড়ীডা ক্লাবের নামে লেইখ্যা দেয় ইডাই দেখবেন। এইসব ছেলেমেয়ে আমরা দেখুম।

রাজু : দরকার অইলে বাড়ীডারে বৃদ্ধাশ্রম বানামু, অহন ইতানের ব্যবসা লাভজনক

নীলাময় : তোমরা চা খাও।

(গৌতম রাজু নীলিমার ট্রে থেকে চা নেয়, চা টা নিতে নিতে নীলিমাদেবী কে বলে)

গৌতম : বৌদি দাদারে একটু বুঝান। একবারে আপন ভোলা মানুষ, নিজের বালাডাও

বুঝে না। (এরপর একটানে চা-টা শেষ করে কাপটা নীলিমার ট্রে-তে দিয়ে গলার সুর বিকৃতি করে বলে।) দাদা আমরা কিন্তু মতিকাকুর ইহান গেছি না তাইনেই নিজে আমরারে গিয়া কইছে। আয়ি দাদা। আয়ি বৌদি, চল রাজু। (গৌতম ও রাজু বেরিয়ে যায়, নীলিমা সেই দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শেষে নীলাময়কে বলে)

নীলিমা : ওরা কি বলে গেল?

নীলাময় : না, তেমন কিছু না।

নীলিমা : তেমন কিছু না মানে, এতো অনেকটা হুমকির মত শোনাল, বল, ওরা তোমার এখানে কেন আসছিল?

নীলাময় : ঐ মতিদা তার ছেলে, ছেলের বৌ এর উপর অভিমান করে বলেছিল, উনার বসত বাড়ীটা ক্লাবের নামে লেখে দেবেন। ক্লাবের ছেলেরা উনাকে দেখাশোনা করবেন।

নীলিমা : বেশ তো, কিন্তু গৌতমরা তোমার কাছে এলো কেন?

নীলাময় : মতিদা হয়তো ওদেরকে আমার কথা বলেছে।

নীলিমা : গৌতম রাজু এরা কি ভাল ছেলে? আমি বলে দিলাম তুমি এসবে যাবে না। শেষে মান সম্মান হারাবে। অবশ্য, তোমার আবার মানসম্মানবোধ। কালকে তুমি বনানীদের ম্যারেজ ডে তে একটা ফুলের তোড়া আর বই নিয়ে গেলে , ছিঃ লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। এক বিবাহ বার্ষিকীতে প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ করেছে, একেই বলে পুরুষ মানুষ। (নীলিমা বলতে থাকে, নীলাময়ের সেদিকে কোন খেয়াল নেই, সে আপন মনে বুক সেল্ফে বই খুঁজতে ব্যস্ত। নীলিমা তা লক্ষ্য করে আরো রেগে যায়।)

যখন চুপ করে থাকে , তখন আরো রাগ উঠে। ঐ খাতা কলম বই এগুলি কাল হল। দেখলে গা জ্বলে যায়। অফিস থেকে ফিরে জামা কাপড় না ছেড়ে বসে গেছে। কথা বলতে ইচ্ছা করে না। (বলতে বলতে নীলিমা অন্য ঘরে চলে যায় , নীলাময় উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে মঞ্চের আলো নিভে যায়)

ষষ্ঠ দৃশ্য

দেখা যায় নীলাময় বাবুর ড্রয়িংরুম। সকালবেলা কলিংবেল বেজে উঠে। দুই একবার বাজার পর নীলিমাদেবী ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দরজা খুলে দেন। মতিবাবুর পেছনে তার বন্ধু প্রাণতোষবাবু প্রবেশ করে।

নীলিমা : আসুন মতিদা। বসুন। বলুন কেমন আছেন?

মতিবাবু : (বসতে বসতে) ভাল আছি, বস প্রাণতোষ। (বসে পড়ে) নীলাময় বাড়ী নেই?

নীলিমা : একটু বাজারে গেছে। (ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে) নীলা একটু চা বসা। দাদা একটা কথা বলব। আমি ওর কাছে শুনেছি, আপনি নাকি আপনার বাড়িটা ক্লাবকে দান করে দেবেন বলেছেন।

মতিবাবু : অনেকটা ঠিক শুনেছ, তবে এখন আমি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছি। (হেসে) এই আমার বন্ধু প্রাণতোষ, (প্রাণতোষবাবুকে দেখিয়ে) নীলাময়ের স্ত্রী। (নীলিমা হাত জোর করে প্রণাম করে)।

নীলিমা : দাদা একটা অনুরোধ করব, আপনি জানেন ও খুব সরল ও সোজা মানুষ, এসব ব্যাপারে ওকে বেশী টানবেন না। কিচ্ছু মনে করবেন না দাদা। ও একটা উদাসীন আর ভুল মানুষ।

মতিবাবু : (মৃদু হেসে) ভুল মানুষ নয়, ভাল মানুষ।

নীলিমা : দাদা সে দিন ক্লাবের ছেলেরা এসেছিল, ওদের কথাবার্তা আমার ছিক ভাল লাগেনি।

মতিবাবু : আমি জানি নীলিমা, আর নীলাময়কে এখন আমার ফাইনাল সিদ্ধান্তটা জানাতেই আমি এসেছি, তুমি ভেবো না, (এমন সময় নীলা প্লেটে করে দুইকাপ চা নিয়ে আসে, নীলিমা নীলার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে এদেরকে দিয়ে মতিবাবু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নীলাকে মিষ্টি করে বলে)। মামণি, এবার কোন ক্লাসে?

নীলা : কলেজে আংকেল, ফার্স্ট ইয়ার।

মতিবাবু : গুড, তোমার বাবা বলেছে তুমি নাকি ভাল নাচ, এর মধ্যে কোথাও কোন অনুষ্ঠান থাকলে আমাকে জানাবে।

নীলা : জানাব আংকেল। (নীলা চলে যায়)

নীলিমা : বাপ মেয়ে এসব নিয়েই থাকে।

মতিবাবু : ভাল তো খুব ভাল, তোমার দিদিও তো একটা গানের স্কুল চালাত, এসবে মন ভাল থাকে। নীলিমা আমি সারা জীবন শিক্ষকতা করেছি, তোমার দিদিও গানের শিক্ষিকা ছিলেন, ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করেছি, কিন্তু মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি নি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। এমন সময় ভিতরের ঘর থেকে নীলাময় প্রবেশ করে। মতিবাবু ও প্রাণতোষবাবুকে দেখে)

নীলাময় : আরে মতিদা, কতক্ষণ?

মতিবাবু : এই ত কিছুক্ষণ।

নীলাময় : নীলিমা বাজারটা রান্না ঘরে রেখে এলাম, যাও একটু দেখ। (নীলিমা ভেতরে চলে যায়)

নীলাময় : (প্রাণতোষ বাবুর দিকে তাকিয়ে) বলুন মতিদা কি খবর?

মতিবাবু : নীলাময়, এ আমার বন্ধু প্রাণতোষ, এক সময়ের বীরেন্দ্র ক্লাবের দুর্ধর্ষ ষ্ট্রাইকার। এখানের কৃষ্ণনগরের বাড়ীটা বিক্রি করে কলকাতা চলে গিয়েছিল, আত্মঘাতী গোল খেয়ে আবার আগরতলা।

নীলাময় : হ্যা হ্যা চিনতে পেরেছি, ওনাকে সবাই পানুবাবু বলত।
(পানু বাবু হাসে) তা আপনারা দু'জন তো দুই শিবিরের, আপনি ব্লাড মাউথ, পানুদা বীরেন্দ্র।

পানুবাবু : সত্যি কথা ভাই, মতির ডিফেন্স ভেঙ্গে কোনদিন গোল করতে পারি নি। জীবনের খেলাতেও শেষ পর্যন্ত মতির কাছে ধরা পড়ে গেলাম। এখন মতিই আমার ভরসা।

নীলাময় : ব্যাপারটা বুঝলাম না দাদা।

মতিবাবু : পানু, নীলাময় খুব ভাল মানুষ, লেখালেখি করে, বিদ্বজন। মনের কথা শুধু নীলাময়কেই বলি। তোর আত্মঘাতী ধারাবিবরণী তুই নীলাময়কে বলতে পারিস।

পানুবাবু : কি আর বলব ভাই, ছেলে আর ছেলের বৌ এর চালাকি বুঝতে পারি নি, এখানে আমার এতবড় বাড়ীটা জলের দামে বিক্রি করে কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনল। ছেলে ছেলের বৌ দুজনেই ভাল কোম্পানীতে চাকরী করে, আমরা বুড়োবুড়ি দুজনকে বাড়ি রেখে ওরা অফিসে চলে যেত, আমাদের ডিউটি ছিল ওদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করা, স্কুলে পাঠানো, স্কুল থেকে আনা, জাস্ট হাউস সারভেন্ট। একটা মনের কথা বলার মানুষ নেই । তোমার বৌদি তো একেবারে অতীষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, এখানে এসে যেন শ্বাস ফেলতে পারছি ভাই। বাড়ী ভাড়া একটা ঠিক করে ফেলেছিলাম, এমন সময় মতি ভরসা দিল, এর ছেলে ছেলের বৌ নাকি শহরে ফ্ল্যাট কিনে চলে যাচ্ছে, এত বড় বাড়ীটাতে মতি একা থাকবে, তাই আমাকে বলল, ওর এখানে চলে আসতে।

নীলাময় : খুব ভাল দাদা, দুই বন্ধু একসাথে থাকবেন। এইতো আনন্দ।

মতিবাবু : নীলাময়, ওই দিন তুমি আমাকে ঠিকই বলেছিলে, আর একটু ভাববার দরকার ছিল, হুট করে ক্লাবের ছেলেদের কাছে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি। ওরা তো এখন আমাকে রীতিমতো হুমকি দিচ্ছে।

নীলাময় : হ্যা, আমার এখানেও এসেছিল। ওদের ব্যবহার কথাবার্তা আমার ভাল লাগেনি।

মতিবাবু : নীলাময়, জীবনে কোনদিন অন্যায়ের সাথে আপোস করিনি। কর্মক্ষেত্রে, ব্যক্তি জীবনে কারো কাছে মাথা নত করিনি। তোমরা তো জান, আমাদের একটা সময় গেছে, যখন আমি এই পানু , নিতাই ঘোষ, মাখন , শৈবাল

আগরতলা শাসন করতাম, ওরা ভেবে ছিল ওদের হুমকিতে আমি ভয় পাব। সোজা বলে দিয়েছি আমার বাড়ী বিক্রী করব, না দান করব না , সেটা আমার মর্জি, তোমরা কে, গেট আউট।

পানু বাবু : আগের সময়টা নেই রে মতি, আমরাও মস্তানি করেছি, আমাদের নিজের গায়ের জোরে, রাজনীতি বা ইউনিয়নের জোরে নয়। একবার তখন কলেজে পড়ি, উমাকান্ত মাঠ থেকে বাড়ী ফিরছি, সেদিন নন্দিতা এসেছিল আমার খেলা দেখতে, ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে দুইটা গোল করেছিলাম, নিজেকে হিরো মনে হচ্ছিল, তখন ধর্মেন্দ্র অমিতাভের যুগ, নন্দিতাকে নিয়ে কদমতলী যেতেই তিন চারটি ছেলে আমাদের পিছু নিল, তখন রাস্তায় আলো ছিল না, একটা আলো আঁধারী স্থানে আসা মাত্র একটি ছেলে নন্দিতাকে উদ্দেশ্য করে একটা বাজে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, আর যায় কোথায়, এমন মার দিলাম, দুইটাকে তখন সময়ের ভি এম হাসপাতালে আনতে হলো। নন্দিতা এখনো সেই কথা বলে হাসে। (সকলে হো হো করে হাসে)।

নীলাময় : তাহলে দাদা, ছেলের সঙ্গে আপনার কথা হয়ে গেছে।

মতিবাবু : নীলাময় তোমাকে সেইদিনই বলেছিলাম, এই বাড়ীটা তোমার বৌদির হাতে গড়া, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই চারুভিলাতেই আমি থাকতে চাই। ছেলেকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, তোমরা চলে যাও এতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আমি এখানেই থাকব। ওরা বলেছে, আপাতত ওরা শহরে একটা ভাড়া বাড়ীতে থাকবে। ফ্ল্যাট কমপ্লিট হলে সেখানে চলে যাবে। আমি বলেছি আমার জন্য তোমাদের কোন চিন্তা করতে হবে না। সরকার আমাকে পেনশন দেয় একটা লোক রেখে দিলেই ভালই চলে যাবে। তেমরা মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে দাদুভাইকে নিয়ে এসে আমায় দেখে যেও।

সপ্তম দৃশ্য

মঞ্চে আলো ফুটতে দেখা যায় নীলাময় বাবুর ড্রয়িংরুম, সময় সন্ধ্যা, নীলাময় বাবুর মেয়ে নীলা তার একটা নাচের পোষাকে জরির পাড় সুই সুতা দিয়ে সেলাই করছে, আর গুনগুন করে গান গাইছে। সেদিনের পর থেকে ড্রয়িংরুমের টি টেবিলে বইপত্র খাতা কলম এগুলি আর দেখা যায় না। এমন সময় টি টেবিলে রাখা তার সেল ফোনটা বেজে উঠে। নীলা ফোন রিসিভ করে, হ্যা মৌসুমী, বল বাড়ীতে কেউ নেই রে, মা বেরিয়েছে, বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি, দেখিনা, এর মধ্যে যদি ওরা এসে পড়ে তবে চেষ্টা করব। ঠিক আছে রাখ, (নীলা আবার গুন গুন করে। এমন সময় তাদের দরজায় কলিংবেলটা বেজে উঠে, নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। নীলাময়বাবু অফিস থেকে বাড়ী ফিরে আসে, নীলাকে ঘরে দেখে বিস্ময়ে বলে।)

নীলাময় : কি রে দরজা বন্ধ করে, তোর মা বাড়ীতে নেই?

নীলা : মা বেরিয়েছে।

নীলাময় : রিহার্সাল নেই?

নীলা : ছিল তো, এই মাত্র সৌসুমী ফোন করে বলেছিল। খালি বাড়ী ফেলে কি করে যাব।

নীলাময় : তোর মা কোথায় গেছে?

নীলা : বলেছে বান্ধবীর বাড়ী। দুপুরে একটা ফোন এসেছিল, মা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। বলে গিয়েছিল তুমি আসার আগেই চলে আসবে।

নীলাময় : তোর মার বান্ধবী, মানে হিমাংশুদের বাড়ী। (কাঁধের ব্যাগটা নীলার হাতে দিয়ে) একটু চা খাওয়াবি মা, অফিসে আজ প্রচন্ড ধকল গেছে।

নীলা : তুমি হাত মুখ ধুয়ে আস, আমি চা করছি। বাবা তুমি যখন এসে গেছ তখন আর রিহার্সালটা বন্ধ করি না।

নীলাময় : তাহলে তুই চলে যা, আমি চা বানিয়ে নেব, তোর দেরি হবে।

নীলা : তুমি বস, আমি চা নিয়ে আসছি।(নীলা ভিতরে চলে যায়, নীলাময় সোফায় বসে পড়ে, তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন করে)

নীলাময় : হ্যালো, বিমল আমি নীলাময়দা, আচ্ছা তুই যেন কেন্টিনে কি বলিছিলি? আরে হিমাংশু যেন কি কিনেছে বললি। কিচেন চিমনি, তখন তোর কথাটা খেয়াল করিনি, আরে না না, আমার সেই ক্ষমতা নেই রে ভাই। এমনিতে তোকে জিজ্ঞেস করলাম। হ্যা হ্যা বাড়ীতে রাখি। (নীলাময় মোবাইলের সুইচ অফ করে নিজে নিজে বলে) হু বনানী ফোন করে নীলিমাকে ডেকে নেবার কারণ এই। (নীলাময় সোফা থেকে উঠে বুক সেল্ফের কাছে যায়, কি যেন একটা বই খোঁজে। দুই একটা বই সেল্ফ থেকে নামিয়ে দেখে আবার সেগুলি জায়গায় রেখে দেয়, চোখে মুখে একটা অস্থিরতা দুই একবার ড্রয়িংরুমে পায়চারী করে, শেষে একবার ভিতরের দরজার সামনে গিয়ে নীলাকে ডেকে বলে)

নীলাময় : কি রে নীলা হয়েছে?

নীলা : (নেপথ্যে) হয়ে গেছে, আর একটু। (নীলাময় আবার এসে সোফায় বসেন, নীলা চা নিয়ে আসে, নীলাময় নীলার হাত থেকে চায়ের প্লেটটা নিয়ে নীলাকে বলে)

নীলাময় : নীলা মা, একটা কাজ করবি, তোর পড়ার ঘরে আমার সঞ্চয়িতা আর গীতবিতান বই দুটি আছে, একটু এনে দিবি মা।

নীলা : (বিস্ময়ে) তোমার সঞ্চয়িতা গীতবিতান আমার পড়ার ঘরে?

নীলাময় : হ্যা রে। তোর মা সেদিন হুকুম জারি করলো না, ড্রয়িংরুমে রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারবে না, ঐসব বই টই রাখা যাবে না, ওরা তাই তোর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। নিয়ে আয় মা।

নীলা : অফিস থেকে এসে জামাকাপড়ও ছাড়লে না, এখন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বসবে। বুঝতে পেরেছি, মা বাড়ীতে নেই তাই সুযোগ পেয়েছ।

নীলাময় : (হেসে) খুব বুঝিস। পাকা মেয়ে। যা নিয়ে আয়।

নীলা : বাবা, আজকে আর রিহার্সালে যাব না। তুমি আমি দুজনে মিলে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তি সংবাদ কবিতাটি আবৃত্তি করব। কতদিন তোমার আবৃত্তি শুনিনি। মা বাড়ীতে নেই, চল না গলা ছেড়ে আবৃত্তি করব, দাঁড়াও আমি বইগুলি নিয়ে আসছি।

নীলাময় : আজকে মুড নেই রে মা। অন্য দিন হবে। তুই বরং মা আমাকে একটা গান শোনা।

নীলা : ঠিক আছে, বাবা আগে গান পরে আবৃত্তি।

নীলাময় : ঠিক আছে, আসলে কি জানিস মা, তোর মার বাক্যবাণ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করি।

নীলা : রবীন্দ্রনাথকে তুমি ঢাল হিসাবে ব্যবহার কর, বাবা ঢাল কি গো?

নীলাময : ঢাল হলো পুরোনো সিনেমায় দেখিসনি, সৈনিকরা এক হাতে তরবারী অন্য হাতে গোল চাক্কির মতো একটা থাকে যা দিয়ে শত্রুর আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। সেটাই হলো ঢাল। (মৃদু হেসে) তুই লক্ষ্য করিস নি, তোর মা যখন কোন ব্যাপারে আমার সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করে, তখন আমি গীতবিতান এবং সঞ্চয়িতার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখি, সেটাই আমার ঢাল, মানে আত্মরক্ষা।

নীলা : বাবা, আজকে কি এরকম কিছুর সম্ভাবনা আছে?

নীলাময় : না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তোর মা কেন তোর বনানী আন্টিদের বাড়ী গেছে জানিস?

নীলা : (মাথা নেড়ে) না।

নীলাময় : কালকে ওদের বাড়ীতে কিচেন চিমনি লাগিয়েছে, কোম্পানীর লোকেরা এসে ওদের কিচেনে রুমে তা ফিট্ করে গেছে। তোর বনানী আন্টি সেটাই দেখাতে তোর মাকে ফোন করে নিয়ে গেছে। তোর মা প্রতিদিন রান্না করতে গিয়ে একটা চিমনীর জন্য কিরকম হৈ চৈ করে দেখিস না। আজ বনানীদের বাড়ীতে সেই চিমনি দেখে এসে কি হবে বুঝতেই পারছিস।

নীলা : (গম্ভীর হয়ে) দাঁড়াও এনে দিচ্ছি। (নীলা ভিতরে চলে যায় নীলাময় উদাসভাবে

নিজে নিজে আবৃত্তি করে)

নীলাময় : 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বার বার এসেছে জীবনে' (এমন সময় নীলা বই দুটি নিয়ে আসে এবং টি টেবিলের উপর রাখে)

নীলা : বাবা, তোমার মার প্রতি রাগ হয় না, মা তোমার সঙ্গে এরকম করে, মাকে তুমি ধমক দিতে পার না।

নীলাময় : তুই শুনেছিস, কথায় কথায় তোর মা আমাকে ভুল মানুষ বলে, আমি যে সত্যি তাই রে। ভুল মানুষদের রাগ মেজাজ এসব থাকতে নেই।

নীলা : বাবা আজকে মা এসে যখন এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে তখন মাকে তুমি কড়া ভাবে একটা ধমক দেবে, ও বাড়ীর কাকুর মতো। দেখবে মা ভয় পেয়ে তোমাকে আর কিছু বলবে না।

নীলাময় : দূর পাগলি, আমি এসব পারব না।

নীলা : দেখ না, একবার ট্রাই করে।

নীলাময় : না না আমি পারব না। এই এত বছরে একদিনও আমি তোর মাকে ধমক দিইনি, এতে আরো অশান্তি হবে। ও সব আমি পারব নারে, তার চেয়ে চল আমরা গলা ছেড়ে আবৃত্তি করি। (নীলা সঞ্চয়িতার পাতা উল্টায়) আমার বই লাগবে না তুই বই দেখে বলবি, নে শুরু কর।

(নীলাময় চোখ বুজে আবৃত্তি শুরু করে নীলা তাতে গলা মেলায়) পূর্ণ জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতায় বন্দনায় আছি রত। (এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠে, নীলা আবৃত্তি থামিয়ে সোফা থেকে উঠে বলে)

নীলা : মা এসে গেছে। (নীলা দ্রুত দরজার দিকে ছুটে যায়, নীলাময় গীতবিতানটা বুকে চেপে ধরে, উদাস ভাবে তাকিয়ে থাকে। নীলা দরজা খুলে দিতেই নীলিমা ঝড়ের গতিতে ছুটে আসে নীলাময়ের পাশে সোফাতে ধপ্ করে বসে পড়ে, তারপর এক অপলক দৃষ্টি নিয়ে নীলাময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে দেখতে নীলিমার চোখ থেকে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নীলা তা লক্ষ্য করে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাগ্র হয়ে বলে,)

মা তোমার কি হয়েছে ? মা তুমি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে তোমার? ও মা।

(নীলিমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কান্নাভেজা গলায় বলে)

নীলিমা : তুই তোর পড়ার ঘরে যা। (নীলা অনিচ্ছা সত্বেও তার পড়ার ঘরে চলে যায়। নীলা চলে যেতেই নীলিমা হঠাৎ নীলাময়ের বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

নীলাময় : (বিস্ময়ে বলে) তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন করছো কেন? তোমাকে কি ক্ষমা করবো, কি করেছো তুমি? কি হলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

(নীলিমা আবার চোখ মুখে কান্নাভেজা গলায় বলে)

নীলিমা : বনানীদের বাড়ী, বনানী ফোন করেছিল।

নীলাময় : বনানী?

নীলিমা : (মাথা নেড়ে জবাব দেয়) হ্যা।

নীলাময় : কি হয়েছে তার?

নীলিমা : বনানীর স্বামী হিমাংশুদাকে পুলিশ অ্যারেষ্ট করেছে। হিমাংশুদা তাদের অফিসের টাকা নয়ছয় করেছে। পুলিশ তাদের ফ্ল্যাট থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার করেছে। হিমাংশুদা সাসপেন্ড হয়ে গেছে। বোধহয় চাকরীটাও থাকবে না। স্থানীয় চ্যানেলগুলিতেও দেখিয়েছে।

নীলিমা : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) জানো, হিমাংশুদা কিন্তু এরকম ছিল না। বনানীর অস্বাভাবিক উচ্চাশাই হিমাংশুদাকে এ পথে যেতে বাধ্য করেছে, (নীলিমা আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) বনানীকে দেখে আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি। আমার ভিতরেও এমন একটা উচ্চাশা ছিল, যা এতদিন আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল, সবাই বনানীকে দুষছে, তোমার সঙ্গে আমি কত দূর্ব্যবহার করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (নীলিমা আবার নীলাময়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

নীলাময় : নীলিমা, সব বুঝতে পারা মানে সব ক্ষমা করা, আমি তো তোমাকে বুঝি,আমি তোমাকে ভালবাসি (নীলিমার পিঠে হাত রেখে) নীলিমা প্লিজ নীলিমা এসব বলো না।

নীলিমা : আজ আমাকে বলতে দাও, আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, জীবনের অনেকগুলি সুন্দর মুহূর্ত আমার হারিয়ে গেছে। তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি। আর কিচ্ছু বলব না, আমরা ভাল আছি, খুব ভাল আছি, জানো বনানীও সুখে নেই হিমাংশুদা প্রায়দিন নেশা করে বনানীকে টর্চার করে, বনানী নিজে আমাকে বলেছে। আমি সুখী, খুব সুখী। তুমি খুব ভাল মানুষ, আমি আর কিচ্ছু চাই না, তুমি চিরদিন এমনি থাক, চিরকাল, এমনি সহজ, সরল, আর এমনি ভুল মানুষ।

(এবার নীলাময় নীলিমাকে বুকে জড়িয়ে নেয়, নীলিমা অপলক দৃষ্টিতে নীলাময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। নেপথ্যে মৃদু সুরে রবীন্দ্র সংগীত শোনা যায় ‘ আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো,’ নীলাময় ও নীলিমা ঘনিষ্টভাবে ফ্রিজ হয়ে থাকে। (ছেলেমেয়ে দুজনে আড়াল থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।)

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে। মঞ্চ অন্ধকার হয়।

৪৬তম আন্ত: অফিস নাটক প্রতিযোগিতা, ত্রিপুরা ২০১৮-১৯, স্থানীয় শ্রেষ্ঠ পান্ডুলিপি।

শ্রুতিনাটক

২২শে শ্রাবণ

নন্দা চৌধুরী

(ঘরের মাঝখানে টেবিলে কিছু তাজা ফুল রাখা, বই, কাগজ ইত্যাদি। সোফাতে কেয়া বসে মেয়েকে ডাকছে)।

কেয়া : আ: পূবের জানালা দিয়ে কি হাওয়া আসছে দেখ! এই বুবাই বিকেলে এত ঘুমোচ্ছিস্, ওঠ, দ্যাখ! কি হাওয়া! ঐ গানটা কর না!
"পূব হাওয়াতে দেয় দোলা,
জাগে লহরী, মরি মরি ' (কলিং বেল)

কেয়া : আরে! আয় আয়, যুঁই, সৌরভ, সায়ন- আমি তো ভাবতেই পারছি না, বোস্ বোস্,

সৌরভ : দেখলি তো, আমরা ভুলি না, না বলে চলে এসেছি, কোন ঝামেলায় ফেল্‌লাম না তো!

কেয়া : আরে না না! কত ভালো লাগছে জানিস, কতদিন পরে আবার আমরা সবাই,

সৌরভ : আজকে বাইরে কোনো অনুষ্ঠান আছে? আমরা কিন্তু প্ল্যান করে এসেছি, আজকের সন্ধ্যেটা অন্যরকম করে কাটাবো, তোর কোনো—

কেয়া : না না ! আমি কোথাও যাবই না, ২২শে শ্রাবণ, আজ শুধু আমরা ক'জন মিলে, তোরা একটু চা খা, দাঁড়া, বলে আসি। ছুটির দিদা চা দিও চারজনকে।

সৌরভ : ডাকলি কাকে?

কেয়া : ও- আমার হেল্পার যে মাসী, তার নাতনীর নামটা আমি রেখেছি ছুটি, মাসীকে ও বলি ছুটির দিদা? কিরে? ভাল করিনি?

সায়ন : খুব ভাল করেছিস। আর কোনো কাজ নেই, একেবারে ছুটি। (সবাই হাসে)

যুঁই : এই নামটাতো রবীন্দ্রনাথেরও খুব প্রিয় ছিল। জানিস তো সৌরভ?

সৌরভ : আমি অত জানি না, আজ জানলাম, আচ্ছা, আজ তো ২২শে শ্রাবণ? তাই বলছি—

কেয়া : বল? থামলি কেন?

সৌরভ : বলবো বলেই তো এসেছি, বলবো, শুনবো, আচ্ছা, শুনেছি, রবিঠাকুরের

রচনাতে কোনো বিয়োগের অঙ্ক নেই, শুধু যোগ, তাই সবাই চলে এসেছি, এবার তাঁর সঙ্গে -

যুঁই : মানে সবাই মিলে আমরা যদি রবিঠাকুরের সাথে যোগাযোগ করি কেমন হয়?

কেয়া : দারুণ হবে!

সায়ন : তবে একটা কথা, সারাদিন বৃষ্টি ছিল, আবার হবে, এই নামল বলে, এই ঘরোয়া আড্ডাটা সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, বুবাই কোথায়, ? ডাক তোর মেয়েটাকে, ওকে নিয়ে সবাই বসবো।

সৌরভ : এ্যাই, রাত্রিতে ভাত খেয়ে ফিরবো কিন্তু,

কেয়া : খাবিনা মানে?

যুঁই : বুবাই, আয় না মা, দ্যাখ! আমরা বুড়োরা কেমন এসে জুটেছি, কেন জানিস?

কেয়া : এই বুবাই দ্যাখ! কারা এসেছেন, ডাকছেন তোকে? আয় না,

ছুটির দিদা: দিদিমণি, নেন চা, কিছু বলবেন?

কেয়া : তুমি যা মনে করবে, তাই। সবাই খাবে। আজ আমাকে পাবেই না।

যুঁই : এই তো বুবাই, আয় আয়! উহুঁ, আজ মায়ের কাছে নয়, আমাদের কাছে! এ-এইখানে বোস, এই তো ঠিক আছে,

কেয়া : ও তো পারতপক্ষে কোনো কথা বলে না, হাসি পেলে আবার ঠিক (হাসি)

সবাই : (হেসে) ঠিক আছে!

সায়ন : এই যথেষ্ট, ঠিক তো বুবাই, বুবাই খুব ভাল মেয়ে,

সৌরভ : আরে ওকে তো আমি কলেজ থেকে ফিরতে রোজই দেখি, হাবভাবটা খুব গম্ভীর- একদম কেয়ার মত (হাসি)

সবাই : তাই!

সৌরভ : নে, এবার প্রোগ্রাম শুরু কর, জমিয়ে একটা গান কর তো! কিরে? তৈরী আছে তো?

কেয়া : এ হয়ে যাবে, সায়ন হারমোনিয়ামটা, (সবাই গান ধরে)

গান : " এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে
এই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখে পড়ে না রে।
তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো রূপের নাচন দেখ
তালবনের ঐ গাছে (২)

" বাদল হাওয়া পাগল হল, সেই আগুনের হুহুঙ্কারে,

সৌরভ : কি সাংঘাতিক কথারে বাবা! আগুন? শ্রাবণের বুকে আগুন!

কেয়া : হ্যাঁ, সেই আগুনের কালোরূপটা দেখেছিলেন মানুষের দুচোখের পাতায়।

সৌরভ : গানের অর্থটা ভারী অদ্ভূত তো!

সায়ন : হ্যা, ভারী অদ্ভূত! কবির কল্পনাতে মানুষ হবে সর্বজয়ী, ভীরু, কাপুরুষ নয়!

যুঁই : সেই মানুষ মৃত্যুকেও ভয় করে না!

সৌরভ : তার মানে?

যুঁই : দুঃখকে সে বলে, এসো দুঃখ, জ্বালো শিখা,
এসো দুঃখ , জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা,
মরণ আসুক চুপে, পরম প্রকাশরূপে
সারাজীবন ধরে শুধু এঁকেছেন মানুষের মৃতুঞ্জয়ী রূপ,

কেয়া : পড়, সৌরভ,
" যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও,
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়।"

সৌরভ : কি সাংঘাতিক কথা।
আচ্ছা, এবার বুবাই কিছু, আরে তোর হাতের এই কাগজগুলো কিসের, এগুলো কি কোনো লেখাটেখা? আজ কোন প্ল্যান ছিল, তাই বল? কিরে বুবাই!

কেয়া : ও জানেই না, এগুলো বলতে পারিস আমার সঙ্গী, কবির লেখা আমার সর্বক্ষণের প্রেরণা।

যুঁই : দে তো আমার হাতে, তাঁর লেখা চির অভিনব, তবে এগুলো তো দেখছি সংগীতকে নিয়ে লেখা।

সায়ন : বেশ, শুরু কর!

যুঁই : লেখাগুলো তো মনে হচ্ছে কবির বিভিন্ন বক্তৃতা বা এই সংগীতকে নিয়ে কোনো চিঠি, এসবেরই বেছে নেওয়া অংশ তাই নয় কি?

কেয়া : একদম্, তবে সংগীত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও আছে,

সৌরভ : ঠিক আছে তো, গানের সঙ্গে রিলেট করে একেক একজনকে দিয়ে পড়াবি, এই কথা হলো, আচ্ছা, তাহলে আমাদের আজকের আসরে থাকছে গান, কবিতা, শ্রুতি নাটক, কি? সম্ভব হবে? তবে মনে হচ্ছে গানটাই।

যুঁই : গানের-ই প্রাধান্য থাকবে, এই গান লিখতে গিয়ে নাকি রবীন্দ্রনাথ যত আনন্দ পেতেন, তেমন আর কোনোটাতেই নয়।

কেয়া : আজকের বিশেষ দিনে তাই তাঁর গানেই আমরা ভেসে যাবো। তবে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই - মানুষের কাছে কি বলবো- একটা সুচিন্তিত —

সায়ন : হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, মানুষের কাছে সুচিন্তিত, -সঠিক পথের ইঙ্গিত!

যুঁই : আচ্ছা এবার বলছি, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি, তাঁর প্রিয় ঋতু বর্ষা। তাই বর্ষার আর একটা গান! এখনতো বৃষ্টি নেই, চল না মাঠটা ঘুরে আসি ! চল!

কেয়া : যাওয়া যায়, after all তিনি প্রকৃতির কবি!
খোলা প্রকৃতিটা বোধ হয় আমাদের ডাকছে চল!
কখন আবার ঝমঝম শুরু হয়ে যাবে,
সন্ধ্যা নামেনি, বুবাই দুটো ছাতা সঙ্গে নে, চল!

সৌরভ : By the way প্রকৃতির কবি কেন? কবি তো কবিই।

কেয়া : তাও ঠিক, আসলে , প্রকৃতির রূপ রসে বিভোর কবিও একদিন নিরাশার অতলে ডুবে গিয়েছিলেন, প্রকৃতির অস্থিতিশীল শূন্যতায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন, ভাবনায় আত্মস্থ হয়ে একসময় শূন্য হৃদয়ে সুন্দরের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। চেতনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব জ্যোতির্ময়তার স্পর্শ পেলেন হৃদয়ে, তার পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে এলেন বিশ্ব মানবের দুয়ারে, মূলে ছিল এই প্রকৃতি , তাই বলা হয় তিনি প্রকৃতির কবি।

সায়ন : কিন্তু শুধু এই সবুজ স্নিগ্ধ ছায়া সুনিবিড় প্রকৃতি নয়, তার অর্থ অনেক ব্যাপক। অনন্ত সকল দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, শ্রুত, অশ্রুত সকল উপচার নিয়েই সাজিয়েছেন পূজার অর্ঘ্য। মানুষতো এই প্রকৃতিরই অংশ।

কেয়া : হ্যাঁ, অনন্ত বিশ্ব প্রকৃতির সকল অর্ঘ্য দিয়ে ডালি সাজিয়ে প্রদক্ষিণ করেছিলেন কাকে জানিস?

সৌরভ : কাকে?

কেয়া : কবির অন্তরে যিনি কবি, তাঁর সেই অন্তরতরকে অনুভব করলেন অন্তরে।

যুঁই : গান কোথায় এবার গান কর।

সায়ন : সবাই গাইবি, বুবাই বলতো, কোন্‌টা গাইবো?

যুঁই : সেকি! মেঘ ডাকছে, আবার নামবে, বাড়ি ফিরবো কি করে?

সৌরভ : এর এক কথা!

সায়ন : " শ্রাবণের গগনের গায়, বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়,

সবাই : ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে হায়।

তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি
সঙ্গোপনে,
ধেরজ যায় যে টুটে, হায়
----------।"

সায়ন : এবার ঘরে চল, সন্ধ্যা ঘনায়মান, মনে হচ্ছে
আজ একেবারে ধরা দেবে সঘন গহন রাত্রি, সঙ্গে-

কেয়া : ঝরিবে শ্রাবণধারা,

যুঁই : বুবাই, আকাশটা দেখ, মনে হচ্ছে কত সম্ভার নিয়ে আকাশটা অপেক্ষা করছে। এবার ঘরে চল।

কেয়া : আরেকটু দাঁড়া,

সৌরভ : পৃথিবীটা ছেড়ে গেলেও আমরা তার পিছু ছাড়ছি না। (হাসি)
এই দ্যাখ, বুবাই হাসছে, হাস! বেশী করে, হাসলেই তো ভাল লাগে।

যুঁই : ওরে বাবারে, মেঘ ডাকছে, আমার খুব ভয় করছে কি হবে জানি না।

সৌরভ : তোর এত ভয় , (হাসি) চল, (সবাই ঘরের দিকে ফিরছে)

সৌরভ : এবার কিন্তু আমাকে কিছু পড়তে দিবি। আমি পড়বো।

কেয়া : ঠিক আছে।

সায়ন : সৌরভ! একটু শান্ত হয়ে বোস্, আজ আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কাজেই be serious.

কেয়া : সব কাজের একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের আজকের টার্গেট কি, সেটা কিন্তু স্পষ্ট নয়, তবে মনে হচ্ছে মূল্য লক্ষ্যটা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, সে কিছু বলতে চায়, তাই না? সায়ন?

সায়ন : আগে চল, বেয়ে চলি, নোঙর করবো যেখানে, লক্ষ্য সেখানেই স্থির, দন্ডায়মান।

সৌরভ : সাড়ে পাঁচটা, নে শুরু কর। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কথা বলবো, আমার পছন্দের গান শুনবো। কিছু প্রশ্ন আমার আছে , তোদের সংগীতকে নিয়ে। (সবাই হাসে।)

কেয়া : বাঃ খুব ভাল, আশা করি সব উত্তর তুই পেয়ে যাবি। (সবাই হাসে)

সৌরভ : আর, গাইতে তো পারি না, তোরা কেমন গাইছিস! দেখতে হবে তো, গা, একটা ধর!

যুঁই : বাব্বা! উনি একেবারে - (সবাই হাসে)

সৌরভ : নয়তো কি?

সায়ন : ওফ্ সৌরভ! নে এটা পড়।

সৌরভ : "ভুলভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগ বিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকবো নবসৃষ্টির কামনা নিয়ে।"

কেয়া : বাঃ

সৌরভ : মানে? লেখাগুলো কি আমাকে নিয়ে লেখা, (সকলের হাসি) আশ্চর্য! আরেকটা কথা, ওর কলমে কি যাদু ছিল? কথাগুলো কেমন তাক লাগিয়ে দেয়, তাই না?

সায়ন : কলমে যাদু ছিল না, ছিল তাঁর মেধা, চিন্তাশীলতা - ঘটেছে দু-এর সমন্বয়।

কেয়া : এবার একটা সমবেত আবৃত্তি, কবির প্রিয় 'সঘন সজল বরষা' (সবাই)

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কুলে একা বসে আছি নাহি ভরষা,
রাশি রাশি ভাঁড়া ভাঁড়া, ধানকাটা হলো সারা
ভরা নদী ঘোরধারা খর পরসা
কাটিতে কাটিতে ধন এল বরষা,

সৌরভ : খুব ভাল, যুঁই কেমন লাগল?

যুঁই : মনে হোলো নদীতে একটা পূণ্যস্নান করে নিলাম,

কেয়া : আমারো, জীবনে কত সোনার ধান তুলেছেন ঘরে , সে ধানে বোঝাই করেছেন সোনার তরী।

সায়ন : এই সোনার ধান যদি জীবনের মাটিতে একটু রুইয়ে দেওয়া যায়, বুঝলি বুবাই, অনেক প্রত্যাশার আলো জ্বলে উঠবে, একবার রুইয়ে দ্যাখ! জীবনের প্রকৃত স্বাদ, আনন্দ খুঁজে পাবি।

সৌরভ : আমি একটা কথা বলি?

কেয়া : বল?

সৌরভ : সংগীতকে মানুষের কি প্রয়োজন? এই পৃথিবীতে তো শুনেছি ভাবালুতার কোনো দাম নেই, ঠিক কিনা?

কেয়া : এটা পড়, যুঁই!

যুঁই : " পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু সংগীত ঐ শূন্যে, যেখানে তাহার অপরিচ্ছন্ন অবকাশ!

সৌরভ : এবার আর মাথায় ধরছে না, যার অবস্থান শূন্যে, তাকে নিয়ে এত চর্চা কেন? একটা অলৌকিক ব্যাপার নয় কি?

কেয়া : সংগীত অধরা, এই অধরা মাধুরীকে ধরে ফেলেছে মানুষ! কখনো ছন্দোবন্ধনে,

কখনো সে মানুষের মনের আকাশটাতে মুক্ত বিহঙ্গের মতো!

যুঁই : বাস্তবের দুনিয়াতে তার কি কোনো গুরুত্ব নেই! খুব খারাপ লাগে ভাবতে।

সৌরভ : আমার তো প্রশ্ন আছে তাকে নিয়ে, কিরে সায়ন, এসবের কোনো উত্তর হয় না?

কেয়া : এটা পড়, সায়ন!

সায়ন : " এই সংগীতে বাস্তবলোকে কী কাজ হয় জানি না, কিন্তু ইহারই পক্ষের কম্পমান আঘাতবেগে অতি চৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।"

সৌরভ : সিংহদ্বার চৈতন্যলোকের?

কেয়া : ঠিক তাই?

যুঁই : অভিনব, শুধু এই লেখাগুলো পড়তে বার বার জন্ম নেব এই পৃথিবীতে!

কেয়া : আচ্ছা, সৌরভ! ছন্দোবন্ধনে ধরা ফেলা সেই অধরা মাধুরীটাই সংগীত নয় কি?

সৌরভ : কথাগুলো খুব ভাল, একেবারে দারুণ, তবে একটু বেশী শুনতে গেলে বা ভাবতে গেলে আমার একটু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে,

যুঁই : একটু? যাক্ রক্ষে! অভ্যেস নেই তো!

কেয়া : আ: যুঁই, তুই-ও পারিস।

সৌরভ : কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুনতে ইচ্ছে করে, মনে হয় কোন মন্ত্র টন্ত্র দিয়ে কেউ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মনটাকে, কেমন নেশা ধরে যায়। এবার কোনো লেখা আছে কিনা দেখতো কেয়া, যেমন ধর, প্রতিদিন সংসারে কোনো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মন যদি ভারাক্রান্ত হয়, কাজে বিঘ্ন ঘটে, তার থেকে কি মুক্ত রাখা যায় মনকে! ঐ সংগীতের মাধ্যমে?

সৌরভ : যুঁই এর আবার কি হোলো, তুই তো দিব্যি নেচে বেড়াচ্ছিস, সব সামলাচ্ছে শাশুড়ী মা,

সায়ন : আ: সৌরভ, serious বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। সমস্যা শুধু যুঁই এর হতে যাবে কেন? বাস্তবে তো আমরা সবাই আছি, আর বাস্তব সংসার তো সবার ক্ষেত্রে একই নিয়মে চলে,

সৌরভ : তবে ভাল কিছু নেই এখানে?

সায়ন : আছে বলেই তো আমরা নিশ্বাস নিতে পারি, যুঁই গানটা ধর,

"সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ
আনো হে নাথ, প্রণমি তোমায়

গাহি বসে তব গান।"

সৌরভ : এবারও আমার মাথায় ধরছে না, বুঝলি, একটা প্রশ্ন আবার আসছে, এই গানটা গেয়ে প্রাণটাকে জাগালো তো? কি করে? তবে এই abstract বিষয়কে বোঝা কঠিন ব্যাপার? চোখে না দেখে বিশ্বাস করবো কি করে?

কেয়া : পৃথিবীর সবকিছু তো আর চোখে দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়।

যুঁই : মানুষের অনুভব করার শক্তি আছে বলেই তো সে মানুষ! - অন্য প্রাণীর মত নয়!

কেয়া : এবার আমি পড়ছি, " সংগীত তার নিজের ভিতরকার সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহুর্তের মধ্যে যেন এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটা পারস্‌পেকটিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে, " ওর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না"।

সায়ন : এবার বুঝলি সৌরভ! তবে সংগীত যদি অধরা বিষয়ও হয়, তাকে অনুভব করতে আমাদের ভাল লাগে, তো এই ভালো লাগাটাই সবচেয়ে ভাল কথা, একটু ভাললাগার জন্য আমরা তো কত কিছু করি, তাই না?

কেয়া : এর পর নিশ্চয়-ই আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কিরে? কিছু বলবি?

সৌরভ : আমার খুব ভাল লাগছে তো কথাগুলো, লাগাটাই স্বাভাবিক, আমিও তো তোদের-ই মত মানুষ। কথাগুলোতে ফ্যাকরা ধরেছি- তাও ভাল লাগার কারণেই।

যুঁই : বা: এবার খুব ভাল লাগছে, সত্যি সৌরভ, আজকের সন্ধ্যেটা সার্থক, আমাদের সঙ্গে মূলস্রোতে ফিরে আয়!

কেয়া : যুঁই, তুই বলে দিতে পারিস, ওর মনের কথাটা,

সায়ন : আমি বলি, মন বলছে এমন সৃষ্টির পরিমন্ডল থেকে দূরে সরে গিয়ে বাস্তবে আমরা কোথায় আছি, কেন আছি? এই বাস্তবে সেই পরিমন্ডল তো আমরা গড়ে নিতে পারি।

কেয়া : একদম ঠিক, কিন্তু বাস্তবটা কখনো নির্মম হলেও সেটা আমাদের বুঝতে হবে, এই বাস্তব সত্যি! কঠিন হলেও হাজারবার এটাই সত্যি। তাই মনে প্রাণে সৃজনশীলতাকে আঁকড়ে ধরে থাকলেও , চোখের একটা কোণ ফেলে রাখতে হবে এই বাস্তবের মাটিতে, আমরা পারবোই এ কাজটা করতে, নইলে বিপদ!

সৌরভ : কখন থেকে মাথাটা ঝিমঝিম করছে, চা-এর কথা বল,

কেয়া : দাঁড়া, বলে আসি,

সৌরভ : এখনো রাত ৮ টাই বাজলো না, একটা প্রেমের গান করনা যুঁই, আরো গা

তো!

যুঁই : পরে, সবশেষে,

সৌরভ : কেন?

যুঁই : ঐ যে "সর্বনেশের গানটি আমার আছে তোমার তরে"

কেয়া : বাব্বা, যুঁই, তোর মনে এত প্রেম, খুব ভাল লাগছে,

যুঁই : আরে, পৃথিবীতে তো প্রেমই একমাত্র খাঁটি , তাই সেটা পরে হবে, জমিয়ে, আসর জমিয়ে।

সৌরভ : কি মুশকিল, আরে খাঁটি বলেই তো সেটা আগে হওয়া উচিত ছিল, দেখি তো কেয়া, এই প্রেমভাবনার উপর কোনো লেখা আছে? দে তো, আমার এটা খুব ভাল লাগে, আমি পড়বো, দে, (সবাই হাসে)

কেয়া : সত্যি বলতে কি? ওর প্রেমের গানের জুড়ি নেই, তাই যুঁই সহজে সেটাকে release করতে চাইছে না। (সবাই হাসে)

সৌরভ : শুনেছি, ওর গানে আজো নবীন যৌবনে বসন্তের দোলা লাগে, সায়ন ধর তো!

সায়ন : " ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখো তোমার
মনের মন্দিরে,

সৌরভ : দে দে, আমায় দে, " যৌবন তরঙ্গে মন দোদুল্যমান, জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে, গানের সুরে যেমন সৃষ্টির বদল করে দেয়, তেমন আর কিছুতেই নয়, ঘোর শীতের সময় — ওফ্ lengthy,

কেয়া : নে নে, শীতে গরম চা,

সৌরভ : আঃ দারুণ, " ঘোর" - আাঃ

কেয়া : পড়,

সৌরভ : " ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্ম রাগিনীলোকে অতীতের সমুদ্র পার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া , মনের মধ্যে কূজন চলছে, গুঞ্জন চলছে,"

বা: বা: - দারুণ, জীর্ণ শরীর, তবু যৌবনের এত উচ্ছ্বাস, হাজার বার সেলাম ঠুকতে হয়!

যুঁই : আরে তা না হলে ঊনবিংশে জন্ম নেওয়া মানুষটা এই একবিংশের শেষেও কেমন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এই সংস্কৃতির আকাশটাকে,

সৌরভ : উনি শুধু প্রেমের গান লেখেননি, তার সঙ্গে নিজেও মেধাবী প্রেমিক!

যুঁই : lengthy এই লেখাটা তুই পড়লি অনেক ধৈর্য্য নিয়ে, কেন বলবো?

সৌরভ : প্রেম বলে ! আমি তো বললামই, উনার প্রেমের - গান, মেধাযুক্ত, ক্লাসিক! আর নইলে শুধু কি আর বিদেশিনীরা তার প্রেমে পড়েছিল,

যুঁই : তার ঐ এক কথা, " রাম গিয়েছিল বনে" (সবাই হাসে)

সায়ন : ধরনা, আমি চিনি গো,

সায়ন : " আমি চিনি গো চিনি তোমারে , ওগো বিদেশিনী ,
তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ওগো বিদেশিনী,
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে,

সৌরভ : গানটা খুব touchy, তবে বুঝলি যুঁই, কবির ঐ প্রেম সংক্রান্ত চর্চাটা এখনো লোকের মুখে মুখে,

কেয়া : তাতে হোলো কি?

যুঁই : এতবড় একজন সাংস্কৃতিক আইকন, লোকে তাকে নিয়ে একটু চর্চা করবে না তো কি তোকে নিয়ে করবে?

সায়ন : ওফ্, আজ একটা বিশেষ দিন?

কেয়া : ওদের আবার মিলেরও শেষ নেই, দেখিস্, একটা কথা বলবো সৌরভ! চর্চা তাকে নিয়ে আরো অনেক বেশী দরকার! কম হচ্ছে; তাঁর প্রেমের চর্চাটা বেশী হলেই মানুষ বুঝবে, কোন রাজসম্মান, রাজস্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রেমকে, কোন মহাসমারোহ নিয়ে করেছিলেন তার অভিষেক। এই প্রেম- রাজাধিরাজের সম্মান নিয়ে বসেছিল তার হৃদয় সিংহাসনে।

সৌরভ : আর কিছু বলার নেই। আর একটা প্রেমের গান হলে, — তবে যুঁই কণ্ঠে, নির্ভেজাল প্রেম, খাদ নেই, যান্ত্রিকতা নেই!

যুঁই : আবার! " ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে,
তোমরা যে বল দিবস রজনী, ভালবাসা ভালবাসা,
সখী ভালবাসা কারে কয়,
সেকি কেবলই যাতনাময়, সেকি কেবলই চোখের জল
সেকি কেবলি দুখের শ্বাস
লোকে তবে বলে কি সুখের তরে—
এমন দুখের আঁশ।

সৌরভ : আরে, শুধু চোখের জল এই ভালবাসার মানে, আর কিছু নেই,

কেয়া : এটা তো universal , ভালবাসা ব্যথা দেয়।

সৌরভ : যৌবনে তো মানুষ যাকে সবুজ, অবুঝ, এত পরিণামের কথা চিন্তা করে কেউ ভালোবাসে না। এসব গান শুনলে ভয়ে আর কেউ ভালবাসবে না, বাপরে বাপ্, বলবে পালাই! আর এই পৃথিবীটা শুধু মরুভূমি হয়ে যাবে বুঝলি?

যুঁই : গান সবটা শোন, ধর,
" আমার চোখে তো সকলি শোভন, সকলি নবীন সকলি বিমল
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন, বিষাদ জোছনা , কুসুম কোমল,
সকলি আমার মতন তারা, কেবলি হাসে, কেবলি গায়
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন ,
না জানে সাধের যাতনা যতন,

সৌরভ : এবার বুঝলাম, বেশ! আরেকটা-

যুঁই : 'না, না গো, না
করো না ভাবনা,
যদি নিশি যায়, যাব না যাবনা।"
আর না ! প্রেমের গান বেশী হয়ে যাচ্ছে, বাড়ী ফিরতে হবে তো! আমি আর পারছি না, তোরা দেখলি তো, সৌরভ পেয়ে বসেছে আমাকে?
(সবাই) — তাই তো!

সৌরভ : ওমা, তুই যে বললি, প্রেমই একমাত্র খাঁটি সেটা?

কেয়া : আমি একটা conclusion টেনে দিই,

সৌরভ : কোনটা?

কেয়া : সারা রাত্রি জুড়ে ফুটে থাকা পথমঞ্জরী যখন ঝরে যাবে
শিশিরের সাথে ভোরবেলা, বলে যায়।
" ভালোবাসা পেয়ে যদি, কাঁদিতাম নিরবধি-,
সে বেদনা ছিল ভালো, সুখ ছিল সে কাঁদাতে"

যুঁই : নজরুল,

কেয়া : এই ২২শে শ্রাবণে নজরুলকেও নিলাম পাশে।

সায়ন /সৌরভ : দারুণ!

যুঁই : দারুণ! কিন্তু বৃষ্টি তো নামলো বলে, বুবাই! আজ কি ২২শে শ্রাবণ বলেই এত বৃষ্টি! অনেকে তাই বলে!

কেয়া : না, ২২শে শ্রাবণ বলতে দিন, মাসের কোন গন্ডী নয়, - সব সীমা ছাড়িয়ে

সে পৌঁছে গেছে—

সবাই : কোথায়?

কেয়া : অসীমের সীমানায়, আবার নেমে এসে মিশে যায় শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণে।
" শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে
কী বাণী আশে ওই রয়ে রয়ে।" (সবাই) গান:
" শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে
তোমার-ই সুরটি আমার মুখের পড়ে, বুকের পড়ে।
পূরবে আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুনয়নে,
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে
নিশিদিন এই জীবনে সুখের পড়ে, দুখের পড়ে।

কেয়া : এই শ্রাবণ অনন্য এক বার্তা, নবযুগ বিধাতার ডাক! এই ডাক শুনে চলতে থাকবো আমরা নবসৃষ্টির কামনা নিয়ে। কবি তাই চাইতেন,

সৌরভ : "প্রত্যেক যুগেরই এই কান্নাটা আছে, 'সৃষ্টি চাই' অনুযুগের প্রসাদভোগী হয়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে বাঁচাবে, তাকে সে আহ্বান করছে।"

সায়ন : বুবাই, কথাগুলো পৌঁছেছে সকল বন্ধুদের কাছে।

সৌরভ : আজকের দিনে সুযোগের অভাব নেই।

কেয়া : সময়টা দুর্বোধ্য,

সৌরভ : মোটেই নয়, এই শ্রাবণ, super positive,

সায়ন : আমরা কোন অসম্ভবকে জানি না, মানি না, দেখবি—বুবাই একদিন সকল বন্ধুরা তোর হাতে হাত মেলাবে, তোকে কুর্নিশ জানাবে! তোরা একপথে হাঁটবি।

কেয়া : আমাদের অনেক প্রত্যাশা, হয়তো ফলবে আবার অনেক সোনার ফসল!

যুঁই : আবার বোঝাই হবে। রাশি রাশি, সাজবে সোনার ফসলে সোনার তরী।
(সবাই) গান: " আসিছে সে ধরা জলে, সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে,
যদিও বা নাহি আসে, তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি পরে রাখিবো রে,
মিলন আসনখানি পাতি।
আজি বরিষন মুখরিত
শ্রাবণ রাতি। "

বৃষ্টি মুখর এক রাতে

(গীতি-নাট্য)

গ্রন্থনা : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী

(বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। ঝির ঝির বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়।)

মানসী : বৃষ্টি যেন থামতেই চায়না। আকাশের মুখ ভারাক্রান্ত। কাজী নজরুল ইসলামের সেই গানটা এখন ভীষণ মনে পড়ছে—

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে
ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপন সম
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ পরে
বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে ।।

(অপর দিকে অভিষেক তার বাড়িতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে স্বগোক্তি করে—)

অভিষেক: *(গান)* বড় একা লাগে এই আঁধারে
মেঘের খেলা আজ আকাশ পারে।
সারাটি দিনের কাজে কি জানি কি ভেবে আমি
কেমনে ছিলাম ভুলে এই বেদনাকে
কে যে বলে দেবে এই আমাকে
মেঘের খেলা আজ আকাশ পারে। *(এখন বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে।)*

অভিষেক: না, এখন যেন বৃষ্টি কিছুটা বিরাম দিয়েছে। বরং মানসীর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। সেখানে গেলে গান-বাজনাও করা যাবে। একাকিত্ব ভুলে আনন্দ সাগরে একটু অবগাহনও করা যাবে।

(গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ। একটু পরেই মানসী র বাড়ির দরজায় কলিং বেলের শব্দ)

কেষ্টচন্দ্র: কে, কে কলিং বেল বাজায়? একটু দাঁড়ান। আইসতেছি । *(দরজা খোলার শব্দ)*

কেষ্টচন্দ্র: ও বাবু আপনি আইসেছেন। যান দিদিমনি ঘরে বইসা গান করতাছেন। *(অভিষেক ও কেষ্টচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করে)*

মানসী : কেষ্টদা তুমি গিয়ে ভালো করে গরম গরম দু'কাপ চা নিয়ে এসো।

কেষ্টচন্দ্র: আইচ্ছা, দিদিমনি। *(চলে যায়)* *(মানসী গান ধরে)*
একটু বেশী রাতে / মনের মানুষ ফিরল ঘরে / একটু বেশী রাতে ।

অভিষেক: জানো মানসী, তোমার গান শুনবো বলেই এসেছি। এখন কিন্তু আকাশে মেঘের ঘনঘটা নেই। আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার। মাঝে মাঝে মেঘের দু'একটা ভেলা দেখা যায়। খোলা আকাশের নীচে ছাদের উপর নিশিথের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে চলো গান শোনা যাক্।

মানসী : আবার কখন অঝোরে বৃষ্টি নামবে কে জানে।

অভি : ঠিক আছে। বৃষ্টি এলে না হয় আবার ঘরেই চলে আসবো।

মানসী : বেশ, তবে চলো ছাদেই যাই। *(একটু পরে)* দেখো, দেখো অভি, চাঁদের কি অপরূপ শোভা!

অভি : এই রাত তোমার আমার এই চাঁদ তোমার আমার
শুধু দু'জনের।
এই রাত শুধু যে গানের এইক্ষণ কুহু কূজনের
শুধু দু'জনের।

অভি ও মানসী : তুমি আছ আমি আছি তাই অনুভবে তোমারে যে পাই
শুধু দু'জনের।

অভি : আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, মেঘের ফাঁকে চাঁদটা কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

মানসী : মেঘের ফাঁকে একটু চাঁদের ঐ দেখা সে ভুল
ভুল সবই ভুল এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সে ভুল ।
প্রশ্ন করি নিজের কাছে কে আমি—

অভি : তুমি কে জান না?
তুমি শশীহে ভাতিছ গগন মাঝে
আমি যামিনী তুমি শশীহে ভাতিছ গগন মাঝে
মম সরসীতে তব উজাল প্রভাতে বিম্বিত যেন লাজে
আমি যামিনী তুমি শশীহে ভাতিছ গগন মাঝে।

মানসী : একটু আস্তে গাইতে পারো না? রাত হচ্ছে। পাশের বাড়ির লোকজন শুনলে কি বলবে?

অভি : যে যা বলে বলুক
ওদের কথায় কি আসে যায়
ওরা দিনের বেলায় সাধু সাজে
নিশিপদ্মের মধু খায়।
(মানসী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে উদ্যত হয়। অভিষেক গান ধরে —)
সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না

আজ নিশীথে কাছে থাকো না বলো না।
অনেক শিখা পুড়ে তবে
এমন প্রদীপ জ্বলে
অনেক কথার মরণ হলে হৃদয় কথা বলে না - না
চন্দ্রহারে কাজল ধোঁয়া জল ফেলো না না।

মানসী : এখন তো সুন্দরী, টুন্দরী কত কিছুই বলবে। আবার রাত পোহালেই আমাকে ভুলে যাবে—

নিশি ফুরালে কেহ চায়না আমায় জানিগো আর
আমি যে জলসাঘরে, বেলোয়ারী ঝাড় ।
আমি যে আতর ওগো আতরদানে ভরা
আমারই কাজ হলো যে গন্ধে খুশী করা
কে তারে রাখে মনে ফুরালে হায় গন্ধ যে তার
আমি যে জলসাঘরে ।

কেষ্ট : দিদিমনি নীচের ঘরে গরমা গরম আদা-চা আর পকোড়া দিয়া আইছি। এখন আবার ইলসাগুড়ি বৃষ্টি পড়তাছে। আপনারা নীচে আইয়া চা-পকোড়া খাইয়া যান। নইলে পরে কিন্তু সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবগা। খাইয়া আরাম পাইতেন না।

মানসী : ঠিকই বলেছ কেষ্টদা। তুমি যাও, আমরা আসছি। চলো তবে নীচেই যাওয়া যাক।

অভি : হ্যাঁ, তাই চলো ।

মানসী : ফ্যানটা চালিয়ে দেব?

অভি : না, তার দরকার নেই। এখন আর তেমন গরম নেই। শোন, বর্ষার উপর তোমার যে একটা ভাল হিন্দি গান জানা আছে, আরে ঐ যে ঘির ঘির আইরে বদরিয়া কারি — এই গানটা একটু শোনাও না ।

মানসী : গাইতে পারি, তবে আমার সঙ্গে তোমারও গাইতে হবে

অভি : বেশতো ধরোই না। আমিও না হয় তোমায় সঙ্গ দেবো।

মানসী : আচ্ছা, তাহলে শুরু করি?

অভি : হ্যাঁ, হ্যাঁ শুরু করো ।

মানসী : ঘির ঘির আইরে বদরিয়া কারি
কারিরে বদরিয়া কারি, কারিরে
(অভিষেক মানসীর সঙ্গে গান ধরে)

মানসী : শাওন বরষে, ভাদো বরষে, বরষে বারো মাস
বরষ বরষ দুনিয়া ভিজে ভিজেরে বিহারী
বদরিয়া কারি কারিরে বদরিয়া কারি - কারিরে।।

উভয়ে গাইতে থাকে —

চাতক বোলে কোয়েল বোলে
মোর ঝুমকে নাচে
ঔর পাপিহা পি পি বোলে পিয়াকো পুকারে
বদরিয়া কারি কারিরে বদরিয়া কারি কারিরে।।
বরষা ঋতু আই সুহানী, সব মিল মংগল গায়ে
পিয়া হমারে গয়ে বিদেশবা ছোড়ি হ্যা বটমারে
বদরিয়া, বদরিয়া কারি, কারিরে বদরিয়া কারি কারিরে।।

মানসী : আমার কিন্তু আরেকটা গান ভীষণ মনে পড়ছে
অভি : কোন গানটার কথা বলছো।
মানসী : আরে কেদার রাগে সেই গানটা।
ঐ যে — "বাদর গরজে বিজুরী চমকে করি
আই ঘনঘটা ঘোর।"
এ গানটাতো তুমি ভালোই গাইতে পারো।

অভি : আমি একাই গাইবো?
মানসী : আচ্ছা ধরোই না, আমিও না হয় তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গাইবো।
অভি : বেশ তো তাহলে হয়ে যাক্।
(গান ধরে) বাদর গরজে বিজুরী চমকে করি
আই ঘনঘটা ঘোর।
মানসীও গান ধরে — রিমঝিম রিমঝিম বুদন বরষে
পবন চলি ঝক ঝোর

অভিষেক ও মানসী - বাগমে পিউ পিউ বোলে পাপইয়া
বনমে বলে মৌর।

মানসী তান ধরে - ধাধা পামা গমা রেসা ।[১] নি্সা মাগা পাহ্মা ধাপা
র্সার্সা ধাপা হ্মাপা ধাপা ।[৩] মামা রেনি রেরে সাসা

উভয়ে এক সঙ্গে - বাদর গরজে বিজুরী চমকে করি
আই ঘনঘটা
আই ঘনঘটা

আই ঘনঘটা ঘো - র ।।

"বাদর গরজে" গানটির স্বরলিপি

বর্ষা ঋতুর গান । রাগ কেদারা — তাল - ত্রিতাল

স্বরলিপি

স্থায়ী ঃ-

০	১	+	৩
হ্ম পা হ্মপা ধা	পা মা রা সন্‌সা	মা গা পা হ্ম	ধা ধা পা পা
বা দ র০ ০	গ র জে বি০০	জু রী চ ম	কে ০ ক রি

০	১	+	৩
সা সা ধা পা	হ্ম প ধা পা	মা মা রা মা	রা রা সন্‌ সা
আ ০ ই ঘ	ন ০ ঘ টা	ঘো ০ ০ ০	০ ০ ০ র

অন্তরা

০	১	+	৩
পা পা র্সা ধ	র্সা র্সা র্সা র্সা	সা না ধা না	র্সা র্সা র্সা র্সা
রি ম ঝি ম	রি ম ঝি ম	বু ০ দ ন	ব র যে ০

০	১	+	৩
র্সা র্সা ধা ধা	ধা না র্সা র্রে	র্সা র্সা ধা ধা	পা পা মা মা
প ব ন চ	লে ০ ঝ ক	ঝো ০ ০ ০	০ ০ ০ র

০	১	+	৩
সা সা মা মা	মা মা মা মা	পমা গা পা হ্ম	ধা ধা পা পা
বা ০ গ মে	পি উ পি উ	কে ০ লে প	প ই ০ য়া

০	১	+	৩
হ্ম পা ধা সা	ধা ধা পা পা	মা মা রে মা	রা রা সা নি্‌সা
ব ন মে ০	বো ০ লে ০	মৌ ০ ০ ০	০ ০ ০ র

তান- ০	১	+	৩
ধাধা পমা গমা রেসা	নসা মগা পহ্ম ধপা	র্সার্সা ধপা হ্মপা ধাপা	মম রেনি রেরে সাসা

অভি : অনেকক্ষণ তো রইলাম, গানও শুনলাম। এবার তবে যাবার অনুমতি দাও

মানসী : না, যেওনা রজনী এখনো বাকি
আরো কিছু দিতে বাকি
বলে রাত জাগা পাখি।
আমি যে তোমারি শুধু জীবনে মরণে
ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে।।
না, যেওনা, রজনী এখনো ..... জাগা পাখি
না, যেওনা।

(অভিষেক ফুলদানী থেকে একগোছা রজনীগন্ধা তুলে এনে মানসীর হাতে দিয়ে বলে —)

অভি : এ যেন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা, তোমারই ফুলদানী থেকে একগোছা রজনীগন্ধা তোমার হাতে দিয়ে বলি —
একগোছা রজনীগন্ধা হাতে দিয়ে বললাম
চললাম, চললাম।
বেশ কিছু সময় তো থাকলাম
ডাকলাম মন রাখলাম
দেখলাম দু'টি চোখে বৃষ্টি
বৃষ্টি ভেজা দৃষ্টি
মনে করো আমি এক মৃত কোন জোনাকি
সারা রাত আলো দিয়ে জ্বললাম
চললাম। চললাম।।

(অভিষেক চলে যায়। গাড়ি যাবার শব্দ। মানসী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।)

বাপুজী

বিভু ভট্টাচার্য

প্রথম অভিনয় ঃ ত্রিপুরা থিয়েটার
রবীন্দ্রভবন ২ নং প্রেক্ষাগৃহ
আগরতলা- ২৬ এপ্রিল, ২০১৯

(কোন অনুষ্ঠান শুরু হবে। মঞ্চ প্রস্তুত। ঘোষকের কণ্ঠে তারই পূর্বাভাষ। মৃদু শব্দ তাল ও লয়ে একটা গান বাজতে পারে, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম।

ঘোষক ঃ (পুরুষ বা মহিলা) সুধী সজ্জনমন্ডলী।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে আপনারা সকলেই অবগত হয়েছেন যে ভারতের কৃতি সন্তান, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আমরা প্রায়শই যাকে বাপুজি বলে সম্বোধন করি, তিনি শুধু আমাদের দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীরই একজন মহান পুরুষ।

যাই হোক তাঁর জন্মসাল ১৮৬৯। অর্থাৎ ভারতে তখন চলছে পুরো ইংরেজ রাজত্ব। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এদেশের মানুষের জীবনে অধিকারের সংজ্ঞাটাই ছিল অজ্ঞাত। অধিকাংশ ভারতবাসীর ধারণা ছিল 'অধিকার আবার কি'! 'মা ফলেষু কদাচন', 'কর্তব্য কর্ম করে যাও, ভাগ্য অনুযায়ী, তুমি ফল পাবে।' এটাই একটা বিস্ময় যে গান্ধীজিই সর্বপ্রথম ভারতের মত বিশাল দেশের সাধারণ মানুষকে সেই অধিকার সম্পর্কেই সচেতন করার কথা ভেবেছিলেন এবং দেশের আপামর জনগণ তাতে উদ্বুদ্ধও হয়েছিলেন।

তবে একথা ঠিক যে গান্ধীজি নানা কারণে অনেকের বিরাগভাজন। এটা তাঁর সমস্যা নয়, ঐসব মানুষের। তাঁকে কম জানা বা তাঁর সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিতে , ক্ষতি সাধারণ মানুষের। তবে গান্ধীজি সন্ত বা অবতার নন, সে দাবিও তার নেই। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি তাঁর গোটা জীবনকে সত্যের এক গবেষণাগার করে গড়ে তুলেছিলেন। যাই হোক তাকে এবং তাঁর কার্যধারাকে বিচার করতে হবে সেই সময়েরই পরিপ্রেক্ষিতে।

মাননীয় সুধীমন্ডলী, সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁরই মস্তিস্ক প্রসূত সত্যাগ্রহ ও শাসকদের অসহযোগিতা- এ দুটি নতুন দিশা। বিশেষ করে নন্ কোঅপারেশন মুভমেন্ট তো সারা পৃথিবীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব কর্তৃক সমাদৃত। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে সকল ভবিষ্যৎ - বক্তার হৃদয়ে সাহস থাকে, মনে থাকে বিনয়, যাদের চেহারায় বোঝা যায় যে তারা ভয়হীন, গান্ধীজি তাদের দলে। সত্যরূপী

ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবনে দায়িত্ব স্বীকার, চরিত্রের দৃঢ়তা ইত্যাদি মূল্যবোধে, তার মনের ভান্ডার ছিল পরিপূর্ণ। এসব মূল্যবোধ দেশীয় বা মহাদেশীয় নয়, বিশ্বজনীন।

তাই বর্তমান কালেও গান্ধীজির আদর্শ প্রাসঙ্গিক। সারা পৃথিবীতে চলছে তীব্র জাতি বর্ণ বিদ্বেষ, দেশে দেশে সংঘর্ষ। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি দেখান অন্য পথ। অহিংসার পথ, সত্যের পথ। এই পথে চলতে চলতে, বলতে গেলে বাপুজী বর্তমানে হয়ে উঠেছেন মানুষের নৈতিক শক্তি সমূহের- বিশ্বমানের প্রতিনিধি। তাঁর জীবনে বলতে গেলে বাপুজী বর্তমানে হয়ে উঠেছেন মানুষের নৈতিক শক্তি সমূহের- বিশ্বমানের প্রতিনিধি। তাঁর জীবনে গৃহীত নীতি ও রীতিতে আকৃষ্ট হয়েছেন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলার মত কৃতি মানুষ। বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর সম্পর্কে বলেন, এ্যা রোল মডেল ফর জেনারেশন টু কাম।

(দর্শকের মধ্য থেকে উঠে হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে কিছু বলতে চায়)

দ-১ : ও দাদা, আর কত বক্তৃতা করবেন! অনুষ্ঠানটা আরম্ভ করুন না!

ঘো : হ্যাঁ ভাই কিছু বললেন!

দ- ১ : বলছি, ভূমিকা সংক্ষেপ করে আসল কথা কি বলবেন বলুন!

ঘো : আমি কি কিছু ভুল বললাম!

দ-২ : আহা কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই দাদা! দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলবেন তো!

ঘোষক : হা হা হা, দেখুন, এই যে আপনারা গান্ধীজীকে নিয়ে শুরুতেই যেভাবে রিঅ্যাক্ট করলেন তাতে আমরা কিন্তু খুশী। কারণ আমাদের ভুল হলে তাও শুধরে নিতে পারব। আসুন না মঞ্চে উঠে আসুন!

দ-২ : **(দুদিক থেকে দুজন উঠতে উঠতে)** আহা, শুনুন না যে দেশে যে নিয়ম। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তখন কালা আদমিদের রেলের ফার্স্ট ক্লাসে চড়া বারণ, তো টিকিট আছে বলেই কি আপনাকে রেল কোম্পানী ফার্স্টক্লাসে নিতে বাধ্য! রাইট রিজার্বড্ বলে একটা কথা তো রয়েছে নাকি?

ঘোষক : বাঃ সবই তো জানেন দেখছি।

দ-১ : জানব না কেন! ইন্টারনেট তো এখন হাতে হাতে!

ঘোষক : বেশ, বেশ! শুনুন ঠিক এই ঘটনা থেকেই গান্ধীজী শিক্ষাগ্রহণ করেন যে ওখানকার শাসকদের ভেতরের যে মহারোগ, সেটা হলো বর্ণবিদ্বেষ! তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে সরব হতে লাগলেন। যার প্রভাব পরিবর্তীকালে ভারতবর্ষেও পড়েছিল।

দ-১ : আপনি তো মশাই অনেক কথাই বলছেন। কিন্তু এটা তো আপনি মানবেন

যে গান্ধীজি ছিলেন ভীষণ দুর্বলচেতা মানুষ। ক্রমাগত নিজের মত পাল্টানোতে তার কোন জুড়ি নেই। এখন এটা বলছেন তো পরক্ষণেই অন্যটা।

দ - ২ : হ্যা আপনি ঠিক বলেছেন। মতামত দেবার ক্ষেত্রে এই দোদুল্যমানতা, তা কোনভাবেই নেতৃত্ব দান-কারী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের চরিত্র নয়।

ঘোষক : দেখুন, এ সম্পর্কে গান্ধীজি পরিস্কার। তিনি নিজেই জানতেন তার দূর্বলতার কথা। তাই এ সম্পর্কে তার কথা স্পষ্ট। **(ছোট্ট একটা লাইটে গান্ধীজি)**

" আমি দাবী করি না যে আমি অভ্রান্ত। আমিও রক্ত মাংসের মানুষ, আমারো ভুল হয়। কিন্তু সেটা কোনভাবেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। দ্বিতীয়ত সমাজের কোন বিষয়ই স্থির থাকে না, নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই সে সম্পর্কে আমার মতও পরিবর্তিত হতে পারে। যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমার পূর্বেকার মত পরিবর্তিত হয় তাহলে সে সম্পর্কে আমার পরের মতটাই গ্রাহ্য।" (গান্ধীজির উপরে ছোট লাইট অফ)

দ-১ : আচ্ছা, এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে রবীন্দ্রনাথ উনাকে মহাত্মা উপাধি
: দিয়েছেন একমাত্র সেজন্যই কি সেটা আমাদের সকলকে মানতে হবে!

দ - ২ : ঠিকই তো, তিনি এমন কি কাজ করেছেন যে অনাদিকাল তাকে আমাদের সেভাবেই ডাকতে হবে?

ঘোষক : হা হা হা! দেখুন এটা ব্যক্তিগত মত। আমি আপনাদের সঙ্গে তর্ক করবো না। তবে আপনাকে এটা বলতে পারি এবং আশা করি এটা আপনিও মানবেন যে আমাদের দেশের নতুন প্রজন্ম অন্তত কিছু কিছু ছেলে মেয়ে কিন্তু গান্ধীজি সম্পর্কে বা ধরুন আমাদের সাম্প্রতিক অতীত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

(দর্শকদ্বয় ও ঘোষক অন্ধকার। মঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে আনমনে কবিতা পড়তে থাকে। অন্য নাট্যাংশ। মোহন, পরনে পুরনো হাফ প্যান্ট, খালি গায় খেলছে দেখে মা পুতলিবাঈ আসেন।)

পুতলি : মোহন, তুমি ওর সঙ্গে খেলবে না। (হাতে ধরে টেনে মঞ্চে আনে। (ছেলেটি হা করে তাকিয়ে থাকে)

মোহন : খেলব না, কেন মা!

পুতলি : ওদের সঙ্গে আমাদের জল-চল নেই।

মোহন : জল-চল কি মা!

পুতলি : পান করার জন্য ওরা জল দিলে, সেটা পর্যন্ত আমাদের গ্রহণ করা বারণ।

মোহন : কেন মা!

পুতলি : ওরা যে ছোট জাত। অস্পৃশ্য!

মোহন : অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্য কি মা!

পুতলি : যাদের স্পর্শ করা উচিত নয়।

মোহন : ছোট আর বড় জাত কি করে হয় মা?

পুতলি : ওঃ এতসব এই বয়সে বুঝবে না, বড় হলে সব জানতে পারবে।

মোহন : কিন্তু মা ও যে আমাদের মতই মানুষ!

পুতলি : মানুষতো সকলেই; কিন্তু মানুষে মানুষে ভেদাভেদ হয় না!

মোহন : ওর মা কিরকম সুন্দর নাড়ু বানায় জানো! খুব মিষ্টি। আমি খেয়েছি তো!

পুতলি : এ্যা! সর্বনাশ, বলে কি! একদম না। কি বোকা ছেলে আমার। কিচ্ছু বুঝে না। আরে ওরা নীচু জাত। আমাদের থেকে অনেক ছোট। ওদের ছুঁলে তোমার জাত যেতে পারে। তখন!

মোহন : জাত কি করে যায় মা!

পুতলি : ওঃ এই ছেলের সঙ্গে আর পারি না বাবা। চল্ চল্ (টানতে টানতে প্রস্থান) (প্রবেশ করে টিচার/ আন্টি)

কবিতা : আরে আন্টি! এসো এসো । তুমি আমাকে " ছোটবেলার গান্ধী " নামে যে চটি বইটা দিয়েছিলে সেটা শেষ করেছি।

আন্টি : শেষ করেছ, কেমন লেগেছে?

কবিতা : খুব ভাল। অস্পৃশ্যতা যে ভারতীয় সমাজের একটা ক্ষত, তা ছোটবেলা থেকেই গান্ধীজীর মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু আন্টি, আমি আরো জানতে চাই। তুমি আমাকে আরেকটা বই দাও না প্লীজ।

আন্টি : দেব নিশ্চয়ই দেব। তবে তোমার জানার জন্য বলছি এদেশের পড়াশুনা শেষ করে গান্ধীজি চলে গেলেন লন্ডন, উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং সেখান থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে ভারতে ফিরে এলেন।

কবিতা : কি বললে গান্ধীজি ব্যারিষ্টার!

আন্টি : হ্যা তিনি উচ্চশিক্ষিত! কিন্তু দেখলে একদম মনে হয় না! তিনি অনেকগুলো ভাষা জানেন।

কবিতা : বাঃ তাঁর চলা ফেরায় বুঝাই যায় না যে তিনি এত বড় একজন পন্ডিত ব্যক্তি!

আন্টি : যা হোক ভারতে তার আইন ব্যবসা তেমন জমলো না। তাই তিনি একটা প্রাইভেট জব নিয়ে চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা। এবং সেখানে ক্রমশ সাধারণ মানুষদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে নেতৃত্বের ভূমিকায় চলে গেলেন। শুরু করলেন সমাজ সেবা। সৃষ্টি করলেন ফিনিক্স আশ্রম। বেশ কয়েকবছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে গান্ধীজি ফিরে এলেন ভারতে । সত্যের খোঁজে আর মানুষের কল্যাণে গড়ে তুললেন সবরমতী আশ্রম।

কবিতা : গুজরাটের সবরমতী নদীর তীরে যে আশ্রম সেটাই তো সবরমতী আশ্রম।

আন্টি : হ্যা। রবিঠাকুরের উল্লেখযোগ্য কীর্তি যেমন শান্তিনিকেতন, তেমনি সবরমতী আশ্রম হলো গান্ধীজির জীবনের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি। ধরো, এই বইটা নাও। সবরমতী আশ্রম গড়ে তোলা থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজির জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুমি এই বইতে পাবে। বইটির লেখকও খুবই কীর্তিমান। আশা করি তোমার ভাল লাগবে।

কবিতা : ঠিক আছে আন্টি।

আন্টি : আর শোন বইটি পড়ে যদি কোথাও বুঝতে তোমার অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে বলো, কেমন!

কবিতা : ঠিক আছে।

আন্টি : তাহলে আমি আসি!

কবিতা : হ্যা আন্টি, এসো!

(আন্টির প্রস্থান, কবিতা বইটি পড়তে পড়তে এগোয়।) লাইট অফ/অন ছোটেলাল, ধাঙড়, তার স্ত্রী গান্ধীজির কাছে এসে আশ্রমে থাকতে চায়। গান্ধীজির কাছে আসে)

ছোটেলাল : বাবা আমি ছোটেলাল।

গান্ধীজি: তো এখানে কি চাই!

ছোটেলাল : আমরা আপনার আশ্রমে থাকতে চাই।

গান্ধীজি: অন্য জায়গায় থাক না! এখানে তো জায়গা বেশী নেই।

ছোটেলাল : আমরা ধাঙড়। কেউ আমাদের থাকতে দেয় না।

গান্ধীজি: সঙ্গে ওরা কে?

ছোটেলাল : এ আমার জেনানা। আর ইটা আমার বেটি, লছমী। বাবা, শহর ইলাকায় কাজ কাম খুব বেশি পাওয়া যায়। আপনার যদি কোন আপত্তি না তাকে তো আমরা স্বামী স্ত্রী আর বেটি আশ্রমে থাকতে চাই। সকালবেলা আমাদের কাজ করব আর সারাদিন আশ্রমের কাজ-কাম করতে পারব।

গান্ধীজি: বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই । তবে আশ্রমের কিছু নিয়ম কানুন আছে, সেগুলো তোমাদের মেনে চলতে হবে। যেমন ধরো আশ্রমের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, আশ্রমের জন্য জল তোলা, বাগান করা, অতিথি সেবা করা, কিছু কিছু পড়াশুনা করা, প্রতিদিন প্রার্থনা সভায় যোগদান করা ইত্যাদি।

ছোটে স্ত্রী : হা বাবা হামদের কুন আপত্তি নাই। আমরা সব কাজ করব, আপনার সব কথা শুনব, আশ্রমের সক্কল নিয়ম কানুন মেনে চলব।

ছোটেলাল : হা বাবা হা।

গান্ধীজি : ঠিক আছে। তাহলে, মগন ঐ যে আমাদের আশ্রমের মগনলাল আছে না, ওর সঙ্গে দেখা করো। আর বলো, আমার সঙ্গে তোমাদের কথা হয়েছে। ও যেন তোমাদের থাকার ঘর দেখিয়ে দেয় আর কি কি করতে হবে সেটা যাতে বলে দেয়। কেমন!

ছোটে : হা বাবা।

স্ত্রী : হা বাবা পর্‌ণাম ! (দুজনেই প্রণাম করে। প্রস্থান)
(প্রবেশ করে হরিভাই বিত্তবান ব্যবসায়ী)

হরি : ও ভাই মগললাল!

মগন : হা জি!

হরি : কেমন আছ!

মগন : ভাল জি!

হরি : কি শুনছি! অবস্থা নাকি মোটেও ভাল নয়!

মগন : নাঃ আমি তো এমন কিছু জানি না ! কি হয়েছে যদি দয়া করে বলেন!

হরি : ছোট জাত, অস্পৃশ্য সব লোক নাকি এখন আশ্রমে ঢুকছে, ঘর বাড়ী বানাচ্ছে!

মগন : আরে বলেন কি শেঠজি, এও কি সম্ভব?

হরি : না, বলছিলাম কি, আমাদের টাকায় আশ্রম চলবে আর সমাজের অস্পৃশ্য লোকদের জায়গা দেবে তা তো চলবে না মগন!

মগন : ও বুঝতে পেরেছি। আপনি ছোটেলাল আর তার স্ত্রী ও মেয়ে লক্ষ্মীর আশ্রমে থাকার কথা বলছেন তো! ও তারা এক কোনায় পড়ে থাকবে। কি যায় আসে!

হরি : না না মগনলাল টাকা দিই আমরা। আমাদের মতামত বলেওতো একটা কথা আছে নাকি!

মগন : নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। তো কি করব বলুন!

হরি : দেখো ভাই, ছোটলোকদের খাওয়াবার মত টাকা বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নাই।

মগন : শেঠজি আপনি বাবাজির সঙ্গে দয়া করে একটু কথা বলুন না।

হরি : আমার কথা বলার কোন দরকার নাই। ই-মাস থেকে আর কোন টাকা আশ্রমকে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় । তুমি বাবাজিকে কথাটা বলে দিও। যত্তসব। (দ্রুতবেগে প্রস্থান)

মগন : আচ্ছা (চিন্তিত, গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলতে আসে।)

গান্ধীজি : দেখি কি করা যায়। কিন্তু ছোটেলাল আর তার স্ত্রী ও কন্যা আশ্রমে থাকবে। (গান্ধীজির প্রস্থান, প্রবেশ করে একজন লোক)

লোকটি : (মগনের হাতে একটি টাকার বান্ডিল দেয়)। মগনলাল টাকাটা রাখুন। আশ্রমের জন্য।

মগন : আপনার নাম কি?

লোকটি : নাম বলা যাবে না।

মগল : আমাকে রসিদ কাটতে হবে।

লোকটি : আমার রসিদ লাগবে না।

মগন : রসিদ ছাড়া আমি টাকা রাখতে পারব না।

লোকটি : টাকাটা আশ্রমের কাজে লাগবে।

মগন : আপনার নামটা বলে যান।

লোকটি : আশ্রম যাতে বন্ধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

মগন : বাবাজীকে বলতে হবে।

লোকটি : তার প্রয়োজন নেই। আশ্রম যাতে বন্ধ না হয় সেটা দেখবেন। প্রয়োজনে আরো সাহায্য দেওয়া যাবে। (লোকটি চলে যায়। মগনলাল স্তব্ধ। প্রবেশ করেন কস্তুরবা)

কস্তুরা : মগন, মগন!

মগন : হা মাঈজী!

কস্তুরা : কি শুরু করেছ তোমরা!

মগন : কেন মাঈজী!

কস্তুরা : আশ্রমে কি আর থাকা যাবে না?

মগন : কেন মাইজী?

কস্তুরা : অস্পৃশ্য লোকেরা যেভাবে দাপিয়ে আশ্রমে দিন কাটাচ্ছে তাতে কি আর ভদ্রলোকদের থাকার উপায় আছে? এই যে ছোটেলাল, ঐ ধাঙড় লোকটি, তার স্ত্রী বা মেয়ে লক্ষ্মী যা-তা শুরু করেছে, তোমরা কি এসব দেখতে পাওনা! নিয়ম শৃঙ্খলা কি লাটে উঠল? বাকি রইল কি ছোটলোক অস্পৃশ্য লোকেদের হাতে ভাত খাওয়া?

মগন : মাঈজি, আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি কি আর করতে পারি বলুন !

কস্তুরা : আশ্চর্য ! আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছ তুমি, আর সেই তুমি বলছ এ কথা!

মগন : তবে এটা বলতে পারি মাঈজি, আমি এ বিষয়ে আপনার কথা বলে বাপুজীর সঙ্গে কথা বলব।

কস্তুরা : হ্যা বলবে ! বলবে যে আশ্রমের প্রায় সকলেই উদ্বিগ্ন। সকলেই এর একটা সমাধান চাইছেন। আমার পরিস্কার কথা ঐ অস্পৃশ্য লোকেদের রান্না, বা বাসন ধোওয়া ইত্যাদি কোন কাজ করতে দেওয়া যাবে না।

মগন : হা মাঈজি। আমি সব বলব।

কস্তুরা : হ্যা আমিও বলব।

(মাইম দৃশ্য- কস্তুরী গান্ধীজিকে বলেছেন, গান্ধীজি ধৈর্য্য ধরে কোন মন্তব্য না করে সব শুনছেন)

গান্ধীজি : বেশ সব শুনলাম। এবার তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

কস্তুরা : হ্যা বলো !

গান্ধীজি : তুমি আমার ধর্মপত্নী তো!

কস্তুরা : হ্যা নিশ্চয়ই!

গান্ধীজি : দেখো আমি যদি কোন পাপ করি তার জন্য দায়ী তো আমিই! তাই নয় কি!

কস্তুরা : হ্যা নিশ্চয়ই!

গান্ধীজি : (নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন)

গান্ধীজি : আমি যদি কোন অন্যায় করি বা তোমার উপর চাপিয়ে দিই তাহলে সেটা আমার পাপ!

কস্তুরা : তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

গান্ধীজি : আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ঐ অস্পৃশ্যদের পাড়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করব। আমার সঙ্গে তোমার অসুবিধা হবে তাই তুমি পোরবন্দরে গিয়ে থাক।

কস্তুরা : না না এ কি কথা! আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব।

গান্ধীজি : বেশ। মগনলাল!

মগন : (ঘাবড়ে যায়) বাপুজী !

গান্ধীজি : ছোটেলাল, তার স্ত্রী আর তার মেয়ে লক্ষ্মীকে এখানে ডাকো।

মগন : বাপুজী !

গান্ধীজি : যা বলছি তাই করো, তাদেরকে ডাকো।

মগন : (ডাকে) ছোটেলাল! তোমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এখানে এসো। বাপুজী ডাকছেন! (সকলে লাইনে)

গান্ধীজি : ছোটেলাল! কেমন আছ!

ছোটেলাল : ভাল বাপুজি হামরা সকলেই ভাল আছি। হামদের জন্য আপনার কোন অশান্তি হয়েছে কি!

গান্ধীজি : তোমার জন্য অশান্তি হলেই বা কি করবে!

ছোটেলাল : অশান্তি হলে আমরা আশ্রম ছেড়ে চলে যাব বাপুজি।

ছো-স্ত্রী : হ্যা বাপু! (কাঁদে) আপনার কোন অসুবিধা সইতে পারব না। হামরা চলে যাইবে।

গান্ধীজি : না না তোমাদের জন্য কোন অসুবিধা নয়। শোন! আমি আজ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছি যে আমাদের আশ্রমবাসী ধাঙড় ছোটেলালের কন্যা লক্ষ্মীকে

আমি আমার দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করলাম।
(কস্তুরবাঈ, মগনলাল, ছোটেলাল, স্ত্রী সকলে চমকে উঠে, আর লক্ষ্মী মিষ্টি হেসে গান্ধীর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়)

কস্তুরা : বাপুজী ! এ তুমি কি করলে! (মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদে)

গান্ধীজি : লক্ষ্মী ! তোমার নূতন মাকে প্রণাম করো। (লক্ষ্মী কস্তুরাকে প্রণাম করে, কস্তুরাও লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে)

ছোটে-স্ত্রী : লক্ষ্মী তোমার বাবাকে (গান্ধীজিকে দেখিয়ে) প্রণাম কর। (লক্ষ্মী তাই করে। সকলের চোখে জল)

লক্ষ্মী : মাম্মি! দত্তক কন্নিয়া ক্যা হ্যায় মাম্মি! ছোটে-স্ত্রী: ও তু নেহি সমঝেগি!

লক্ষ্মী : বলো না, বলো না মাম্মি দত্তক কন্নিয়া ক্যায়া হয়!

গান্ধী : শুন ! তুমহারা মা বাপসে হাম তুমকো গোদ লে -লিয়া! আভি তুমহারা দেখভাল হাম করেগা! সমঝি!

লক্ষ্মী : ও হ্যা লেকিন হামারা খুদিকা মা বাপ!

গান্ধী : ঠিকই রহেগা। তুম তো সৌভাগ্যবতী হো! তুমহারা দো মা আর দো বাপ মিল গিয়া। ঠিক হ্যা না?

লক্ষ্মী : হ্যা তব তো ঠিক হ্যায়। বহুৎ মজা আয়েগি! চলো মাম্মি চলো। (সকলে বেরিয়ে যায়)

গান্ধীজি: কস্তুরবা ! আজ থেকে তুমি এক অস্পৃশ্য কন্যার জননী হলে। তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। কস্তুরবা! (গান্ধীজির উপর আলাদা লাইট) অস্পৃশ্যতা হলো হিন্দু ধর্মের কলঙ্ক। অস্পৃশ্যতা প্রাচীন হিন্দুধর্মের অঙ্গ ছিল না। কাজ দিয়ে মানুষের জাত বিচার করা অর্থহীন। সমাজে কোন কাজটা না করলে চলে বলতো? বুদ্ধদেব অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। চৈতন্যদেব বলতেন 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়নঃ অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে চন্ডালও ব্রাহ্মণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অস্পৃশ্যরা হলো হরিজন অর্থাৎ হরির আপনজন, ঈশ্বরের কাছের সন্তান। কস্তুরবা! আজ বলে রাখি যদি কোন দিন সম্ভব হয় তাহলে দেশের সকল অস্পৃশ্যদের, সকল ভারতীয়দের সঙ্গে সমান আসনে বসাবার আইনি উদ্যোগ গ্রহণ করবো। (লাইট অফ, কিশোরীর লাইট অন)

কবিতা : আন্টি, আন্টি!

আন্টি : হ্যা বালো!

কবিতা : দেখো, দেখো আন্টি কি লিখেছে ' অস্পৃশ্যতা যদি বেঁচে থাকে তাহলে হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে অস্পৃশ্যতা টিকে থাকার চেয়ে হিন্দু ধর্মের মৃত্যুও শ্রেয়।' জানো আন্টি, গান্ধীজি সম্পর্কে যত পড়ছি ততই অবাক হচ্ছি। কিন্তু একটা বিষয় আমি এখনো কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

আন্টি : কি বুঝতে পারছ না কবিতা? কি অসুবিধা হচ্ছে বলো আমায়!

কবিতা : না মানে ধরো রবিঠাকুর। দেশে প্রথম নোবেল পেয়েছেন। অথবা ধরো স্বামী বিবেকানন্দ! সমস্ত কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈস্বর' এসব কথা প্রচার করেছেন। অথবা ধরো নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর নেতাজী সুভাষের নাম তো যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। নেতাজীর নাম বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার কথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আন্টি! গান্ধীজিকে নিয়ে তো এরকম কিছু জানি না!

আন্টি : সব ঠিক আছে। দেখো তুমি যে তিন মহাপুরুষের কথা বললে তারা সকলেই বাংলার। ফলে তাদের সম্পর্কে নানা তত্ত্ব বা তথ্য আমাদের মজ্জায় মিশে গেছে। অন্যদিকে গান্ধীজি সম্পর্কে আমাদের পড়াশুনাও তেমন যথেষ্ট নয়। যেমন তাঁর জন্মকালে ঐ প্রদেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতি কিরকম ছিল। সেকেন্ডলি তুমি যাদের নাম বললে, রবিঠাকুর বা নেতাজী তাদের সঙ্গেও কিন্তু নানা সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে গান্ধীজির মতবিরোধ হয়েছে।

কবিতা : নেতাজীর সঙ্গে মতবিরোধের কথা তো কিছু জানি। কিন্তু রবিঠাকুরের সঙ্গে কি নিয়ে মতভেদ হয়েছিল?

আন্টি : সে এক কান্ড। শোন, ঘটনাটা আমি বইপত্র পড়ে যেরকম জেনেছি। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্পে সাত হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছিল। 'হরিজন' পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়ে গান্ধীজি বললেন 'বিহারে বর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা-পাপই এই ধ্বংসলীলার মূল কারণ।' বিবৃতিটি প্রকাশের পরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতভাবে এর বিরোধীতা করেন।

কবিতা : ঠিকই তো। আরে বাবা ভূমিকম্প তো প্রাকৃতিক বিষয়। এর সঙ্গে পাপ পুণ্যের কি সম্পর্ক!

আন্টি : ঠিক তাই। কিন্তু দেখো রবিঠাকুরের মত মহাপুরুষরাই কিন্তু আবার গান্ধীজি সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত।

কবিতা : বাঃ এতো দেখছি একই অঙ্গে ভিন্ন রূপ! কি দেখতে পেলেন তাঁরা গান্ধীজির মধ্যে !

আন্টি : হ্যা, তাঁরা গান্ধীর মধ্যে দেখেছেন গভীর দূরদৃষ্টি আর জাতপাত নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জন্য গভীর মমতা আর ভালবাসা।

কবিতা : আন্টি! ধীরে ধীরে কি বিষয়টা খুব জটিল হয়ে উঠেছে! আমি কিন্তু খুবই হাল্কাভাবে জানতে চেয়েছিলাম।

আন্টি : না না কোন জটিলতা নেই। দ্যাখো, তাঁর মত অনুযায়ী তাঁর কাজের ধারাকে

আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একদিকে হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পঞ্চায়েত ইত্যাদি নিয়ে দেশ কিভাবে চলবে তার একটা প্রকরণ আর দ্বিতীয়টি হলো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কিভাবে চলবে। এই দুটি বিষয়েও অন্যদের সঙ্গে মতভেদ রয়েছে কিন্তু তাঁর মতও স্পষ্ট। তিনি অহিংসার পূজারী, তাই আবেদন নিবেদনের পক্ষপাতি ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

কবিতা : বেশ, বলো। (কবিতা আন্টির লাইট অফ ওদিকে গান্ধী মগনের লাইট অন) (গান্ধীজি এককোণে বসে লিখছেন। খুবই চিন্তিত মনে হয়। মগনলাল এসে বসে)

মগন : বাপুজী! (বাপু তাকান) শরীর ঠিক আছে!

গান্ধী : হ্যা ঠিকই আছে ! কি, কিছু বলবে?

মগন : নাঃ বলেছিলাম কি, আপনার কাছে তো রোজ কত কিছুই শুনি। তো এ অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টজনকে আসতে বলেছিলাম। আপনার সামনে বসে আমরা মত বিনিময় করবো।

গান্ধী : বেশ তো আমার কোন অসুবিধা নেই।

মগন : বাপুজি। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। কিভাবে চলবে বছরের পর বছর এদেশের বিরাট কর্মযজ্ঞ?

গান্ধী : উঃ কিন্তু মগন, আমি তো চটজলদি এর কোন সমাধান দেখি না। তবে এই বিশাল দেশে সম্পদও প্রচুর। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। দেশের উন্নয়নে এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

মগন : বাপুজী ! সাত লক্ষেরও বেশি গ্রাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষইতো গ্রামে থাকে।

গান্ধী : হ্যা দেশের মূল উৎপাদিকা শক্তি হল কৃষি। এই কৃষিকে কাজে লাগাতে হবে তবেই উন্নতি দ্রুত সম্ভব। পঞ্চায়েতি -রাজ কথাটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মগন : কি বললেন? পঞ্চায়েতি রাজ?

গান্ধীজি : হ্যা পঞ্চায়েতিরাজ। বিষয়টিকে সুনিশ্চিত অহিংস পরিকল্পনায় গড়ে তুলতে হবে। দরকার সাহসী, যৌথ এবং বিচক্ষণ উদ্যোগ।

মগন : বেশ, কিন্তু পঞ্চায়েতি- রাজ ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে কি কিছু ভেবেছেন?

গান্ধী : দেখো আমার ভাবনায় যা হওয়া উচিত সেটা হলো জীবন পিরামিডের মতো হবে না। অর্থাৎ ভিত্তি তার চূড়াকে শুধু ধরে রাখবে না। এ হবে এক মহাসাগরীয় বৃত্ত, যার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ। গ্রামের উন্নতির জন্য গ্রাম বৃত্তের সকলে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করবে। সৃষ্টি হবে সম্মিলিত উদ্যোগ।

মগন : ঐ তো সকলে এসে পড়েছেন। আসুন আসুন আপনারা সকলে আসন গ্রহণ করুন। বাপুজী আমরা তাহলে আলোচনা শুরু করি।

গান্ধী : হ্যা।

(লাইট অফ/ অন)

(পঞ্চায়েত - রাজ্যের গ্রাম পরিচালনার একটি নমুনা। উঁচু নীচু আসনের বৃত্তে ৫/৬ জন বসে সভা করছেন)

ম : এলাকার নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কি কি করা যেতে পারে, এই মর্মে উপস্থিত সকলের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

২ : বাপুজি আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে আমার প্রস্তাব সেভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

৩ : নির্দিষ্টভাবে বললে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

৪ : পঞ্চায়েত রাজে ভারতে যারা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পাবে তারা হলো কৃষক। কিভাবে তার অগ্রগতি ঘটানো যায় সেটাই প্রশ্ন।

৫ : একটা কথা প্রথমেই পরিস্কার হওয়া দরকার সেটা হলো আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে সেটা কিভাবে ফয়সালা হবে!

৬ : আমার মনে হয় তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, বিবাদ কিভাবে এড়ানো যায় সেটা আমাদের গ্রামবাসীদের শেখাতে হবে। সন্দেহ নেই বিষয়টি জটিল কিন্তু আখেরে আমাদের লাভই হবে।

ম : বাপুজি এবার আপনি কিছু বলবেন?

গান্ধীজি : দেখো আমি যা ভেবেছি, পঞ্চায়েতে পুলিশ মিলিটারি নয়, নিজেদের মধ্যে সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবাদ মেটাতে হবে। আর কৃষিকাজ সহ গবাদি পশুর দিকে সম্পূর্ণ নজর দেওয়া পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত। অন্যদিকে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে, এবং জাতপাত নয়, হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রীষ্টান সকলে একসঙ্গে আত্মীয়ের মত থাকার পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে নিতে হবে। মূল কথা যে যার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

ম) : হ্যা, মূল কথা হলো নিজেদের দ্বারা নিজেদের শাসন করা।

২) : জমিতে সার অসুধ প্রয়োগের বিধান দিয়ে কৃষকদের উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা পঞ্চায়েতকে করতে হবে।

৩) : মাদকদ্রব্য বর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা জরুরী।

৪) : গ্রামে খেলাধূলা, গান, বাজনা প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসবে গ্রামের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫) : পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্কুল স্থাপন করে 'নয়ী তালিম' এর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা দরকার।

৬) : বছরে একবার, প্রয়োজন হলে আরো বেশি, গ্রামের সকলকে ডেকে সভা করে তাদের মতামত নিতে হবে।

মগন : যা হোক আমরা আজ প্রাথমিক আলোচনা করলাম। এর জন্য প্রয়োজন পঞ্চায়েতি -রাজ আর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন। ঠিক আছে আজ তাহলে আপনারা আসুন। প্রয়োজনে আমরা আরেকদিন বসব।

সকলে : ঠিক আছে। ঠিক আছে। (সকলের প্রস্থান)

মগন : কিন্তু বাপুজী, এত নিরক্ষর লোক পড়া লিখা শিখবে কি ভাবে!

গান্ধী : দেখো ভাল মন্দ জ্ঞান তো সকলেরই আছে, ব্যাপকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন ঘটাতে হবে। কাজটা শুরু হোক না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

মগন : কিন্তু বাপু মাধ্যম ! শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত! মাতৃভাষা না কি অন্য কোন সাধারণ মাধ্যম!

গান্ধী : দেখো, আমরা যেন ভাবতে শুরু করেছি ইংরেজী ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। কিন্তু না এ ধারণা ভুল। মাতৃভাষাটা ভাল করে জানলে অন্যগুলিও অধরা থাকবে না। যা হোক মগন! আমরা সবরমতী আশ্রম গড়ছি। তুমি জানতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিমধ্যেই বাংলার শান্তিনিকেতনে একটি শিক্ষা - আশ্রম গড়ে তুলছেন। বিরাট কর্মযজ্ঞ।

মগন : বাপুজী ! আপনি তো বহুদিন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যাবার কথা বলতেন!

গান্ধীজি : হ্যা যাব নিশ্চয়ই যাব! আমাদের ডায়রিটা দেখতো! (মগন ডায়রী দেখে)

মগন : হ্যা বাপুজী! লেখা রয়েছে আপনি কিছুদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতন যাবার ইচ্ছা রাখেন।

গান্ধীজি : হ্যা পৃথিবী বিখ্যাত শান্তিনিকেতন। আচ্ছা মগন! এই কেন্দ্র স্থাপনে কি কি বিষয় তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ?

মগন : আসল কথাটাই হলো পরিবর্তনশীল ভারতে শহর ও গ্রামের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধি।

গান্ধীজি : বাঃ

মগন : পাশাপাশি অন্য সকল দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে শ্রীনিকেতন।

গান্ধীজি : ওটা আবার কি!

মগন : শ্রীনিকেতন হলো যুবসম্প্রদায়কে আত্মনির্ভর হতে ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

গান্ধীজি : আরে, এতো দেখছি শিক্ষা আর কর্মসংস্থানের আয়োজন! মগন এতসব কথা আমি কেন বলছি জান?

মগন : কেন বাপুজী?

গান্ধীজি : তুমি তো জান আফ্রিকায় গড়ে তুলেছিলাম ফিনিক্স আশ্রম। আর ভারতবর্ষে চলছে সবরমতী আশ্রম গড়ে তোলার কাজ। তো হাতের কাছে রয়েছে এমন একটা মানুষ গড়ার কারখানা। যার কারিগর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সাবরমতীকেও একইভাবে গড়ে তুলতে হবে। মগন, আমাকে দেখতেই হবে। কিভাবে চলে এতবড় উদ্যোগ। আমি যাব, মগন, তুমি ব্যবস্থা করো।

মগন : যথা আজ্ঞা বাপুজি! আমি বাংলায় যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করছি।

(গান্ধী, কস্তুরবা ও মগনলাল শান্তিনিকেতন আসেন। ধুতি পাঞ্জাবী পোষাকে আগের ৬ জন দীনবন্ধু এনড্রুজ, পিয়ারসন, নেপালবাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, আলিবাবু প্রমুখ, তাদের বরণ করেন। এখানে গান্ধীজির আগমন উপলক্ষে রবিঠাকুরের লেখা একটি প্রার্থনা সঙ্গীত 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা' গাওয়া হয়।)

ক্ষিতিমোহন : মাননীয় গান্ধীজি! শান্তিনিকেতনে আপনি স্বাগত। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন!

গান্ধীজি : প্রণাম! প্রণাম! গুরুদেব আশ্রমে নেই?

এনড্রুজ : না তিনি জরুরী প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছেন।

পিয়ারসন : তবে আপনার জন্য একটি চিঠি রেখে গেছেন।

গান্ধীজি : দেখি দেখি! (একজন এসে মগনের হাতে একটি চিরকূট দেয়)

মগন : বাপুজী, বাপুজী! দেখুন গুরুদেব বাণী পাঠিয়েছেন। দেখুন, দেখুন!

গান্ধী : দেখি, দেখি !)কাগজের দিকে তাকিয়ে) (টেপে শব্দ)

রবীন্দ্র : " যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সৎ মহাত্মাজী তাহারই প্রতীক। তিনি ভারতের প্রাণস্বরূপ। তাইতো তিনি মহাত্মা। মহাত্মা গান্ধী। শান্তিনিকেতনে স্বাগত মহাত্মাগান্ধী।" (টেপে শোনা যায়)

গান্ধী : (কাগজটা মাথায় ঠেকিয়ে)- প্রণাম প্রণাম 'গুরুদেব' ! কি সৌভাগ্য ! আমি এসেছি বলে গুরুদেব বাণী পাঠিয়েছেন! মগনলাল ! কি সৌভাগ্য আমার! শোন! আমাদের সাবরমতীকেও এভাবে গড়ে তুলতে হবে! চলুন! (সকলকে) আশ্রমটা একটু ঘুরে দেখি।

ক্ষিতি : আসুন আসুন (সকলে শান্তিনিকেতনে ঘুরতে যায়)
(প্রোজেকশনে (১) শান্তিনিকেতন দেখানো হয়)
(মৃদু আবহ- যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে)

লাইট অফ।

(সবরমতী আশ্রম)

মগন : বাপুজী! শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসা অবধি এ কয়দিন তো আপনার উপর ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে।

গান্ধী : আরে রাখ তোমার পরিশ্রম! কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখে কি রকম লাগল বলো! আহা!

মগন : হ্যা সে আর বলতে।

গান্ধী : দেখো আমরা হয়তো গুরুদেবের মতো উন্নত শিক্ষার বিভিন্ন দিক খুলতে পারব না কিন্তু মগন একটা আদর্শ আশ্রমতো গড়ে তুলতে পারি। আমার স্বপ্নের সাবরমতী আশ্রম। যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে থাকবে, নিজের কাজ নিজে করবে, স্বচ্ছতা নিয়ে চলবে, দেশের সেবা করবে, কি পারি না?

মগন : কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব।

গান্ধী : আমাদের তো সত্যের পূজা, সত্যের সন্ধান করতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছি তার পরিচয়ও নিজের দেশ ভারতবর্ষে দিতে হবে।

মগন : আপনার সেই আদর্শ আর পদ্ধতি অনুযায়ী তো এখানেও কাজ চলছে বাপুজী। আজ আশ্রমে একটা নতুন জিনিস চালু হয়েছে সেটা আপনাকে দেখাব। এতদিন চরকায় সূতো কাটা হতো।

মগন : ঐ শুনুন আওয়াজ শোনা যায়। (তাঁতের আওয়াজ শোনা যায়)

গান্ধী : কিসের শব্দ এটা ? মগন! তাঁত?

মগন : হ্যা, চরকায় যে সূতো কাটা হয় তা দিয়ে এখন কাপড় তৈরী হবে। ঐ চলছে!

গান্ধী : হা ঈশ্বর! মগন তুমি একি অসাধ্য সাধন করলে?

মগন : বাপুজী! আপনার আদর্শে যে আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছিল লক্ষ্য আর আদর্শে স্থির থেকে এই সবরমতী আশ্রম ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গান্ধী : মগনলাল! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! (লাইট অফ)

(ওদিকে দেখা যায় রাস্তায় দু একজন লোক আসা যাওয়া করছে। টেপে শোনা যায়)

আন্টি ঃ জানো তো কবিতা ! সবরমতী আশ্রম শুরু হয়েছিল ৫ জন দিয়ে আর শেষে হয়েছে ২৩০ জন!

কবিতা : আন্টি সবই ঠিক আছে। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে কিভাবে গান্ধীজি প্রধান হয়ে উঠলেন!

আন্টি : সে আরেক গল্প! ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে খবর এলো বিহারের চম্পারণ জেলায় চাষীদেরকে নীলকর সাহেবদের অকথ্য নির্যাতন চলছে। খবর পেয়ে গান্ধীজী চম্পারণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।) **টেপ অফ**।

(দেখা যায় গান্ধীজির সঙ্গে অনেক লোক হৈচৈ। পথ ছাড়ো, কমিশনার, কমিশনার আসছেন। পথ ছাড়ো।)

কমিশনার: স্টপ, আই সে স্টপ! এক পাও এগোবেন না।

গান্ধী : না আমি এগোব না, কিন্তু চম্পারনে নীল চাষীদের উপর জুলুম সম্পর্কে আমি যা যা চেয়েছি সেসব তথ্য আপনি আমায় দিন!

কমিশনার: না, বাইরের কোন লোককে আমি তথ্য দিতে বাধ্য নই।

গান্ধী : না, আমি বাইরের লোক নই আমি একজন ভারতবাসী।

কমিশনার: হুঁ, ভারতবাসী! আমি এখনও বলছি ভালয় ভালয় এখান থেকে চলে যান, নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।

গান্ধী : মাননীয় কমিশনার! আপনি জনগণের সেবক। এভাবে সাধারণ মানুষকে ধমক দিতে পারেন না।

গান্ধী : আপনার ভালর জন্যেই বলছি।

কমিশনার : দেখুন কথা বাড়াবেন না। এখনও বলছি সময় আছে, এখান থেকে চলে যান।

গান্ধী : চলে যাবার জন্যে তো আমি আসিনি!

কমিশনার : ঠিক আছে ! শুনুন, আইন শৃঙ্খলার যদি অবনতি হয় তাহলে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে আপনি দায়ী থাকবেন। কোর্টে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। (প্রস্থান)।

গান্ধী : মিঃ কমিশনার (চেঁচিয়ে), শুনে রাখুন! আইন অনুযায়ী যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমি এখান থেকে যাব না। **(চম্পারণ আন্দোলনের ভিডিও-২ প্রথম ভাগ। প্রবেশ করে রাজ কর্মচারী)**

কর্মচারী : এখানে সই করুন।

গান্ধী : এটা কি?

কর্মচারী : আদালতের শমন।

গান্ধী : আদালতে শমন দিয়ে আন্দোলন রোখা যাবে না। (সই করে দেন। কর্মচারী চলে যায়)।

কোর্ট কর্মচারী : মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধী : হ্যা আমি।

কর্ম : আপনার চিঠি, ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়েছেন।

গান্ধী : চিঠি, দেখি, দেখি! (চেহারা উজ্জ্বল হয়। চিঠি পড়ে । (টেপে শোনা যায়) গভর্ণরের আদেশ অনুসারে মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। নীলচাষ বা নীল-চাষীদের সম্পর্কে গান্ধীজির যা অনুসন্ধান করার বিষয় তা তিনি করতে পারবেন। সরকারী কর্মচারীরা তাকে সাহায্য করবে।

(ভিডিওর ২ শেষাংশ সঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। লাইট অফ, ওদিকে অন)

আন্টি : এই আন্দোলনে গান্ধীজির বিরাট জয় সূচিত হয়।

কবিতা : বাঃ তারপার, তারপর কি হলো!

আন্টি : গভর্নর গান্ধীজিকে আলোচনায় ডাকেন। গান্ধীজি তাকে কৃষকদের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা জানান। গভর্নর তা মেনে নেন এবং তিন কাঠি প্রথা বিলোপের জন্য গান্ধীজির প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

কবিতা : তিনকাঠি! তিনকাঠি প্রথা কি আন্টি!

আন্টি : তিনকাঠি প্রথা হলো, নীলকর সাহেবরা নীল চাষীদের বাধ্য করত তাদের জমির প্রতি বিঘার মধ্যে তিন কাঠা জমি নীলচাষের জন্য বরাদ্দ করতেই হবে।

কবিতা : তো সেটা স্বাধীনতা আন্দোলনকে কিভাবে প্রভাবিত করলো।

আন্টি : এই কুখ্যাত প্রথা তিন কাঠিয়া নামে চম্পারনের কৃষকদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতদিন নীল চাষীরা জানত যে নীলকর সাহেবরা সমস্ত আইনের উর্দ্ধে। কিন্তু চম্পারনে গান্ধীজির আন্দোলন কৃষকদের নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় , এ এক বিরাট প্রাপ্তি। গান্ধীজি বিহারের চম্পারণে সত্যাগ্রহের যে সূচনা করেন তাই কালে কালে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়।

কবিতা : আচ্ছা!

আন্টি : এরপর এলো রাউলাট এ্যাক্ট। সে আর এক বিভীষিকা।

কবিতা : রাউলাট এ্যাক্ট! কিভাবে এর নাম হল, আর এই আইনটা ঠিক কি!

আন্টি : একজন ব্রিটিশ বিচারক সিডনি রাউলাটের নেতৃত্বে ভারতীয়দের উপর দমনপীড়ন মূলক আইন রচিত হয়। এটাই রাউলাট এ্যাক্ট। এতে শাসক শ্রেণী উৎসাহিতহয়। ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার বাড়ে। এর বিরুদ্ধে ১৯১৯ এর ৬ এপ্রিল ভারতব্যাপী ধর্মঘট হয়। এরপর ১২ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা হয়।

কবিতা : জালিয়ানওয়ালাবাগ! আরে ওখানে তো ইংরেজ শাসকরা বহু ভারতীয়দের গুলি করে মেরে ফেলে।

আন্টি : হ্যা আসলে এটা ছিল একটা বাগান। ছোট এই সভাস্থলে ঐদিন প্রায় ২০ হাজার ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন, আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে

গুলি করে পুলিশ হাজারেরও বেশী ভারতীয়কে মেরে ফেলে। উত্তাল হয়ে উঠে সারা দেশ।

(ভিডিও-৩ হত্যাকান্ড প্রদর্শন। স্লোগানে মুখরিত হয় মঞ্চ- বন্দেমাতরম্। বন্দে মাতরম্)

কবিতা : জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের নিন্দা করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের দেয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। বইয়ে এটা আমরা পড়েছি তো।

আন্টি : হ্যা এই ঘটনাই গান্ধীজিকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে টেনে নিয়ে আসে।

আন্টি : জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের কিছুদিন পর থেকেই দেশের নানা ক্ষেত্রে পটপরিবর্তন হতে শুরু করে। শুরু হয় লবণ আইনের বিরুদ্ধে ৪০০ মাইল ডান্ডি অভিযান। পাশাপাশি বেশ কিছু মানুষ সশস্ত্র আন্দোলনের দিকেও ঝুঁকতে থাকে। এদিকে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। উত্তাল হয়ে উঠে সারা দেশ। তখন বাংলা ছিল কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক তীর্থক্ষেত্র। জাতীয় নেতারাও ছিলেন এই রাজ্যে। তাদের প্রত্যক্ষ মদতে নারী -পুরুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কংগ্রেসের আন্দোলনে। (সমস্বরে) ইংরেজ ভারত ছাড়ো , ইংরেজ ভারত ছাড়ো।

কবিতা : আচ্ছা জালিয়ানওয়ালা-বাগের ঘটনা তো ঘটেছে পাঞ্জাবে কিন্তু এই যে বাংলার আন্দোলনের কথা বললে তার কি বিশেষ কোন ঘটনা তোমার জানা আছে?

আন্টি : হ্যা তাই তো বলছি।

কবিতা : কিরকম?

আন্টি : এতই উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল এই প্রদেশ, যে মেয়েরা পর্যন্ত দলে দলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে একজনের শহীদের নাম বললে তুমি হয়তো চিনতে পারবে।

কবিতা : বলতো সে নামটা।

আন্টি : মাতঙ্গিনী হাজরা!

কবিতা : ও! ওমা আন্টি মাতঙ্গিনী হাজরা সম্পর্কে আমরা পড়েছি তো!

আন্টি : বললাম না ! এই বীরাঙ্গনার জন্ম ১৮৭০ সালে, গান্ধীজির জন্মের পরের বছর। অর্থাৎ তারা দুজনেই ছিলেন সমসাময়িক। ৯ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় কিন্তু ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে তিনি একা একটি কুটিরে বসবাস শুরু করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন তাকে খুব টানতো। তিনি ছিলেন গান্ধীজির এক ভাবশিষ্যা। কংগ্রেস কোন আন্দোলনের ডাক দিলেই তিনি ঝাপিয়ে পড়তেন।

সবাই তাকে গান্ধীবুড়ি বলে ডাকত।

কবিতা : গান্ধীবুড়ি ! হা হা হা ! তারপর ! তারপর !

আন্টি : কংগ্রেস মিছিলের ডাক দিলো। প্রচুর সংখ্যায় মহিলারা এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ তিনি ছিলেন মিছিলের একেবারে সামনে। এদিকে তখন জারী করা ছিল ১৪৪ ধারা।

(শুরু হয় মিছিল। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম)

পুলিশ : (সমস্বরে) এই গান্ধীবুড়ি ! সাবধান আর এগুবে না !

মাতঙ্গিনী : আমাদের মিছিল সামনে এগিয়ে যাবে, তোরা কি করবি রে ?

পুলিশ : ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। সামনের দিকে এগোবে না !

মাতঙ্গিনী: এই ইংরেজের দালালগুষ্টি ! আমি তোদের বাধা মানব না ! আমি এগুবই !

পুলিশ : (সমস্বরে) এই বুড়ি যাবি না বলছি, খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু !

মাতঙ্গিনী : আরে যা যা, হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল। গান্ধীবুড়িকে তোরা চিনিস না। আমি যাবই।

(সঙ্গে সঙ্গে তিনটি রাইফেল থেকে একসঙ্গে গুলি, বন্দেমাতরম্ বলে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু। বন্দে মাতরম্)

কবিতা : ওরে ব্বাবা কিরকম থ্রিলিং ! তারপর আন্টি, তারপর কি হলো ?

আন্টি : বলে না দুর্ভাগ্য একাকী আসে না, একদিকে আন্দোলন তীব্র হলো অন্যদিকে অন্যান্য কিছু জ্বলন্ত সমস্যাও এসে হাজির হলো।

কবিতা : কিরকম, কিরকম ?

আন্টি : সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দেশে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে যে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ ছিল তা নানা জায়গায় নষ্ট হতে লাগল। কোন কোন জায়গায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতও বেঁধে যায়।

কবিতা : এরকম বিশেষ কোন ঘটনা তোমার জানা আছে কি !

আন্টি : হ্যা, তখন এরকম সংঘাত চলছিল। তো এর একটা তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয় কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ জিন্না ও গান্ধীজি।

(জিন্না এবং গান্ধীজির পরস্পর কথোপকথন)

জিন্না : মাননীয় মিঃ গান্ধী ! বিশ্বাস করুন, হিন্দু মুসলিম একসঙ্গে হাত না মেলানো পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত অগ্রগতি কক্ষনো সম্ভব নয়।

নেতা-১: আরে এটা কিরকম কথা হলো !

গান্ধী : কেন মিঃ জিন্না তো ঠিক কথাই বলেছেন ! জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের

ঐক্যবন্ধ না হলে চলবে না। নিজেদের মধ্যে সংঘাত হলে দেশ পিছিয়ে পড়বে না!

নেতা-১: আরে বাপুজী আপনিও একথা বলছেন!

জিন্না : হা হা হা।

গান্ধী : নিশ্চয় কেন আমারতো মনে হয় আমি ঠিকই বলছি।

জিন্না : নিশ্চয়ই দিস লাইন ইজ হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট!

গান্ধী : তা এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কিছু বলবে নাকি!

নেতা : হ্যা বলবো তো! নিশ্চয়ই বলবো।

গোন্ধী : তাহলে বলো, কি বলতে চাও !

নেতা : দেখুন হিন্দুরা এক মহান জাতি, হাজার বছর ধরে এর সমৃদ্ধি, এ বিষয়ে আপনি আমার থেকে বেশি অবগত। কিন্তু বাপুজী ! মুসলিমরাতো কোন জাতি নয়, একটা সম্প্রদায় মাত্র। জাতি আর সম্প্রদায় সমান নয়। এ দুটোর ভিত্তি প্রকৃতই অসম। তাই হিন্দু মুসলিম কখনো হাত মেলাতে পারে না।

জিন্না : (গান্ধীজির দিকে তাকায়। কিন্তু গান্ধীজি চুপ) বেশ তবে তাই হোক। (সভা শেষ। সব লাইট অফ।)

(জিন্নার বক্তৃতা। আলাদা লাইটে)

বন্ধুগণ! (এক কোণে শুধু জিন্না আলোকিত, বক্তৃতা করছেন।)

আমাদের শুধু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। এ অঞ্চলের মুসলিমদের একটি আলাদা জাতিতে পরিণত করতে হবে। নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে। অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই! তাই বন্ধুগণ! আমাদের জন্য চাই আলাদা রাষ্ট্র। এটাই হোক সময়ের দাবী। বন্ধুগণ আমাদের চাই স্বদেশ। চাই পিতৃভূমি- (সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন সূচক বিশাল সম্মিলিত ধ্বনি।) আমরা দাবি করছি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিকে হোক দেশভাগ। আমাদের পিতৃভূমি চাই, চাই স্বাধীন দেশ। (সম্মিলিত আওয়াজ।)

(অফ। এবার লাইটে আন্টি ও কবিতা)

আন্টি : (জিন্নার বিপরীত দিকে) হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি চোট খেল। এদিকে, গান্ধী মনোনীত ব্যক্তিকে হারিয়ে নেতাজী সুভাষ বসু তৎকালীন কংগ্রেসের শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হলেন। এ নিয়েও বাধল বিরোধ।

কবিতা : কেন কেন বিরোধ কেন?

আন্টি : কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ছিল এই বিরোধ। গান্ধীজি চাননি সুভাষ বসু সভাপতি হোন। পরে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে

গান্ধীজি আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসু সশস্ত্র আন্দোলন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার পক্ষে ছিলেন। দেশের নানা জায়গায় এই মতের সমর্থন ক্রমে বাড়ছিল। একদিকে ভগত সিং সহ বিভিন্ন সংগ্রামী প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে।

আন্টি : হ্যা অন্যদিকে প্রাণ দেন বিনয়-বাদল-দীনেশ।

কবিতা : ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন করে মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বেও প্রাণ দিলেন এক ঝাঁক যুবক যুবতী।

আন্টি : হ্যা। সুভাষ বসু ছেড়ে দিলেন কংগ্রেস । গঠন করলেন ফরোয়ার্ড ব্লক দল। পাশাপাশি কংগ্রেস দলেও পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবী গৃহীত হলো। শুরু হলো ভারতছাড়ো আন্দোলন। কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট।

(স্লোগান- ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ইংরেজ ভারত ছাড়ো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম)

কবিতা : তখনই তো সুভাষ বসু গঠন করলেন আজাদ হিন্দদ্ বাহিনী, আজাদ হিন্দ!

আন্টি : হ্যা, সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ বসু দেশ ত্যাগ করলেন। রাজনীতিতে শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র এই নীতি অনুসরণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের শত্রু জাপানের তোজো, জার্মানীর হিটলার, ইটালীর মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করে, তাদের সমর্থন আদায় করে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুভাষ বসু হলেন প্রধান মন্ত্রী।

কবিতা : ঠিক, এই ফৌজ তো সিঙ্গাপুর থেকে ব্রহ্মদেশ হয়ে মণিপুরে এলে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।

আন্টি : হ্যা যুদ্ধে ইংরেজ হেরে যায়। মণিপুরেই প্রথম ভারতের জয়সূচক ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা পুঁতে দেয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। কিন্তু তখনই খবর আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হেরে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সরবরাহ লাইন। বিলীন হয়ে যায় স্বাধীনতার সমস্ত স্বপ্ন।

কবিতা : আন্টি একটা বইয়ে পড়েছিলাম ওয়ার গ্রাউন্ড থেকে নেতাজী গান্ধীজিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন!

আন্টি : হ্যা তুমি ঠিক বলেছ । ইম্ফলে যুদ্ধের ময়দানে বসেই সুভাষ বসু মহাত্মা গান্ধীকে চিঠিতে লিখেছিলেন ।

(নেতাজী, মিলিটারী পোষাকে, চিঠি লিখছেন, টেপে শব্দ আসছে)

'বাপুজী,

ভারতের শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা সাহসিকতার সাথে ভারতের মাটিতে লড়ছে এবং সমস্ত বাধা সত্বেও ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ ব্রিটিশ নাগরিকটি ভারতের মাটি থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত এবং

নয়া দিল্লীতে লালকেল্লায় আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা না উড়া পর্যন্ত এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে। হে আমাদের জাতির পিতা, ভারতের এই পবিত্র মুক্তি-যুদ্ধে আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি। জয় হিন্দ " (তীব্র গতিতে একটি জঙ্গী বিমান উড়ে যাবার শব্দ দিগন্তে মিলিয়ে যায়)

কবিতা : (কেঁদে) আন্টি, নেতাজী কি ঐ বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছিলেন আন্টি!

আন্টি : (কেঁদে) জানি না কবিতা, আমি জানি না। (লাইট অফ, ওদিকে তিন ইংরেজ ক্রুর হাসিতে মত্ত)

১,২,৩ : হা হা হা হা/ হা হা হা হা

১ : অবস্থা কিন্তু সুবিধার নয় কি বল!

২ : ঠিক, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

৩ : চল তিন টুকরোই করা যাক।

১ : কিরকম! কিরকম?

২ : মূল ভূখন্ড, পাক আর বাংলা , হা হা হা। জিন্নাকেও তো ঠান্ডা রাখা দরকার! কি বলো?

৩ : একদম ঠিক! তাহলে কি দাঁড়াল? পূর্ব/পশ্চিম আর মূল ভূখন্ড!

১ : হ্যা ঠিক তাই। কারণ প্রেসার দিন দিন বাড়ছে। আর দেখো, উইপনস্ যখন হাতে নিয়ে নিয়েছে তখন আর দেরি করা ঠিক হবে না।

২ : হ্যা এখনো সময় আছে। বিভাজনটা এখনই করে দিলে আমাদের প্রতি দু দলেরই আনুগত্য দীর্ঘদিন বজায় থাকবে।

৩ : আমার মনে হয় দুটো দেশই করা হোক। আন্ডার-ওয়ান- এথিক্স। মুসলিম এন্ড হিন্দু।

১ : হা হা হা নাইস, ভেরি নাইস। বাট জায়গা যে ভিন্ন?

২ : আরে বাবা বুজছ না কেন! মুসলিমদের জন্য রইল দুটো জায়গা। ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, আর এদিকে ওদের জন্য মেইনল্যান্ড তো রইলই।

৩) : ও ফেন্টাস্টিক। ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট এ ঝগড়াটাও রইল। দেখ না কতদিন টিকে থাকে। হা হা হা।

১২৩ : হা হা হা

১ : কিন্তু ডেট, ডেট, ডেটটা কি হবে।

২ : আহা যা হোক একটা করে দাও না! আগের দিন আর পরের দিন। একটা উন্মাদনার ব্যাপারও আছে তো! স্বাধীনতা বলে কথা।

সকলে : হা হা হা হা।

৩ : ওকে, তাহলে ফরটিন্থ আর ফিফটিন্থ অফ আগষ্ট, ফরটি সেভেন করে দিচ্ছি।

(কাগজে) ওকে!

(তিনজনে হেসে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সম্মতি জানায়) হয়ে গেল সো কলড্ স্বাধীনতা। হা হা হা।

(ওদিকে সব লাইট অফ। শুধু একদিকে ছোট্ট লাইটে কবিতা আর আন্টি)

কবিতা : আন্টি! তখন গান্ধীজি কোথায়?

আন্টি : গান্ধীজি, গান্ধীজি তখন কোলকাতার বেলেঘাটায়, দাঙ্গা পীড়িত এক মুসলিম পরিবারের সদস্যদের সেবায় ব্যস্ত।

(অন্যদিকে নীচে চাটাইয়ে বসে গান্ধী, এক মুসলিম পরিবারকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন)

(পিছনে পতাকা নিয়ে সারা মঞ্চে লোকের দৌড়াদৌড়ি আর বন্দেমাতরম্ স্লোগান)

আন্টি : সারা দেশের মানুষ কত খুশি, চারদিকে আনন্দ, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিছুদিন পরে গান্ধীজি দিল্লী গেছেন। তার বিশেষ কোন হেলদোল নেই। তিনি দেশের মন্ত্রীসভায় নেই। নেই কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেও। এমনভাবেই তার দিন কাটছে।

কবিতা : তারপর! তারপর কি হলো?

আন্টি : এলো ১৯৪৮ সালের সেই ৩০ জানুয়ারী। বাপু প্রার্থনা সভায় যাচ্ছেন। সঙ্গে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ সঙ্গী। হঠাৎ করে কি যে হলো।!

আততায়ী : (রাস্তায় চিৎকার) হল্ট! (গুলি, তিনটা গুলির শব্দ। আততায়ী মেরেই দৌড়ে পালায়। আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান গান্ধী)।

গান্ধী : হায় রাম! (সঙ্গীরা চিৎকার করে)

(সমস্ত আলো নিভে। প্রবেশ করে ঘোষক ও দুজন দর্শক - প্রথম দৃশ্যের অবস্থার মত)

ঘোষক : সুধী সজ্জনমন্ডলী,

সারা জীবনই গান্ধীজি ভারতবর্ষকে একটি গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। চেয়েছেন এমন এক সমাজ যার সার কথা একে অন্যের দুঃখ ভাগ করে নেয়া। এটা স্বীকার করতেই হবে যে অহিংসা আর সত্যাগ্রহ ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। আমাদের সংবিধানে ছড়িয়ে আছে এমন অসংখ্য সব মণিমুক্তো যাদের পেছনে গান্ধীজির প্রভাবই হয়তো সর্বাধিক।

দর্শক-১: হ্যা একথা আপনি ঠিকই বলেছেন। জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন, মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা, সারা দেশকে স্বচ্ছ রাখার পরিকল্পনা, সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বীকৃতি, বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতীরাজ ইত্যাদির তালিকা দীর্ঘ।

দর্শক- ২ : নিশ্চয়ই ! এটা ঠিক যে গান্ধীজির চিন্তা - প্রসূত নীতিগত বহু বিষয় স্বাধীনতার পরে আইনে পরিণত হয়ে এখনো ভারতীয় সমাজকে দৈনন্দিন দিশা দেখিয়ে যাচ্ছে।

ঘোষক : হ্যা ঠিক। তবে এটাও সঠিক যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এবং সমসাময়িক মহানুভবদের সঙ্গে বহুবার গান্ধীজির মতান্তর বা ভিন্ন মত ভারতীয় সমাজে সুবিদিত, কিন্তু কখনো বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে মনান্তর হয় নি বা একে অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রকাশ করেন নি।

(দেখা যায় পেছনের উঁচু একটা জায়গা থেকে বলছেন রবিঠাকুর)

যুগে যুগে সংসারে দৈবাৎ এইরকম মহাপুরুষের আগমন হয়। মহাত্মাজীই হলেন একমাত্র লোক যিনি জনগণকে নৈরাশ্যের শোচনীয় অবস্থা এবং আত্ম-অপমানকর দাসত্বের গ্লানি হইতে জাগাইয়া তুলিতে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহিত করিয়াছেন। তাহার আশা ও বিশ্বাসের বাণী রাতারাতিই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। যে সব মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের শিরে অপমানের বোঝাকে নিত্যকালের সঙ্গী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে সেইসব মানুষের হৃদয়ে তিনি সাহস ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন। যিনি এই অলৌকিক ঘটনাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রতি সবিস্ময় শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি। জয়তু মহাত্মা গান্ধী।

ঘোষক : মাননীয় সুধীজন, দেখুন, আমাদের দেশ নানাদিকে যতই এগিয়ে যাক না কেন এটা কিন্তু ঠিক, যে এক ধরনের নীতি-হীনতা বর্তমানে আমাদের চারপাশ তছনচ করে দিচ্ছে। তাই জাতীয় জীবনে গান্ধীজির নীতিবোধ আর সত্যবাদিকাকে এখন খুবই প্রয়োজন। চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য তিনিই বলতে পারতেন যে তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। সুতরাং দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জনকল্যাণকর আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কল্যাণকর।

(সামনের লাইট অফ)

(সাইক্লোরামায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অগণিত শিল্পীদের গলায় মহাত্মাজীর ১৫০ বর্ষের পূর্ত্তি-সঙ্গীত।)

ঋণ স্বীকার ঃ-

১) আত্মকথা ঃ মো. ক. গান্ধী ২) গান্ধী মানস ঃ আর.কে.প্রভু, ইউ.আর.রাও
৩) গান্ধীজি জীবনী ঃ তীর্থপতি দত্ত ৪) গল্পকথায় গান্ধীজি ঃ বিপুল রঞ্জন সরকার
৫) গান্ধী নেহেরু সুভাষচন্দ্র ঃ শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬) মহাত্মা ও গুরুদেব ঃ অমলেন্দু দে ৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ সহ বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকী ।

With Best Compliments from :-

RELIANCE

MDRT

Md. Jahirul Uddin (SENAP)
(Financial Planing Advisor)
DIMOND CLUB (2 Times)

M D R T, USA, 2 Times

RELIANCE NIPPON
Life Insurance Company Ltd.

Address

2nd Floor, Holding No: 602N/602J, T.G. Rd.
Ker Chowmuhani
Above Vijoya Bank
Ramnagar, Agartala, Tripura
9485156074/9774878258

With Best Compliments from :-

KHOWAI MUNICIPALITY

Khowai, Tripura

Address

Kabiguru Park
Khowai, Tripura